বিশ্ব
পরিচয়
দেব সাহিত্য কুটীর
ক লি কা তা

প্রকাশ করেছেন—

শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন

কলিকাতা—৯

সম্পাদনা করেছেন—

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবেত্তাগণ

প্রথম প্রকাশিত হয়েছে—

দশহরা

১৩৫৮

সংশোধিত ৩য় সংস্করণ—

মাঘ

১৩৬০

ছবি এঁকেছেন—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-চক্রবর্ত্তী

ছেপেছেন—

এস. সি. মজুমদার

দেব প্রেস

২৪, ঝামাপুকুর লেন

কলিকাতা—৯

দাম আট টাকা
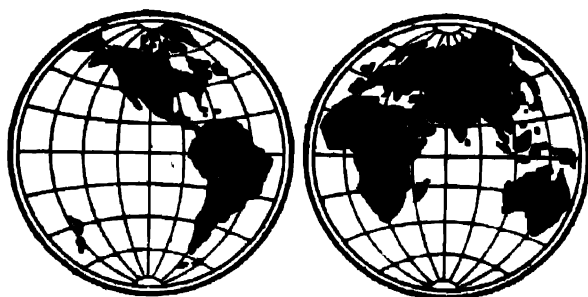
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার রেফারেন্স হিসাবে (স্কুল ও কলেজের জন্য)
অনুমোদন করেছেন (গেজেট, ২০শে মার্চ্চ, ১৯৫২)

এক
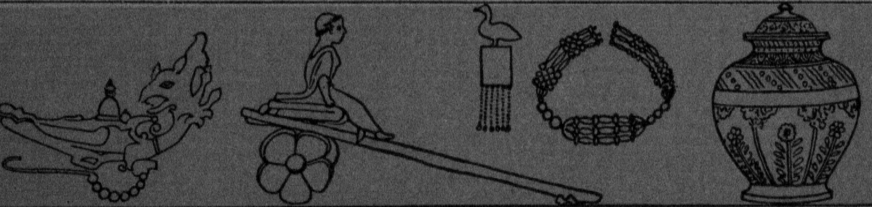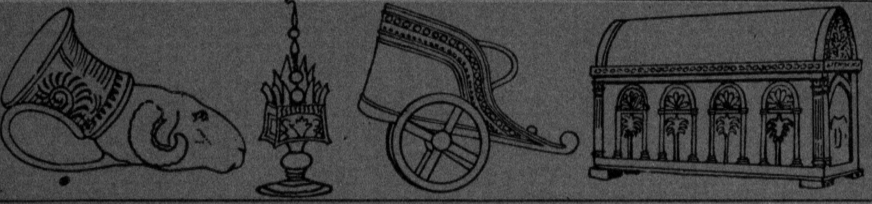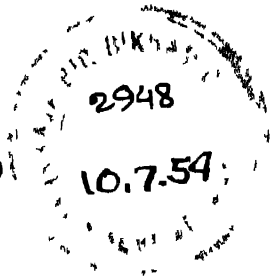
স্মৃষ্টির আদিম যুগে—সে কতো লক্ষ কোটি বছর আগের কথা তা কে জানে—অনন্ত আকাশে ঘুরে বেড়াতো শুধু ধোঁয়াটে বাষ্পের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা। না ছিল রূপ, না ছিল রেখা। কেটে গেলো আরো কতো শত বছর। তারপর একদিন কোন্ অজানা রহস্যবলে, কেমন ক'রে তারই মাঝে জন্ম নিলো পৃথিবী। কিন্তু তখনো সে শুধুই পৃথিবী—জীবধাত্রী বসুন্ধরা নয়, এমন কি সমুদ্রস্তনিতা পৃথ্বীও সে নয়। বন্ধ্যা পৃথিবী—মর্মবেদনায় তার নিজের দেহমনই শিউরে ওঠে নিশিদিন। মনে জাগে তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা—আর তারি পরিণতিতে নীলাম্বু মহাসাগর-রূপে তার বক্ষে বুঝি দেখা দিলো স্নেহসুধাধারা। তার দেহে জাগ্‌লো জীবনের স্পন্দন। তারপর নিত্যনূতন জীবনের সংস্পর্শে সসাগরা ধরিত্রী যেন প্রথম সন্তানবতী জননীর মতোই সেদিন মহিমময়ী গরীয়সী মূর্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

'…শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে, উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।'

দেহ তার বিচিত্র শোভায় হ'য়ে ওঠে উদ্ভাসিত। তারপর পৃথিবীতে এলো প্রাণী—এলো পশুপাখী, এলো মানুষ। কবির ভাষায়—

'…প্রাণস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে ; তোমার মৃত্তিকা সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন।'

তাদের বিচিত্র কলরবে, তাদের পদধ্বনিতে পৃথিবী অনুরণিত হ'য়ে উঠ্‌লো। খুশীতে ভরে উঠ্‌লো তার সারা মন। জীবধাত্রীর বাৎসল্যের ধারায় অভিসিঞ্চিত হ'লো জীবকুল।

মানুষ ধরিত্রীমাতার কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠের মতোই তার আব্দার আর বায়না। তাই তার আগমনে জটিলতর হ'য়ে উঠ্‌লো পৃথিবীর সমস্যা। মানুষ চায় আহার, কিন্তু সে আহার শুধু স্বচ্ছন্দ নবজাত শাকসব্জি দিয়ে নয়। বুদ্ধি আর হাতের সাহায্যে সে কৃষিকার্য করে, ফসল উৎপাদন করে, তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে সে বেঁচে থাক্‌তে চায় পৃথিবীর বুকে। কাজেই দেখা দিলো ভূমির সমস্যা। প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণাতেই তারা বংশবিস্তার করে—আর বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করে। সে সমস্যার সমাধানে মানবসন্তান ছড়িয়ে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে, এদিকে সেদিকে।

কিন্তু শুধু ভূমি হ'লেই তার চলে না—সুস্থদেহে বেঁচে থাকবার প্রেরণায় তার চাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সুরু হ'লো প্রতিযোগিতা, আর প্রতিযোগিতা তো চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধার ঘেঁষেই। কাজেই শীঘ্রই তাদের মধ্যে সুরু হ'য়ে গেলো ভূমির দ্বন্দ্ব বা জমির লড়াই।

এ লড়াই কিছুকাল সীমাবদ্ধ রইলো ব্যক্তি বা দলের মধ্যেই। কারণ, আদিম মানুষ অনেককাল যাপন করেছে যাযাবরের জীবন। তারা যখন যেখানে আহার্যের সন্ধান পেয়েছে অথবা যেখানে পেয়েছে তাদের গৃহপালিত পশুর উপযোগী চারণভূমি, তারা দলবেঁধে ছুটে গেছে সেখানেই। সে ভূমিতে হয়তো লুব্ধ হ'য়ে ছুটে গেছে অন্য এক মানবগোষ্ঠী—আর তখনি তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ। জীবন-সংগ্রামে তো যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটে। তাই এ সঙ্ঘর্ষ, এ শক্তি-পরীক্ষায় যোগ্যতমের আঘাতে হয়তো হীনতেজার বিলোপ ঘটেছে। ধরণীর শ্যামশীতল বক্ষোদেশ তারি সন্তানের উষ্ণপ্রবাহে কদমাক্ত হ'য়ে উঠেছে। বারবার ঘটেছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আর ধরণীমাতার কাতর ক্রন্দন যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে আকাশে বাতাসে। কবির কথায়—

'অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ
দিয়েছে পঙ্কিল করি—

দস্যু-পদ-পাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।'

এই যাযাবর জাতিই হয়তো বা কখনো রণক্লান্ত হ'য়ে, কখনো প্রচুর আহার্য ও চারণভূমির সংস্থানে স্থায়িভাবে বেঁধেছে কুটির—মানুষের চিরন্তন আশ্রয়। কুটিরে কুটিরে গড়ে ওঠে জনপদ—গ্রাম আর নগর। আর তারি সমাবেশে গড়ে উঠ্‌লো সমাজ আর রাষ্ট্র—রচিত হ'লো মানবেতিহাসের প্রথম অধ্যায়। সভ্যতার একটি সোপানে রেখাঙ্কিত হ'লো মানবের পদচিহ্ন।

এইভাবে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হ'লো বটে, কিন্তু শান্তির প্রতিষ্ঠা হ'লো না। কারণ ক্রমবর্ধমান মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন রুচি আর চিন্তাধারা সভ্যতার সংস্পর্শে ক্রমশই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছিলো। তাই শ্রেষ্ঠ আহার্য, শ্রেষ্ঠ বাসস্থান, অতুল ঐশ্বর্য আর দুর্বার ক্ষমতালাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় পারস্পরিক সজ্ঘর্ষ ভীষণতর আকার ধারণ করলো। সভ্যতা হ'লো বিধ্বস্ত, আবার তারি উপর হয়তো গড়ে উঠ্‌লো নোতুনতর সভ্যতার বুনিয়াদ। প্রলয় আর সৃষ্টি হাত ধরে চল্লো পাশাপাশি—

'উন্মথিত ইতিহাস
প্রকাশ লভিতেছিল অকস্মাৎ সৃষ্টিতে প্রলয়ে ;
বারম্বার অবলুপ্ত সভ্যতার ভূগর্ভ বিলীন
কবরের 'পরে
উঠেছে হঠাৎস্ফূর্ত প্রতাপের স্পর্ধিত পতাকা।'

মানুষ আশাবাদী। তাই ধ্বংসের মধ্যেও পরম সৃষ্টির বীজ দেখতে পায় ; তাই মানুষ কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখেই হতাশ হ'য়ে পড়ে না—ধর্মাশোকের নোতুন সভ্যতা-সৃষ্টি তাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে দেয়! মানুষ সৃষ্টি ক'রে চলে ইতিহাস।

দুই

ইতিহাস বলি কাকে? সে কি শুধুই যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী? সে কি শুধু ক্ষমতালোভীদের শক্তি-পরীক্ষার ফলাফল! সাধারণভাবে কোন দেশের বা জাতির রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনকেই আমরা ইতিহাস বলে মনে ক'রে থাকি।

তাই আমরা রাজার জন্ম আর মৃত্যুর তারিখ, তার যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীকেই ইতিহাসে মুখ্যস্থান দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তো তা' নয়!

রাজা বা রাষ্ট্রপতি হ'তে পারেন একটা গোটা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, হ'তে পারেন তিনি প্রজাস্বার্থের প্রতিভূ, কিন্তু তিনিই তো সব ন'ন! তার বাইরে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছে, রয়েছে তাদের ভাবনা-কামনা, আশা-নিরাশা আর সুখ-দুঃখময় জীবন, তার সঙ্গে রাজার তো কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই! তবে রাজার ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীতে সেই অগণিত জনগণের প্রতিফলন দেখ্‌তে পাবো কেন? আজ সময় এসেছে, নোতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাসকে বিচার করতে হবে, ইতিহাসের পুনর্মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। নইলে ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের ব্যর্থ হবে।

সত্য বটে, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজ-রাজড়াদের কাহিনী বাদ দিয়ে ইতিহাস রচিত হ'তে পারে না; কিন্তু শান্তির কাহিনী, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কাহিনীও তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে অঙ্গাঙ্গিভাবে—তবেই ইতিহাস হবে সর্বাঙ্গীণ। মানব-সভ্যতার উত্থান-পতনে ছোট বড়ো যে-সমস্ত উপাদান জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যদি থাকে অসম্পূর্ণ, তবে ইতিহাস-পাঠের উপকারিতাকে আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার সুযোগ পাবো কী ভাবে? পূর্বতন ইতিহাসের শিক্ষা এবং তজ্জাত অভিজ্ঞতা যদি সভ্যতাকে একটুখানিও এগিয়ে দিতে না পারে, তবে সে ইতিহাসের সার্থকতা কোথায়?

'ইতিহ' + 'আস' = 'এইরূপই ছিল' এইটেই আমাদের জান্‌বার কথা। তারপর বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এর সারটুকু আহরণ করে আমাদের শিক্ষাকে করবো সম্পূর্ণ, অভিজ্ঞতাকে করবো কার্যোপযোগী। এমনিভাবে নোতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে কোন দেশের বা জাতির সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস-রচনাই ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

তিন

আরও একটা কথা। যেদিন ধরিত্রীমাতার কনিষ্ঠ সন্তান সভ্যতার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল, সে দিন থেকে আজকের দিনের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। মানুষ রচনা করে চলেছে ইতিহাস, গড়ে তুলেছে সভ্যতার দৃঢ় বুনিয়াদ।

সে আর কোনক্রমেই স্বতন্ত্র বা একক নয়। কোন কাজের ফলই আর তাকে একলা ভোগ করতে হয় না। বিজ্ঞান আজ আর প্রকৃতির কোন বাধাকেই স্বীকার করছে না। দুই দেশের মধ্যবর্তী ভৌগোলিক সীমানা সত্যি সত্যি আজ আর কোন বাধা নয়। বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, পরকে করেছে আপন। ফলে কোন রাষ্ট্র বা জাতিই আজ আর অন্য-নিরপেক্ষ নয়—একের অপরাধের বোঝা অপরের কাঁধে চড়ে বসে ; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে যে কত পড়েছে, সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অবিরল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দু'টি মাত্র জাতির সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ সভ্য মানবসমাজ নিজের নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নিয়েছিল, একের উত্থান ও পতন অপরের ভাগ্যকেও করেছে নিয়ন্ত্রিত। তাই কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস অন্য-নিরপেক্ষভাবে আলোচনা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস যখন পারস্পরিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, একের ভাগ্যসূত্র যখন অন্যের সঙ্গে গ্রথিত, তখন সমগ্রভাবে পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা-দ্বারাই দেশ-বা জাতিবিশেষের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় প্রচলিত ইতিহাস যে জাতির বা দেশের আংশিক পরিচয়মাত্র বহন করবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই এই সদ্য-কথিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাসপদবাচ্য।

চার

বাংলাদেশ আর বাঙ্গালীজাতির সামনে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে 'কঃ পন্থাঃ'? একটা দেশ আর জাতি যে যুগসঞ্চিত সভ্যতার দৃঢ় বুনিয়াদে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'য়েছিল, তার ভিত্তিতে ফাটল দেখা দিয়েছে, মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে সে বুনিয়াদ। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসও কি জলবুদ্বুদের মতোই অবলুপ্ত হ'য়ে যাবে?—মনীষীদের চিন্তাস্রোত আজ এই পথেই প্রবাহিত হচ্ছে।

কিন্তু কি এর প্রতিকার? কোথায় তার মুক্তি?

এর প্রতিকারের পথ, এর মুক্তির উপায় আমরা খুঁজে পাবো পৃথিবীর ইতিহাসে। কারণ ইতিহাসের ইঙ্গিতে বহুতর মুমূর্ষু জাতিই আত্মচেতনা আর আত্মশক্তি লাভ করে আজও পৃথিবীর বুকে সগৌরবে দণ্ডায়মান।

পাঁচ

প্রাগুক্ত বহুমুখী উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কামনায় আমরা আজ বাঙ্গালীর হাতে তুলে দিচ্ছি পৃথিবীর ইতিহাস বা 'বিশ্ব-পরিচয়'। বিশ্বের বহু মনীষীর মানস-কুসুম থেকে তিল তিল মধু আহরণ করেই আমরা তিলোত্তমারূপী বিশ্ব-পরিচয়ের মধু ভাণ্ডার গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। তাঁরা সবাই নমস্য—ঋণ বা কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অবকাশ কোথায়! কিন্তু তবু উল্লেখ করতে হয়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার যদুনাথ সরকার, ডাঃ ভাণ্ডারকর, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ হেমচন্দ্র চৌধুরী—এঁদের কথা। ওঁদের আজীবন সাধনার ফল আমরা যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ।

বাঙ্গালীর সেবায় আমাদের এই শ্রম যদি বিন্দুমাত্রও স্বীকৃত হয়, তবেই আমরা ভাব্‌বো—'ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।'

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালী ইতিহাস-বিমুখ—বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ চিরকালের। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে বাঙ্গালী যে আত্মসচেতন হ'য়ে উঠেছে, তাতে তার প্রতি আরোপিত অভিযোগ খণ্ডিত হ'য়েছে—স্পর্ধা নিয়েই আমরা এ কথা ঘোষণা করছি। যে দেশে 'বিশ্ব-পরিচয়ের' মতো বই দু'মাসে নিঃশেষ হয়ে যায়, সে দেশের অধিবাসীকে আর যাই বলি না কেন, কোনক্রমেই আত্মবিস্মৃত বলতে পারিনে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, স্বাধীনতার নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর মনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সভ্যতার ইতিহাস অবগত হ'বার জন্যে একটা ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দিয়েছে। নোতুন সংস্করণ তৈরী করবার তাগিদ পাচ্ছি প্রতিদিন কত শত পাঠকের কাছ থেকে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে সহৃদয় পাঠকদের হাতে দ্বিতীয় সংস্করণ 'বিশ্ব-পরিচয়' তুলে দিতে দেরী হলো তারও কারণ আছে

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে মানচিত্রের রং বারবার আবর্তিত হচ্ছে—সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি ঘটনাই তার প্রমাণ। এই সংঘাত-মুখর দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ইতিহাসের পুনর্লিখন বড়ো সহজসাধ্য নয়। পরন্তু যে নোতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনা করেছি, তাতে আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বভার অনেক বেশি দুরূহ হ'য়ে উঠেছে।

'দেব সাহিত্য কুটীর'-প্রকাশিত এই 'বিশ্ব-পরিচয়ের' সঙ্কলন বাংলা ভাষায় একটি নোতুন ধরণের প্রচেষ্টা। এতে বিশ্ব-ইতিহাসের ঘটনাসমূহ পুঞ্জীভূত করা হয়নি। অসংখ্য চিত্র-সংযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের মানব-সভ্যতা ও ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারার প্রতি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় আলোকপাত করা হ'য়েছে! দেশে দেশে যুগে যুগে যাবতীয় দৃশ্যমান বিভেদ-বৈষম্যের অন্তরালে, সব কিছু ছাপিয়ে ইতিহাসের স্বকীয় আবর্তনের রেখাঙ্কন ও একটি পরিব্যাপ্ত ঐক্যের সুর প্রবহমান। অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের ঘটনা-

বলীর যথাযথ বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই অনাহত প্রবাহের সূত্রটি পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরাই এই পুস্তক-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কিছুটা পরিবর্তন এবং অনেকটা সংযোজন করা হ'য়েছে। ধারাবাহিক সম্পৃক্তি রক্ষার জন্য কতকগুলি অনুল্লিখিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসকে যথাসম্ভব আধুনিক-কাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হ'য়েছে, প্রয়োজনস্থলে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও সংযোজিত হ'য়েছে।

'বিশ্ব-পরিচয়'কে সম্পূর্ণতর পৃথিবীর ইতিহাসে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে এই সংস্করণে আরও কয়েকটি নোতুন দেশের ইতিহাস-সংযোজনা আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে; যেমন—ইন্দোনেশিয়া, মালয়-ইন্দোচীন এবং বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাস। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল, দ্বীপময়ভারত বা 'সুবর্ণভূমি'র সঙ্গে ভারতের যোগা-যোগ বহুকালের—কাজেই ভারতের ইতিহাস-প্রসঙ্গে দ্বীপময় ভারতের ইতিহাসও আবশ্যিক আলোচ্য বিষয়। বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জ ইউরোপের রাষ্ট্রনীতির মহাঝঞ্ঝা-সঙ্কুল কেন্দ্রস্থল—এর আভ্যন্তরীণ কলহ অন্যূন দুইবার সমগ্র পৃথিবীর বুকে মহা অনর্থের সৃষ্টি করেছে, তাই বল্কান রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাস যোগ না করলে ইউরোপের ইতিহাস সম্পূর্ণাঙ্গ হবে না।

পরিশেষে নিবেদন—এত বৃহৎ কর্মসম্পাদনে স্খলন-পতন-ত্রুটি প্রায় অনিবার্য। তথাপি আমরা গ্রন্থকে সর্বপ্রকার দোষমুক্ত করে তোলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—পাঠকসমাজ সাদরে গ্রহণ করলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গুপ্ত মহাশয় বর্তমান সংস্করণ তৈরীর ব্যাপারে যে দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রকাশক

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

[একবর্ণ]

চিত্র-পরিচয়		পৃষ্ঠা	চিত্র-পরিচয়		পৃষ্ঠা
ইস্তাম্বুলের একটি মসজিদ	...	১৫৯	পেরিক্লিস্	...	২১৮
মুস্তাফা কামাল পাশা	...	১৬৫	পেরিক্লিসের বিদ্বৎ-সভা	...	২১৯
আব্রাহামের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশের দৃশ্য	...	১৬৯	সিসিলিতে এথেনিয়ানদের দুর্দ্দশা	...	২২০
সল ও ডেভিড্	...	১৭০	সক্রেটিস	...	২২১
ডেভিডের টাওয়ার	...	১৭১	সক্রেটিসের বিষপান	...	২২২
রাজা সলোমন	...	১৭২	ইপামিণ্ডাসের মৃত্যু	...	২২৩
সলোমনের মন্দিরের একটি দৃশ্য	...	১৭৩	থিবসে মাসিডন-রাজ ফিলিপ	...	২২৪
নেবুচাডনেজার জুডারাজ্য ধ্বংসের দৃশ্য	...	১৭৪	দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার	...	২২৫
জেরুজালেম নগরীর ধ্বংসাবশেষ	...	১৭৫	আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক দুষ্ট ঘোটক দমন	...	২২৬
জেরুজালেম নগরীর পুনর্গঠন	...	১৭৬	কমিশিয়া কিউরিয়াটা	...	২২৮
পবিত্র জর্ডন নদী	...	১৭৭	প্যাট্রিসিয়ান সমীপে প্লিবিয়ান প্রজা	...	২৩০
ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুখৃষ্ট	...	১৭৮	ভল্সিয়ানদের সহিত রোমানদের যুদ্ধের দৃশ্য	...	২৩১
পো-নগরের মন্দির	...	১৮২	রোমান সেনেট কর্ত্তৃক পাইরাসের সন্ধি-প্রার্থনা অগ্রাহ্যকরণের দৃশ্য		২৩২
আঙ্কোরভাট	...	১৮৪	ট্রাসিমেন হ্রদের যুদ্ধ	...	২৩৪
বায়ন মন্দির	...	১৮৬	জামার যুদ্ধের দৃশ্য	...	২৩৫
বায়ন মন্দিরের স্থাপত্য নিদর্শন	...	১৮৭	শস্য-আইন পালনের দৃশ্য	...	২৩৬
বরবুদার মন্দির	...	১৯২	সুল্লা ও মেরিয়াস	...	২৩৭
বরবুদার সোপানাবলী	...	১৯৪	জুলিয়াস্ সীজার	...	২৩৮
বরবুদার গ্যালারী	...	১৯৬	পম্পে কর্ত্তৃক জেরুজালেম অধিকারের দৃশ্য	...	২৩৯
বুদ্ধমূর্ত্তি	...	১৯৮	বন্য বরাহ শিকার	...	২৪১
সোকার্ণো	...	২০২	রোমের এ্যামফে থিয়েটার	...	২৪১
ঈজীয়ান যুগের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দালান	...	২০৬	সম্রাট্ নীরো	...	২৪২
মহাকবি হোমর	...	২০৭	সম্রাট্ হাড্রিয়ান	...	২৪৩
থুকিডাইডিস	...	২০৭	সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস্	...	২৪৪
ঐতিহাসিক হেরোডোটাস	...	২০৮	রাজসভায় সম্রাট্ কনষ্টান্টাইন	...	২৪৫
প্রাচীন স্পার্টায় শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা	...	২০৯	রোমান ধনীদের প্রমোদ উদ্যান	...	২৪৭
প্রাচীন অলিম্পিক ক্রীড়া	...	২১০	গ্যারিবল্ডী	...	২৪৯
স্পার্টার একটি ভোজনশালা	...	২১১	ইতালির সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি	...	২৫১
এথেন্সের বিধানদাতা সোলন	...	২১২	মুসোলিনী	...	২৫৪
সোলন কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র সংস্কার	...	২১৩	প্রটেষ্টাণ্ট মতের প্রবর্ত্তক মার্টিন লুথার		২৫৯
সারাদিস নগরী দগ্ধকরণ	...	২১৪	ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি	...	২৬১
ম্যারাথন-যুদ্ধের দৃশ্য	...	২১৫	গ্রেট ইলেক্টর	...	২৬২
থার্ম্মোপলি-যুদ্ধের দৃশ্য	...	২১৬	ফ্রেডারিক দি গ্রেট	...	২৬৩
সলোমিসের জলযুদ্ধ	...	২১৭			

চিত্র-পরিচয় — পৃষ্ঠা

[একবর্ণ পূর্ণপৃষ্ঠা]

চিত্র-পরিচয় | পৃষ্ঠা

[ত্রিবর্ণ]

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী... ...

....

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,

বিপরীত তুমি ললিত কঠোরে,

....

মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।

ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা,

বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,—

তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;

দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।

....

তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,

ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,

সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা

তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,

ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

—রবীন্দ্রনাথ

শবাধারে মিশরের 'ম্যামি'

মিশর

ফারাওদের দেশ

মরুভূমি-ঘেরা উত্তর-আফ্রিকার মধ্যে পূর্ব্বপ্রান্তে একটি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ আছে; তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদ। এই দেশটির নাম মিশর। আফ্রিকার মধ্যদেশে বড় বড় হ্রদ এবং আবিসিনিয়ার পাহাড়-পর্ব্বত-অঞ্চলে নীল নদের উৎপত্তি। এই নদ গিয়ে পড়েছে ভূমধ্য-সাগরে। শীত ও বসন্তকালে এই নদের জল শান্ত ভাবে বয়ে চলে, কিন্তু বর্ষায় তার জলধারা দুকূল ছাপিয়ে আশে-পাশের সমস্ত জায়গা ভাসিয়ে দেয়। পাশের জায়গাগুলো এই জল পেয়ে উর্ব্বর হয়ে ওঠে, সেখানে তখন ভালো ভালো ফসল ফলে। এইজন্য নীল নদকে লোকে বলে 'মিশরের প্রাণ'।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মিশরে নীল নদের দু'পাশে লোক এসে বাস করতে আরম্ভ করে। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলাদা বাস করতো। চাষবাস করা ও গরু-ভেড়া চরানো ছিল এদের জীবন ধারণের উপায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এরা বুঝতে পারল যে, এ ভাবে আলাদা হয়ে থেকে লাভ নেই। নীল নদের জলে বন্যা এসে যখন দু'পাশের ঘর-বাড়ী সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখন তিন-চার গ্রামের লোক একসঙ্গে কাজ করে নতুন ঘর-বাড়ী যত সহজে তৈরি করতে পারে, শুধু একটি মাত্র গ্রামের লোক তা পারে না। তা ছাড়া, এক-এক গ্রামে এক-এক রকম জিনিষ তৈরি করে, পরে সকলের দরকার মত সেগুলো বদলাবদলি করে নিলে সবারই সুবিধা হয়।

তারা নৌকা তৈরি করতে শিখেছিল, কাজেই দূর গ্রাম থেকে জিনিষ আনতেও কোনো অসুবিধা ছিল না। নদীতে যখন জল কম থাকত তখন খাল কেটে, শাদুফ নামক এক রকম চমৎকার যন্ত্রের সাহায্যে জল তুলে, সেই খাল বেয়ে জল নিয়ে ক্ষেতে দিত। মিশরে বর্ষা খুব বিরল। কাজেই অনেক সময়ই তাদের এই ভাবে নদী থেকে জল তুলে ক্ষেতের ফসল
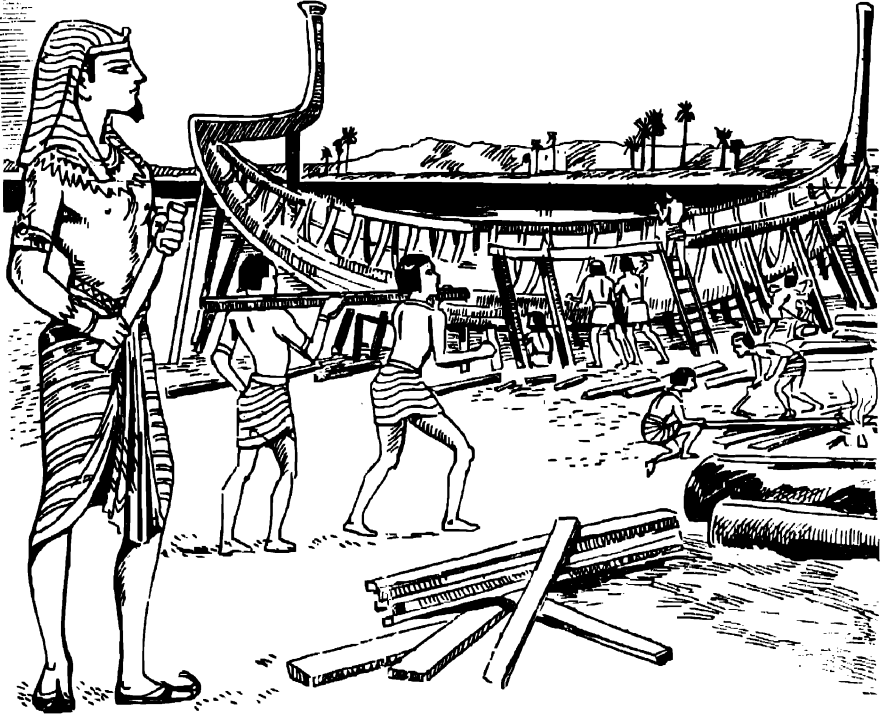
নৌ-নির্ম্মাণ

বাঁচাতে হতো। মিশর দেশটি ৭০০ শত মাইল বিস্তৃত একটি দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। এর দক্ষিণ দিকের দেশটিকে বলে সুদান।

পুরাকালে মিশরের রাজাদের উপাধি ছিল 'ফারাও'। প্রজাগণ ফারাওদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। বিশেষ করে মিশর ছিল 'পিরামিডের দেশ' বলে পরিচিত। বর্ত্তমান মিশরের রাজধানী কাইরোর নিকটে, গিজে নামক স্থানে পাথরে নির্ম্মিত বিশালকায় পিরামিডগুলি পৃথিবীর অতি আশ্চর্য্য বস্তু।

অনেকগুলি রাজবংশের মধ্যে প্রথম দিকের রাজবংশদের যুগে এই পিরামিডগুলি তৈরি হয়েছিল। সে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার কথা। এগুলি ছিল রাজাদের সমাধি-মন্দির। তৃতীয় রাজবংশের প্রথম

ফারাও যোসেরের জন্য প্রথম পিরামিড নির্ম্মাণ করা হয়। বড় তিনটি প্রসিদ্ধ পিরামিড গড়া হয়েছিল চতুর্থ রাজবংশের ফারাওদের সময়ে। এই ফারাওগণের মিশরীয় নাম খুফু, খাফ্‌রে এবং মেঁন-কু-রে এবং এঁদের গ্রীক নাম যথাক্রমে—কিওপ্‌স্‌, সেফ্রেন ও মাইসেরিনাস্‌।

এই পিরামিড বা কবরগুলো তৈরি হতো সবুজ মাঠের শেষে মরুভূমি
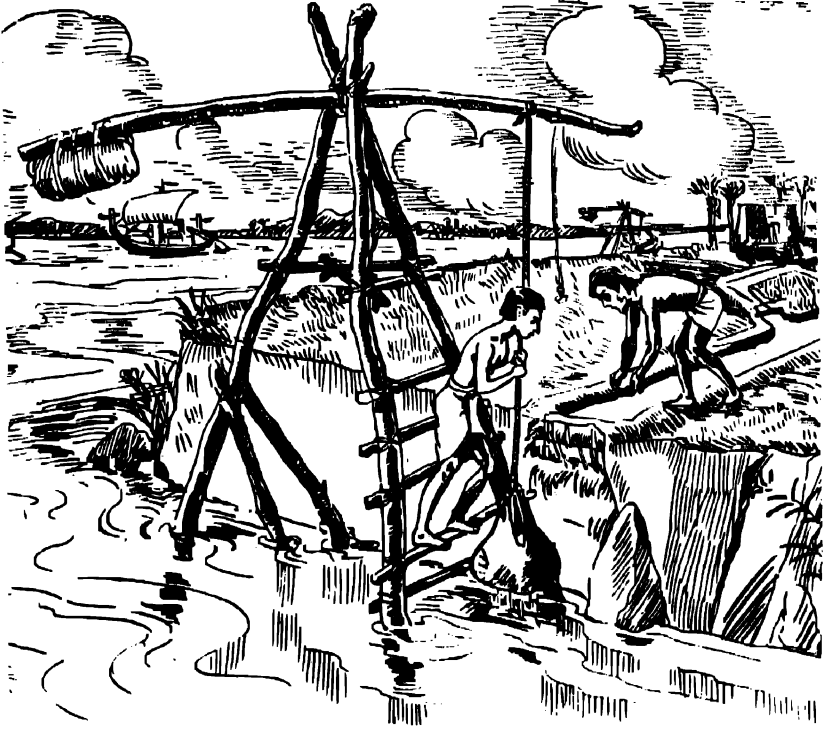
নীল নদ হতে জল সেচ

যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেইখানে। এই মরুভূমির প্রান্তে পাহাড় থেকে তামার ছুরি ও ছেনী দিয়ে পাথর কেটে, সেই পাথর দিয়ে যে সব বাড়ী তৈরি করেছে, তা দেখে আজও লোকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ঐ প্রাচীন যুগে কেমন করে, তারা অত শক্ত পাথর কেটে সেগুলোকে অমন সুন্দর চৌকো করলো, এই পাথর দিয়ে কেমন করে যে বাড়ীর ছাদ তৈরি করলো, কেমন করেই বা অত ভারী পাথর তারা অত উঁচুতে তুললো, আজও পর্য্যন্ত লোকে তা ভাল করে বুঝতে পারে নাই। এই শক্ত পাথর কেটে তারা নানা রকম মূর্ত্তি খোদাই করতেও পারত। পাথর দিয়ে যে সব স্তম্ভ তারা তৈরি করতো, সেগুলি এবং বাড়ীর ছাদ ও দেওয়ালগুলিকে তারা রং দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেও জানত।

আগেই বলা হয়েছে যে, পিরামিডগুলি ছিল ফারাওদের কবর। রাজাদের মৃতদেহগুলির রক্ষাকল্পেই মিশরীরা পিরামিড গড়ত। তারা বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যুর পর ফারাওদের আত্মা ততদিন স্বর্গে বাস করবে যতদিন তাদের দেহ রক্ষা করা যায়। ফারাওদের দেহ কবরের অভ্যন্তরে স্থাপন করার পূর্ব্বে ইহাকে এক অদ্ভুত কৌশলে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হতো।

বৃহৎ পিরামিড নির্ম্মাণ

ক্রমে তারা এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছিল, যা মানুষের মৃতদেহে মাখিয়ে দিয়ে, সেই দেহ সূক্ষ্ম কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়িয়ে রাখলে, উহা হাজার হাজার বছর ঠিক তেমনই থাকে, পচে যায় না। রাজাদের মৃতদেহে তারা এই জিনিষ মাখিয়ে তাকে কবর দিত। এই রকম সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে 'মমী'।

মিশরীরা শুধু যে, এই সব কাজই শিখেছিল তা নয়। মনের ভাব ব্যক্ত করবার জন্যে তারা নিজে নিজে লিখতে শিখল, জল আর গঁদের আঠার সঙ্গে রান্নাঘরের ঝুল মিশিয়ে কালি তৈরি করে। তারা 'পেপিরাস রিড' নামে একরকম নলখাগড়াকে একটার সঙ্গে আর একটা আটকে তাই দিয়ে কাগজ তৈরি করলো। তাদের লেখা ছিল চিত্রাঙ্কন-রীতিতে। তাদের অনেক

লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলো থেকে একটা উঁচু ধরণের সভ্যতার রূপ পাওয়া যায়।

ইতিহাসের গোড়ায় মিশর, উচ্চ-মিশর এবং নিম্ন-মিশর এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। **মেনেস** ছিলেন এই দুই রাজ্য মিলিত করে গোটা মিশরের

মমী প্রস্তুত করা হচ্ছে

প্রথম ফারাও। তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ মিশরীয় ইতিহাসের রাজবংশগুলির প্রথম রাজবংশ। মিশরের দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরেরও অধিক কালের প্রাচীন ইতিহাসে ত্রিশটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরি হয় চতুর্থ রাজবংশের প্রথম ফারাও **খুফুর** আমলে। এই বংশেরই খাফ্রে নামক এক ফারাও, একটা আস্ত পাথরের পাহাড় কেটে, একটা বিরাট অদ্ভুত মূর্ত্তি তৈরি করেন; তার শরীরটা সিংহের কিন্তু মাথাটা মানুষের। এই মূর্ত্তি আজও প্রসিদ্ধ **স্ফিংক্স্** নামে পৃথিবীর একটা আশ্চর্য্য বস্তু হয়ে রয়েছে।

প্রথম সেটির মমী

আদি রাজ্যগুলির যুগে কাইরোর নিকটবর্ত্তী **মেমফিস** নগরী ছিল মিশরের রাজধানী। কিন্তু মধ্যরাজ্যযুগের শক্তিমান ফারাওগণ **থিবিস** নগরীকে তাঁদের রাজধানী করেন; এর অদূরেই সেই 'রাজাদের কবরের উপত্যকা,' যেখানে পরের যুগে নৃপতি **টুট্আঙ্খ-আমন্** সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

দ্বাদশ রাজবংশের শাসকদের অনেকেই বৃহৎ বৃহৎ মন্দির এবং অন্যান্য সৌধ নির্ম্মাণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে তৃতীয় **আমেন-এম-হেট** প্রাচীন কালের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

তৃতীয় থোথমেস

দ্বাদশ রাজবংশের পর মিশরে দীর্ঘদিন গৃহ-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা চলে। এই সময়ে 'হিক্সস' বা মেষপালক রাজগণ রাজত্ব করেন। এঁরা এশিয়াবাসী বৈদেশিক ছিলেন। অষ্টাদশ রাজবংশের প্রথম ফারাও, প্রথম আহ্মেশ এই হিক্সসদের মিশর থেকে বিতাড়িত করেন।

এই অষ্টাদশ রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফারাও, তৃতীয় **থোথমেসকে** বলা হয় 'মিশরের নেপোলিয়ন'। তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর যোদ্ধা-সম্রাট। তাঁর সময়ে মিশর বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি

বারবার পশ্চিম-এশিয়ার রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আফ্রিকা অতিক্রম করে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং আরও দূরে এশিয়া-মাইনরের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত ছিল তাঁর বিজিত সাম্রাজ্যের সীমানা।

শুধু স্থলপথে নয়, নৌযুদ্ধেও তৃতীয় থোথমেস বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপের অধিপতিগণ তাঁকে কর প্রদান করতেন।

বিখ্যাত স্ফিংক্স্

মেসোপোটেমিয়ার রাজাগণ তাঁর বন্ধুত্ব লাভের আশায় তাঁকে মহামূল্য উপঢৌকনসমূহ পাঠাতেন।

তৃতীয় থোথমেসের পর আর একজন শ্রেষ্ঠ ফারাও, তৃতীয় **আমেন-হোটেপ**। তিনি একজন শক্তিমান যোদ্ধা ও শিকারী ছিলেন। থিবিসে তাঁর রাজধানী বিলাস-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল। তিনি অনেক বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির ও প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ের অভিজাতগণ খুব জাঁক-জমকপ্রিয় ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন।

এই রাজবংশের একজন বিখ্যাত স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ফারাওর নাম চতুর্থ **আমেনহোটেপ**। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, কবি, স্বপ্নবিলাসী ও ধর্ম্মবিপ্লবী। তিনি মিশরের বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস না করে ও বিখ্যাত দেবতা আমনকে উপেক্ষা করে, একমাত্র সূর্য্য-দেবতা আটনের উপাসক হন—নিজের নাম বদলে করেন, **আখ-এন-আটন**। রাজধানী, থিবিস নগরী হতে বর্ত্তমান টেল্-এল্-আমারণা অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানে মিশর, বাবিলন, হিটাইট এবং অন্যান্য দেশের রাজন্যদের পরস্পরের মধ্যে লিখিত অনেক চিঠি আবিষ্কৃত
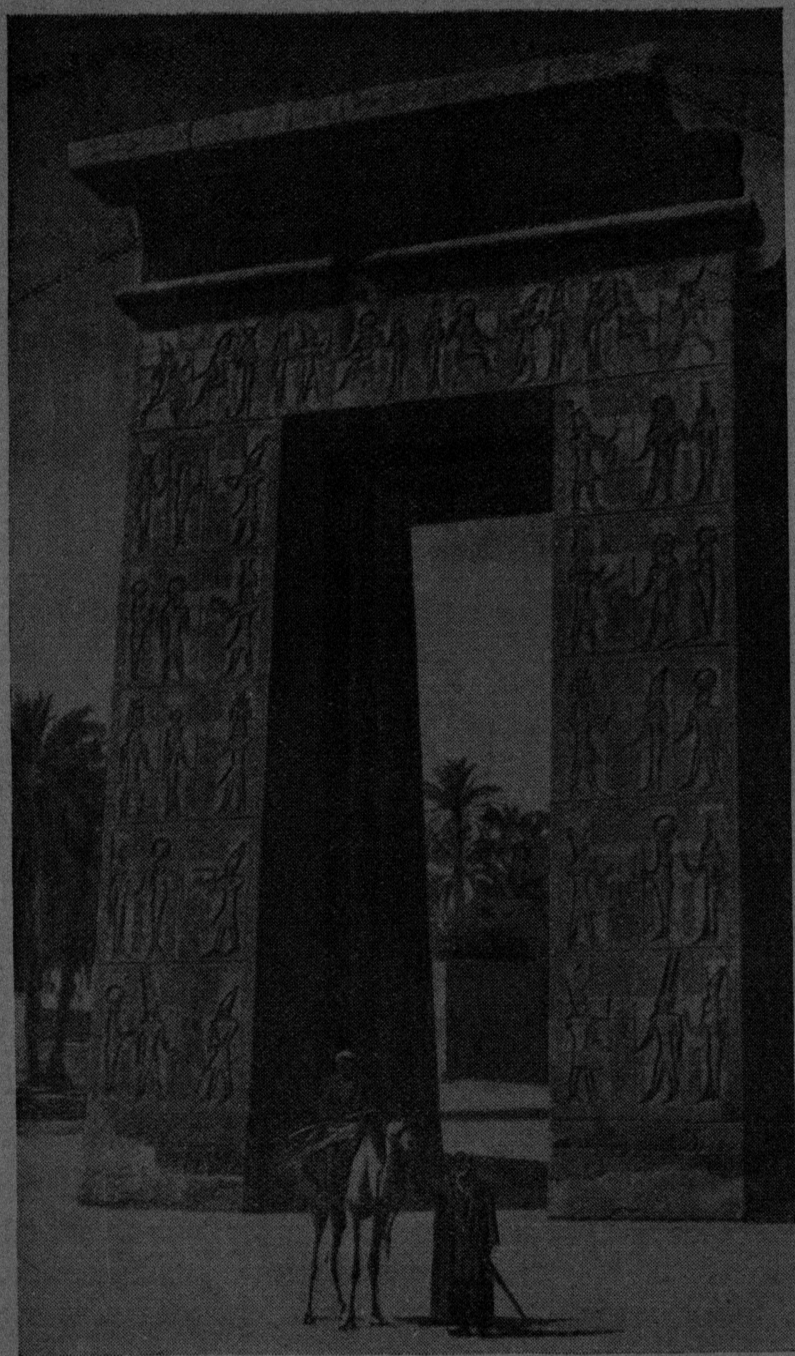
তৃতীয় টলেমির তৈয়ারি বিখ্যাত তোরণ

বর্ত্তমান মিশরের রাজধানী কাইরো নগরীর একটি দৃশ্য।

হয়েছে। এই চিঠিগুলি সে যুগের বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে।

আখ-এন-আটন যুদ্ধবিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই বলে পশ্চিম-এশিয়ায় মিশর সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন সুরু হয়। ঊনবিংশ রাজবংশের ফারাওগণ আবার এই সাম্রাজ্যের অনেকখানি উদ্ধার করেন। এই বংশের একজন যোগ্য ফারাও, প্রথম সেটি। তিনি সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে দুর্দ্ধর্ষ আমোরাইট ও হিটাইটদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেন।

প্রাচীন যুগের মিশরীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন

(দেঁদারার হাথর মন্দিরের একটি স্তম্ভ)

ঊনবিংশ রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফারাও, দ্বিতীয় রামেসিসকে "মহামতি রামেসিস" বলা হয়। তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তেমনি বিখ্যাত সৌধ-নির্ম্মাতা। তিনি এশিয়ার বিদ্রোহী জাতিদের দমন করবার অভিপ্রায়ে বহু অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি তৃতীয় থোথমেসের বিশাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস করেছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। দ্বিতীয় রামেসিস ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, অগণিত বিরাট বিরাট সৌধ, মন্দির ও তাঁর নিজের প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে যশস্বী হন। থিবিস নগরীতে তাঁর নির্ম্মিত "প্রশস্ত হল-গৃহ" খুব বিখ্যাত।

এর পর মিশরের পতনের যুগ সুরু হয়। লিবিয়া, ইথিওপিয়া প্রভৃতি নানা স্থানের ফারাওগণ বিভিন্ন সময়ে মিশরে রাজত্ব করেন। পরে এশিয়া-মাইনরে আসিরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠলে, তাদের আক্রমণে মিশর দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে উহা পারসিকদের করতলগত হয়।

প্রাচীন যুগে মিশরীয়রা নৌ-বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও অন্যান্য নানারকম শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ঐ পৌরাণিক যুগে থিবিস নগরী ছিল জ্ঞানে, গুণে, গরিমায়, ঐশ্বর্য্যে খুব অগ্রসর ও উন্নত।

মিশরের এক জন প্রাচীন ফারাও 'নেকো, সুয়েজ-খালের মত একটা খাল কাটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটা খাল কেটে তারই সাহায্যে নীল নদের সঙ্গে লোহিত-সাগরকে যুক্ত করা, যাতে আরব এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার করা যায়।

বৈদেশিক আধিপত্য

মিশরের যখন পতন-অবস্থা আরম্ভ হলো, তখন দেশের বিভিন্ন দলের কলহ-বিবাদের সুযোগ নিয়ে পশ্চিম-এশিয়ার নানা উদীয়মান জাতি একে একে মিশর আক্রমণ সুরু করলো। অবশেষে পারসিকগণ সমস্ত পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করলে মিশর তাদের অধীনে চলে গিয়ে পরাধীন দেশে পরিণত হলো।

সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। **কাম্বিসেস** নামক এক পারসিক সম্রাট মিশর জয় করে, সেখানকার লোকদের উপর দারুণ অত্যাচার সুরু করে দিলেন। পারস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট **দারায়ুস** সিংহাসনে আরোহণ করে মিশরীদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি দেশের ব্যবসায়ের উন্নতি করেন; কিন্তু পারসিকদের শাসনের সময়ে মিশরের বিখ্যাত বন্দর নক্রেটিসের গ্রীকগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা হারালো। মিশরী ফারাও নেকো যে খাল কাটা অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, সম্রাট দারায়ুস তা সম্পূর্ণ করলেন। ফলে ভূমধ্য-সাগরের জাহাজগুলি তখন নীল নদে ঢুকে ঐ খাল দিয়ে লোহিত-সাগরে যেতে সুরু করলো।

পারসিকদের প্রায় দুইশত বছরের রাজত্বকালে, অনেক সময়ে অত্যাচার হওয়ায়, মিশরীরা লিবিয়াবাসী এবং ভাড়াটে গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু পারসিকরা কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করে।

এর পর মাসিডোনিয়ার পৃথিবী-বিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার যখন তাঁর পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে, দেশের পর দেশ জয় করছিলেন, তখন মিশরীরা তাঁকে তাদের ত্রাণ-কর্ত্তারূপে বরণ করলো। আলেকজাণ্ডার নিম্ন-মিশরের ভূমধ্যসাগর-উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করলেন। কালক্রমে, টলেমিদের শাসনকালে এই নগরী বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়েছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি **টলেমি** সোটার মিশরের রাজা হন। এই টলেমি-বংশ সেখানে প্রায় তিন শ' বছর শাসন করেছিলেন। এই সময়ে মিশরীদের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী বিস্তার করে। টলেমি-বংশের শেষ শাসক ছিলেন প্রসিদ্ধ সুন্দরী রাণী **ক্লিওপেট্রা**। ইনি রোমক সেনাপতি মহাবীর **অ্যাণ্টনিকে** বিয়ে করেছিলেন। অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রেমের কাহিনী নিয়ে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে।

রাণী ক্লিওপেট্রা

রাণী ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর রোমের প্রথম সম্রাট **অগাষ্টাস,** মিশর জয় করে সারা দেশটা অধিকার করেন। পরে মিশর থেকে এত প্রচুর পরিমাণে শস্য-সম্ভার রোমে যেত যে, উহাকে 'রোমের শস্য-গোলা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রবর্ত্তক চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসারের রাজ-দরবারে, মিশরীয় গ্রীক নৃপতি টলেমির কাছ থেকে রাজদূতগণ এসেছিলেন।

এই সময়ে এথেন্সের পরিবর্ত্তে **আলেকজান্দ্রিয়া** নগরী হয়েছিল গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্র। এর বৃহৎ লাইব্রেরী এবং যাদুঘর দূর-দেশের ছাত্রদেরও আকৃষ্ট করতো। বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ **ইউক্লিড্‌** ভারত-সম্রাট অশোকের যুগে আলেকজান্দ্রিয়ার নগরবাসী ছিলেন। কথিত আছে যে, ঐ নগরীতে ভারতীয় সওদাগরদের একটি উপনিবেশ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার-উপকূলেও আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ব্যবসায়ীদের বসতি-স্থান ছিল।

টলেমিদের শাসনের সময়ে গ্রীকরা আচারে-ব্যবহারে অনেক মিশরীয় রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল। রোমেরও আগে খৃষ্টধর্ম্ম মিশরে প্রবেশ করে; কিন্তু মিশরে বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুত্ব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। এইজন্য মিশরীরা ক্রমে সমস্ত খৃষ্টানদের উপরেই বিরক্ত হয়ে যায়

এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা যখন একটা নতুন ধর্ম্ম নিয়ে এল, তখন তারা তাদের অভ্যর্থনা জানালো। এর ফলে মুসলমানদের মিশর-বিজয় সহজ হলো।

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সময়, কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব্ব-রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতিদের সঙ্গে পারস্যের সাসানিড রাজবংশের নৃপতিগণের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। সাসানিডগণ এই যুগে মিশর জয় করে কিছুদিন সেখানে রাজত্ব করেন। পরে আরবে যখন ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হলো
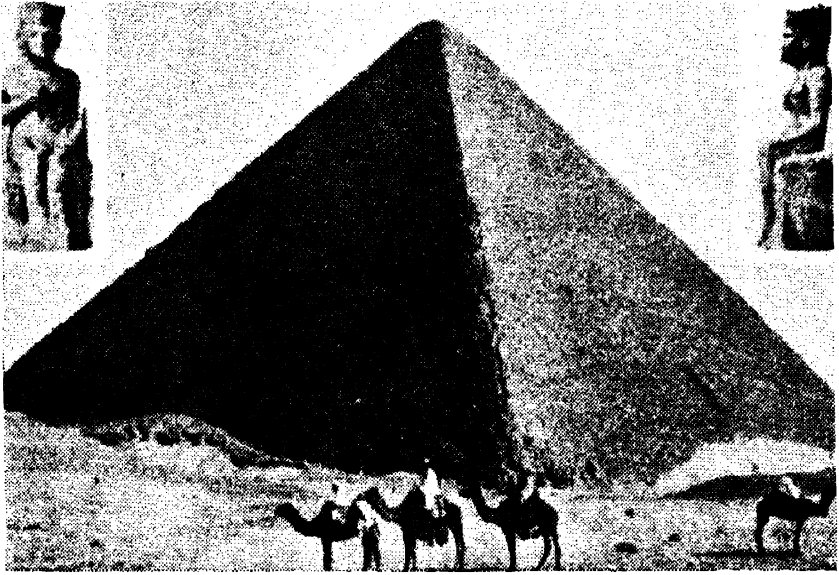
খুফুর বৃহৎ পিরামিড

তখন আরবগণ নতুন ধর্ম্মের প্রেরণায় শীঘ্রই আশপাশের দেশগুলি একটার পর একটা জয় করতে লাগল।

সপ্তম শতাব্দীতে, আরব-খলিফা প্রথম ওমরের সময়ে মুসলমানেরা মিশর আক্রমণ করে। ওমর ছিলেন আরবদের রাজা এবং ধর্ম্মগুরু। মুসলমানদের ধর্ম্মগুরুকে বলে খলিফা। মিশর জয় করে ওমর নিজে সেখানে গিয়ে থাকেন নাই, বিজিত দেশ শাসন করবার জন্যে সেখানে তিনি গভর্ণর পাঠিয়ে দিতেন। আরব রাজত্বে মিশরে আরব ভাষা ও সভ্যতা দ্রুত বিস্তার লাভ করলো। দুই শতাব্দী পরে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন বাগদাদের খলিফাগণ দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন, তখন তুর্কী গভর্ণররা বেশ কিছুদিন সেখানে স্বাধীন ভাবে শাসন চালাতে লাগলেন।

এর তিন শতাব্দী পর বিখ্যাত সেল্‌জুক্ তুর্কী সুলতান **সালাদিন** মিশরের সুলতান হলেন। ইনি খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ক্রুসেড্' বা ধর্ম্মযুদ্ধের যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। সালাদিনের একজন বংশধর ককেশাস্ পাহাড়-অঞ্চল হতে অনেক শ্বেতকায় তুর্কী ক্রীতদাস মিশরে এনেছিলেন। এই ক্রীতদাসদের বলা হতো **মাম্‌লুক**। এদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই মাম্‌লুকগণ শক্তিশালী হয়ে বিদ্রোহ করে এবং তাদের নিজেদেরই একজনকে মিশরের সুলতান-পদে বহাল করে।

এইরূপে মিশরে মাম্‌লুকদের শাসনকাল আরম্ভ হয়। তাঁরা আড়াইশো বছর কর্ত্তৃত্ব করেন। তারপর অর্দ্ধ-স্বাধীনরূপে আরও প্রায় তিন শ' বছর তাঁদের অধিকার চালান। ইতিহাসের এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, এভাবে একদল বিদেশী ক্রীতদাস, পাঁচশত বছরেরও বেশী মিশর দেশের কর্ণধার ছিলেন। মাম্‌লুকগণ ককেশাস্-অঞ্চল হতে ভাল দেখে স্বাধীন ক্রীতদাসদের প্রায়ই আমদানী করে তাদের সংখ্যা বাড়াতো। এই মাম্‌লুকরা মিশরে দীর্ঘদিন অভিজাত এবং শাসক-শ্রেণীরূপে বিরাজ করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশর, কনষ্টান্টিনোপলের তুর্কী **অটোমান** সুলতানদের অধিকারে যায়। মিশর তখন বিশাল অটোমান-সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। সে সময়ও কিন্তু মাম্‌লুকগণ সেখানকার শাসক-অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এর পর যখন তুর্কীরা ইউরোপে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, মিশর দেশ তখন নামে মাত্র তুর্কী শাসনের অধীনে হলেও মাম্‌লুকগণ যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্ব করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন বিখ্যাত ফরাসীবীর নেপোলিয়ন, মিশরে এসে এ দেশ জয় করেছিলেন তখন তিনি এই মাম্‌লুকদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিলেন। নেপোলিয়ন বেশী দিন মিশরে অধিকার রাখতে পারেন নাই। ইংরেজরা তখন ফরাসীদের প্রবল শত্রু। ইংরেজরা আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে ফরাসীদের হারিয়ে দেয়। নেপোলিয়ন শীঘ্রই মিশর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

মহম্মদ আলি

ফরাসীরা মিশর ছেড়ে যাওয়ার পরে তুর্কীরা আবার প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করে। ১৮০৫ সালে **মহম্মদ আলি** নামক একজন আলবেনিয়ার তুর্কীকে, তুর্কীর সুলতান মিশরের শাসনকর্ত্তা অথবা 'খেদিভ' নিযুক্ত করেন। মহম্মদ আলির প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল মিশরকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন করবেন। বিদেশীদের তিনি মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। এর ফলে ইংরেজরা তাঁর উপর মনে মনে খুব অসন্তুষ্টই ছিল। মহম্মদ আলি মিশরী ও মামলুকদের উপরেও ভয়ানক অত্যাচার করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটা মস্ত দল ছিল। ১৮০৭ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় একদল ইংরেজ সৈন্য এসে ঘাঁটি বাঁধলো। মহম্মদ আলির শত্রুপক্ষের লোকেরা ইংরেজদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালো।

মহম্মদ আলি

ইংরেজের সহায়তায় তারা মহম্মদ আলিকে তাড়াতে পারবে এই ছিল তাদের ধারণা। ঠিক এই সময়ে মহম্মদ আলির শত্রু-পক্ষের যিনি নেতা ছিলেন, তিনি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের লোকেরা দুর্ব্বল হয়ে পড়লো। মহম্মদ আলি এবার প্রবল বিক্রমে তাঁর শত্রুপক্ষ এবং ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর তাঁর শত্রুপক্ষ একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ইংরেজরাও খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লো। ইংরেজদের হারিয়ে দিয়ে মহম্মদ আলির সাহস আরও বেড়ে গেল। তিনি গ্রীস আক্রমণ করলেন এবং ক্রীট দ্বীপটি কেড়ে নিলেন।

মহম্মদ আলির শাসনে মিশরের অনেক উন্নতি হয়েছিল। তিনি মিশরের উপর তুরস্কের প্রভুত্ব অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিলেন, দেশে তুলার চাষের অনেক উন্নতি করেছিলেন, সুদান জয় করেছিলেন এবং মিশরে ইউরোপীয়, বিশেষ করে ফরাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়েছিলেন। আশী বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইসমাইল পাশা

তুর্কী প্রভুত্বের শেষের দিকে মিশরের শাসনকর্তারা **খেদিভ** নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তুরস্কের সুলতান তাঁদের তাঁর অধীন রাজা বলে স্বীকার করতেন। মহম্মদ আলির পর খেদিভ **ইসমাইল পাশাও** মিশরে ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানী করেন। ইসমাইলের আমলে মিশরের লোকেরা সাহেবী কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করে।

ইসমাইল একটু বে-হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি এত বেশী খরচ করে ফেলতেন যে, কর বসিয়ে তার সব টাকা তোলা যেত না। তাঁকে বাধ্য হয়ে ইউরোপের দেশগুলোর কাছ থেকে টাকা ধার করতে হতো কিন্তু সে সব টাকা তিনি সব শোধ দিতেও পারতেন না। কাজেই ধার পাওয়াও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো।

তাঁর শাসনকালেই সুয়েজ-খাল খোলা হয়। দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের
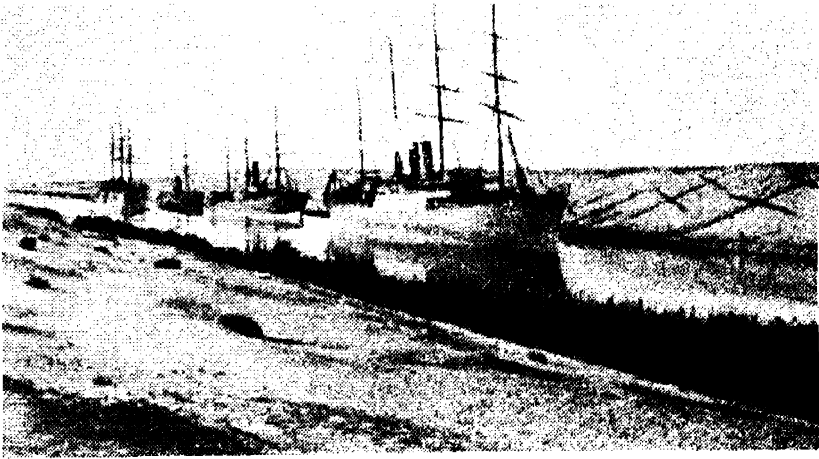
সুয়েজ-খাল

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়ে, তাঁহার উৎসাহে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ফার্দ্দিনান্দ্-দি-লেসেপ্স্ দ্বারা সুয়েজ-খাল খনন করা হয়। ইংরেজদের এই ব্যাপারে প্রবল অমত ছিল।

সুয়েজ-খাল কোম্পানীর প্রায় দু'লাখ শেয়ার ইসমাইল পাশার হাতে ছিল। সুয়েজ-খালের বেশীর ভাগ শেয়ার ছিল মিশরীদের এবং ফরাসীদের হাতে। অথচ এই খাল দিয়ে যাতায়াত করার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ইংরেজের।

এইজন্য টাকার অভাবে, ইসমাইল পাশা যে মুহূর্তে সুয়েজ-খালের শেয়ার বেচে ফেলতে রাজি হলেন, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলির নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ চার কোটি টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নিলেন।

মিশরে ইংরেজের আগমন

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যখন অনেক টাকা খরচ করে সুয়েজ-খাল কাটালেন তখন থেকে ইংরেজরা মিশরের ব্যাপার নিয়ে দস্তুরমতো মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলো। সুয়েজ-খাল কাটানোর পর ইংলণ্ড থেকে কোন জাহাজ ভারতবর্ষে যেতে হলে আর আফ্রিকা ঘুরে যাওয়ার দরকার হতো না। ভূমধ্য-সাগর এবং সুয়েজ-খাল দিয়ে গেলে অর্দ্ধেক সময়ে সে জাহাজ ভারতবর্ষে পৌঁছে যেত। ইংরেজরা বুঝলো যে মিশর যদি তাদের কোন শত্রুর অধীনে থাকে, তাহলে সুয়েজ-খাল দিয়ে ব্রিটিশ জাহাজ ইচ্ছামত চলাচল করতে পারবে না।

মিশর সেই সময় তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন দেশ। তুর্কীর সঙ্গে ইংরেজের তখনও শত্রুতা হয় নাই; কিন্তু তাদের ভয় ছিল পাছে তাদের অন্য কোন শত্রু এসে মিশর দখল করে বসে। এই ভয়ে ইংরেজরা মিশরের খেদিভের অধীনে চাকরী নিয়ে দলে দলে সেখানে আসতে আরম্ভ করে দিল। ধীরে ধীরে দল ভারী করে তারা সেখানে এমন একটা অবস্থা করে তুললো যে, মিশরের খেদিভ ইংরেজদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে সাহস পেতেন না।

আরাবি পাশা

ইংরেজরা ক্রমাগত মিশরীদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল এবং তাদের নিজেদের দেশের অর্থসম্বন্ধীয় হিসাব-পরীক্ষকদের কর্ত্তৃত্ব স্থানে বসালো; কাজেই মিশরীরা এতে খুব চটে গেল এবং দেশের যুবকদের দ্বারা একটি জাতীয় দল গড়ে উঠলো। এই দলের নেতা **আরাবি পাশা** ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করলেন। ইংরেজ তার উন্নত অস্ত্র ও যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যে মিশরীদের এই বিদ্রোহ দমন করলো এবং পূরোপূরিরূপে ঐ দেশে নিজেদের আধিপত্য স্থাপিত করলো।

মিশরের চতুর্থ রাজবংশের প্রথম ফারাও খুফুর প্রস্তর-মূর্ত্তি।

এই ভাবে মিশরে ইংরেজ-অধিকার আরম্ভ হলো। ইংলণ্ডের প্রেরিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্রোমার স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার ন্যায় মিশর শাসন করতে লাগলেন। ক্রোমার দেশে শৃঙ্খলা আনলেন বটে কিন্তু তিনি মিশরীদের উন্নতির জন্য কিছুই করেন নাই। বিদেশী মহাজনদিগকে মোটা লাভাংশ দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

ফরাসীরা মিশরে ইংরেজের এই আধিপত্য মোটেই পছন্দ করে নাই। তারা লুটের ভাগ পায় নাই। আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইংলণ্ড ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে এই সুবিধাজনক সন্ধি করলো যে, ইংরেজ মরোক্কোর উপর ফরাসী-অধিকার মেনে নেবে আর ফ্রান্স তার বিনিময়ে মিশরের উপর ইংরেজ আধিপত্য স্বীকার করবে।

এই রূপেই অনেক বছর কেটে গেল। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তুরস্ক যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তার শত্রু জার্ম্মাণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বসলো, ইংলণ্ড তখন ঘোষণা করলো যে, মিশরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সে নিজের হাতে তুলে নিল। বন্দোবস্ত সব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্য এসে মিশরে বসলো। ইংরেজরা খেদিভকে 'সুলতান' উপাধি দিয়ে সম্মান দেখালো এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই তারা তাঁরই হাতে তাঁর রাজ্য ছেড়ে দেবে।

অবশেষে ১৯১৮ সালে যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন মিশরের লোকেরা ভাবলো এইবার তাদের দুঃখের দিনের অবসান হবে, আবার তারা নিজেদের দেশের উপর নিজেদের কর্ত্তৃত্বের অধিকার ফিরে পাবে! কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হলো না। তারা মিশর থেকে ইংরেজ সৈন্যদল সরাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, কিন্তু ইংরেজরা সে-বিষয়ে বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কার্য্যে কিছুই করলো না। যুদ্ধের পর প্যারিসে যখন, কোন্ দেশের অবস্থা কি হবে, তা ঠিক করবার জন্য শান্তি-বৈঠক বসলো, মিশর সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পেল না। ঘরের পাশে অর্দ্ধসভ্য আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত প্যারিসের এই শান্তি-বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠালো, কিন্তু অতি প্রাচীন সভ্য দেশ মিশরকে ইংরেজরা সে অধিকারে বঞ্চিত করে রাখলো।

বিদ্রোহ

প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাতে না পেরে মিশরীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলো। তারা বুঝলো ইংরেজরা সহজে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে না। অসন্তুষ্ট মিশরীরা তখন একটা দল গড়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলো। এই দলের নাম দিল তারা **ওয়াফ্‌দ্‌**-দল, তার নেতা হলেন মিশরের গণনেতা **জগলুল পাশা**। জগলুল দেশের স্বাধীনতার দাবী আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এবং ওয়াফ্‌দ্‌-দলের আরও তিনজন নেতাকে ইংরেজরা নির্ব্বাসিত করলো।

জগলুল পাশাকে মিশরীরা অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতো। তাঁকে নির্ব্বাসিত করবার পর তারা ক্ষেপে উঠে, যত রকমে পারে ইংরেজের ক্ষতি করতে আরম্ভ করলো। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রাজধানী কাইরো সহরের চারিধারের রেল-লাইন এবং রাস্তা নষ্ট করে ইংরেজদের তারা ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। এক জায়গায় আন্দোলনকারীরা কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে বসলো। এই সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তারা চিন্তিত হলেন।

ইংলণ্ড থেকে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে একদল রাজনৈতিককে মিশরে পাঠান হলো। এই দলই 'মিলনার-কমিশন' নামে পরিচিত। জগলুল পাশা এই মিলনার-কমিশন বয়কট করবার জন্য মিশরীদের অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা আবার তাঁকে নির্ব্বাসিত করলো। কিন্তু মিশরীরা তাঁর অনুরোধ ভুললো না। মিলনার-কমিশন যখন মিশরে এসে পৌঁছালেন, একজন মিশরীও তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো না, তাঁদের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বললো না তারা সম্পূর্ণভাবে কমিশনকে বয়কট করলো। হতাশ হয়ে মিলনার-কমিশন দেশে ফিরে গেলেন

এই ভাবে প্রায় চার বছর তুমুল আন্দোলন চলবার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নরম হয়ে তাঁদের মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হলেন। তাঁরা ১৯২২ সালে ঘোষণা করলেন যে, মিশরকে আর ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে রাখা হবে না, মিশরকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করা হলো। কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁরা এই বলে কয়েকটা সর্ত্ত দিলেন যে, মিশরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ইংলণ্ডই রক্ষা করবে, এই জন্য সেখানে কিছু ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে এবং সুদানের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে। মিশরের দক্ষিণে সুদান বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে খুব ভাল তূলা উৎপন্ন হয়। নীল নদ সুদানের

ভিতর দিয়ে মিশরে গিয়ে পড়েছে। এই তথাকথিত স্বাধীনতা এত সর্ত্ত-কণ্টকিত ছিল যে বস্তুতঃ মিশরীদের অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না।

এই স্বাধীনতা মিশরবাসিগণ মেনে নিল না। এর শাসনপ্রণালী ছিল অত্যন্ত প্রতিক্রিয়ামূলক। রাজা ফুয়াদের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। রাজা যথেচ্ছভাবে দেশ শাসন করতে লাগলেন, যখন খুসী তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে দেশের সর্ববনিয়ন্তার অধিকার প্রয়োগ করতে লাগলেন। বাস্তবিকপক্ষে এই স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের পর রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্রস্বরূপ এবং মিশরে ইংরেজ প্রতিনিধির নির্দ্দেশ অনুসারে দেশে স্বৈরাচার চালাতে লাগলেন।

জগলুল পাশা

মিশরের এক দরিদ্র ফেল্লা বা কৃষকের ঘরে জগলুলের জন্ম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈদেশিক জাতিদের বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিশরে কতক লোক কৃষক গোষ্ঠী থেকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সাদ জগলুল তাদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই জগলুল ছিলেন বুদ্ধিমান্ ও সাহসী। তিনি খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন। মিশরীদের সুখ-দুঃখ তিনি যে ভাবে অনুভব করতেন এবং যে ভাষায় তা প্রকাশ করতেন, আজ পর্য্যন্ত কোন লোকই তা পারে নাই। এই সব কারণে, মিশরীরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতো এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতো না। মিশরের স্বাধীনতা ইংরেজরা স্বীকার করবার পরে দেশের লোকের ভোটে যখন নতুন পার্লামেণ্ট গঠিত হলো তখন জগলুলের ওয়াফ্‌দ্-দলের লোকেরাই খুব বেশী সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হলেন। পার্লামেণ্টের বেশী আসন এঁরাই দখল করলেন। নতুন গবর্ণমেণ্ট যখন গঠিত হলো, জগলুল হলেন তার প্রধান মন্ত্রী।

ইংরেজরা মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করেছিল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তারা যে সব সর্ত্ত রেখে দিয়েছিল, মিশরীরা তা মোটেই পছন্দ করে নাই। জগলুল প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর তারা এই সব সর্ত্তের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আরম্ভ করলো। আবার আন্দোলন চরমে উঠলো ; কয়েকজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী নিহত হলেন। ইংরেজরা দোষ দিতে লাগলো জগলুলকে। ঠিক এমনি সময় মিশরের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি সার লী ষ্ট্যাক কাইরো সহরে নিহত

হলেন। **রাজা ফুয়াদ** ভয় পেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং জগলুলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।

এইবার চলল দমন-নীতির পালা। ইংরেজ বন্ধুদের পরামর্শে রাজা ফুয়াদ, দলে দলে লোককে জেলে পাঠাতে লাগলেন। এই ভাবে প্রায় তিন বছর চলবার পর ১৯২৬ সালে আবার পার্লামেন্টের সাধারণ নির্ব্বাচন হলো। এবারও জগলুলের দলই পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন দখল করলেন। জগলুলের ওয়াফ্‌দ্‌-দলের মধ্যে মিশরের সংখ্যালঘু খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত কপ্‌ট্‌ও অনেকে ছিল। ইংরেজরা কপ্‌টদের হাত করে মিশরীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য বারবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নাই।

লর্ড লয়েড তখন মিশরে ইংরেজদের প্রতিনিধি; রাজা ফুয়াদ তাঁরই পরামর্শে চলতেন। লর্ড লয়েড জগলুলকে প্রধান মন্ত্রী করতে কিছুতেই রাজী হলেন না, কাজেই রাজা ফুয়াদও জগলুলকে ডেকে তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে বলবার সাহস পেলেন না। এই সব গোলমালের মধ্যে পরের বৎসর ৬৭ বৎসর বয়সে জগলুল পাশার মৃত্যু হলো।

বর্ত্তমান অবস্থা

জগলুলের মৃত্যুর পরও কিন্তু ইংলণ্ডের সঙ্গে মিশরের গোলযোগ মিটলো না। ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ মিশরীদের জানালেন যে মিশরের সৈন্যদল তারা নিজেরাই পরিচালনা করতে পারবে, শুধু যুদ্ধের সময় মিশরে ব্রিটিশ সৈন্যের ঘাঁটি বসাবার সুযোগ ইংলণ্ডকে দিতে হবে। তা ছাড়া, সুদানের উপর মিশর এবং ইংলণ্ড দুজনেরই কর্ত্তৃত্ব থাকবে, অর্থাৎ প্রকৃত-পক্ষে সুদানের উপর ইংলণ্ডের প্রভুত্বই বজায় থাকবে।

নাহাশ পাশা জগলুলের পর ওয়াফ্‌দ্‌-দলের নেতা হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের নির্ব্বাচনেও ওয়াফ্‌দ্‌-দলই পার্লামেন্টের বেশীর ভাগ আসন দখল করেছিল এবং নাহাশ পাশা হয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী। ইংরেজদের এই সন্ধির প্রস্তাবেও তিনি রাজি হলেন না। রাজা ফুয়াদ ইংরেজদের পরামর্শে ওয়াফ্‌দ্‌-দলকে জব্দ করবার জন্য, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে তাঁরই এক বন্ধু **সিদকী পাশার** হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিলেন।

ওয়াফ্‌দ্‌দের উপর কঠোর অত্যাচার চললো। তাদের সভা-সমিতি করা

নিষিদ্ধ হলো, এবং সংবাদ-পত্রগুলো বন্ধ হয়ে গেল। ওয়াফ্‌দ্‌রা যাতে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ আসন দখল করতে না পারে, সেজন্য দেশের নির্ব্বাচন-পদ্ধতি পর্য্যন্ত এমনভাবে বদলে ফেলা হলো যাতে, শুধু বড়লোকেরাই বেশী করে ভোট দিতে পারেন, কৃষকদের ভোট দেবার ক্ষমতা যাতে কমে যায়। কারণ, ওয়াফ্‌দ্‌-দল ছিল দেশের জনসাধারণের প্রিয় দল, গরীবেরা এবং কৃষকেরাই ছিল তার প্রাণ।

ওয়াফ্‌দ্‌-দলকে এইভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এবং নেতাদের কাইরো সহরে

প্রথম সেটি

দ্বিতীয় রামেসিস

বন্দী করে রেখে রাজা ইংরেজদের পরামর্শ অনুযায়ী দেশ শাসন করতে লাগলেন।

তারপর ১৯৩৫ সালে ইতালী যখন মিশরের ঘরের পাশে আবিসিনিয়া আক্রমণ করে বসলো, ইতালীর ভয়ে মিশরীরা তখন ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজি হলো। ১৯৩৬ সালে এই সন্ধি হয়। ইংরেজরা মিশর থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজি হলো এবং সুয়েজ-খাল রক্ষার জন্যে ইংরেজরা তাদের ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করলে মিশরীরা তাতে আপত্তি করবে না বলে জানিয়ে দিল। বৈদেশিক ব্যাপারে মিশর ইংলণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে সম্মত হলো।

এই সন্ধির ফলে মিশরের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা কতকটা কমে গেল।

এই সন্ধির কিছুদিন পর রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হয় এবং তাঁর ছেলে রাজা **ফারুক** মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সেখানে নিজের প্রভুত্ব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলো, না করে তার কোন উপায়ও ছিল না; কারণ, এদিকে সুয়েজ-খাল হলো তার ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহদ্বার, ওদিকে মিশরের পশ্চিম-সীমান্ত হলো লিবিয়ার প্রবেশ-পথ। দুই পথ দিয়েই জার্ম্মাণ ও ইতালীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই।

বস্তুতঃ, লিবিয়া ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধের অনেকটা ঢেউ এসে মিশরেই ধাক্কা দিতে লাগলো বারবার। রোমেলের সঙ্গে ইংরেজ সেনার যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল তিন বৎসর ধরে, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল সেলেম-বেনগাজী অঞ্চল। যুদ্ধের সময় এই প্রদেশ বারবার হাত বদলেছে।

কাইরোতে রুজভেল্ট, চার্চ্চিল প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের একটা কূটনৈতিক কেন্দ্র ছিল। এখানে তাঁরা বারবার পরস্পরে সম্মিলিত হয়েছেন, এবং চিয়াং-কাইশেক, ইনোনু প্রভৃতি বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

ইংরেজ সৈন্যের অন্যতম ঘাঁটি ছিল কাইরো, এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে ছিল ইংরেজ নৌ-বাহিনী ও রাজকীয় বিমান বহরের অন্যতম আশ্রয়-স্থল। গ্রীসের নির্ব্বাসিত গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসর কাল কাইরোতে অবস্থান করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর থেকে মিশরবাসিগণ আবার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। মধ্য-প্রাচ্য মুসলমান দেশগুলির ভিতর তারাই রাজনীতিকতায় বেশী সচেতন। মিশরের স্ত্রীলোকেরাও রাজনৈতিক জ্ঞানে খুব অগ্রসর। মিশরীরা দাবী করতে লাগল যে, ১৯৩৬ সালের সন্ধি তাদের পক্ষে অবমাননাকর, ঐ সন্ধি রহিত করতে হবে। সুয়েজ-খাল অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্য থাকতে পারবে না আর সুদান থেকে ইংরেজ আধিপত্য সরিয়ে নিয়ে সুদানকে মিশরের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে হবে। যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গরিমা অনেক ম্লান এবং তাদের সামরিক শক্তি শিথিল হয়ে যাওয়ায় তারা এইসব দাবীর জোর প্রতিবাদ করতে পারলো না। ইংরেজগণ ক্রমান্বয়ে ১৯৪৬, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে মিশরীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় পূর্ব্বসন্ধির পরিবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিল কিন্তু কার্য্যে কোন আন্তরিকতারই পরিচয় দিল না।

যুদ্ধের পরে রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-আমেরিকার বিরোধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিল এবং সুয়েজ-খালের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী সজাগ হতে আরম্ভ করলো। ১৯৪৬ সালে উত্তর পারস্যে যখন রাশিয়ার সৈন্য মোতায়েন ছিল তখন থেকে আমেরিকার নৌবহর পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলো। ইংলণ্ডও সুয়েজ-খাল অঞ্চলে ক্রমেই সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে লাগল। সুদানকে মিশর থেকে আলাদা রাখার জন্য ইংরেজ বরাবরই চেষ্টা করে এসেছে।

এই সব কারণে মিশরীদের অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ১৯৫০ সালে আবার ওয়াফ্‌দ্‌-দল প্রবীণ নেতা নাহাস পাশার অধীনে মিশরে কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী হবার পর হতে বৃদ্ধবয়সেও মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রবল উদ্যমে সংগ্রাম সুরু করেন।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে মিশরী পার্লামেণ্ট একক শক্তির জোরে ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি বাতিল করে দেয়। ইংরেজরা এতে ভীষণ চটে গিয়ে বলে যে তাদের সম্মতি ছাড়া এ সন্ধি বাতিল করা বে-আইনী। মিশরীদের মধ্যে তারপর ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। তারা সুয়েজ-খাল অঞ্চল ও সুদান হতে ইংরেজ আধিপত্য অপসারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রদত্ত মধ্যপ্রাচ্য রক্ষণ-ব্যবস্থায় যোগ দেবার জন্য তাদের প্রতি আমন্ত্রণ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। গোলমালের সময় ইংরেজ তার সৈন্য ও জাহাজ দ্বারা সুয়েজ অঞ্চল ছেয়ে ফেলে। এখন ইংলণ্ড ও মিশর, এই দুই দেশের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের একটা সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য চেষ্টা চলছে।

চীন

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকের বাসভূমি হচ্ছে চীন। চীনের লোকসংখ্যা চল্লিশ কোটিরও বেশী। জাতি হিসাবে চীনাদের বলে মঙ্গোলিয়ান। এদের গায়ের রং পীত, নাক খাঁদা এবং চোখ ছোট। ভারতবর্ষের মত চীনদেশকেও প্রকৃতিদেবী অনেকটা সুরক্ষিত রেখেছেন। চীনের উত্তরে বরফে ঢাকা সাইবিরিয়া, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে হিমালয় আর পশ্চিমে পাহাড়-পর্ব্বত এবং মরুভূমি।

চীনের ইতিহাস অতি প্রাচীন; প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে চীনদেশের ইতিবৃত্ত জানা যায়। চীনে ইয়াংসি এবং পীত নদী নামে দুটো নদী আছে। এদের মাঝখানের সমতল ভূমিতে ছিল চীনাদের আদি বাস। এখান থেকেই তারা ধীরে ধীরে চীনের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তারা একজন রাজা ঠিক করে নিল। রাজাকে তারা বলতো "ঈশ্বরের পুত্র" এবং তাঁকে আন্তরিক সম্মান করতো।

জাপানীরাও রাজাকে সূর্য্যদেবীর পুত্র বলে ভক্তি এবং পূজা করেছে। চীনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে জাপানীদের তফাৎ এই যে, চীনারা রাজাকে ভক্তি করেছে, সম্মান জানিয়েছে, কিন্তু কখনো তাঁকে দেবতা বলে পূজা করে নাই। প্রায় হাজার চারেক বছর আগেই চীনবাসীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিষ তৈরি করতে এবং লিখতে পড়তে শিখেছিল। তাদের লেখা ছিল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে।

প্রাচীন কাল থেকে চীনে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করেন। প্রথমে **শিয়া**-বংশ চারশত বছরের অধিক রাজত্ব করেন। এর পর **শাং** অথবা **জিন্**-বংশ
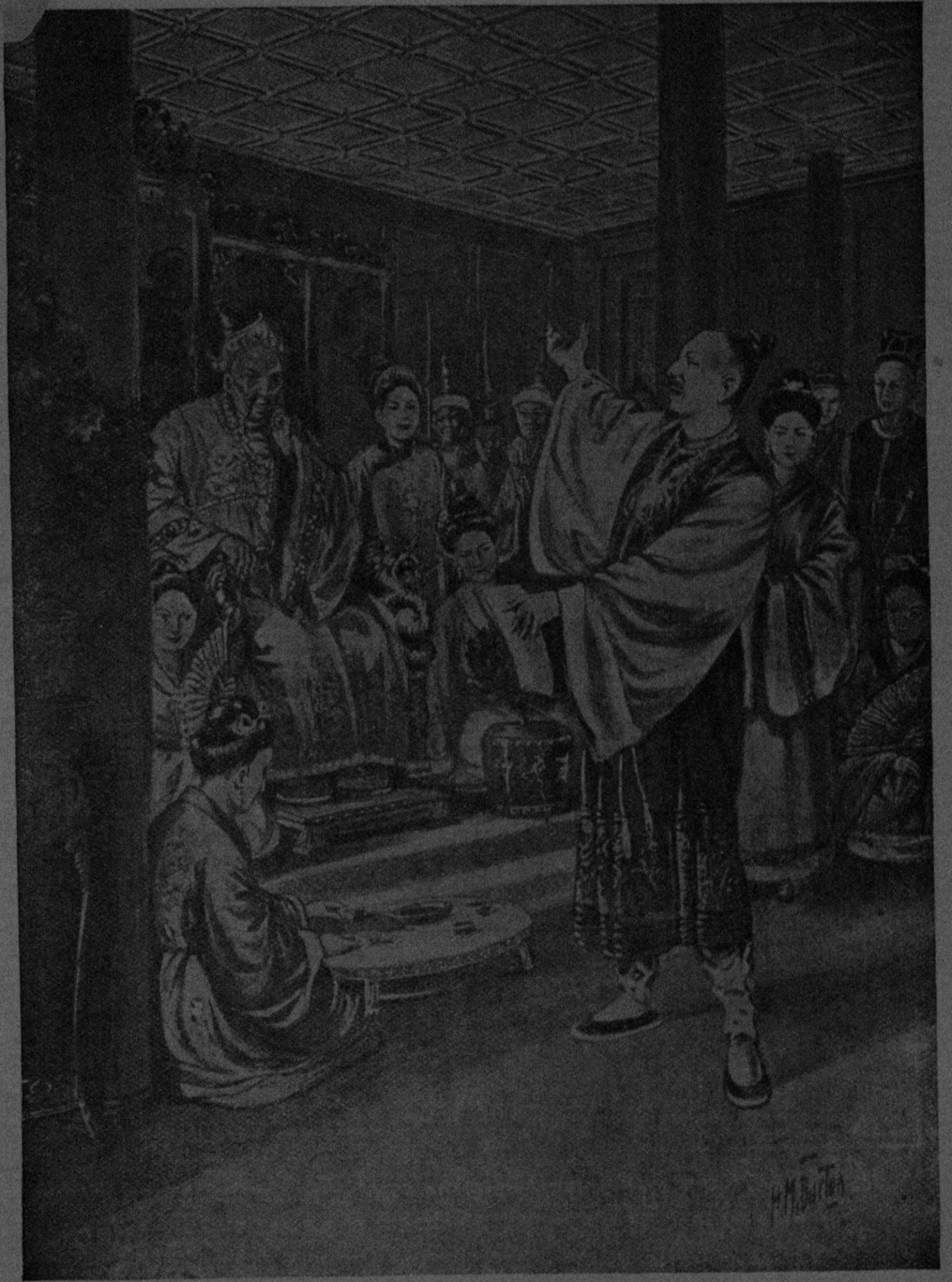
তাং যুগে কবিতা লেখার খুব উন্নতি হয়েছিল—তাং বংশীয় রাজসভায় বিখ্যাত কবি লি-পো তাঁর কবিতা পাঠ করছেন।

অধিকার লাভ করেন। তাঁরা দীর্ঘযুগ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর রাজত্ব চালান। প্রাচীন কালে এই দীর্ঘ রাজত্বের যুগগুলিতে প্রথমে যাঁরা রাজত্ব করতেন তাঁদের রাজা না বলে প্যাট্রিয়ার্ক অথবা গোষ্ঠীমুখ্য বলা চলে। আস্তে আস্তে সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের উদ্ভব হয়। তখন রাজ্যের আয়তন বেড়ে যায় এবং রাজারা রাজত্ব সুরু করেন। শাং-বংশের পর চৌ-বংশ অধিকার লাভ করেন। এঁদের রাজত্বকাল প্রায় নয়শত বছর। এঁদের সময়েই চীনে প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দু-জন দার্শনিক, কনফুসিয়াস্ এবং লাও-সে এ-যুগেই চীনে বাস করতেন।

যখন শাং-বংশ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন তখন এঁদেরই একজন বড় রাজকর্ম্মচারী, কি-সে পাঁচ হাজার অনুচর সহ কোরিয়া দেশে গিয়ে শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঐ দেশের নাম দেন, চোসেন। এই সময় থেকেই কোরিয়ার ইতিহাস সুরু হয়।

চৌ-বংশের পর চী'ন-বংশের এক রাজা সিংহাসনে বসেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম শি-হুয়াংতি। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী রাজা এবং এঁকে বলা হয় চীনের "প্রথম সম্রাট।" এই বংশের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয় চীন।

শি-হুয়াংতির ধারণা ছিল তাঁর আগে যাঁরা রাজত্ব করেছেন তাঁরা কেউই কিছু নন। তাঁদের কীর্ত্তিকলাপ লিখে রাখারও কোন সার্থকতা নাই। সুতরাং তিনি চীনের সমস্ত পুরাণো ইতিহাস পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। রাজার এই অদ্ভুত হুকুমে অনেক বই পোড়ানো হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের পণ্ডিত লোকেরা ভাল ভাল বইগুলো সব লুকিয়ে ফেলেছিলেন বলে সেগুলো রক্ষা পেল। শুধু ডাক্তারী, কৃষিবিদ্যা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বইগুলো পোড়াতে তিনি বারণ করেছিলেন।

শি-হুয়াংতি চীনের রাজধানী পিকিং সহরের চারদিকে এক বিরাট প্রাচীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। এই প্রাচীর আজও পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্যের বস্তু হয়ে রয়েছে। চীনের উত্তর দিক থেকে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির দস্যুরা এসে প্রায়ই লুঠপাট করে যেত, তাদের ঠেকাবার জন্যই শি-হুয়াংতি এই প্রাচীর গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু পিকিংয়ের চারদিকে নয়, চীনের উত্তর দিকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ধরে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার

মাইল লম্বা এই বিখ্যাত প্রাচীর। এই প্রাচীর রাজা শি-হুয়াংতির রাজত্বের সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য কীর্তি। শি-হুয়াংতি সম্রাট অশোকের সমসাময়িক।

রাজা শি-হুয়াংতির আদেশে চীনের প্রাচীন ইতিহাস পোড়ানো হচ্ছে।

কনফুসিয়াস এবং লাও-সে

চীনদেশে যত মহাপণ্ডিত লোক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছেন **কনফুসিয়াস** এবং **লাও-সে**। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কনফুসিয়াসের জন্ম, লাও-সে তাঁর চেয়ে কিছু বড়।

খুব ছোট বেলায় কনফুসিয়াসের বাবা মারা যান, তাঁর মা তাঁকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করেন। বড় হয়ে কনফুসিয়াস চীনের ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্য একটা স্কুল খোলেন। চীনদেশের সম্রাটের খুব বড় লাইব্রেরী ছিল। শি-হুয়াংতি তখনো রাজা হন নি, কাজেই সে লাইব্রেরীর কোন ক্ষতি তখনো হয় নাই। তাঁর মনে সম্রাটের লাইব্রেরীতে গিয়ে ইতিহাসের বই পড়বার ইচ্ছা জাগলো।

কনফুসিয়াস

রাজধানী অভিমুখে তিনি রওনা হলেন। সেখানে পৌছে লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন এবং ঘুরে ঘুরে তিনি লাইব্রেরী দেখতে লাগলেন। এই সব বই কিন্তু এখনকার কাগজে ছাপান ছিল না। বাঁশের ছালের উপর তুলি দিয়ে অক্ষর এঁকে এই সব বই তৈরী হয়েছিল। পড়া শেষ করে কনফুসিয়াস তাঁর দেশে ফিরে এলেন। তিনি যেখানে বাস করতেন, সে প্রদেশের নাম লু।

কনফুসিয়াসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে লু'র শাসনকর্তা তাঁকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন। কনফুসিয়াস চীনাদের আচার-ব্যবহার পালন করবার জন্য নানারকম নিয়ম-কানুন করে দিলেন। চীনাদের সভ্যতা

ও ভদ্রতা শেখাবার উপর তিনি খুব ঝোঁক দিলেন। ভদ্র ব্যবহার এবং সুসভ্য আদবকায়দা শিখে চীনাদের চরিত্র উন্নত হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাঁর প্রধান শিক্ষা এই ছিল যে, "অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার তুমি পেতে চাও না, অপরের সঙ্গে সে ব্যবহার কখনো করো না।"
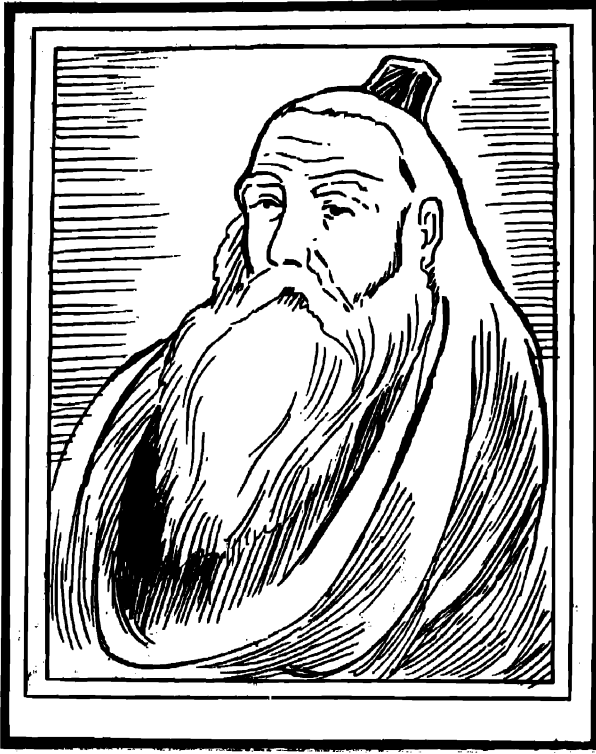
লাও-সে

লাও-সেও মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি চীনবাসীদের শিখিয়েছেন সত্যের ও প্রেমের বাণী। তিনি বলতেন, "যদি কেউ তোমাকে আঘাত করে, তাকেও তুমি ক্ষমা করো, তার সঙ্গেও সদয় ব্যবহার করো।"

চীনবাসিগণ আজও কনফুসিয়াস এবং লাও-সে'কে দেবতার মত পূজা করে। কনফুসিয়াসের শিক্ষা তাদের কাছে আজও ধর্ম্মের মতো সম্মান পেয়ে আসছে।

হান ও তাং-বংশ

শি-হুয়াংতির চী'ন-বংশ লোপ পাওয়ার পর সুরু হয় **হান**-বংশের রাজত্ব। হান-রাজাদের আমলে চীনে আবার ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এই বংশের গৌরবের যুগ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **উ-তি**। তিনি ছিলেন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিনায়ক। পূর্ব্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের সীমানা পর্য্যন্ত ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন। দক্ষিণ এশিয়ার পাহাড়ে' জাতিরাও তাঁকে অধীশ্বর বলে মানত। তখন রোম-সাম্রাজ্য খুব বড় ও ক্ষমতাপন্ন ছিল; কিন্তু চীন ছিল তার চেয়েও বড় ও শক্তিশালী।

সম্রাট উ-তির সময়েই বোধ হয় চীন ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই হান-বংশের সময়েই চীনে ভারত থেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাবও চীনে বিস্তার লাভ করে। এই প্রভাব চীন থেকে যায় কোরিয়ায় এবং কোরিয়া থেকে জাপানে। হান-রাজাদের রাজত্বকালেই কাগজ ও ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয় এবং পাথরের মূর্ত্তি তৈয়ারী সুরু হয়। হান-রাজারাই সর্ব্বপ্রথম সরকারী চাকুরীতে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নেওয়া আরম্ভ করেন।

হান-বংশের পতনের পর চীনে কয়েক শত বৎসরের জন্য বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তারপর সুরু হয় তাং-বংশের রাজত্ব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর

চীনের সাধারণ পাঠাগার (লাইব্রেরী)

প্রথম দিকে। এই সময়ে নানাদিকে উন্নতির চরম বিকাশ হয়। বড় বড় লাইব্রেরী ও সুন্দর চিত্র-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ও পণ্ডিত চীনে গমন করেন এবং চীন থেকেও অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতে আগমন করেন।

বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং তাং-যুগেরই প্রথম দিকে ভারতে আসেন। নানা দেশ থেকে বিদেশীরা এসে চীনে বসবাস করে। এই সময়ে খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্ম্মও চীনে প্রবেশ করে। কথিত আছে, আরবেরা চীনাদের কাছে কাগজ তৈয়ারী-বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে ইউরোপকে এই

বিদ্যায় শিক্ষিত করে। এই বংশ ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই যুগকে 'চীনের স্বর্ণযুগ' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তাং-যুগের চীনারা কাগজ প্রস্তুত, গোলা-বারুদ তৈরী এবং যান্ত্রিক বিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। এই সময়ে সিল্কের কাপড় বোনা ও কবিতা লেখার খুব উন্নতি হয়েছিল। লি-পো তাং-যুগের একজন বিখ্যাত কবি।

এরপর কিছুদিন দেশে বিশৃঙ্খলা চলল। তারপরে সুং-বংশ নামে আর একটা বড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হলো। সুং-বংশের সময়ে চীনের উত্তর প্রান্ত হতে দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতিরা ঐ দেশ ক্রমাগত আক্রমণ সুরু করে। খিতান জাতিরা আক্রমণ সুরু করলে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে, সুংএরা 'কিন্' অথবা 'তাতার'দের তাদের সাহায্য করতে আমন্ত্রণ করেন। কিন্ জাতির লোকেরা এসে খিতানদের তাড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু তারা জোর করে এ দেশে থেকে যায়। তারা উত্তর-চীন অধিকার করে পিকিংকে তাদের রাজধানী করে। সুংএরা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যান।

এরপর মঙ্গোল জাতিরা এসে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন আক্রমণ করে এই দেশের শাসনকর্ত্তা হয়। তবে চীনের সামরিক পরাজয় হলেও নিজের উন্নত সভ্যতা দ্বারা সে মঙ্গোলদের জয় করে।

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ

চীনের উত্তরে সাইবিরিয়ায় মঙ্গোল জাতির বাস ছিল। এদের মধ্যে দুটো উপজাতি ছিল, তাদের নাম হূন এবং তাতার। এরা যেমন অসভ্য ছিল, তেমনি ছিল দুর্দ্ধর্ষ ও হিংস্র। সুযোগ পেলেই এরা চীনদেশে এসে লুটপাট করতো। আগেই বলেছি, এদের ভয়ে চীনারা তাদের রাজধানী পিকিং সহরের চারদিকে এবং চীনের উত্তর-সীমান্তে বিরাট উঁচু প্রাচীর তুলে দিয়েছিল।

মঙ্গোল জাতির মধ্যে এক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নাম **চেঙ্গিস খাঁ**। এই চেঙ্গিস খাঁ এসে পিকিং আক্রমণ করলেন, চীনারা সহরের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে রইল। মঙ্গোলরা শত চেষ্টা করেও ভিতরে ঢুকতে পারছিল না। এমনি সময় এক বিশ্বাসঘাতক চীনা চেঙ্গিস খাঁকে সহরের একটা গোপন দরজা খুলে দেয়। সদলবলে

চেঙ্গিস খাঁ এসে পিকিংএ প্রবেশ করলেন। লুটপাট, নরহত্যা তিনি তো করলেনই, চীনাদের রাজাকেও তিনি পিকিং থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পিকিং-এ চুপচাপ বসে থাকতে চেঙ্গিস খাঁর ভাল লাগলো না। তিনি বিরাট মঙ্গোল-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে

মঙ্গোল চেঙ্গিস খাঁর বোখারা জয়

গিয়ে হাজির হলেন পারস্যে। বোখারা ও সামারকাঁদ নগরী ধ্বংস করে ইসলাম সংস্কৃতির অনেক ক্ষতি করেছিলেন। তিনি উত্তর দিকে অভিযান করে রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং কিয়েভের গ্রাণ্ড ডিউককে পরাজিত করেন।

চেঙ্গিস খাঁ অত্যাচারী হলেও ধর্ম্মব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি বিরাট, সুদূর-বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। তাঁর সময়ে মঙ্গোলরা পৃথিবীর নানাস্থান জুড়ে বসেছিল। তাঁর রাজধানী কারাকোরামে এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে বহু শিল্পী, গণিতজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সমাবেশ হয়েছিল। যোদ্ধা হিসাবে আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজারও তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যান।

চীনের মঙ্গোল রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **কুবলাই খাঁ।** তিনি সম্পূর্ণ চীন জয় করেন। কুবলাই খাঁ মঙ্গোল হলেও চীনাদের সঙ্গে মিশে অনেকটা সভ্য হয়েছিলেন। ইনিও তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের মত দুর্দ্ধর্ষ

চীনের প্রাচীর

যোদ্ধা ছিলেন এবং জাপান ও কোরিয়া জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি টংকিং, আনাম ও বর্মা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিব্বত আগেই বিজিত হয়েছিল। কুবলাই খাঁর আমলেই ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য অনেক বেশী বিস্তৃত হয়েছিল। কুবলাই খাঁর দরবারেই বিখ্যাত ভেনিশিয় পর্য্যটক মার্কো পোলো পোপ দশম গ্রেগরীর চিঠি নিয়ে এসেছিলেন।

চীনের দুরবস্থার সময়েও চিত্রাঙ্কন, চারুশিল্প প্রভৃতি নানা বিদ্যার চর্চ্চায় দেশের লোকেরা পরাঙ্মুখ হয় নাই। নানারূপ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও

চীনারা তাঁদের চিরাচরিত সভ্য, মার্জ্জিত ও সুরুচিপূর্ণ মনোভাব বজায় রেখেছেন।

কুবলাই খাঁর মৃত্যুর কিছু পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবার খাঁটি চীনা মিং-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন। এঁদের শাসনকাল রাজ্যের সুব্যবস্থা, শ্রীবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য
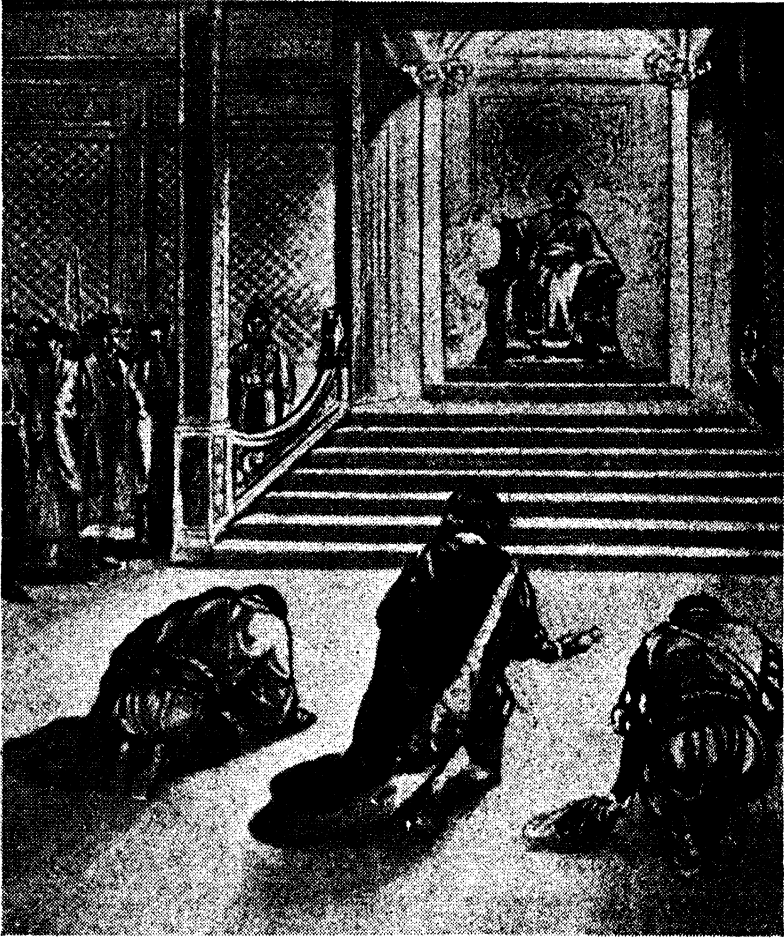
সম্রাট কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কো পোলো

বিখ্যাত। এঁদের পর সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সিংহাসন অধিকার করেন মাঞ্চু-বংশ। মাঞ্চুদের বিদেশী বলা চলে। মাঞ্চু-বংশই চীনের শেষ রাজবংশ।

মাঞ্চু-বংশ চীনের উত্তর দিক থেকে আগত অর্দ্ধ-বিদেশী হলেও আস্তে

আস্তে চৈনিক রীতি-নীতি ও ভাবধারা গ্রহণ করে চীনবাসীর মতই হয়ে যান। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিশারদ ও শক্তিশালী সম্রাটের আবির্ভাব হয়। তাঁদের অধীনে চীন-সাম্রাজ্য খুব প্রসারিত হয় ও শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। মাঞ্চু-রাজারা কেবল সাম্রাজ্য বিস্তারেই যশস্বী হন নাই, সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিবিধ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহেও তাঁরা মিং-রাজাদের ন্যায় অগ্রণী ছিলেন। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে **কাংহি** ও **চিয়েনলুং** বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চিয়েনলুংএর সাম্রাজ্য দূর-দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ১৭৯৬ সালে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও তুর্কিস্থান। কোরিয়া, আনাম, শ্যাম ও বর্ম্মাও তাঁর প্রভুত্বের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু শাসনে দুর্ব্বলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

মাঞ্চু-রাজাদের আমলেই চীনে ইউরোপীয়গণ আসতে আরম্ভ করে। রাজারা প্রথমে তাদের কোন বাধা দেন নাই কিন্তু বিদেশীদের, বিশেষ করে খৃষ্টান যাজক-শ্রেণীর অনাচার ও অপকার্য্যে রুষ্ট হয়ে সময়ে সময়ে তাঁরা ইউরোপীয় বণিকদের উপর অনেক কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেন। তা সত্ত্বেও বিদেশী ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত এসে চীনের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

চীনে ইউরোপীয়দের আগমন

চীনদেশের মত বিরাট রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা ছিল; ব্যবসা করে টাকা রোজগারের লোভে ইউরোপের অনেক দেশ থেকে ভারত ও অন্যান্য পূর্ব্বদেশের ন্যায় চীনেও বণিকেরা আসতে লাগলো। তাদের সঙ্গে আবার পাদ্রীরাও আসতেন। পর্ত্তুগীজ, ডাচ, রাশিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ধীরে ধীরে চীনদেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিল; তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্য ঐ সব দেশের গবর্ণমেণ্টও চীনে রাজদূত পাঠালেন। মাঞ্চু-রাজাদের নিয়ম ছিল, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হলে প্রত্যেককে তাঁদের সামনে 'কৌ-তৌ' করতে হবে।

কৌ-তৌ মানে হচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসে ঠকাস্ করে মাটিতে মাথা ঠোকা। ডাচ এবং রুশ রাজদূতেরা এই ব্যাপার দেখে ভয়ানক চটে গেলেন, মাটিতে মাথা ঠুকতে তাঁরা রাজী হলেন না। ইংরেজরা দেখলেন যে, মাটিতে দু-

একবার মাথা ঠুকে যদি কোটি কোটি টাকা রোজগারের উপায় হয়, তা'হলে মন্দ কি? তাঁরা কৌ-তৌ করতে রাজী হলেন এবং চীনদেশে রয়ে গেলেন। পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি অন্যান্য জাতির লোকেরাও থেকে গেলেন। ধীরে ধীরে বাণিজ্য বিস্তার করতে করতে ইংরেজরা দক্ষিণ-চীনের একটি খুব ভাল বন্দর ক্যান্টনে পোক্ত হয়ে বসলেন।

১৮৪০ সালে ইংরেজদের সঙ্গে চীনাদের একটা বড় যুদ্ধ হয়। ইংরেজ বণিকদের আফিমের ব্যবসা এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল বলে একে **আফিম-যুদ্ধ** বলা হয়। চীনদেশে আফিম চালান দেওয়াই ছিল ইংরেজদের প্রধান ব্যবসা। "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে যে কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য

আফিম জ্বালান

করতে আসে, তারা ভারতবর্ষ থেকে চীনে আফিম চালান দিত এবং বিনিময়ে চীন থেকে আসতো রূপা। এই ব্যবসায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং অন্যান্য ইংরেজ কোম্পানীর কোটি কোটি টাকা লাভ হতো। মাঞ্চু-রাজারা দেখলেন যে, আফিম খেয়ে আর চণ্ডু টেনে সমস্ত জাতিটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। তাঁরা ঠিক করলেন, চীনে আফিম-বিক্রী বন্ধ করতে হবে।

রাজার আদেশে ক্যান্টন সহরে একজন সরকারী কর্ম্মচারী অনেকখানি আফিম পাকড়াও করে সেটা পুড়িয়ে দিলেন। ইংরেজরা দেখলো, আফিমের ব্যবসা হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদের ভয়ানক ক্ষতি হবে। কাজেই তারা ক্যান্টনের ঘটনার পর চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

দুই বৎসর ধরে এই যুদ্ধ চললো। মাঞ্চু-রাজা পরাজিত হলেন। ইংরেজরা চীনের পাঁচটি বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করবার অধিকার আদায় করলো এবং হংকং দ্বীপটিও কেড়ে নিল। এই ভাবে ইউরোপীয়রা চীনে 'চুক্তিপ্রাপ্ত' বন্দরগুলি গ্রাস করতে আরম্ভ করলো এবং দেশটির শোষণ সুরু করলো।

ইংরেজের সঙ্গে এবার এসে যোগ দিল ফ্রান্স, জার্ম্মাণী এবং রাশিয়া। চীনদেশের সমস্ত বহির্ব্বাণিজ্য ধীরে ধীরে এদের হাতে চলে গেল। আমেরিকা তার 'ওপেন্ ডোর' (Open Door) নীতি ঘোষণা করে শোষণকারী দেশ-গুলির আরও সুবিধা করে দিল। 'ওপেন্ ডোর' মানে হচ্ছে খোলা দরজা,
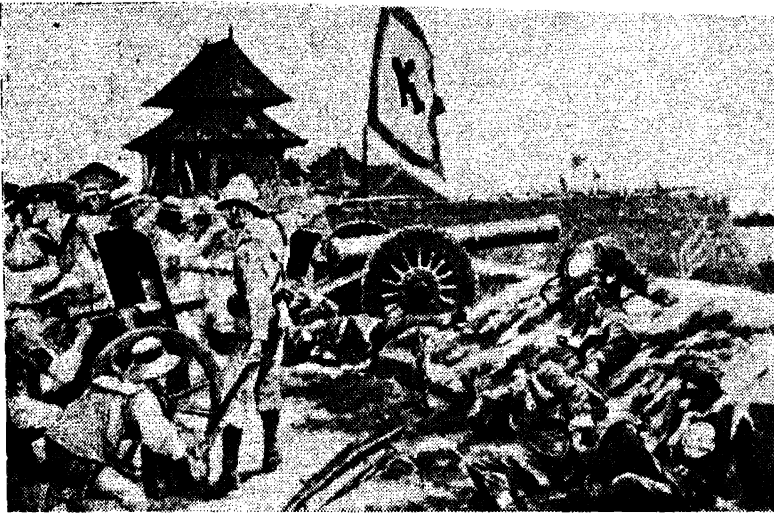
বক্সার বিদ্রোহ

অর্থাৎ চীনদেশের দরজা খোলাই আছে, যার ইচ্ছা সেখানে গিয়ে অবাধে বাণিজ্য করতে পারে।

ইংরেজের শিল্প ছিল সবচেয়ে বেশী উন্নত, জাহাজও ছিল তার সবচেয়ে বেশী, কাজেই 'ওপেন্ ডোর' নীতির ফলে তার ও আমেরিকার লাভই বেশী হলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু-রাজাদের দুর্ব্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি চীনদেশে উদ্ধতভাবে হস্তক্ষেপ করতে সুরু করলো। চীনে এ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ব্বল এবং এই প্রকাণ্ড দেশের নানাস্থানে বিশৃঙ্খলা। দীর্ঘদিনব্যাপী ধ্বংসকারী 'তেইপিং বিদ্রোহে' দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। তার সুযোগ নিয়ে প্রথমে ইউরোপীয় শক্তিগুলি ও পরে

তাদের সঙ্গে জাপান, চীনের কাছ থেকে একটার পর একটা সুবিধা ও ভূ-খণ্ড অন্যায়রূপে আদায় করতে লাগলো। এই সব বিদেশী শক্তি-গুলির মধ্যে পরস্পর স্বার্থ-সংঘাতের ফলে চীনের স্বাধীনতা কোনরকমে বজায় রইলো বটে, কিন্তু আর্থিক অবস্থায়—ব্যবসায়, বাণিজ্যে—পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেললো।

চারদিকে চীনের তখন ভাঙন ধরেছে। কেন্দ্রীয় শাসন-শক্তি শিথিল। স্বার্থান্বেষী লোকেরা যার যার সুবিধা আহরণে মত্ত। দেশের উত্তর দিকে কতকগুলি "তুচুন" বা সামরিক সর্দারের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা

চীন-জাপানের যুদ্ধ

বিদেশীদের অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট হয়ে দেশে নানারূপ অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে লাগলেন। ফলে, চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ ক্রমেই ধ্বসে পড়তে লাগলো। দু-একজন বিচক্ষণ লোক যথা, **লি হুং-চ্যাং** এবং মহারাণী-মাতা **জু-সি** নানারূপ সংস্কারের দ্বারা দেশকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চীনদেশের বিরাটত্ব, তার বিপুল লোকসংখ্যা এবং বিদেশী শক্তিদের ক্রমান্বয়ে অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্য চীনের নেতাদের-পক্ষে কোনরকম কার্য্যকরী সংস্কার করা সম্ভব হলো না।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমেই নানা অজুহাতে ও অস্ত্রের জোরে চীনের নানাস্থানে, বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী বন্দরগুলিতে জুড়ে বসলো। তাঁদের শোষণে চীন ক্রমেই হতবল ও হৃত-সর্ব্বস্ব হতে লাগলো।

জাপান, এই সময়ে উদীয়মান শক্তি। জাপানীদের মধ্যে বরাবরই একটা সামরিক ঐতিহ্য ছিল। তাদের দেশ ছোট এবং তারা যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ বলে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অনাচারকে প্রশ্রয় দিতে রাজী হলো না। কতিপয় বিখ্যাত নেতার চেষ্টায় জাপান আশ্চর্য্যরূপ ক্ষিপ্রগতিতে একটি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত, উন্নত শক্তিমান্ জাতিতে পরিণত হলো। ইউরোপীয় জাতিদের মত জাপানীরাও দুর্ব্বল চীনদেশে হস্তক্ষেপ করা সুরু করলো। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াকে উপলক্ষ করে, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে **চীন-জাপান যুদ্ধের** ফলে জাপান ফরমোসা প্রভৃতি জয় করলো। অবশ্য অপরাপর শক্তির বাধাদানে জাপান আশানুরূপ সুযোগ লাভ করতে পারলো না।

চীন-জাপান যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তিরা আফ্রিকার মত বিরাট চীনদেশকেও ভাগ-বাঁটরা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলো। রাশিয়া গ্রাস করলো উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি, ইংরেজ প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো এবং ফরাসী ক্রমাগত দক্ষিণ-চীনে কায়েমী হয়ে বসতে লাগলো। কিন্তু এই সময়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপের জন্য 'ওপেন্ ডোর' বা ব্যবসা-বাণিজ্যে দরজা-খোলার নীতির প্রচলন হওয়ায় চীনের স্বাধীনতা কোনরূপে টিঁকে গেল। বিদেশী শক্তিদের অনাচারের জন্য চীনে এই সময়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে একটি দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ইহাকে বলে **"বক্সার"** বা মুষ্টিযোদ্ধাদের বিদ্রোহ।

১৯১১ সালের বিপ্লব

বিভিন্ন যুদ্ধে বিদেশীর কাছে মাঞ্চু-রাজা হেরে যাওয়ার পর চীনাদের বিশ্বাসও রাজার উপর থেকে টলে গেল। বিদেশীরা এসে চীনের সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে যাচ্ছে, দেশের লোক ক্রমেই গরীব হয়ে পড়ছে, অথচ রাজা এতে বাধা দিতে পারছেন না। এই সব দেখে দেশের লোকের মন প্রতিকারের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতে লাগলো। ১৯০৪-১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিরাট জয়ও চীনের তরুণদের মনে উৎসাহ জাগালো।

ক্যান্টন সহরে কয়েকজন লোক মিলে একটা বিপ্লবী দল গড়ে তুললেন। দেশের লোকদের এঁরা বোঝাতে লাগলেন যে, মাঞ্চু-রাজত্বের উচ্ছেদ করে দেশে প্রজাদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া চীনের উন্নতির

আর কোন উপায় নাই। এই বিপ্লবী দলের নাম ছিল **'কুয়োমিণ্টাং'** অথবা গণজাতীয়দল, আর এঁদের নেতা ছিলেন ডাঃ **সান ইয়াৎ-সেন।** এই দল ১৯১১ সালে জোর বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন। তাঁরা 1912 সালে মাঞ্চু-রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে চীনদেশে প্রজাতন্ত্র-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। **নানকিং** সহর প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হয়।

সান ইয়াৎ-সেন

দক্ষিণ-চীনের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৬৭ সালে সান ইয়াৎ-সেন জন্মগ্রহণ করেন। হংকং-এর এক ডাক্তারী স্কুল থেকে ২৭ বছর বয়সে তিনি ডাক্তারী পাশ করেন। কুয়োমিণ্টাং-দল তিনিই গড়ে তোলেন। এ-দলের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে তাঁকে ইউরোপে যেতে হয়েছে। চীনারা তাঁকে এত শ্রদ্ধা করতো যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের চীনা ব্যবসায়ীরা তাঁকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। মাঞ্চু-রাজ তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। ১৯১২ সালে কুয়োমিণ্টাং-দল যখন চীনে প্রজাদের গবর্ণমেণ্ট গঠন করলো, সান ইয়াৎ-সেন তখন লণ্ডনে। এই খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসেন।

সান ইয়াৎ-সেন

চীনের লোকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সান ইয়াৎ-সেন আজীবন চেষ্টা করেছেন। চীনদেশের স্থায়ী উন্নতি কি ভাবে হতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করে তিনি তিনটি উপায় নির্দ্দেশ করেন। উপায় তিনটি এই :—

প্রথম, চীন থেকে বিদেশীদের সমস্ত প্রভুত্ব দূর করে চীনাদের হাতে

দেশের সব রকম কর্তৃত্ব নিয়ে আসতে হবে। বাণিজ্য করবার নাম করে বিদেশীরা চীনে এসে চীনাদের উপর যে কর্তৃত্ব করে, তা বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়, দেশের লোকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন, চীনে রাজা থাকবেন না। তৃতীয়, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তাঁর এই সব নীতি কাজে খাটানোর জন্য চেষ্টা আরম্ভ করলেন কিন্তু তাঁকে পদে পদে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কেবল সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে তাঁকে খুব সাহায্য করেছে। কিন্তু তাঁর কাজ শেষ হওয়ার আগেই ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ৫৮ বৎসর বয়সে মারা যান।

চ্যাং কাই-শেক

ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের পর আধুনিক চীনে সব চেয়ে শক্তিশালী লোক বলে খ্যাতিলাভ করেছেন চ্যাং কাই-শেক। চীনের এক ছোট্ট গ্রামে এক সামান্য ব্যবসায়ীর ঘরে ১৮৮৭ সালে চ্যাংয়ের জন্ম। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি জাপানে। সান ইয়াৎ-সেন খৃষ্টান ছিলেন; চ্যাংও বৌদ্ধ নন, খৃষ্টান। ছাত্রাবস্থায় সামরিক শিক্ষালাভের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল সব চেয়ে বেশী। চ্যাংয়ের প্রধান গুণ এই যে, তিনি কোন কাজে একবার হাত দিলে সেটা শেষ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়েন না।

উত্তর-চীন এবং দক্ষিণ-চীনের মধ্যে বরাবরই একটা ঝগড়া আছে। সান ইয়াৎ-সেন, চ্যাং কাই-শেক এঁরা সবাই দক্ষিণ-চীনের লোক। উত্তর-চীনের একজন প্রধান নেতার নাম ছিল উয়ান শি-কাই। উত্তর ও দক্ষিণ-চীনের বিরোধ মেটাবার জন্য ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন নিজে সভাপতির পদ ত্যাগ করে উয়ান শি-কাইকে সভাপতির আসনে বসিয়েছিলেন। উয়ান শি-কাই কিন্তু ডাঃ সানের এই ভদ্রতার সম্মান রাখেন নাই; কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে সম্রাট বলে জাহির করে উল্টে বিপ্লবী দলেরই পিছনে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য উয়ান শি-কাইয়েরই হার হলো ও শীঘ্রই তিনি মারা যান।

জাপান এদিকে ক্রমেই তার শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছিলো এবং চীনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার পর জাপান একরূপ

বিনা কারণেই জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও চীনস্থিত জার্ম্মাণীর অধিকৃত সাণ্টুং প্রদেশের কিউচউ কেড়ে নেয়।

এই সময় থেকে জাপান ক্রমাগতই সাণ্টুং ও মাঞ্চুরিয়ায় জোর করে প্রবেশ করতে থাকে। চীনবাসী প্রবল প্রতিবাদ করে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের কাছ থেকে সাহায্যের অভাবে তারা কিছুই করতে পারে না। ফলে, জাপান ১৯১৫ সালে অসহায় চীনের উপর তার কুখ্যাত "একুশ দফা দাবী" স্থাপন করলো। চীন বিশ্বযুদ্ধে
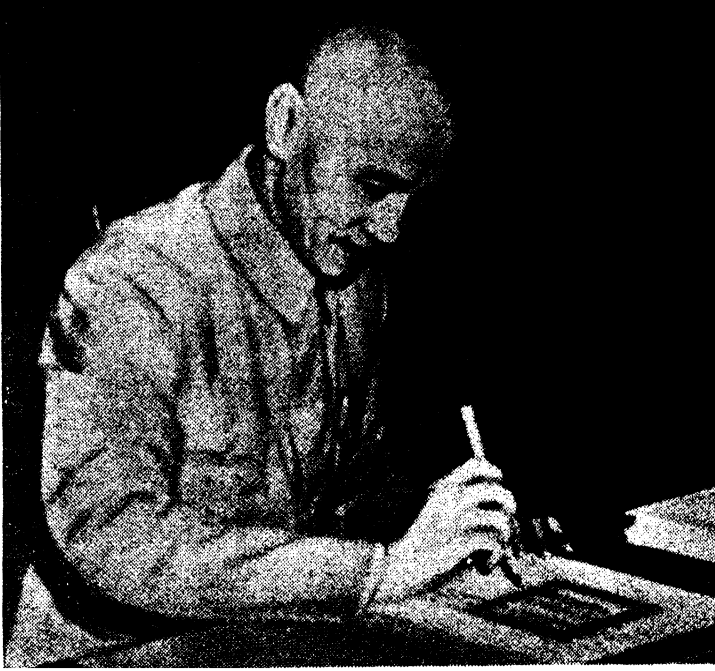
চ্যাং কাই-শেক

মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগদান করা সত্ত্বেও, যুদ্ধের অবসানে, প্যারিস শান্তি সম্মিলনে পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের কাছে কোন সুবিচার পেল না।

অপরাপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেলেও, বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে, সোভিয়েট রাশিয়ার তরফ হতে ডাঃ সান তাঁর দক্ষিণ-চীনের ক্যান্টন সরকারের কার্য্যে প্রভূত উৎসাহ পেলেন। এই সময় থেকে চীনে ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ গোপনে ও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগলো। ১৯২০ সালে একটি কম্যুনিষ্ট দল গঠিত হলো।

চ্যাং কাই-শেকের হাতে ১৯২৪ সালে কুয়োমিণ্টাং-দলের নেতৃত্বভার

আসবার পর তিনি তলোয়ারের জোরে, উত্তর-দক্ষিণ চীনের বিবাদ ঘুচিয়ে, সমগ্র চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই চেষ্টা তাঁর কতকটা সফলও হয়েছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয় নাই। এই জন্য তিনি নিজেই অনেকটা দায়ী কারণ তিনি কুয়োমিণ্টাং-দলের একতা বা দেশের কৃষক মজদুরের স্বার্থের চেয়েও নিজের কর্তৃত্ব ও বড়লোকদের সুবিধা বেশী দেখতে আরম্ভ করলেন। তিনি বামপন্থী ও কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে শত্রুতা ও ব্যাপক অত্যাচার সুরু করলেন। তিনি বরং সাংহাইর বিদেশী বণিকদের সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন। চ্যাংয়ের এই ব্যবহারে কুয়োমিণ্টাং-দলের একতা ভেঙ্গে গেল, দেশে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সব গোলমালের সুযোগ নিয়ে জাপান চীন আক্রমণ করে উত্তর-চীনের মাঞ্চুরিয়া এবং আরও অনেক অংশ দখল করে নেয়, ও উত্তর ও দক্ষিণ-চীনের মধ্যে মস্ত ভেদ সৃষ্টি করে দেয়।

১৯৩১ সাল থেকে জাপান নিজের শক্তিমাদকতায় চীনের নানাস্থানে আক্রমণ সুরু করে ও চীনবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। আধুনিক শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি অবশ্য চীনের ছিল না। কাজেই ক্রমশঃ তাকে পরাজয়ের গ্লানির ভিতর গভীরভাবে ডুবে যেতে হলো। মাঞ্চুরিয়াতে জাপ-নিয়ন্ত্রিত মাঞ্চুকুয়ো-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলো। জাপানের ক্রমাগত আক্রমণ ও অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চ্যাং কাই-শেক দেশের অন্যান্য দলের সঙ্গে সমবেত হয়ে, জাপানের অগ্রাভিযানে প্রবলভাবে বাধা দিলেন কিন্তু তিনি জাপ-সৈন্যের দক্ষিণমুখী গতি কিছুতেই রোধ করতে পারলেন না। জাপানের আক্রমণ-পর্ব্বে চীনের তরুণ-তরুণী ও জনসাধারণ যে সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখিয়েছে ইতিহাসে তা এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। তারা নির্ভীকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে, কখনও দমে নাই; কখনও ক্লান্তি মানে নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে মিত্রতা করলো। কাজেই চীনকে আসতে হলো মিত্রশক্তির পক্ষে। তা ছাড়া, ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল অচ্ছেদ্য। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হলে চীনের সহযোগিতার মূল্য খুবই বেশী। এইটা বুঝতে পেরে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি চীনকে মর্য্যাদাও দিতে লাগলো খুব। চীনের বন্দর-গুলিতে তখনও বিদেশীদের যে অতি-রাষ্ট্রিক ক্ষমতা বজায় ছিল, ১৯৪৩ সালে তারা তা বর্জ্জন করায় এই সময় থেকে চীন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হলো।

মার্কিণ সেনাপতি ষ্টীলওয়েলের উপর চীনা সৈন্যদলকে শিক্ষাদান ও পরিচালনা করবার ভার অর্পণ করে তাঁকে চীনে নিয়ে এলেন চ্যাং কাই-শেক। ব্রহ্ম-রণাঙ্গনে চীনা সৈন্য ইংরেজের স্বপক্ষে যুদ্ধ করতে লাগলো। মিত্র-শক্তির ভিতর চীনকে পঞ্চ-প্রধানের অন্যতম বলে গণ্য করা হলো এই সময়ে।

১৯৪৫এর ২রা সেপ্টেম্বর জাপান বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করলো মিত্রশক্তির কাছে। ৯ই সেপ্টেম্বর নানকিংয়ে চীনা সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলো, চীনস্থিত দশলক্ষ জাপসেনা।

নতুন চীন

বিশ্বযুদ্ধের পরে চীনে কম্যুনিষ্টদলের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়ে চললো। চ্যাং কাই-শেকের কুয়োমিন্টাং ও কম্যুনিষ্ট-দলের ভিতর পূর্ব্ব থেকেই ঘোরতর মনোবিবাদ ছিল। এখন সেই বিবাদ প্রবল হয়ে উঠলো। কম্যুনিষ্ট-নেতা মাও সে-তুংকে আমন্ত্রণ করে এনে চ্যাং কাই-শেক একটা নিষ্পত্তির চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলো। তখন কম্যুনিষ্টগণ অস্ত্রমুখে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হলো। বলা বাহুল্য, তাদের পিছনে সোভিয়েটের আনুকূল্য ছিল।

মাও সে-তু

মিত্রশক্তি চীনের গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হলো না। দেশের জনসাধারণও দলে দলে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যোগদান করলো চ্যাং কাই-শেক পদে পদে পরাজিত হতে লাগলেন। প্রদেশের পর প্রদেশ কম্যুনিষ্টদের বশীভূত

হলো। পিকিং, নানকিং, সাংহাই—এইসব বিখ্যাত মহানগরী একে একে অধিকার করলো কম্যুনিস্টরা। চ্যাং চীনের প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

মাও সে-তুংএর কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট এখন বিশাল চীনদেশ অধিকার করে বসেছে। আমেরিকা বাদে অনেক বড় বড় শক্তি তাঁর গবর্ণমেণ্টকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। চ্যাং কাই-শেকের কুয়োমিণ্টাং বা জাতীয় দল, বিদেশী শক্তির সাহায্যে এখন কোনরূপে ফর্মোসা দ্বীপে টিকে আছে।

নতুন চীন বহুদিনের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির পর নব-মূর্ত্তিতে জেগে উঠেছে। সমস্ত দেশে এখন একটা নবচেতনা, জীবনের স্পন্দন ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। **চীন লোক-সাধারণতন্ত্র** ১৯৪৯, ১লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও সে-তুং হন এর সভাপতি, চৌ এন-লাই প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতি চু তে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। ক্ষমতা লাভ করার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে চীনের নতুন গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কল্যাণকল্পে দেশের আমূল পরিবর্ত্তন করেছেন।

বর্ত্তমানে চীনে কম্যুনিষ্ট-দল প্রভাবশালী হলেও অনেক গণতান্ত্রিক দল সরকারের সঙ্গে যুক্ত আছে। এখানকার কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা রাশিয়ার অবিকল অনুকরণ নয়, চীনের অতীত রীতি, নীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এর গভীর যোগাযোগ আছে। বর্ত্তমান সরকার চীনের ভূমি-বিন্যাস, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমতা, সর্ব্বসাধারণের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সমস্ত দিকেই বিপ্লবকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বহুযুগের বিশৃঙ্খলা ও ভেদাভেদের পর অবশেষে এখন দেশে একটি শক্তিশালী, সংহত কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন চীনের সেনাদল অসংখ্য ও তারা আধুনিক উন্নত রণবিদ্যায় সুদক্ষ। তারা এখন আর সামরিক পর্য্যায়ে পিছিয়ে থাকতে নারাজ। মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশ, যেগুলির উপরে চীনের ঐতিহাসিক যুগে অধিকার ছিল, সেগুলিকে চীনারা তাদের নিজেদের পরিচালনাধীনে আনার জন্য উন্মুখ।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি থেকে কোরিয়ায় যে যুদ্ধ চলেছে চীনকে আত্মরক্ষা ব্যবস্থাস্বরূপ সেখানে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। ১৯৫০, ২৫শে জুন থেকে কোরিয়া দেশে রণদামামা বেজে উঠে। ঐ তারিখ

চীন—
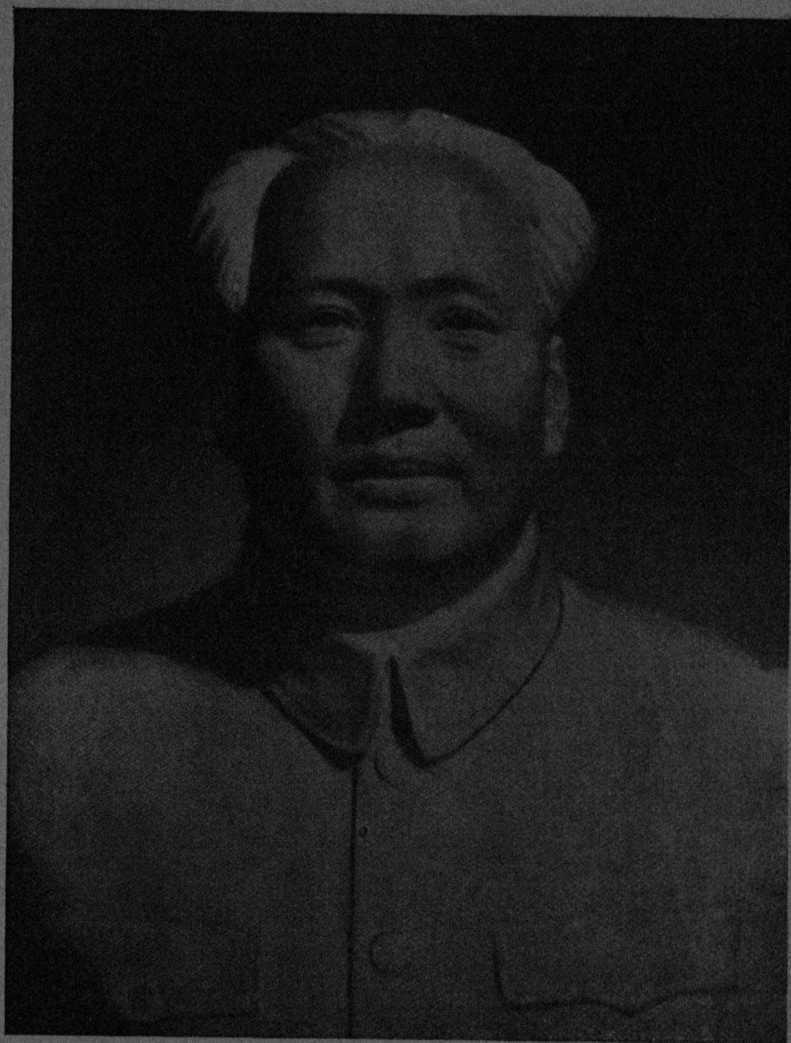
লাল চীনের রাষ্ট্রনেতা মাও-সে-তুং

উত্তর কোরিয়া সরকারের সৈন্যদল ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া সাধারণতন্ত্রকে আক্রমণ করে। তখন থেকে গোলমাল সুরু হয়।

কোরিয়ার ইতিহাস বহু পুরাতন। অতীতে অনেককাল স্বাধীন থাকবার পর কোরিয়া প্রথমে চীন ও পরে জাপানের অধীনে যায়। বর্ত্তমান যুগে কোরিয়াবাসী স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চালের আবর্ত্তে পড়ে কোরিয়া দেশ এখন দ্বিধাখণ্ডিত। ৩৮° অক্ষরেখা দেশের দুই ভাগকে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে। উত্তর কোরিয়া সোভিয়েটপন্থী সাধারণতন্ত্র। কিম ইর সেন এর প্রধানমন্ত্রী, রাজধানীর নাম পিয়ঙ্গিয়াং। আমেরিকার আনুকূল্যপুষ্ট দক্ষিণ কোরিয়া সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হয়েছেন সীংম্যান রী, সিউল এর রাজধানী।

বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত আমেরিকা ও রাশিয়ার উস্কানিতে এই দুই দেশে তীব্র গোলযোগ চলছিল। ১৯৫০ সালে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ শক্তিবর্গ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে আখ্যা দেয় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ অবিলম্বে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়।

১৯৫০ সালে নভেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জের সেনাদল মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে পৌঁছলে চীনের অগণিত স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনী কোরিয়া রণক্ষেত্রে, উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যোগদান করে। তারপর থেকেই কোরিয়ার যুদ্ধ জটিল হয়ে উঠে এবং সে গোলমাল এখনও মিটে নাই। ফর্মোসা দ্বীপে মার্কিণ রণসম্ভার প্রভৃতি মোতায়েন রাখার জন্য চীন আমেরিকাকে তার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী আখ্যা দেয়। ভারত বরাবরই চীনকে জাতিপুঞ্জে সদস্যরূপে গ্রহণ ও কোরিয়া যুদ্ধের সন্তোষজনক সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে। বর্ত্তমানে অনেক দিন পর্য্যন্ত কোরিয়ার দুই যুধ্যমান দলের সদস্যদের নিয়ে যুদ্ধ-বিরতির জন্য একটি সম্মিলন চলছে।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। এই দেশ প্রাকৃতিক আবেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত—উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতমালা আর তিন দিকে সমুদ্র। এই দেশের ইতিহাস-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বহু পুরাতন। কত পুরাতন ঐতিহাসিকগণ এখন পর্য্যন্ত ঠিক করে বলতে পারেন না। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের ফলে ভারতবর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল; কিন্তু কয়েক বছর আগে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বেও সিন্ধু নদের উপত্যকায় এক সুসভ্য জাতি বাস করত। এই সময়কার ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতায় প্রস্তরযুগের পর তাম্রযুগের ইতিহাস। প্রস্তরযুগে এ দেশের অধিবাসী ছিল অনার্য্যগণ।

তাম্রযুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত **মহেঞ্জো-দড়ো** এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত **হরপ্পা** নামক স্থানে মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছে। এই সিন্ধু-সভ্যতা লৌহযুগের এবং বৈদিক যুগেরও আগেকার। এই প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে মিশর, পশ্চিম-এসিয়া এবং চীনের আদি সভ্যতার

তুলনা করা চলে। এই সভ্যতার সহিত বোধহয় পশ্চিম-এসিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার নিকট সম্পর্ক ছিল। এই যুগে ভারতে শিল্পকলা, নগর-নির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয়
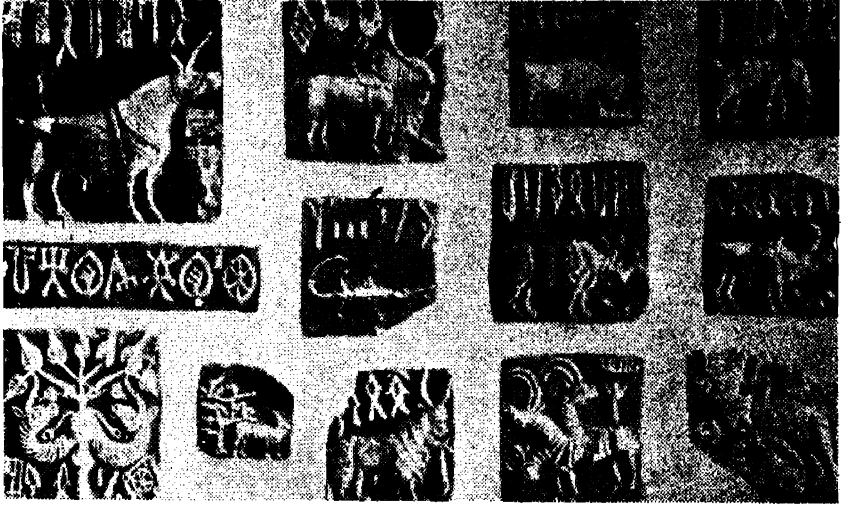
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নানাপ্রকার শীল-মোহর
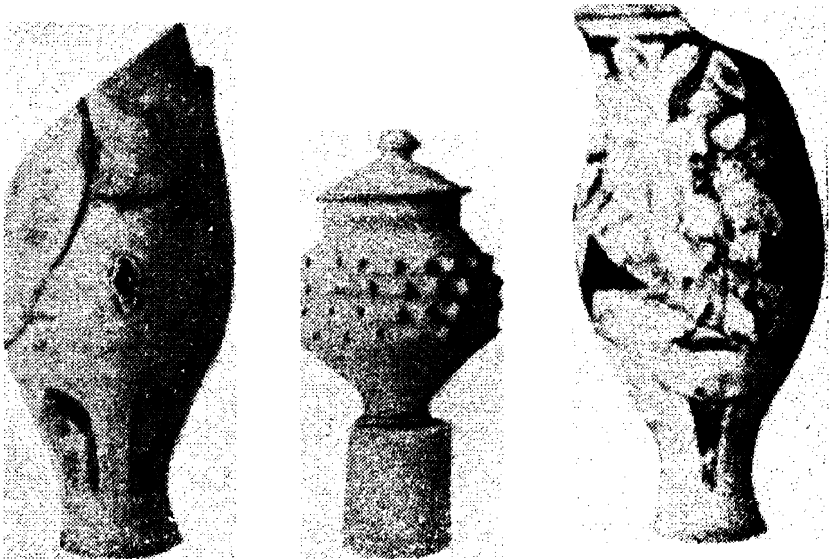
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নানাপ্রকার মৃৎপাত্র

পাওয়া যায়। তখনকার অনেক লেখা পাওয়া গিয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত শীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

আর্য্য-সভ্যতার পূর্ব্বে দ্রাবিড় জাতিও ভারতে উঁচু ধরণের সভ্যতা বিস্তার করেছিল। এরা খুব সম্ভব বাইরে থেকে এদেশে এসেছিল।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ অব্দে আর্য্যজাতি বোধহয় মধ্য-এসিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ জয় করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করে। পাঞ্জাব থেকে তারা ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

আর্য্যেরা খুব ভাল লেখাপড়া জানত। তাদের সব চেয়ে পুরানো এবং সব চেয়ে বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থের নাম **বেদ**। বেদ আবার চার ভাগে বিভক্ত:—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব্ব। আর্য্য ঋষিরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার স্তব করতেন এবং তার জন্য চমৎকার সব স্তোত্র রচনা
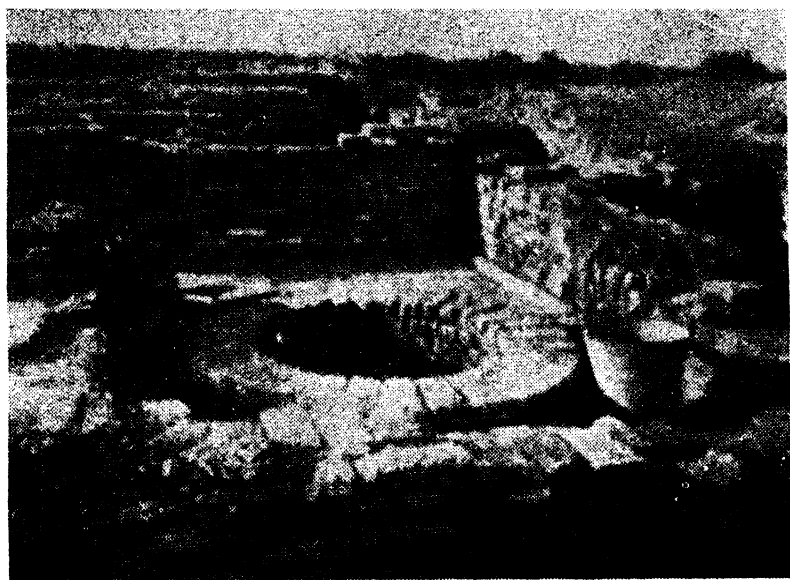
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত একটি কূপ

করতেন। তাঁরা যজ্ঞের জন্যও মন্ত্র রচনা করতেন। এই সব স্তব, স্তোত্র এবং মন্ত্রই হল বেদের প্রধান উপাদান। বেদ ছাড়াও আর্য্য মনীষীগণ বেদাঙ্গ, সংহিতা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সঙ্গীত-কলা, স্থপতি-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁদের অনেক ভাল ভাল লেখা আছে।

আর্য্যেরা হচ্ছে হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষ। হিন্দুদের মধ্যে আর্য্যযুগে **জাতিভেদ-প্রথা** হয়ত আরম্ভ হয়, কিন্তু পরে রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্য যুগে উহার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। এইরূপে ভারতে চারিটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর

উদ্ভব হয়; যথা:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা পূজা-অর্চনা এবং ধর্ম্ম-সাহিত্য অধ্যয়ন করত। ক্ষত্রিয়েরা দেশরক্ষা ও যুদ্ধ করত। বৈশ্যেরা করত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য, আর শূদ্রদের কাজ ছিল এদের ভৃত্য হয়ে থেকে সেবা করা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি

মহেঞ্জোদড়ো নগরীর একটি রাস্তা
(উহার দুই পাশে আবৃত পয়:প্রণালী অবস্থিত)

জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা অনেকাংশে আজও প্রচলিত রয়েছে।

আর্য্যসভ্যতার ধারা মূলতঃ পরবর্ত্তী ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। মিশর, বাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের পুরাতন সভ্যতা এখন অনেক ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু চীনের প্রাচীন সভ্যতার ন্যায়, ভারতীয় বৈদিক-আর্য্যসভ্যতা, নানাযুগের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত অনেকটা অব্যাহতরূপে চলে এসেছে। রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানি মহাকাব্যে বৈদিক আর্য্যযুগের শেষের দিকের পূর্ণতর সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র পাওয়া যায়।

গৌতম বুদ্ধ

উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে কপিলাবস্তু নামে এক নগরে শুদ্ধোধন নামে শাক্য-বংশের এক রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। **গৌতম** নামে তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের অল্প পরেই গৌতমের মায়ের মৃত্যু হয়।

ছোটবেলা থেকেই গৌতম চিন্তাশীল এবং সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁকে সাংসারিক বিষয়ে আকৃষ্ট করবার জন্য, রাজা শুদ্ধোধন গোপা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী বালিকার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। কিন্তু পথে বেরোলেই গৌতমের চোখে পড়ত পীড়িত, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত লোক; তাদের দুঃখ দেখে তিনি বিচলিত হতেন। মৃতদেহ দেখেও তাঁর খুব দুঃখ হত। কেমন করে রোগ, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তিনি সব সময় শুধু সেই সব কথা চিন্তা করতেন। অবশেষে এক যোগীর শান্ত মুখশ্রী দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তি পেলেন এবং কোন্ পথে অগ্রসর হলে মানুষের মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, তার কতকটা আভাস পেলেন।

গৌতম বুদ্ধ

এই সময়ে ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তিনি দেখলেন, সংসারে মায়ার বাঁধন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই তিনি হঠাৎ একদিন রাত্রে সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন।

ছয় বৎসর তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করে কোথাও শান্তি পেলেন না। অবশেষে গয়ায় এক গাছের নীচে বসে তিনি নির্জ্জনে সাধনা আরম্ভ করলেন। দিনরাত তিনি শুধু ধ্যান করতেন, কেমন করে, কোন্ পথে অগ্রসর হলে মানুষের রোগ, শোক, জরার কষ্ট আর থাকবে না। দীর্ঘকাল

গভীর ধ্যানের পর তিনি প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তিলাভের উপায় আবিষ্কার করলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হল বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানী।

তখন তিনি বেরোলেন তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করতে। দেশের লোককে তিনি শেখালেন যে, মানুষ নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিজের ভাগ্য গড়ে তোলে। এ জন্মে যদি কেউ ভাল কাজ করে, তাহলে পরজন্মে সে উন্নততর জীবন লাভ করতে পারে। এইভাবে ক্রমাগত ভাল কাজ করলে এবং সৎপথে জীবনযাপন করলে মানুষ অবশেষে মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করবে। নির্ব্বাণ লাভের পর মানুষের আর জন্ম হবে না; সুতরাং পৃথিবীর রোগ, শোক, জরার কষ্টও তাকে আর ভোগ করতে হবে না। সত্যকথা বলা, জীবে দয়া, আত্মসংযম, এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা, এই সব নীতি মেনে চলা নির্ব্বাণলাভের পক্ষে প্রয়োজন বলে বুদ্ধদেব মনে করতেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। বুদ্ধের প্রচারিত এই ধর্ম্মের নাম হয় **বৌদ্ধধর্ম্ম**। ৪৫ বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর ৮০ বছর বয়সে বুদ্ধের মৃত্যু হয়।

বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন তখন পূর্ব্ব-ভারতে **মহাবীর** নামে আর একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয়। মহাবীর যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন তার নাম **জৈনধর্ম্ম**। বুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করছিলেন, সেই সময়ে উত্তর-ভারত ছিল ছোট ছোট অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত। তখনও সেখানে কোন বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নাই। ক্রমে চারিটি রাজ্য প্রাধান্য লাভ করে। এদের নাম কোশল, মগধ, বৎস এবং অবন্তি। আস্তে আস্তে মগধরাজ্য নৃপতি বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র বিজয়ী অজাতশত্রুর সময়ে বিস্তারলাভ সুরু করে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে থাকে।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে **মহাপদ্ম নন্দ** নামে মগধের একজন অসাধারণ বীর সম্রাট্ উত্তর-ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় করেন। তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী ছিল। মহাপদ্ম নন্দের

ছেলেদের রাজত্বকালে মাসিডোনিয়ার বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এর বহুপূর্ব্বে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সম্রাট্ দারাউস পাঞ্জাব আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় পাঞ্জাবে পারসিক শক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং উহা একতাবিহীন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার দুর্ব্বার গতিতে বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য জয় করে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অনেক দুর্ব্বলচিত্ত রাজা তাঁর নিকট

আলেকজাণ্ডার

বশ্যতা স্বীকার করলেন। তিনি ক্রমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। তবে তার চেয়ে বেশীদূর আর অগ্রসর হতে পারেন নাই। এই সময় ভারতীয় রাজা পুরুর বীরত্বে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। মাত্র দুই বৎসর ভারতবর্ষে থেকেই তিনি ফিরে চলে যান। দেশে ফিরবার পথে বাবিলন সহরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছাবার পরই মহাপদ্ম নন্দের বংশধরকে বিতাড়িত করে ক্ষত্রিয় মৌর্য্যবংশের এক বীর **চন্দ্রগুপ্ত** মগধের সিংহাসনে বসেন। গ্রীকদের হটিয়ে দিয়ে তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন। **সেলুকস** নামে আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব পুনরধিকার করবার জন্য চেষ্টা করেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়। সেলুকস এই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট এই তিনটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এর পর পারস্যের সীমান্ত হতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। তিনি পশ্চিমে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশও জয় করেছিলেন। তাঁর দরবারে সেলুকস-প্রেরিত গ্রীক রাজদূত **মেগাস্থিনিস** অনেকদিন অবস্থান করে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে একখানি মনোরম বিবরণ লিখেছিলেন। **চাণক্য** নামে চন্দ্রগুপ্তের একজন বিচক্ষণ কূটনৈতিক মন্ত্রী ছিলেন। চাণক্য ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। এঁর পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যশাসনে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। চাণক্যের আর এক নাম কৌটিল্য। কৌটিল্যের বিখ্যাত **অর্থশাস্ত্র** পুস্তক হতে আমরা মৌর্য্য শাসনদক্ষতার পরিচয় পাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে শৃঙ্খলা ও আধুনিক ধরণের নানারূপ উন্নত শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী যেমন সুরক্ষিত ছিল তেমনি প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত এবং কর্ম্মব্যস্ততায় মুখরিত ছিল।

মহামতি অশোক

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র **অশোক** ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। সিংহাসনে আরোহণ করবার কিছুদিন পরে তিনি কলিঙ্গদেশ জয় করেন। বর্ত্তমান উড়িষ্যার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। এই যুদ্ধে বিষম হত্যাকাণ্ড দেখে অশোকের মন বেদনায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে, এবং সেই সময় হতেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই সত্যের প্রচার আরম্ভ করেন। **উপগুপ্ত** নামক একজন সন্ন্যাসী অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন। জীবনের অবশিষ্টকাল অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ

করেন। এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু দেশে অশোকের নিজস্ব অনেক প্রচারক ভিক্ষু, ভিক্ষুণীরা গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ফলে, পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বিরাজমান।

রাজ্যশাসনেও অশোক বিশেষ আদর্শ প্রণালীর অবতারণা করেন। তাঁর রাজত্বে দেশের সমস্ত লোক সুখে শান্তিতে সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত। অসংখ্য প্রস্তরগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের সুন্দর নীতি-এবং তাঁর মহান্ উপদেশাবলী অঙ্কিত করে তিনি দেশের লোকের নৈতিক উন্নতির জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেন। পররাষ্ট্র-নীতিতে অশোক ধর্ম্ম-বিজয়ের মহান্ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময় শিল্পকলার খুব উন্নতি হয়। তাঁর শিল্পনিদর্শনের মধ্যে **সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে সিংহমূর্ত্তি** বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। ৪১ বছর রাজত্বের পর অশোকের মৃত্যু হয়। অশোকের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারত আবার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অশোক স্তম্ভ

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্য বিশেষ ছিল না। কেন্দ্রগত প্রভুত্বের অভাবে দেশের নানাস্থানে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান হয়। মৌর্য্যবংশের পতন হলে ক্ষীণায়তন মগধ রাজ্য পর পর শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের শাসনাধীন হয়। শুঙ্গ বংশের স্থাপয়িতা **পুষ্যমিত্র** শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

এই যুগের সাতবাহন বা অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছেন। সাতবাহনবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ **গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি** শক, যবন (বা গ্রীক), পহ্লব (বা পার্থিয়ান) প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিকে পরাভূত করে বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করেছিলেন।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণ পাঞ্জাবে রাজ্যস্থাপন

করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজগণের মধ্যে ডেমেট্রিয়স ও **মিনান্দারের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে বহু বিদেশী দুর্দ্ধর্ষ জাতি একের পর এক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারত আক্রমণ করে ও এদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজ্যস্থাপন করে। গ্রীকদের পরে আসে শকজাতি, তারপরে পহ্লব এবং তারপর **কুষাণ**।

কুষাণ সম্রাট্‌গণের মধ্যে **কণিষ্ক** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বাহুবলে রাজ্যবিস্তার করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। পেশোয়ার বা পুরুষপুর নগরে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপরে এক বিশাল চৈত্য নির্ম্মাণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণের ন্যায় কণিষ্কও সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন এবং অপরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।
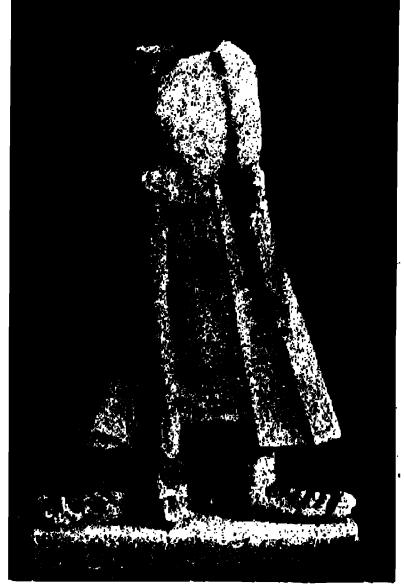
কণিষ্কের ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি
(অধুনা ইহা মথুরার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে)

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের গুপ্তবংশীয় বিখ্যাত সম্রাট্‌গণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে **গুপ্তবংশের** উন্নতির সূচনা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যশস্বী পুত্র সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত-রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্ত প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে এঁকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের বহু দেশ ইনি জয় করেন কিন্তু প্রত্যেক দেশের পরাজিত রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা মাত্র তিনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী এবং পশ্চিমে যমুনা নদী পর্য্যন্ত

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি একাধারে শিল্পী, বীণাবাদক, যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বীরত্বে তিনিও প্রায় সমুদ্রগুপ্তেরই সমকক্ষ ছিলেন, তা ছাড়া তাঁর
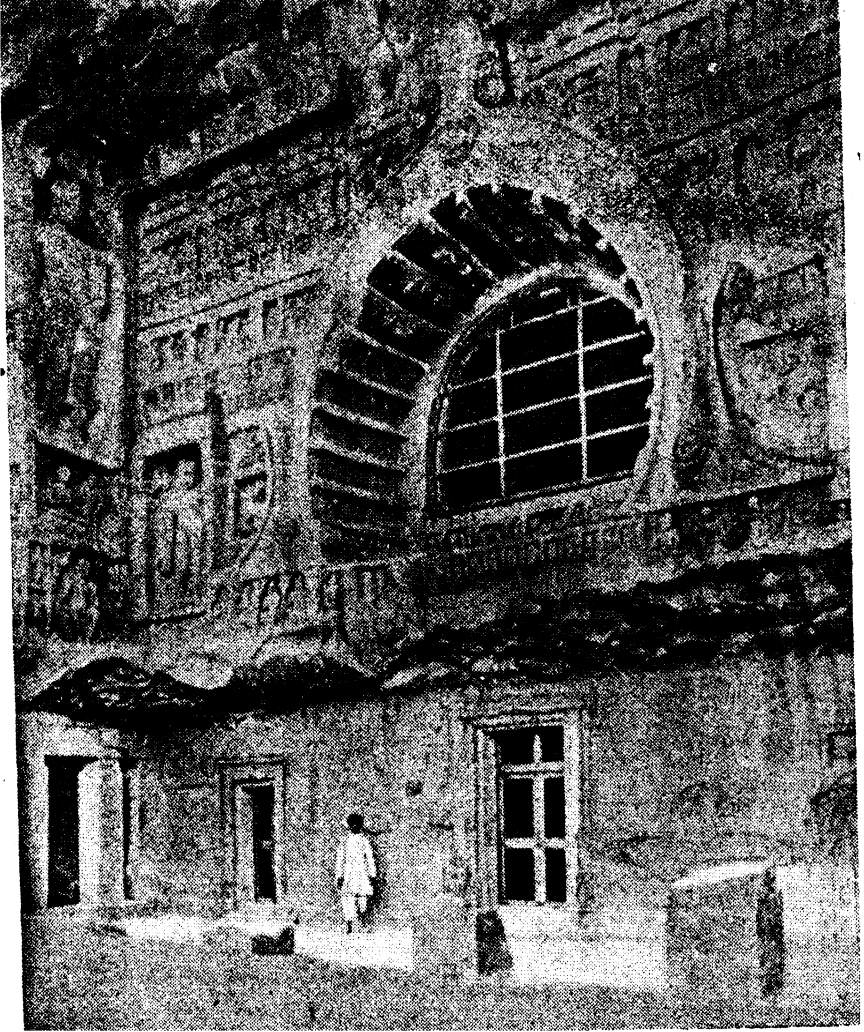
অজন্তা গুহার ভিতরের একটি দৃশ্য

অন্যান্য সদ্গুণও ছিল অশেষ। এই কারণে দেশের লোক তাঁকে **বিক্রমাদিত্য** উপাধি প্রদান করে। ঐতিহাসিকগণের মতে এই চন্দ্রগুপ্তই হিন্দু কিংবদন্তীর বিখ্যাত পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্য রাজা। তাঁরই ছত্রছায়ায় অতুলনীয় **নবরত্ন**

পণ্ডিত-সভার সমাবেশ ঘটেছিল। কালিদাস আদি মহাকবি ও বরাহমিহির প্রভৃতি পণ্ডিতের অনেকে তাঁরই সভা অলঙ্কৃত করে বিরাজ করতেন। পশ্চিম-ভারতের শক-দলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি শকদের হারিয়ে দিয়ে, পশ্চিম-ভারত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরে কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তও পরাক্রান্ত নরপতি
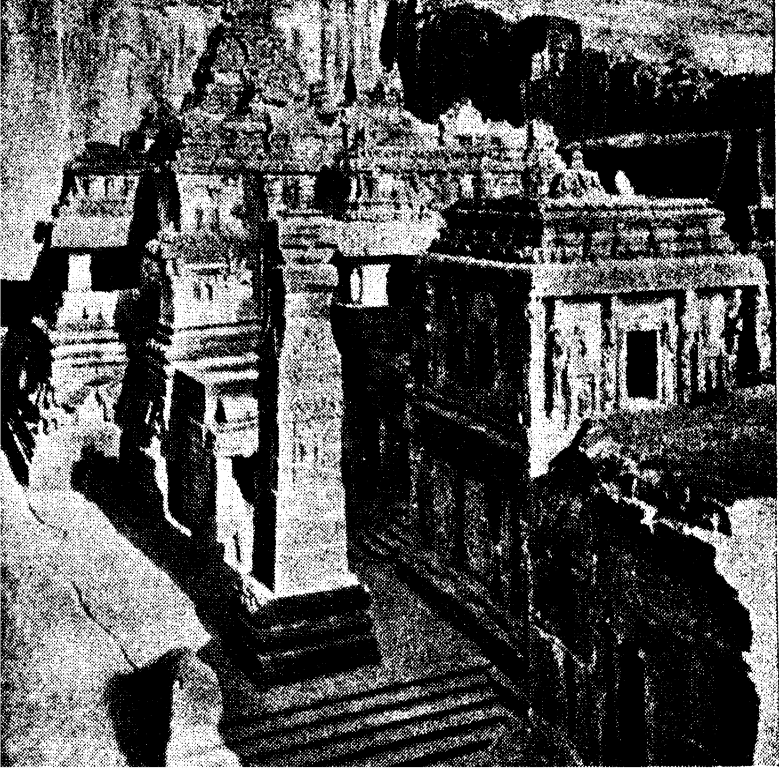
ইলোরা—কৈলাস-মন্দির

ছিলেন কিন্তু তাঁদের বংশধরেরা ক্রমেই ক্ষীণবল হয়ে বিদেশী হূণ-আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। কালক্রমে হূণ-আক্রমণের ফলেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো।

গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের উন্নতি হয়েছিল সর্ব্বতোমুখী। শিল্প, কলা, বাণিজ্য, সাহিত্য, সর্ব্ববিষয়েই ভারতবাসী প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিল এই যুগে। এই যুগকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা

দেওয়া হয়। গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। এই সময় পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র ও রামায়ণ-মহাভারত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করে।

গুপ্ত-সম্রাট্গণ ভারতীয় শিল্পে এক গৌরবময় যুগের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। অজন্তার গুহাগুলি স্থাপত্য ও চিত্রকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। এর অনেকগুলি ভাল ভাল চিত্র গুপ্তযুগে অঙ্কিত হয়েছিল। বর্ম্মা, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্পিগণ গুপ্ত-শিল্পরীতির অনুকরণ করেছিল। গুপ্ত-সভ্যতার যুগে ভারতের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের এবং চীনদেশের ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছিল।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর সপ্তম শতাব্দীতে পাঞ্জাবের পূর্ব্বপ্রান্তে থানেশ্বরের রাজা **হর্ষবর্দ্ধন** প্রবল-পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক **হিউয়েন সাং** ভারত পরিভ্রমণে আগমন করেন। উত্তর-ভারতে হর্ষবর্দ্ধন এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি থানেশ্বর হতে **কনৌজে** রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় থেকেই কনৌজ উত্তর-ভারতের প্রধান নগররূপে পরিগণিত হতে থাকে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পাটলিপুত্রের গৌরব ম্লান হয়ে গিয়েছিল। হর্ষের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে **গৌড়ের** রাজা **শশাঙ্ক** তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন জনহিতকর কার্য্যাবলী, দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অকাতরে দান করতেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত **শীলভদ্র** এই সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হিউয়েন সাং তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

হর্ষবর্দ্ধনের পর হিন্দুযুগ

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে গেল। এর পরে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে **যশোবর্ম্মন** নামক এক পরাক্রান্ত নৃপতি কনৌজে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের অভ্যুদয় হয় **ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের** আমলে। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। **'রাজ-তরঙ্গিণী'** নামক কহ্লন-রচিত ঐতিহাসিক কাব্যে তাঁর দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি কনৌজরাজ যশোবর্ম্মনকে পরাজিত করেন এবং তিব্বতে ও মধ্য-এশিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হতে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত কনৌজের

আধিপত্য নিয়ে উত্তর-ভারতে তুমুল সংঘর্ষ চলেছিল। তিনটি প্রবল রাজবংশ এই সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—পালবংশ, গুর্জ্জর-প্রতিহারবংশ এবং রাষ্ট্রকূটবংশ। **গুর্জ্জর-প্রতিহারবংশীয়** রাজগণ সূর্য্যবংশীয় রাজপুতরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা খুব সম্ভব গুর্জ্জর নামক বৈদেশিক জাতির বংশধর। গুর্জ্জর জাতি হূণ জাতির সঙ্গে মধ্য-এশিয়া হতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। **মহেন্দ্রপাল** গুর্জ্জর-প্রতিহারবংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত নরপতি। এই প্রতিহারবংশই হিন্দুযুগের শেষ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। আরব লেখকগণ প্রতিহার-রাজদের সুশাসনের প্রশংসা করেছেন। এঁদের প্রতাপেই সিন্ধুদেশের আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যবিস্তার করতে পারে নাই।

পালবংশের দীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক পরম গৌরবময় যুগ। ধর্ম্মপাল এবং তাঁর পুত্র দেবপাল পালবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদ্বয়। **ধর্ম্মপাল** সমগ্র উত্তর-ভারতে পালবংশের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাহুবলে কনৌজ অধিকার করেছিলেন। **দেবপাল** নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তিনি অসামান্য কীর্ত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি আসাম ও কলিঙ্গ জয় করেছিলেন এবং হূণ, গুর্জ্জর, কম্বোজ, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের সময়ে ধর্ম্মপাল, **দীপঙ্কর** প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। পালযুগে ভাস্কর্য্যশিল্প ও স্থাপত্য-বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ধীমান ও বীতপাল এই যুগের দুইজন বিখ্যাত শিল্পী।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পালবংশ হীনবল হয়ে পড়লে বাংলায় **সেনবংশ** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। **বল্লাল সেন** উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা জয়দেব তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে মুসলমানগণ বাংলার কতক অংশ জয় করে।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতেও স্বাধীন রাজ্যসমূহের উদ্ভব হতে থাকে। দাক্ষিণাত্যের রাজবংশগুলির মধ্যে বাতাপির চালুক্যবংশ, কাঞ্চীর পল্লববংশ, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটবংশ এবং তাঞ্জোরের চোলবংশ প্রধান। এইসব রাজবংশের বিখ্যাত রাজগণ হয়েছেন

চালুক্যবংশের দ্বিতীয় পুলকেশী, পল্লববংশের নরসিংহবর্ম্মন, রাষ্ট্রকূটবংশের তৃতীয় গোবিন্দ এবং চোলবংশের রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

হিউয়েন সাং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শক্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্ম্মনের সময়ে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে ইলোরার কৈলাস-নাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। চোলরাজগণের পরাক্রান্ত নৌ-বাহিনী ছিল। এর সাহায্যে তাঁরা দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ভারতের বাইরেও অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

মুসলমান যুগ

ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর অল্পকালের মধ্যে এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের নানাস্থানে আরব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সময় আরবগণ ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিহার-প্রমুখ রাজপুত বংশগুলির শৌর্য্যের জন্য মুসলমানেরা বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে আর অধিকার বিস্তার করতে পারে নাই।

মহম্মদ ঘোরী

দশম শতাব্দীর শেষদিক হতে প্রতিহার-শক্তি হীনবল হয়ে পড়লে, আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের সম্রাট্ সুলতান মামুদ বারবার ভারত আক্রমণ করেন এবং এদেশ থেকে প্রভূত ধন, ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। মামুদ লুণ্ঠনকারী হলেও শাসকহিসাবে অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন।

তারপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গজনীর সন্নিহিত ঘোর রাজ্যের তুর্কী প্রধান সেনাপতি মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এদেশে স্থায়ী মুসলমান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি

পৃথ্বীরাজ ও কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের শত্রুতার সুযোগ নিয়ে, দুইবার তরাইন নামক স্থানে যুদ্ধ করে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিন্ধুদেশ হতে বাংলা দেশ পর্য্যন্ত তুর্কীগণের অধীন হলো।

কুতুবউদ্দীন

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন ১২০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম মুসলমান সম্রাট হয়ে বসেন। কুতুবউদ্দীন যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম দাসবংশ।

ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্ব কায়েম হলো ও একাদিক্রমে প্রায় সাতশ' বছর ধরে তারা রাজত্ব করলো। প্রথম তিনশ' বছরের মুসলমান শাসনকালকে বলে তুর্কী-আফগান যুগ। দাসবংশে রজিয়া নামে একজন মহিলা কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন।

রজিয়া

দাসবংশের পরে খিলজীবংশ। এই বংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলজী তুর্কী-আফগান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন বটে কিন্তু কঠোরহস্তে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করেছিলেন।

খিলজীবংশের পর তুঘলকবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মহম্মদ তুঘলক অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুরতা ও কতকগুলি গুরুতর কাজে অবিবেচনা ও নির্বুদ্ধিতার ফলে তুর্কী-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো। শীঘ্রই ভারতে অনেক স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হলো। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ, দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্য এবং সুদূর দক্ষিণ-ভারতে বিজয়নগর রাজ্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।

স্বাধীন বাংলারাজ্যের সুলতানদের মধ্যে হোসেন শাহ খুব বিখ্যাত।

তাঁর রাজত্বকালে **শ্রীচৈতন্যদেব** আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র **নসরৎ শাহ** বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন।

বিজয়নগরে এক সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতির নাম **কৃষ্ণদেব রায়।**

তুর্কী-আফগানদের পর আসে মোগল যুগ। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের নাম বাবর, শেরশাহ, আকবর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজীব।

বাবর

তুর্কী-আফগান যুগের শেষ অধিপতি ইব্রাহিম লোদিকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা **বাবর** দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করবার পর, চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের অধীনে, রাজপুতেরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু যুদ্ধে রাজ-পুতদের পরাজয় ঘটে। রাজপুতদের পরাজয়ের ফলে বাবরের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে কাবুল, দক্ষিণে গোয়ালিয়র ও পূর্ব্বে বাংলা-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করবার পর বাবরের মৃত্যু হয়। বাবর যেমন ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক যোদ্ধা, তেমনি ছিলেন বিদ্বান্, শিল্পানুরাগী ও সাহিত্যিক। তাঁর "আত্মজীবনী" থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কবিতা ও গদ্য দুই-ই ভাল লিখতে পারতেন। তাঁর স্বভাবও অমায়িক এবং মধুর ছিল। তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দৃঢ় মনোবল। আজীবন মদ্যপায়ী বাবর একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্ত্তের সঙ্কল্পে বাকি জীবনের জন্য মদ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন।

বাবর

হুমায়ুন ও শেরশাহ

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হুমায়ুন দিল্লীর সম্রাট হন। সিংহাসনে আরোহণ করবার পরেই হুমায়ুনকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। বিহারের শাসনভার ছিল শেরখাঁ নামক একজন আফগান বীরের হাতে। শেরখাঁর সঙ্গে হুমায়ুনের অনেকবার যুদ্ধ হয়। শেরখাঁ জয়লাভ করেন। হুমায়ুন রাজ্যহারা হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

হুমায়ুন

শেরখাঁ এইবার "শেরশাহ" উপাধি নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করলেন। তিনি নিজের প্রতিভা ও দুঃসাহসিতার জোরে অতি সাধারণ অবস্থা হতে দিল্লীর সম্রাটপদে আসীন হয়েছিলেন। শুধু যোদ্ধা নয়, শাসকরূপেও তিনি ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় খ্যাতি করেছেন। শেরশাহ তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। মুসলমান রাজাদের মধ্যে শেরশাহই সর্ব্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষ একা হিন্দু বা একা মুসলমানের দেশ নয়, উভয় সম্প্রদায়কেই এখানে একসঙ্গে বসবাস করতে হবে। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজাদের উপর যথাসাধ্য ন্যায়বিচার করতেন। এ বিষয়ে সম্রাট আকবর তাঁকেই অনুসরণ করেছিলেন।

শেরশাহ

তিনি প্রজাদের জমির সীমা এবং খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করে দেন; প্রজাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ হতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত

বিরাট গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটি তিনিই তৈরী করিয়ে দেন; মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর শেরশাহের মৃত্যু হয়।

শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নাই। তাঁর লাইব্রেরীর সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। হুমায়ুন যখন রাজ্যহারা হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় তাঁর বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয়।

সম্রাট আকবর

অতি অল্পবয়সে আকবর যখন সিংহাসনে বসলেন তখন মোগল-শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, দেশের চারদিকে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ এবং রাজশক্তি অসুবিধা ও বিপদ দ্বারা বেষ্টিত। আকবর নির্ভীক, অচঞ্চলভাবে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হলেন।

আকবর

আকবর কঠোরহস্তে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দমন করেই রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। গুজরাট, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, কাবুল প্রভৃতি জয় করবার পর তিনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। ক্রমে তিনি উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে বেরার এবং পূর্ব্বে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হন।

সম্রাট আকবরের অনেক গুণ ছিল। রাজ্যশাসনে তিনি বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য তিনি একে ১৫টি সুবা অথবা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলি আবার নানা নিম্নস্তরে ভাগ করেন। সকল স্তরে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অগণিত সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। আকবর নিজে নিরলস ভাবে সমস্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন।

টোডরমল্ল নামে তাঁর একজন বিচক্ষণ রাজস্ব-সচিব ছিলেন। ইনি

শেরশাহের নীতির অনুসরণে প্রজাদের খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য সমস্ত জমি জরীপ করিয়েছিলেন।

আকবর সৈন্যবিভাগে উন্নত সংস্কারসমূহ প্রবর্ত্তন করেছিলেন। **আবুল ফজল** নামক বিখ্যাত বিদ্বান্ ও সাহিত্যিক আকবরের সভাসদ ছিলেন।

আকবর শেরশাহের মত হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজা **মানসিংহ** নামক একজন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালেই বিখ্যাত হিন্দি কবি **তুলসীদাস** তাঁর হিন্দি রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্য, আকবর পরাক্রান্ত রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের **জিজিয়া** নামক একটা কর দিতে হতো, আকবর সেটা তুলে দেন। ধর্ম্মমতে তিনি অত্যন্ত উদার ও গোঁড়ামিবর্জ্জিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছ থেকে সকল ধর্ম্মের আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

ফতেপুর সিক্রি—দেওয়ানি-খাস্

আকবরের রাজত্বে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য-সংগঠনকারী সম্রাট।

রাণা প্রতাপসিংহ

আকবরের রাজত্বকালে **বারভূঞা** নামক বাংলার জমিদারগণ প্রবলভাবে মোগলবিদ্রোহী হয়েছিলেন তবে আকবর তাঁর রাজ্যবিস্তারে সব চেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিলেন, মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের কাছে। রাজপুতনার অধিকাংশ রাজপুত রাজা আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু রাণা

প্রতাপসিংহ কিছুতেই তাঁর কাছে মাথা নত করেন নাই। হলদিঘাটের গিরিসঙ্কটে অগণিত মোগলবাহিনীর সঙ্গে রাণা প্রতাপের ভীষণ যুদ্ধ হয়।

চিতোরের বিজয়-স্তম্ভ

যুদ্ধকালে একবার রাণা প্রতাপের জীবন-সংশয়ও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁরই একজন প্রভুভক্ত সর্দ্দার—ঝালাপতি মান্না, শত্রুদের কাছে নিজেকে রাণা প্রতাপ প্রতিপন্ন করে, উদ্যত আঘাত স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেন। এইভাবে সেদিন প্রভুভক্ত অনুচরের মহান্ আত্মত্যাগে রাণা প্রতাপের জীবন রক্ষা হয়েছিল। জীবন-রক্ষা হলেও যুদ্ধে বিশাল মোগল-বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হন, কিন্তু আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করে তিনি পর্ব্বতের দুর্গম স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখান থেকেই মাঝে মাঝে সৈন্য সংগ্রহ করে, মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করে তিনি লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। শত দুঃখ শত দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে বিরত হন নাই।

রাণা প্রতাপের অপূর্ব্ব সাহস, অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, আজ দেশের প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মেবার রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পুনরুদ্ধার করেছিলেন কিন্তু রাজধানী চিতোর উদ্ধার করতে পারেন নাই। রাণা

প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, চিতোর উদ্ধার না-করা পর্য্যন্ত তিনি তৃণ-শয্যায় শয়ন করবেন এবং বৃক্ষ-পত্রে ভোজন করবেন। রাণা প্রতাপ এই প্রতিজ্ঞা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পালন করেছিলেন। আকবর রাণা প্রতাপের সঙ্গে সন্ধির জন্য প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু প্রতাপ তা'ও প্রত্যাখ্যান করেন। রাণা প্রতাপের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়।

রাণা প্রতাপ

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **জাহাঙ্গীর** দিল্লীর সম্রাট হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর **মেহেরউন্নিসা** নাম্নী এক পরমা সুন্দরী বুদ্ধিমতী নারীকে বিবাহ করেন। বিয়ের পরে এঁর নাম হয় **নুরজাহান**। জাহাঙ্গীর রাজ্যশাসন-ব্যাপারে অনেক সময় নুরজাহানের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জাহাঙ্গীর ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র ছিলেন। তিনি খুব ভাল কবিতা লিখতে ও ছবি আঁকতে পারতেন।
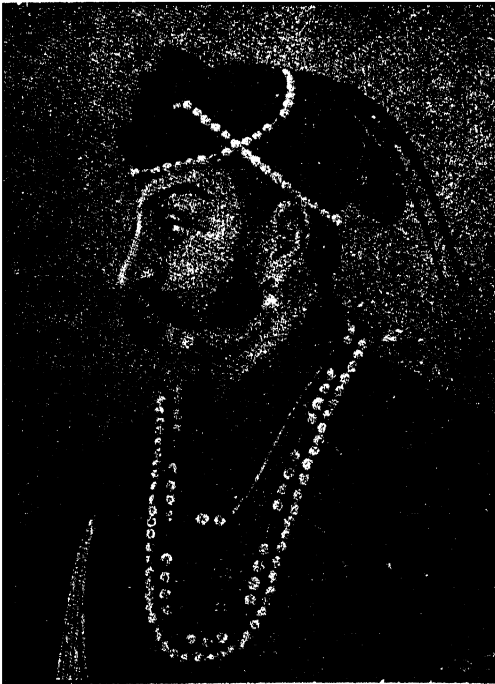
জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের সময় মোগল-শিখ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। স্যার টমাস রো নামক একজন ইংরেজ দূত জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।

শাহজাহান

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **শাহজাহান** দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন। শাহজাহান ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বে দেশে সুখ-শান্তি বিরাজিত ছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সদাশয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়েছিল।

শাহজাহান

শাহজাহান খুব আড়ম্বর-প্রিয় এবং শিল্পানুরাগী সম্রাট ছিলেন। তাজমহল, ময়ূর-সিংহাসন, মতি-মস্‌জিদ প্রভৃতি তাঁরই অমর কীর্ত্তি।

তিনি বেগম মমতাজকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সমাধির উপর এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ
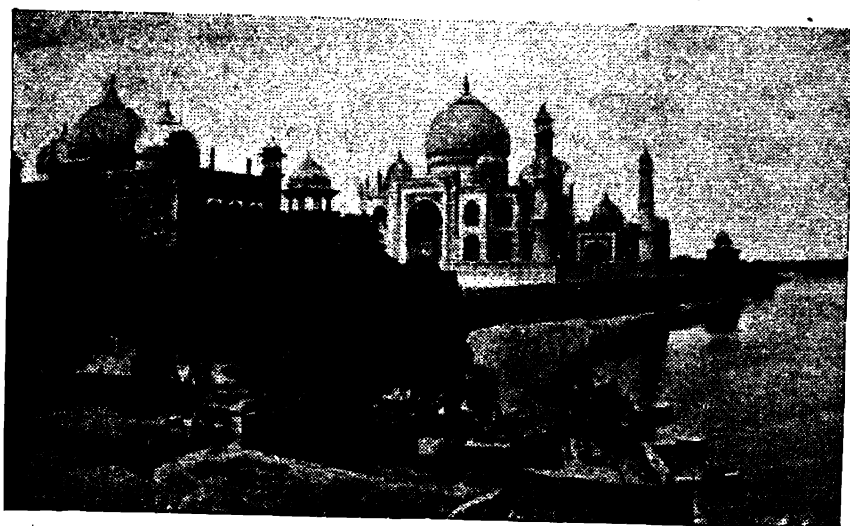
তাজমহল

করেন। এই সমাধি-ভবনেরই নাম তাজমহল। তাজমহল নির্ম্মাণে হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে পারসিক পদ্ধতির অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটেছিল।

শাহজাহান অত্যন্ত সৌখীন লোক ছিলেন। তাঁর রাজত্বে দেশে শিল্প-কলার অনেক উন্নতি হয়। তাঁর ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ছিল। টাভার্ণিয়ে ও বার্ণিয়ে নামক ফরাসী পর্য্যটকদ্বয় তাঁর নির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ এবং তাঁর দরবারের জাঁকজমক দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। শাহজাহানের শেষ জীবন খুব দুঃখের। নিজের পুত্র ঔরঙ্গজীবের হাতে বন্দী হয়ে তাঁকে শেষ দিনগুলো কাটাতে হয়।

শাহজাহানের চার পুত্র ছিল; দারা, সুজা, ঔরঙ্গজীব এবং মোরাদ। এঁদের মধ্যে ঔরঙ্গজীব ছিলেন সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও কৌশলী। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে সিংহাসন দখল করেন। দারা এবং মোরাদকে তিনি হত্যা করেন। সুজা আরাকানে পলায়ন করেন এবং সেখানেই মারা যান।

ঔরঙ্গজীব

ঔরঙ্গজীব প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম ভাগে প্রধান ঘটনা রাজপুতানায় বিদ্রোহ এবং দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধ; দ্বিতীয় ভাগে প্রধান ঘটনা দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বংশধরগণের সঙ্গে যুদ্ধ আর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-বিজয়। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বে ভারতবর্ষে মুসলমান-সাম্রাজ্য সব চেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়; আবার তাঁর সময়ই মোগল-সাম্রাজ্যের পতন সুরু হয়েছিল।

ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত, অনুদার এবং পরধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুর উপর তিনি যথেষ্ট অনাচার করেছেন। তাঁর আদেশে শত শত হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে ফেলে তার উপর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা হয়। কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার বিখ্যাত কেশবদেবের মন্দির তিনি ধ্বংস করেছিলেন। হিন্দুদের উপর তিনি আবার

জিজিয়া কর বসান। ঔরঙ্গজীব পৃথিবীর কোন লোককে বিশ্বাস করতেন না।

তাঁর অনেক গুণও ছিল। তাঁর কর্ম্মশক্তি ও উদ্যম ছিল অসাধারণ। তাঁর পাণ্ডিত্য গভীর ছিল। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন এবং জীবনে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু সবাইকে তিনি অবিশ্বাস করতেন বলে কারও কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য পেতেন না। তাঁর ব্যবহার খারাপ ছিল, তাই দেশের নানাদিকে অসন্তোষ আরম্ভ হ'লো। রাজপুত জাতি ও শিখ-সম্প্রদায় বিদ্রোহ করলো। এই বিদ্রোহ তিনি কতকটা দমন করলেন বটে, কিন্তু মারাঠাবীর শিবাজীকে তিনি বশীভূত করতে পারলেন না। আকবর মোগল-সাম্রাজ্য গঠন করেন, আর ঔরঙ্গজীব তার পতনের জন্য দায়ী।

শিবাজী

মারাঠা-শক্তির স্রষ্টা শিবাজী সুযোগ পেলেই ঔরঙ্গজীবের বিপুল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। শিবাজীকে দমন করবার জন্য ঔরঙ্গজীব তাঁর বিখ্যাত সেনাপতিদের দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। শিবাজী পরাজিত হন। ঔরঙ্গজীব তাঁকে অভয় দিয়ে দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রণ করেন। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর শিবাজী অপমানিত হন এবং ঔরঙ্গজীব তাঁকে রাজ-প্রাসাদে বন্দী করেন।

শিবাজী

শিবাজী কৌশলে, ফলের ঝুড়ির ভিতর লুকিয়ে, দিল্লী থেকে পলায়ন করেন।

তারপর তিনি আরও পরাক্রমের সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবার ঔরঙ্গজীব তাঁকে আর পরাজিত করতে পারলেন না। শিবাজী দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান জয় করে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক হলো; তিনি 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করলেন।

হিন্দুযুগে বিষ্ণুমূর্ত্তি

শিবাজী ছেলেবেলা থেকেই ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরই উৎসাহে মারাঠা জাতি নবজীবন লাভ করে। তিনি মারাঠাদের এমন-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরেও, মারাঠারা ভারতের একটি বিরাট শক্তিরূপে পরিগণিত হতো।

শিবাজী যে সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সমর-কৌশল দেখিয়ে গিয়েছেন, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তাঁর উদারতাও অসাধারণ ছিল। ঔরঙ্গজীব সুযোগ পেলেই হিন্দুর মন্দির চূর্ণ করেছেন, কিন্তু শিবাজী কখনও মুসলমানের মস্‌জিদ অপবিত্র করেন নাই। নিজের ধর্ম্মকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু অপরের ধর্ম্মকে তিনি কখনও ঘৃণা করেন নাই।

শিবাজী বাহুবলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নাই, উন্নত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করে নবস্থাপিত রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। এই বিষয়ে শেরশাহ ও আকবরের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা চলে। মোগল-সম্রাটগণের ন্যায় শিবাজীও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন বটে কিন্তু প্রজার
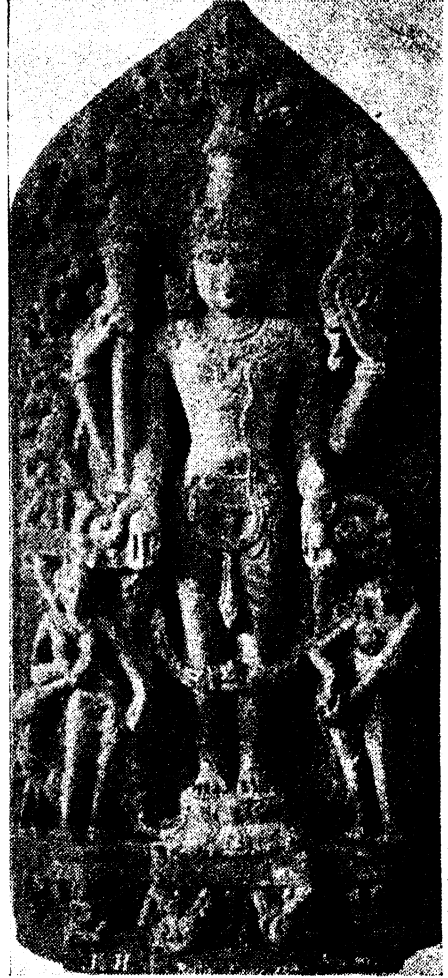
মঙ্গলসাধনই তাঁর রাজ্যশাসনের লক্ষ্য ছিল। তিনি সমরবিভাগে সৈন্যদলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তাঁর বৃহৎ নৌবহর ছিল।

মোগল-সাম্রাজ্যের পতন

ঔরঙ্গজীব পৃথিবীর কোন লোককে বিশ্বাস করতেন না বলে একা তাঁকে রাজ্যের সব দিকে নজর রাখতে হতো। তাঁর অবর্ত্তমানে যে এই বিশাল সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে পারে এমন কোন দ্বিতীয় লোক তিনি তৈরি করে যান নাই। তাঁর মৃত্যুর পর এত বড় সাম্রাজ্য সামলাবার উপযুক্ত লোক একজনও রইলো না। অল্পদিনের মধ্যেই ঔরঙ্গজীবের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হলো, চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিল।

কুতুব-মিনার

এই রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা আরম্ভ হওয়ার পর, **আহমদ শাহ দুরাণী** নামক একজন আফগান সেনাপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তার পূর্ব্বে পারস্যের অধিপতি পরাক্রমশালী **নাদির শাহ** ভারত আক্রমণ করে অমানুষিক ভাবে দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করেন। এই আক্রমণেই মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতা স্পষ্ট-ভাবে প্রকট হলো। নাদির শাহের পর তাঁর সেনাপতি আহমদ শাহ দুরাণী যখন ভারত আক্রমণ করলেন মারাঠারা তখন এদেশের শ্রেষ্ঠ

শক্তি। পাণিপথের রণক্ষেত্রে মারাঠারা দুরাণীর সম্মুখীন হলো এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হলো।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ভারতে হিন্দু-রাজত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আশা শেষ হয়ে গেল। মোগল-সাম্রাজ্য আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবার ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হলো **ইংরেজ**। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের চার বৎসর আগে ইংরেজরা বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে, ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের গোড়াপত্তন করে রেখেছিল।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে **ভাস্কো-দা-গামা** নামক জনৈক পর্তুগীজ নাবিকের ভারতবর্ষে আগমন করার পর থেকে এদেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি-সমূহের বাণিজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়। প্রথমে পর্তুগীজ তারপরে যথাক্রমে ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসীগণ ভারতে এসে বাণিজ্য করার অভিপ্রায়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানীদ্বয় প্রধান হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর মধ্যে বাণিজ্যের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হলো; শীঘ্রই এই সংঘর্ষ সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দ্বন্দ্বে পরিণত হলো। বিচক্ষণ ফরাসী নায়ক **ডুপ্লে** প্রথম ভারতে ফরাসী-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে তিনি এ উদ্দেশ্যে কতকটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু নানাকারণে, বিশেষ **ক্লাইভ** নামক একজন ইংরেজ সেনাপতির আবির্ভাবে ডুপ্লের স্বপ্ন ব্যর্থ হলো, ক্রমে ভারতে ইংরেজের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হলো।

ইংরেজের অভ্যুদয়

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিন ইংরেজরা **পলাশীর যুদ্ধে**, নবাব **সিরাজউদ্দৌলাকে** পরাজিত করে, বাংলাদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করে। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে কিন্তু নানাকারণে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হলো।

সিরাজের মতের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ-নির্ম্মাণ, বাণিজ্যসংক্রান্ত সুবিধাগুলির অপব্যবহার প্রভৃতি করায় নবাব অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কলকাতা আক্রমণ করে নিজের হস্তগত করেন। ক্ষমতাদৃপ্ত ইংরেজ সেনানায়ক

ক্লাইভের কাছে নবাবের স্বাধীন ব্যবহার অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেদের পছন্দমত একজন নবাবকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার জন্য জোর চেষ্টা আরম্ভ করলেন। সিরাজের সেনাপতি **মীরজাফরকে** তিনি হাত করলেন। সিরাজের কয়েকজন মন্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রের ভিতর ছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা

ক্লাইভ সুযোগ বুঝে ভাগীরথীতীরে, পলাশীর প্রাঙ্গণে, সৈন্য সমবেত করলেন। সিরাজও তাঁর সৈন্য নিয়ে এলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। অতর্কিতে তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ বুঝলেন, জয়ের আশা নাই। তবুও তিনি এবং তাঁর **মোহনলাল** নামক একজন বীর সেনাপতি যুদ্ধ করলেন। সিরাজ পলায়ন করলেন। ক্লাইভ এই যুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করলেন। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই ক্লাইভের জয়লাভ সম্ভব হয় এবং ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রভুত্ব লাভ করতে পারে। সিরাজ পরে ধরা পড়েন ও নিহত হন। মীরজাফর বাংলা নবাব হন, কিন্তু তাঁকে ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়।
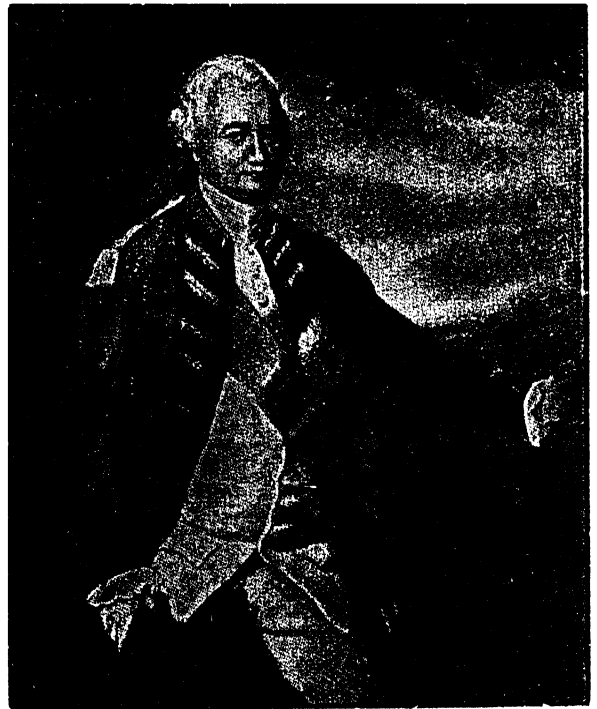
ক্লাইভ

ক্লাইভ নিজেই নবাবের নামে বাংলাদেশ শাসন করতে আরম্ভ করলেন।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার সম্পদ ইংরেজদের হস্তগত হওয়ায় তারা দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হলো। ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল। মীরজাফরের পরবর্তী নবাব মীরকাসিমের বিরুদ্ধে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজ-শক্তি পূর্ব্ব ও উত্তর-ভারতে কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলো। এরপর বাংলার নবাবের যতটুকু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল তা'ও লোপ পেল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস

ক্লাইভের কিছু পরে **ওয়ারেণ হেষ্টিংস** বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর উপাধি ছিল 'গভর্ণর'; ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হতে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে তিনি 'গভর্ণর-জেনারেল' আখ্যা লাভ করেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস

ক্লাইভ ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। **ওয়ারেণ হেষ্টিংস** শাসনপদ্ধতি সংস্কার করবার এবং সরকারী কোষাগারের অর্থাভাব দূর করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এইসব ব্যাপারে হেষ্টিংস সব সময় সদুপায় অবলম্বন করেন নাই।
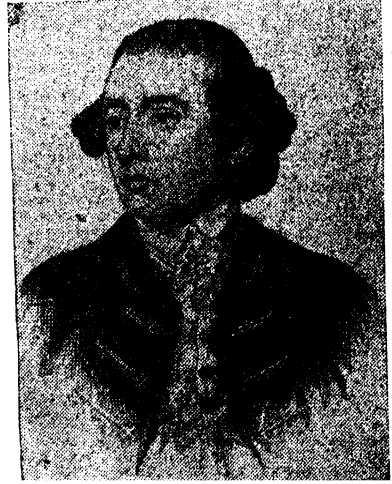
বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ এবং অযোধ্যার বেগমদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে এবং বলপূর্ব্বক তিনি বহু অর্থ আদায় করেন। তাছাড়া তিনি নিজে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। মহারাজা নন্দকুমার এই ঘুষের অভিযোগ আনেন এবং প্রমাণ-স্বরূপ, শাসনপরিষদের কাছে লিখিত দলিলপত্র দাখিল করেন। হেষ্টিংস কিছুতেই নন্দকুমারের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। অবশেষে এক দলিল জাল করবার অভিযোগে **নন্দকুমারের ফাঁসি** হয়। এই প্রাণদণ্ডের মূলে হেষ্টিংস ছিলেন, একথা অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস

করেন। হেষ্টিংসের কার্য্যকলাপে, বাগ্মী বার্ক প্রভৃতি লোকেরা বিলাতে খুব আন্দোলন করেন। তিনি পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

হেষ্টিংসের ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানী ভারতে সাক্ষাৎভাবে দেশশাসনের ভার গ্রহণ করে। ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-সংস্থাপকগণের মধ্যে হেষ্টিংস শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল, তবে তাঁর অনুষ্ঠিত কতকগুলি কাজ নিন্দনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ওয়েলেস্‌লি

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে **লর্ড কর্ণওয়ালিসের** শাসনকাল ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** প্রবর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ। এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে একটি প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণী এবং সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল।

কর্ণওয়ালিস

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তারে সব চেয়ে বেশী মন দেন **লর্ড ওয়েলেস্‌লি**। ইনি মহীশূর, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তাঞ্জোর, কর্ণাট, সুরাট প্রভৃতি তিনি খাস ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত করে নিলেন। হায়দরাবাদের **নিজাম** বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করলেন। মহীশূরের **টিপু সুলতানকে** এবং মারাঠা রাজ্যগুলোকে পরাজিত করতেই ওয়েলেস্‌লিকে সব চেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়েছিল। এই সব রাজ্যজয় সম্ভব হয়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে। একের বিপদে অপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো, প্রতিবেশী রাজ্যকে কোন সাহায্য করতো না। তারপরেই আসতো তার নিজের পালা। ওয়েলেস্‌লির সঙ্গে মারাঠাদের সব চেয়ে বড় যে যুদ্ধ হয়েছিল তার নাম **আসাইর যুদ্ধ**, তাতে হোলকার ছিলেন নিরপেক্ষ; কিন্তু তিনিও শেষ পর্য্যন্ত রেহাই পেলেন না। ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে পরাজিত হয়ে তাঁকে পলায়ন করতে হলো।

ওয়েলেস্‌লি যে সব রাজ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেন নাই, তাদের সঙ্গে তিনি সন্ধি করেন। এই সন্ধিকে বলা হয় "অধীনতামূলক মিত্রতা"। এই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি যে রাজ্য গ্রহণ করতো, তাকে নিজের রাজ্যে, নিজের খরচে একদল ব্রিটিশ সৈন্য রাখতে হতো, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিনা অনুমতিতে বাইরের কোন দেশের সঙ্গে তারা সন্ধি করতে পারতো না। এই নীতির আশ্রিত নৃপতিকে নানাপ্রকারে নিজের স্বাধীনতা খর্ব্ব করতে হয়েছিল। ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন না, সে কারণে নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার আগেই ওয়েলেস্‌লিকে বড়লাটের পদ থেকে অপসারিত করা হয়।

ইউরোপে ফরাসী-বিপ্লবিগণ ও নেপোলিয়নের আধিপত্যের সময় ওয়েলেস্‌লি ভারতে ফরাসী-প্রভাব বিনষ্ট করেছিলেন। তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন এবং ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ওয়েলেস্‌লি

লর্ড হেষ্টিংস নামক একজন বড়লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লির অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি মারাঠা-নায়কদের শক্তি একেবারেই বিনষ্ট করে দেন। হেষ্টিংসের কিছু পরে **লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক** বড়লাট হন। তাঁর শাসনকাল নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর সময়ে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হয়। এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন খ্যাতনামা **মেকলে** এবং রাজা **রামমোহন রায়**।

প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে **প্রথম শিখ-যুদ্ধ** হয়েছিল। মারাঠা-সাম্রাজ্যের প্রথমদিকের পেশোয়াদের ন্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাঞ্জাবে মহারাজা রণজিৎ সিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি বিভিন্ন শিখ-রাজ্য সম্মিলিত করে বিস্তৃত পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ-রাজ্যে দারুণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো। হার্ডিঞ্জের সময় শিখদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখরা হেরে যাওয়ায় পাঞ্জাব প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হলো।

সিপাহী-বিদ্রোহ

ওয়েলেস্‌লির ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী আর একজন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী আক্রমণাত্মক যুদ্ধ, কুখ্যাত **স্বত্বলোপ নীতির** প্রয়োগ এবং আরও অন্য উপায়ে কোম্পানীর রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত করেছিলেন। এজন্য এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণে দেশের সর্ব্বত্র একটা ঘোর অশান্তির ভাব বিরাজিত ছিল। এই সময়ে ইংরেজরা সৈন্যদলে এনফিল্ড-রাইফেল নামক উন্নত ধরণের বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ করে। এই রাইফেলে টোটা ভরবার সময় সেটা দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে গুজব রটে গেল যে, হিন্দু ও মুসলমানের জাত মারবার জন্য, খৃষ্টান সাহেবেরা এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশিয়ে দিয়েছে।

টিপু সুলতান

গুজব রটবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ বারাকপুরের সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়ে তাদের সেনাপতিকে হত্যা করলো। মীরাট এবং লক্ষ্ণৌতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো। সেখানকার বিদ্রোহী সৈন্যেরা সহরের ইউরোপীয়দের হত্যা করে দিল্লীতে উপস্থিত হলো। আরও কয়েক দল বিদ্রোহী দিল্লীতে আসবার পর, তারা শেষ মোগল বাদশাহ **বাহাদুর শাহকে** ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝান্সী বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলো। এই সব স্থানেই অনেক ইউরোপীয় নরনারীকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে।

বিদ্রোহের প্রথম চোটে ইংরেজরা সুবিধা করতে পারে নাই; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারাও সৈন্য সংগ্রহ করে বিদ্রোহ দমনে মন দিল। এই সময় বিদ্রোহী নায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বীরত্বের পরিচয় দেন **ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই**। লর্ড ডালহৌসী বলপূর্ব্বক ঝান্সার রাজার মৃত্যুর পর, ঐ রাজ্য ইংরেজের খাস অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এ'তে ঝান্সীর বিধবা রাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং স্বামীর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য, তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর।

ঝান্সীতে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ইংরেজরা যখন আসে, রাণী লক্ষ্মীবাই তখন পুরুষের বেশে, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে, যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। বিদ্রোহের অপর দুই নেতা ছিলেন নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপি। নানা সাহেব পলায়ন করেছিলেন। তাঁতিয়া তোপি ঝান্সীর বিদ্রোহে ধরা পড়েন, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সিপাহী-বিদ্রোহে শিখেরা ইংরেজকে সাহায্য করেছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হলো। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বনিয়াদ এতদিনে সুদৃঢ় হলো।

বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্পর অবিশ্বাস এবং একতার অভাব, প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে, কোটি-কোটি লোক যে ভারতবর্ষে বাস করে, মুষ্টিমেয় ইংরেজ, এই দেশেরই লোকের সাহায্যে সেই বিশাল দেশ দখল করে নিল।

বঙ্গভঙ্গ

সিপাহী-বিদ্রোহের পর লর্ড কার্জ্জনের আমল পর্য্যন্ত, দেশে আর বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই। ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলির নির্দ্দেশে, ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার করে রাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি ঘোষণা করেন। লর্ড লিটনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড রিপন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাই তাঁর শাসনকাল সংস্কারের যুগরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে।

লর্ড কার্জ্জন ১৮৯৯-১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত এদেশে বড়লাট ছিলেন। শাসনকার্য্যে, রাজনৈতিক জ্ঞানে ও বিদ্যাবত্তায় তিনি অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। আফগানিস্থান, পারস্য এবং তিব্বতে রাশিয়ার প্রভাববৃদ্ধি রোধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কার্জ্জন তাঁর একটা কার্য্যের জন্য ভারতবাসীর অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন।

কার্জ্জন শাসনের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তখন এক প্রদেশ ছিল। কার্জ্জন পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত করে একটি প্রদেশে পরিণত করলেন, এর নাম

হলো বাংলাদেশ; আর পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ব্ব বাংলা ও আসাম নামক নতুন প্রদেশ গঠিত হলো। এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালীরা ঘোর আপত্তি করে। দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। **অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ** প্রভৃতির নেতৃত্বে, দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হয়। দেশের অনেক জায়গায়, বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে এবং অনেক রাজ-কর্ম্মচারী নিহত হন। বাংলাদেশের সমস্ত লোক তখন ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের মূলে তীব্র কুঠারাঘাত করে।

ত্রিমূর্ত্তি

১৯০৪-১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপানের গৌরব-জনক জয়লাভে এসিয়ার অনেক লোক, বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তাদের কাজে খুব উৎসাহ বোধ করে। ক্রমে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনই আজও **স্বদেশী-আন্দোলন** নামে বিখ্যাত হয়ে
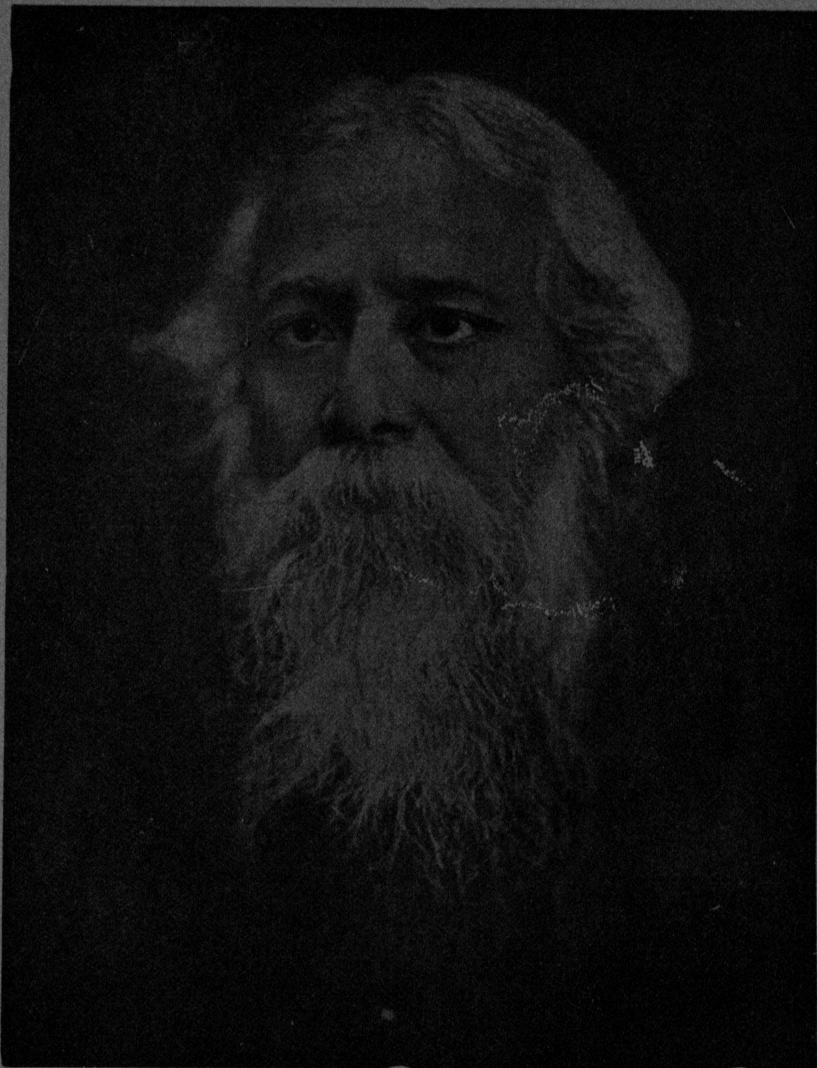
ভারতীয় সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার এক বিস্ময়কর নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রয়েছে। এই সময়ে ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে, দেশে কাপড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরীর জন্য অনেক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন নতুন ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। 'বঙ্গলক্ষী কটন মিল' এবং 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের এই স্বদেশী-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য-

হিন্দু যুগে মাদ্রার একটি মন্দির

বিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তীব্র আন্দোলনের পর ১৯১১ সালে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয়। এই সময় ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির খানিকটা সংস্কার সাধিত হলো। ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদগুলোতে বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা কিছু বাড়লো এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্য

নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা হলো। এই শাসন-সংস্কার **মর্লি-মিণ্টো সংস্কার** নামে পরিচিত। **মর্লি** ছিলেন ভারত-সচিব এবং **মিণ্টো** ছিলেন তখনকার বড়লাট। এই সংস্কারে ভারতকে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় নাই বলে অগ্রসর-মতাবলম্বী রাজনৈতিকগণ এতে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না। এই সংস্কারের একটা বড় দোষ যে এতে প্রথম সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হলো। হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখে তাদের বিরুদ্ধে অনগ্রসর মুসলমান-সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্যই এই প্রথার প্রবর্ত্তন করা হয়।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট খুব বেশী উৎপীড়ন ও দমন-নীতি অবলম্বন করেছিল। বিপ্লবী যুবকগণ তা'তে একটুও বিচলিত হয় নাই, নির্ভয়ে দেশের জন্য তারা চরম নির্য্যাতন বরণ করে নিয়েছে। এই সময়ে কানাইলাল, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি নিঃস্বার্থ দেশ-প্রেমিক তরুণ বিপ্লবীরা হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে নিজেদের জীবন বলি দিয়েছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবলতার সময় ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের সৃষ্টি হয়েছিল।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার

বঙ্গভঙ্গ রহিত হবার পর, স্বদেশী-আন্দোলন থেমে গেল বটে কিন্তু দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে লাগলো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতের মধ্যে নানাকারণে আন্দোলন তীব্রভাবে চলতে পারে নাই। অবশ্য বিপ্লবীরা প্রবল দমন-নীতি সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে বিপুল বাধার বিরুদ্ধে তাদের কার্য্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলো। জার্ম্মেণীতে ভারতীয় বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র দল গড়েছিল। কিন্তু তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নাই। যুদ্ধকালে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-বাসীকে অনেকবার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে যে অধিকার ভারতকে দেওয়া হলো তাতে কংগ্রেসের অগ্রসরপন্থী নেতারা কেহই সন্তুষ্ট হলেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির আরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হলো। এই শাসন-সংস্কার, **মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার** নামে পরিচিত। **মণ্টেগু** ছিলেন ভারত-সচিব, আর **চেমসফোর্ড** ছিলেন তখনকার বড়লাট। এই শাসন-সংস্কারের ফলে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোর ব্যবস্থা-পরিষদ-

সমূহে, বে-সরকারী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের ভার মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হয়, কিন্তু পুলিশ, অর্থ, বিচার প্রভৃতি প্রধান বিভাগগুলো গভর্ণরের হাতে রাখা হয়। গভর্ণরের একটি শাসন-পরিষদ গড়ে দেওয়া হয়; এই শাসন-পরিষদের সদস্যদের সাহায্যে, তিনি ঐ সব বিভাগের কাজ চালাতেন।

গভর্ণরের নিজের হাতের বিভাগগুলিকে বলা হতো 'সংরক্ষিত বিভাগ' আর মন্ত্রীদের হাতের গুলোকে বলা হতো 'হস্তান্তরিত বিভাগ'। অর্থ-বিভাগের উপরে মন্ত্রীদের কোন হাত ছিল না, এই কারণে তাঁরা টাকার অভাবে নিজেদের বিভাগের কোন উন্নতি করতে পারতেন না। কংগ্রেস এই শাসন-সংস্কার গ্রহণ করতে মোটেই রাজি হলো না; রাজনৈতিক আন্দোলন সমানেই চলতে লাগলো।

কংগ্রেস

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বুঝতে হলে কংগ্রেসের কথা জানা দরকার। ষাট বৎসরেরও বেশী আগে কলকাতায়, কলেজ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মিলে 'ভারত-সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির লোকেরা ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা। এই ভারত-সভাই কালে রূপান্তরিত হয়ে বর্ত্তমান **কংগ্রেসে** পরিণত হয়।
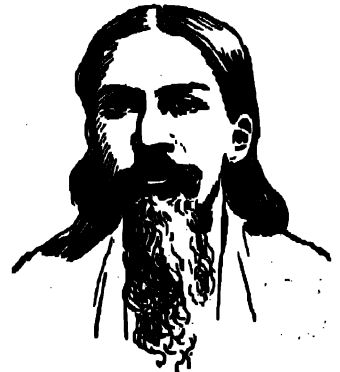
শ্রীঅরবিন্দ

১৮৮৫ সালে, বোম্বাই সহরে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর থেকে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে আসছে। প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন একজন বাঙ্গালী, তাঁর নাম **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**। প্রথমে কংগ্রেসের নীতি ছিল ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি সংস্কার করবার জন্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে আবেদন পাঠানো।—প্রথমদিকের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, লর্ড সিংহ, আনন্দমোহন

বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও লোকমান্য **তিলকের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ সালের কুখ্যাত রাওলাত আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পর, ১৯২০ সালে **মহাত্মা গান্ধী** সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে শাসন-সংস্কার আদায় করবার জন্যে, ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই বৎসর কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয় এবং তা'তে অসহযোগের প্রস্তাব পাশ হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই **অসহযোগ-আন্দোলন** আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের অর্থ, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সব রকমে অসহযোগ, অর্থাৎ আইন-আদালত, সরকারী স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বর্জ্জন করা। সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করে এই আন্দোলন আরম্ভ হলো।

মহাত্মা গান্ধী

বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার **চিত্তরঞ্জন দাশ** এবং **যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত** আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। আই-সি-এস চাকরী পরিত্যাগ করে **সুভাষচন্দ্র বসুও** এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। বিলাতী পণ্য ও মদের দোকানে পিকেটিং করে দলে দলে লোক জেলে গেল। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। জনসাধারণ তাঁকে "**দেশবন্ধু**" উপাধিতে ভূষিত করে। দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এবং ভগিনী শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবীও এই আন্দোলনে পুলিশ-কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিছুদিন খুব জোরের সঙ্গে চলবার পরে এই আন্দোলন থেমে গেল। অসহযোগ-আন্দোলন সবচেয়ে বেশী তীব্র হয়েছিল বাংলাদেশে।

অসহযোগ-আন্দোলন থামলো বটে, কিন্তু কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ত্যাগ করলো না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে ভারতবর্ষের **পূর্ণ স্বাধীনতা** দাবী করলো। ১৯৩০ সালে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলো। ঐ বৎসরই দেশে আবার ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হলো। এবার সুরু হলো দেশের সর্ব্বত্র **লবণ-আইন অমান্য**। মহাত্মা গান্ধী এবারও আন্দোলনের নেতৃত্ব

গ্রহণ করলেন। বারদৌলি-তালুকে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে প্রজারা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করলো। এই আন্দোলন এমন তীব্র আকার ধারণ করলো যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

লণ্ডনে তখন ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য এক গোলটেবিল বৈঠক চলছিল। মহাত্মা গান্ধী, লর্ড আরউইনের সঙ্গে সন্ধির পর লণ্ডন গিয়ে, সেই বৈঠকে যোগ দিলেন। বৈঠকের আলোচনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর ফলে ভারতবর্ষের কোন লাভ হবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে কিছুতেই স্বাধীনতা দেবে না। তাই তিনি দেশে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্দোলন আরম্ভ হলো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

লর্ড আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন লর্ড উইলিংডন। ইনি আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য, কঠোর হস্তে, দমন-নীতি প্রয়োগ করলেন। প্রায় দুই বৎসর তুমুল আন্দোলন চলবার পর দেশ আবার শান্ত হলো।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন

ইতিমধ্যে গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ফলে, ১৯৩৫ সালের নতুন ভারত-শাসন আইন রচিত হলো এবং পার্লামেণ্টে পাশও হয়ে গেল। এই আইনে, ভারতবর্ষকে, এগারোটি প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্যের এক যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যবস্থা হলো। ঠিক হলো যে, প্রদেশগুলিতে একটি করে ব্যবস্থা-পরিষদ থাকবে এবং প্রত্যেক গভর্ণরের একটি করে মন্ত্রিসভা থাকবে। এই মন্ত্রীরা তাঁদের সমস্ত কাজের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যেরা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হবেন।

কিন্তু এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করা হলো যে, মুসলমানের ভোটে মুসলমান, শিখের ভোটে শিখ, ইউরোপীয়ানের ভোটে ইউরোপীয়ান, খৃষ্টানের ভোটে খৃষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ানের ভোটে এংলো-ইণ্ডিয়ান, এবং অবশিষ্ট সকলের ভোটে হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন। তা ছাড়া, ব্যবস্থা-পরিষদগুলোতে মুসলমানদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু বেশী আসন দেওয়া হলো। অতএব এই শাসনতন্ত্র রচিত হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় শাসনের যে বন্দোবস্ত এই আইনে করা হয়েছিল, কংগ্রেসের আপত্তিতে, তা কার্য্যকরী করা হয় নাই।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ

এই নতুন আইন অনুসারে প্রথম নির্ব্বাচনেই কংগ্রেস বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ আসন দখল করে। তারপর কংগ্রেস এই ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। সীমান্তপ্রদেশ এবং আসামেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই কয়টি প্রদেশে, কংগ্রেসের উদ্যোগে, জন-সাধারণের সুবিধাজনক অনেক ভাল ভাল আইন পাশ হয়। জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার থেকে প্রজারা অনেকাংশে অব্যাহতি পায়। পুলিশের উপদ্রবও অনেক কমে যায়। লোকে যাতে সুবিচার পায়, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য, ইউরোপীয়দের সহায়তায়, মন্ত্রি-সভা গঠন করেন। মৌলবী ফজলুল হক তার প্রধানমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রিসভা এমন অনেক আইন পাশ করেন যার দ্বারা হিন্দুদের ক্ষতি হয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায়, কংগ্রেস স্থির করে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, এই কথা ঘোষণা না করলে তারা যুদ্ধে সাহায্য করবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এরকম কোন ঘোষণা দিতে রাজি হলো না। ফলে আটটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলো। একমাত্র আসামে, মুসলীম-লীগ সদস্য, সার মহম্মদ সাদুল্লা, কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলেন। অবশিষ্ট সাতটি প্রদেশে গভর্ণরেরা দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

এরপর আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'সত্যাগ্রহ' সুরু হলো। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সব মন্ত্রী জেলে আবদ্ধ হলেন।

বাংলাদেশ

সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের আরম্ভও এই বাংলায়। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যে পনেরোটিতেই সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন বাঙ্গালী।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম্মচর্চ্চাতেও বাংলাদেশ, অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক অগ্রসর। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। চৈতন্যদেব মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত প্রেমের ধর্ম্ম আজও বাঙ্গালীর চিত্তকে ভক্তি-রসে আপ্লুত করে। রাজা রামমোহন রায়, বাঙ্গালীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে, তাকে শক্তিমান্ জাতিতে গড়ে তোলবার জন্য, একশ' বছরেরও বেশী আগে চেষ্টা করে গিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ভারতে এসে পৌঁছলে বাঙ্গালীই প্রথম তার বৈশিষ্ট্য-গুলি উপলব্ধি করে তখনকার দেশের সামাজিক ও অন্যান্য ত্রুটিসমূহ সংস্কারে অগ্রণী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর মনকেই প্রথম আন্দোলিত করে। বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসীর নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক বাঙ্গালী।

বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে সর্ব্বত্র সম্মান পেয়েছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংস, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিক্ষাব্রতী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন ও বিপিনচন্দ্র পাল, আর দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং যদুনাথ সরকার, কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক
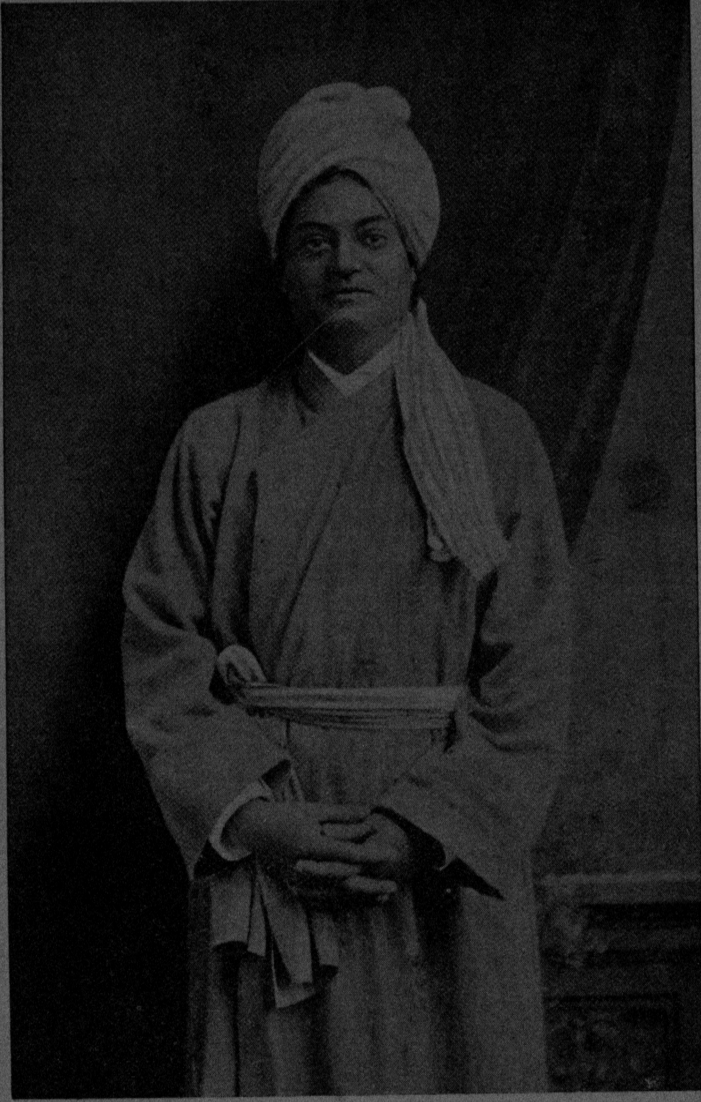
স্বামী বিবেকানন্দ

বিধানচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার, আইনজীবী লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির সমকক্ষ লোক ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিরল।
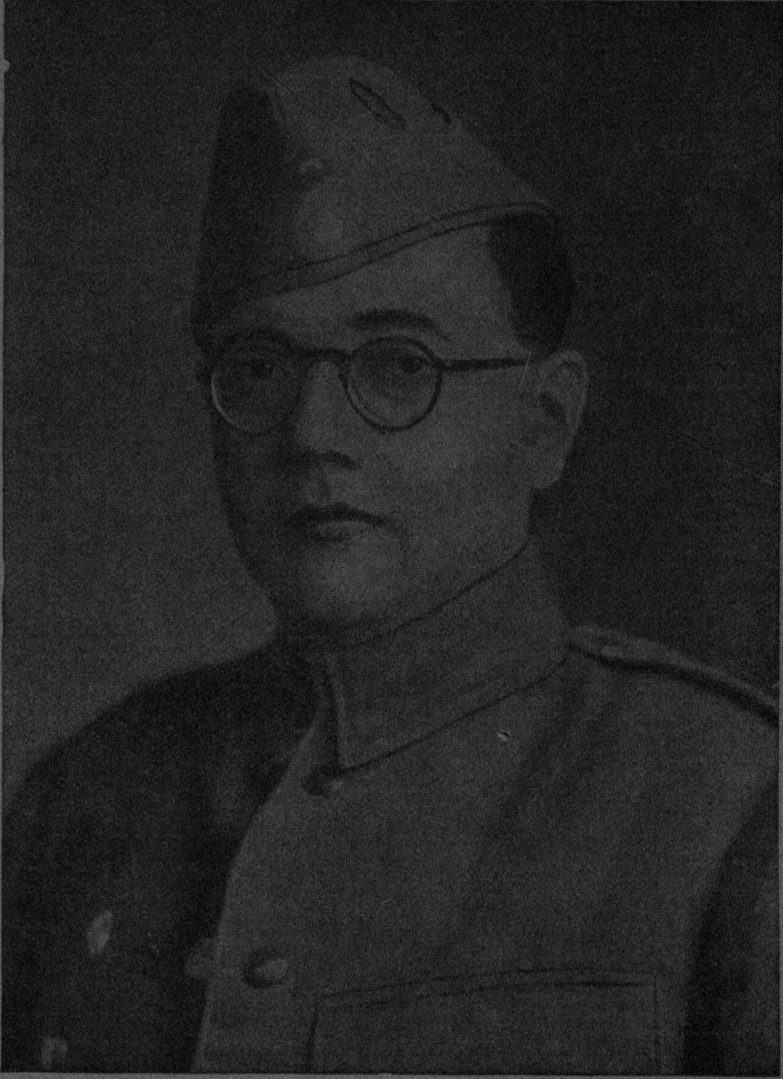
সাহস, বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসিত করে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

মহাযুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করে, মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃগণ কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার পর, ইংরেজের রণোদ্যম প্রবলভাবে চলতে লাগলো ভারতবর্ষে। ইংরেজের আজ্ঞাবহ দেশীয় রাজন্যবর্গ, চিরদিনই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপর বিরূপ ছিলেন। তাঁরা প্রাণপণে ইংরেজ সরকারের সাহায্য করতে লাগলেন। ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যগণ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় সমভাবে প্রেরিত হতে লাগলো—ইংরেজের পক্ষে লড়বার জন্য। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী যখন ডানকার্ক থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের ভিতর ভারতীয় বাহিনীর কোন কোন দল উপস্থিত ছিল। ১৯৪১ সালে ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়া রণাঙ্গণে ভারতীয় বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। জেনারেল ওয়াভেল ওদের মরুভূমির যুদ্ধে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

এ ছাড়া, সমর-সম্ভার উৎপাদনে ভারতের প্রত্যেকটি কারখানাকে নিযুক্ত করেছিল ইংরেজ সরকার। ভারতীয় নৌ-বাহিনী এর আগে খুবই দুর্ব্বল ছিল। এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই তাকে কিছু পরিমাণে শক্তিশালী করে তোলে গভর্ণমেণ্ট। আর-আই-এন্ বা রাজকীয় ভারতীয় নৌশক্তি এই সময়ে লোহিত সমুদ্র ও আরব-সমুদ্রকে শত্রুর ইউ-বোট ও সাবমেরিণের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল, এটা তাদের কম কৃতিত্বের কথা নয়।

বিমান-বাহিনীতেও ভারতীয় পাইলটগণ উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষালাভ করেছিল। হায়দরাবাদের নিজাম, নিজের ব্যয়ে, দুই স্কোয়াড্রন যুদ্ধ-বিমান ইংরেজ সরকারকে উপহার দিয়েছিলেন।

ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন ভারতের ধনবল ও জনবল ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যে নিয়োজিত হচ্ছিল তখন কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান সুভাষচন্দ্র বসু, ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য জার্ম্মেণী ও জাপানে, এক ইংরেজ-বিরোধী ভারতীয় সৈন্যদল গড়ে তুলছিলেন। গান্ধীজি ও পণ্ডিত জওহরলালকে বন্দী করে ইংরেজ মনে করেছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধকে অঙ্কুরেই দলিত করা গিয়েছে! কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে অবলম্বন করে ভারতের মুক্তি-প্রয়াস যে অচিরেই সুদূর প্রাচ্যে বিরাট ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করবে, তা তারা জানতো না।

মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করার ফলে, ১৯৪২ সালে সারা ভারতব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, ভারতের ইতিহাসে এই বিক্ষোভকে "আগষ্ট-বিপ্লব" নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতি নির্ম্মম ভাবে ইংরেজ সরকার, জনগণের এই অভ্যুত্থানকে দমন করে। তারপর এলো ১৯৪৩ সালের করাল দুর্ভিক্ষ। বাংলা-দেশে তখন খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত। দেশের লোকের খাদ্য-সংস্থানের দিকে তিলমাত্র দৃষ্টি না দিয়ে, মন্ত্রিগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার দিকেই একান্ত মনোযোগী হয়ে বসে রইলেন। ফলে বাংলায় মানুষ মরতে লাগলো হাজারে হাজারে। পল্লী থেকে লোক ছুটে আসতে লাগলো সহরে খাদ্যের অন্বেষণে। সেখানেই বা খাদ্য কোথায়? রাস্তায় পড়ে মানুষ মরতে লাগলো।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

এদিকে লক্ষ লক্ষ বাঙালী না খেয়ে মরলো। ওদিকে লক্ষ লক্ষ মার্কিণ সেনা বাংলায় এসে ঘাঁটি গাড়তে লাগলো—জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য। ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আই-এন-এ বা আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যে আক্রমণ করেছিল, তাকে ইংরেজ সরকারের প্রচার-বিভাগ, ঐ সময়ে, জাপ-আক্রমণ নামেই অভিহিত করেছিল। ভারতবাসী কেউ জানতেই

পারে নি যে, কোহিমা ও ইম্ফলে যারা আক্রমণ করেছে, তারা সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নয়, তারা ভারতের মুক্তিকামী ভারতীয় সৈনিক।

১৯৪৪ সালের সূচনাতেই আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আজাদ হিন্দ্
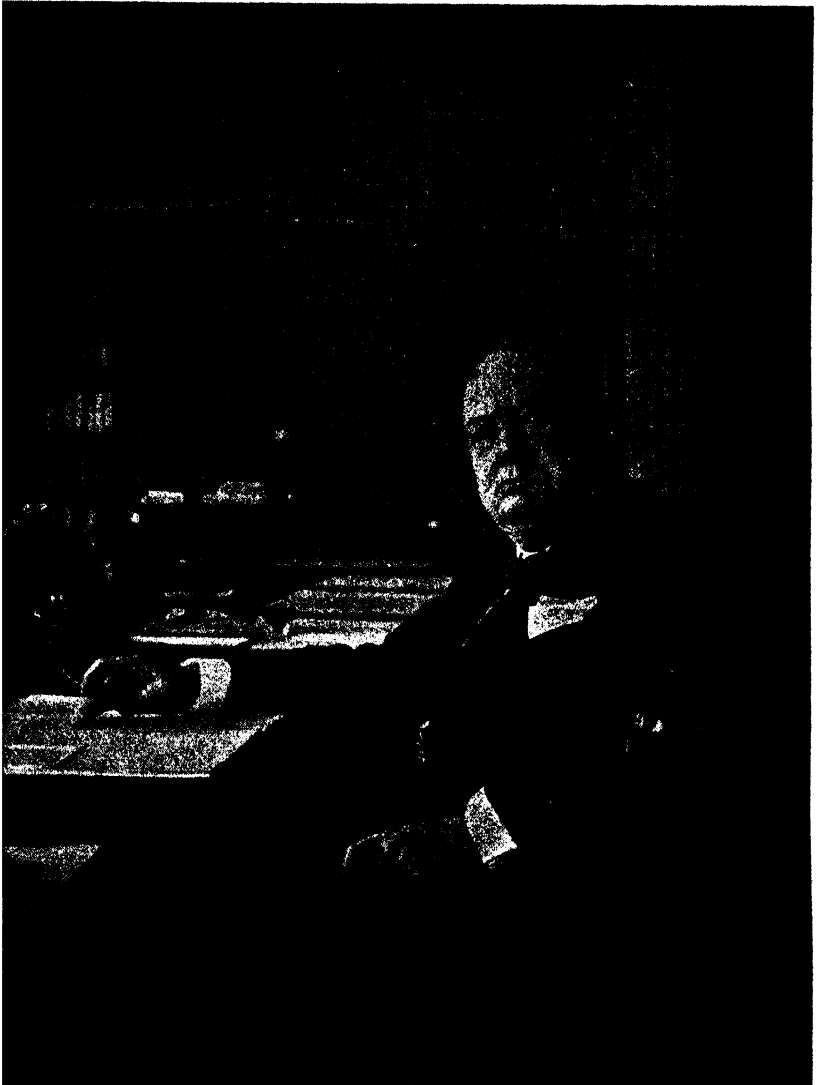
উইনষ্টন চার্চ্চিল

বাহিনীর আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠলো। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল সরল, অথচ সুদূরপ্রসারী। পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা, তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ইম্ফল-কোহিমা অঞ্চল আক্রমণ করবে, তারপর ত্রিশ

মাইল উত্তরে অগ্রসর হয়ে, অধিকার করবে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে। ইংরেজ বাহিনীর চতুর্দ্দশ-সংখ্যক রেজিমেণ্ট এই প্রদেশ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তাদের পরাস্ত করে তারা পশ্চিম-দক্ষিণে অগ্রসর হবে কলকাতার দিকে।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর একাংশ দক্ষিণ থেকে টিড্ডিমের দিকে অগ্রসর হলো, অন্যান্য অংশ আরও উত্তরে চিন্দুইন নদী পার হয়ে পশ্চিম দিকে ছুটলো। ১৭-সংখ্যক ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট পালিয়ে ইম্ফল পৌঁছোবার আগেই তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলা এদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৭-সংখ্যক রেজিমেণ্টের অধিনায়ক, জেনারেল কাওয়ান টিড্ডিমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে রাতারাতি চল্লিশ মাইল হটে গেলেন। তাদের পিছনে পশ্চাদ্ধাবন করলো আজাদী ফৌজ।

ইম্ফল উপত্যকায় এসে ঘাঁটি স্থাপন করলো বিভিন্ন ইংরেজ সৈন্যদল। ইম্ফলের উত্তরে কোহিমা রোড। এই রাস্তায় আশী মাইল গেলে পাওয়া যায় কোহিমা, তারও চল্লিশ মাইল পরে ডিমাপুর। আজাদী ফৌজ কোহিমা পাহাড়ের উপর দিয়ে এসে রাস্তা বন্ধ করে ফেললো। কোহিমা পড়লো বিচ্ছিন্ন হয়ে। পাহাড়ের মাথায়, ৫০০০ ফুট উপরে **কোহিমা**: এখানে তিন হাজার ইংরেজ সৈন্য আগে থেকেই ছিল। তা ছাড়া আরাকান থেকে ৫ম ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী, রয়্যাল ওয়েষ্ট কেণ্টস সৈন্যদল, ব্রিটিশ সেকেণ্ড ডিভিশন—সবাই বায়ুবেগে ধেয়ে এলো কোহিমা-রক্ষার জন্য। ডিমাপুর থেকে ৩৩শ-সংখ্যক ইংরেজ সেনাদলও এসে পড়লো জেনারেল ষ্টফোর্ডের অধীনে।

এরা এসে পৌঁছোবার পূর্ব্বেই, আজাদী ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল **শাহ নওয়াজ** কোহিমায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলেন। চৌদ্দ দিন তিনি কোহিমা অধিকার করে রেখেছিলেন। তারপর, রসদের অভাব তাঁকে বিব্রত করে তুললো। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিজস্ব বিমানবহর না থাকায়, রসদ সরবরাহের ভার জাপানী সৈন্যের উপর প্রদত্ত হয়েছিল। তারা হয়ত আজাদী ফৌজের কৃতিত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ হয়েই রসদ পাঠাতে অবহেলা করেছিল। কারণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যে, ভারত-আক্রমণে জাপসৈন্যকে অংশগ্রহণ করতে তিনি দেবেন না।

যাই হক, ১৪ই মে আজাদ-ফৌজ কোহিমা পরিত্যাগ করে পশ্চাৎপদ হলো।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে কোহিমায় যারা যুদ্ধ করেছিল, তারাও অধিকাংশ ভারতীয় সৈনিক। যুদ্ধে তারাও কম শৌর্য্যের পরিচয় দেয় নি, যদিও সে শৌর্য্যের ফলে মাতৃভূমির বন্ধন-পাশ সাময়িক ভাবে দৃঢ়তরই হয়েছিল।

অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, জাপান আত্মসমর্পণ করার ফলে, ভারতবর্ষ শান্তির মুখ দেখলো আবার।

ততদিনে ইংলণ্ডে চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। শ্রমিক দলের নেতা এ্যাটলি হয়েছেন প্রধান মন্ত্রী। তিনি ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, পূর্ব্বে এসে প্রচুর আলোচনা করেও ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কোন উপায় বার করতে পারেন নি। তাঁর অসামর্থ্যের প্রধান কারণ ছিল চার্চ্চিলের অনমনীয় মনোভাব। ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে তাঁর আন্তরিক অনিচ্ছা ছিল।
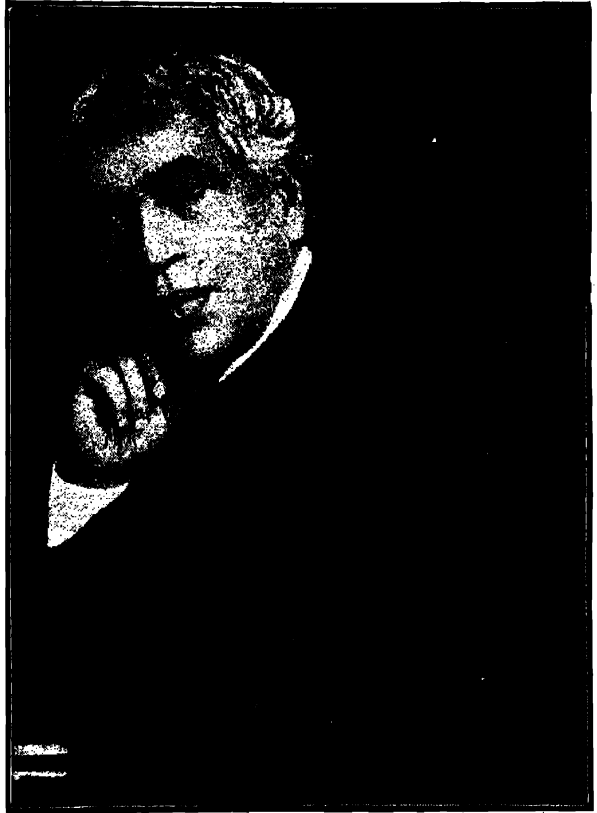
জগদীশচন্দ্র বসু
(বাংলার স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক)

এ্যাটলী এবারে পুনরায় আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য তিনজন মন্ত্রীকে প্রেরণ করলেন ভারতে। তাঁরা এসে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম নেতৃগণের মতদ্বৈধ কিছুতেই দূর হলো না। জিন্না-পরিচালিত মুসলিম-লীগ, কিছুতেই হিন্দুদের সঙ্গে যৌথ শাসন-যন্ত্রে মিলিত হতে রাজী হলো না। তখন এ্যাটলী-গভর্ণমেণ্ট ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন,—মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম অংশ ও পূর্ব্বাঞ্চলের

পূর্ব্ববঙ্গ একত্র করে **পাকিস্তান** রাষ্ট্র গঠন করা হলো। এর প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হলেন কায়েদে আজম **জিন্না** এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **খাজা নাজিমুদ্দীন**।

ভারতবর্ষের বাকী অংশটা **ভারত** বা **ইণ্ডিয়া** নামেই পরিচিত হতে থাকলো। এর গভর্ণর-জেনারেল হলেন প্রথমে **লর্ড মাউণ্টব্যাটেন**, পরে **চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী**। প্রধান মন্ত্রিপদে কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত
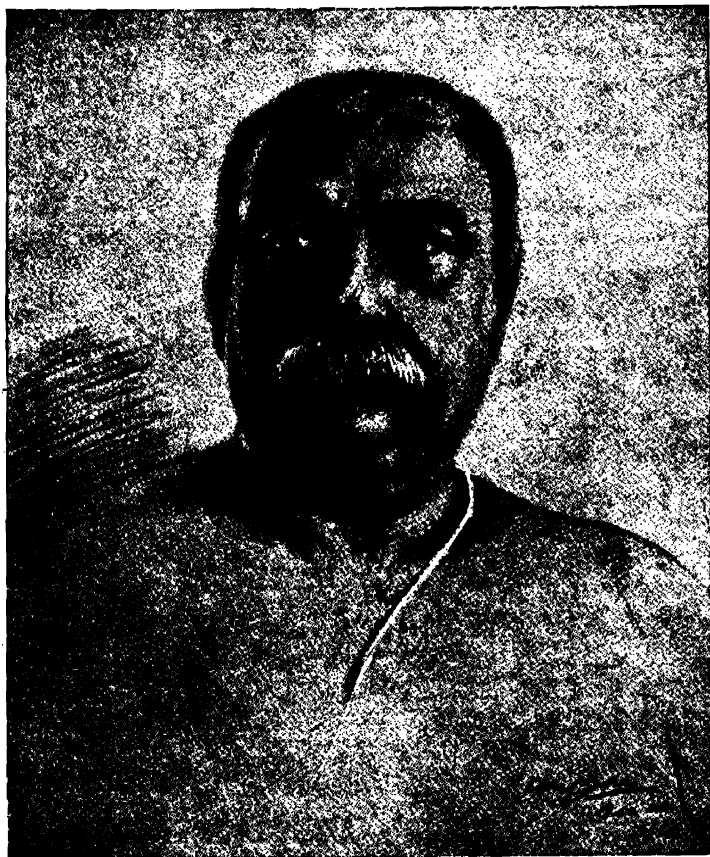
স্যার আশুতোষ

জওহরলাল নেহেরু প্রথম থেকেই অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলো। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

ভারতবর্ষ ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সাধারণতন্ত্র হওয়ার পরেও ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের তুল্য অংশীদার হয়েই আছে। বড়লাট পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারত

সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হয়েছেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ভারতবাসীর নিজেদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসন-সংবিধান রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ এখন পূরোপূরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ায় দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে। হায়দরাবাদ, জুনাগড় অনেক গোলমালের পর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অবশ্য কাশ্মীর-সমস্যা অনেকদিন ধরে অমীমাংসিতই রয়েছে। নানাকারণে ভারতের আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও অর্থ-নৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এখন পর্য্যন্ত হতে পারে নাই। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কতকগুলি বিষয়ে মতের মিল না হওয়ায় এবং পাকিস্তান থেকে অগণিত বাস্তুহারার ভারতবর্ষে চলে আসায় অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত অল্পসময়ের মধ্যেই একটা বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বৈদেশিক নীতিতে তাঁর বিচক্ষণতা ও উদার নীতির জন্য সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেছেন। ভারত-সরকার বর্ত্তমান বিরোধ-কণ্টকিত রাষ্ট্রসমূহের প্রতি শান্তি-নীতির প্রচার, নিরপেক্ষতা, কোরিয়া-সমস্যা, নতুন চীন, জাপানের শান্তিচুক্তি, মধ্যপ্রাচ্য-সমস্যা প্রভৃতির প্রতি স্বাধীন ও উদার মতবাদের দ্বারা, বিশেষ করে এসিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছেও একটা সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছে।
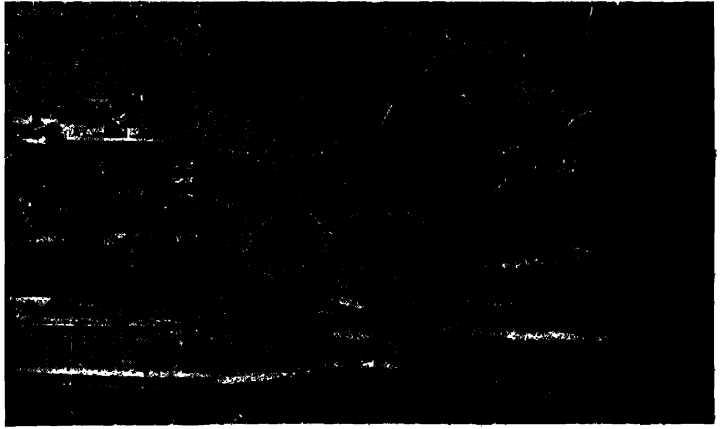
কাশ্মীরের সেতু

কাশ্মীর-সমস্যা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধের একটি প্রধান কারণ। কাশ্মীর একটি দেশীয় রাজ্য। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যজাতিরা অতর্কিতে কাশ্মীর আক্রমণ করে দেশবাসীর উপর নৃশংস

অত্যাচার চালায়। আক্রমণকারীরা অবাধগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর রাজধানী শ্রীনগর বিপন্ন হলে কাশ্মীরের মহারাজা লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং কাশ্মীররাজ্যকে ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার বিধিগত চুক্তিপত্রে সহি করেন। ভারত সরকার সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কাশ্মীর রক্ষাকল্পে সেখানে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠায়। ইতিমধ্যে মহারাজা শেখ আবদুল্লা ও জাতীয় সমিতির অপরাপর কতিপয় নেতার সাহায্যে একটি কার্য্যকরী গভর্ণমেণ্ট গঠন করেন।

পার্ব্বত্য উপদলের কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয়
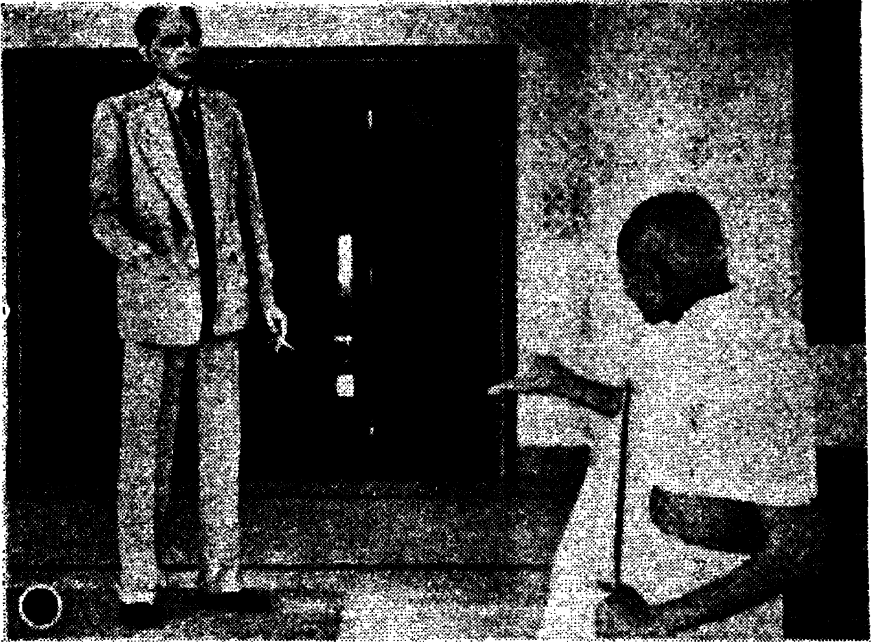
কায়েদে আজম জিন্না ও মহাত্মা গান্ধী

সহযোগ আছে জানতে পেরে ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান জাতিপুঞ্জের হস্তে ন্যস্ত করলো। তখন থেকে জাতিপুঞ্জ এই সমস্যার সমাধানকল্পে অনেকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু নানাকারণে আজ পর্য্যন্ত সমস্যাটি একভাবেই জটিল ও অমীমাংসিত রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এর লোকসংখ্যা সাত কোটির উপর, তাদের অধিকাংশ
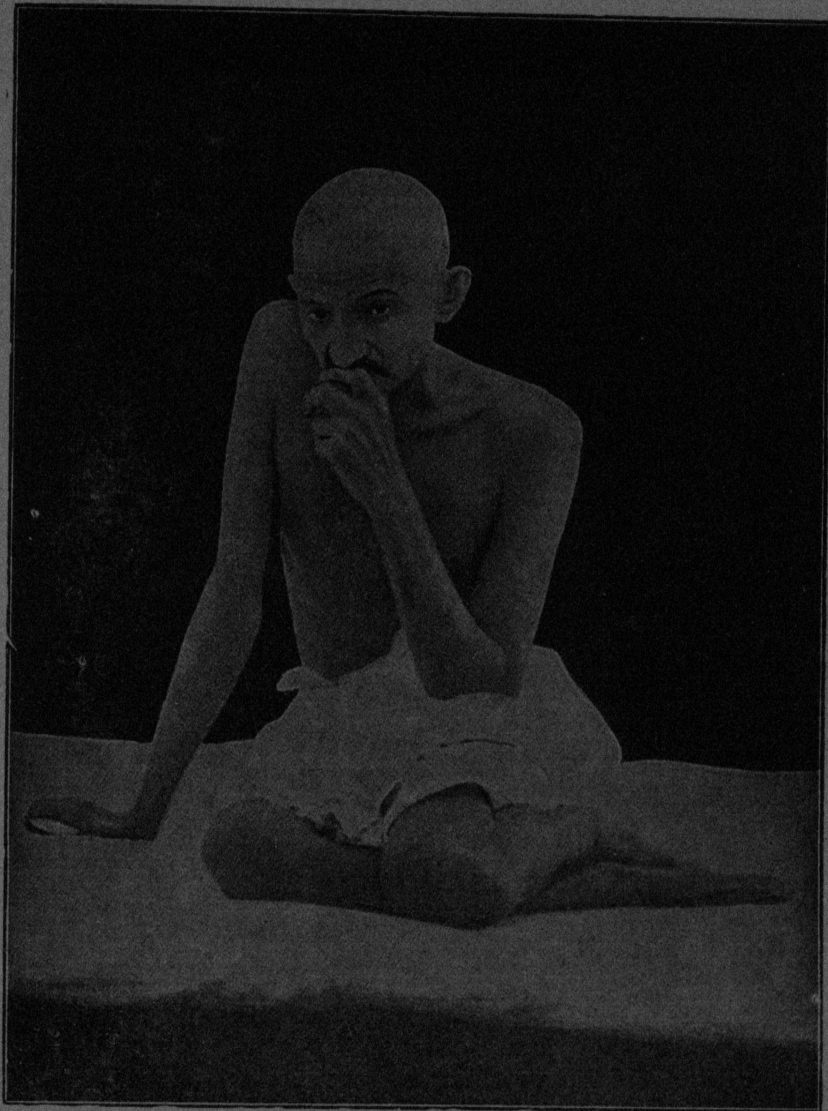
জাতীয়তার মহামন্ত্রে সমগ্র ভারতবর্ষকে উদ্বোধিত করেছিলেন ভয়হীন দ্বেষহীন অহিংসাধর্ম্মী মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

মুসলমান। রাষ্ট্রের রাজধানী করাচী। পাকিস্তান দুই অংশে গঠিত, পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব্ব-পাকিস্তান, মাঝখানে শত শত মাইলের ব্যবধান। পশ্চিম-পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান প্রদেশ পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত। পূর্ব্ব-পাকিস্তান পূর্ব্ব-বাংলা প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলাদ্বারা গঠিত। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা। কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

লিয়াকৎ আলি খাঁ

কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না হন পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল আর **লিয়াকৎ আলি খাঁ** প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জিন্নার মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন দেশের বড়লাট হন। ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর লিয়াকৎ আলি খাঁ আততায়ীর হস্তে নিহত হলে নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং গোলাম মহম্মদ বড়লাট-পদে অধিষ্ঠিত হন।

পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ, শিল্পসমৃদ্ধিতে এখন পর্য্যন্ত অনগ্রসর। ভারত সরকার কর্তৃক মুদ্রামান সঙ্কোচন আর পাকিস্তান কর্তৃক ঐ নীতি গ্রহণে অসম্মতিতে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধার স্বষ্টি হয়েছে। কাশ্মীর-সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মন-কষাকষির অবধি নেই। ১৯৫০ সালে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের জন্য ভারতবাসীরা উত্তেজিত হয়, তবে বর্ত্তমানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সম্পর্কই চলেছে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে যে দেশটি পারস্য নামে পরিচিত মাঝখানে কিছুদিন এর নাম **ইরাণ** দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর হতে এর নাম আবার **পারস্য** হয়েছে। মুসলমান-যুগের পূর্ব্বে এই দেশকে ইরাণ বলতো এবং এর অধিবাসীরা ছিল আর্য্য।

ইরাণ হলো বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের দেশ। এখানকার লোকেরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো। ছোট ছোট গ্রামে তারা বাস করতো। চাষ-আবাদ এবং ভেড়া চরানো ছিল তাদের উপার্জ্জনের পথ। এদের মধ্যে একটা কোন সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল না, ছোট ছোট উপজাতিতে এরা বিভক্ত ছিল।

ইরাণ দেশটি যে স্থানে অবস্থিত বহু প্রাচীন কাল হতেই ঐ অঞ্চলে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়। পর পর আসিরিয়, মিডি, বাবিলন সাম্রাজ্য প্রভৃতির পতন হলে কাইরাস নামক একজন পারসিক আরও বহুদেশ-জয়ী যোদ্ধা এখানে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন।

কাইরাস সর্ব্বপ্রথম দেশের লোকদের একত্র করে, তাদের এক জাতিতে পরিণত করেন। তিনি যে রাজবংশ স্থাপিত করেন তাকে বলে **একিমিনিড-বংশ**। তিনি পারসিকদের তিনটি জিনিষ শিখিয়েছিলেন—ঘোড়ায় চড়তে, তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে, আর সত্য কথা বলতে। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত চামড়ার পোষাক পরে তারা যুদ্ধ করতো।

কাইরাস এমনি সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে এশিয়া-মাইনর, প্যালেষ্টাইন, আসিরিয়া এবং বাবিলন জয় করেছিলেন। ভারতবর্ষও বোধহয় তিনি আক্রমণ করেছিলেন।

একটা দেশ জয় করেই পারসিকরা সেখানে গভর্ণর বা **সেট্রাপ্** নিযুক্ত করতো এবং বিজিত দেশের লোকদের জন্য যতদূর সম্ভব ভাল আইন তৈরী করে, তারা যাতে ভাল ভাবে থাকতে পারে, তার চেষ্টা দেখতো। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাওয়া-আসার সুবিধার জন্য তারা ভাল ভাল রাস্তা তৈরী করে দিত, যাতে দেশের ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে যাতায়াতের কোন অসুবিধা না হয়। হাজার হাজার মাইল রাস্তা তারা তৈরী করেছিল এবং যাতায়াতের সময় পথিকদের বিশ্রামের অসুবিধা যাতে না হয়, সেজন্য রাস্তার পাশে পাশে, তারা অসংখ্য সরাইখানাও তৈরী করে দিয়েছিল।

একটা দেশ জয় করলে পারসিকরা সে দেশের ভাল জিনিষগুলো সব শিখে নিত। বাবিলন জয় করে তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করতে শিখলো, মিশর জয় করে মন্দিরে কারুকার্য্য করা শিখে নিল। তারপর তারা নিজেদের দেশে চমৎকার সব সহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করলো।

রাজা দারায়ুস

ইরাণে আজ পর্য্যন্ত যত রাজা রাজত্ব করেছেন তার মধ্যে **দারায়ুস** সবচেয়ে বড়। রাজা দারায়ুসের আমলেই পারসিক সভ্যতা সবচেয়ে বেশী উন্নত হয়েছিল এবং এঁরই আমলে ইরাণের অধীন দেশের লোকেরা সবচেয়ে বেশী সুবিচার ও সদ্ব্যবহার পেয়েছিল। সম্রাট দারায়ুসের সাম্রাজ্য সিন্ধু-নদীর উপকূলভাগ হতে মিশরদেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল।

ইরাণের **পার্সেপোলিস** নামক সহরে ছিল দারায়ুসের প্রাসাদ। প্রাসাদের দেয়াল ছিল বহুমূল্য কাঠের, সেই কাঠের উপর সোনার পাত মোড়া, তার সামনে বহুমূল্য ভারতীয় সিল্কের পর্দ্দা ঝুলতো। প্রাসাদের ছাদ ছিল রূপার তৈরী টালির। যে পালঙ্কে দারায়ুস শয়ন করতেন সেটা দেখতে ছিল চমৎকার একটি আঙুর গাছের মত এবং খাঁটি সোনার তৈরী। তার মধ্যে মধ্যে সবুজ রংএর বহুমূল্য হীরা বসানো থাকতো, সেগুলোকে দেখাতো ঠিক যেন আসল আঙুর!

দারায়ুস শুধু যে সৌখীন লোকই ছিলেন তা নয়; তাঁর শক্তিও

বড় কম ছিল না। তাঁর সৈন্যদল ছিল বিরাট, সেই দলে অনেক দেশের লোক ছিল। মিশরের লোক, মধ্য-আফ্রিকার সিংহ-চর্ম্ম পরা নিগ্রো, উত্তর-আফ্রিকার উট-সওয়ার কাফ্রী—এরা ছিল দারায়ুসের সৈন্য। হাতী-সওয়ার একদল হিন্দুও তাঁর সৈন্যদলে ছিল। পারসিকরা তো ছিলই। এই সৈন্যদল নিয়ে দারায়ুস যখন যুদ্ধে যেতেন, শত্রুরা ভয়েই তাঁর পথ ছেড়ে দিত।

তাঁর জয়-যাত্রা সর্ব্বপ্রথম আঘাত পেল গ্রীসে। গ্রীস আক্রমণ করে দারায়ুস কিছুতেই জয়লাভ করতে পারলেন না। বিখ্যাত **মারাথনের** যুদ্ধে দারায়ুসের সৈন্যেরা ক্ষুদ্ররাষ্ট্র এথেন্সের কাছে পরাজিত হয়েছে এই সংবাদ পাওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।

রাজা দারায়ুস

দারায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **জেরাক্সেস** সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি নানাজাতি সমন্বিত এক বিপুল বাহিনী নিয়ে ছোট গ্রীস-দেশকে আক্রমণ করেন। এই সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ **থার্ম্মোপলির** গিরিবর্ত্মের যুদ্ধে পারসিকরা জিতলো বটে কিন্তু তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারলো না। থার্ম্মোপলিতে স্পার্টাবীর **লিওনিডাস** ও তাঁর তিনশত সহকর্ম্মী অসীম বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। জেরাক্সেস এবং তাঁর পরবর্ত্তী পারসিক সম্রাটগণ গ্রীসের সঙ্গে আরও যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। কিন্তু গ্রীকজাতির বীরত্বের সম্মুখে তাঁরা ক্রমেই হটে যেতে লাগলেন। পারস্য-সম্রাটের গ্রীস-বিজয়ের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে অতৃপ্ত রয়ে গেল।

একিমিনিড-বংশ ২২০ বছর কাল এক বিশাল সাম্রাজ্যের উপর শাসন চালাবার পরে মাসিডোনিয়ার বিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার এই সাম্রাজ্য জয় করেন এবং পার্সেপোলিস সহর অগ্নিদগ্ধ করেন।

পারসিকেরা খুব সভ্য ও ধর্ম্মব্যাপারে উদার ছিল। তারা খুব

রাজা দারায়ুস পর্ব্বত-গাত্রে শিলালিপি উৎকীর্ণ করাচ্ছেন.

উঁচুদরের শিল্পী ছিল। ভারতের বিখ্যাত তাজমহলে পারসিক শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যুগ যুগ ধরে পারস্য বা ইরাণ দেশের উপর অনেক ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে কিন্তু এর পুরাতন শিল্প-নৈপুণ্যের ঐতিহ্য এবং উন্নত সংস্কৃতির ধারা বরাবর একরূপ অব্যাহতভাবেই চলে এসেছে।

পারসিক সম্রাটগণ খুব সুদক্ষ শাসক ছিলেন। দেশের মধ্যে অনেক বড়

বড় রাস্তা থাকায় চারদিকে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণের সঙ্গে প্রাচীন পারসিকদের নিকট-সম্বন্ধ ছিল। এদের জোরস্তার ধর্ম্ম এবং বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে যোগাযোগ আছে। একিমিনিড শিল্পরীতি ভারতীয় মৌর্য্য শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়।

একিমিনিড-রাজবংশের অবসানের পরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি

যুদ্ধক্ষেত্রে দারায়ুস

সেলুকস ইরাণে এক গ্রীক রাজবংশের প্রবর্ত্তন করেন। এর পর এখানে অপরাপর অর্দ্ধ-বৈদেশিক গ্রীক শাসনকর্ত্তাদের কর্তৃত্ব বহুদিন ধরে চলে। এই দীর্ঘকাল ভারতের পশ্চিমে এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় কুশান সাম্রাজ্যও গ্রীক শিল্প ও গ্রীক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, ইরাণে একটি জাতীয় আন্দোলনের ফলে, **সাসানিড** নামে এক দেশীয় রাজবংশ সিংহাসনে বসে। এই বংশের রাজত্বের সময়, শক্তি, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রাঙ্কন, সমস্ত দিকেই পারস্যদেশ বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে। সাসানিডদের সঙ্গে কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব্ব-রোমসাম্রাজ্যের, শত শত বছর ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে। ভারতে সাসানিডদের সমসাময়িক ছিল গরিমাময় **গুপ্তযুগ**। এ সময়ে ইরাণ ও ভারতের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক নানা সম্বন্ধ ছিল। সাসানিডদের যুগেই বোধহয় পারসিকদের ধর্ম্মপুস্তক **অবেস্তা** রচনা সম্পূর্ণ হয়।

ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি, ইরাণ আরব-শক্তির অধীনে যায়। মুসলমানেরা তখন নতুন উন্মাদনা নিয়ে দেশের পর দেশ জয় করতে থাকে এবং সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, মিশর সর্ব্বত্রই তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। ইরাণীরাও বিজেতা আরবদের সভ্যতা গ্রহণ করে কিন্তু তাদের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তারা হারায় নাই। ইরাণীরা আর্য্যজাতি আর আরবেরা সেমিটিক জাতিভুক্ত লোক, সে জন্য ইরাণীরা তাদের জাতিগত ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলো। পারস্যের বিলাস ও ঐশ্বর্য্য সরল মরুভূমিবাসী আরবজাতির জীবনযাত্রার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।
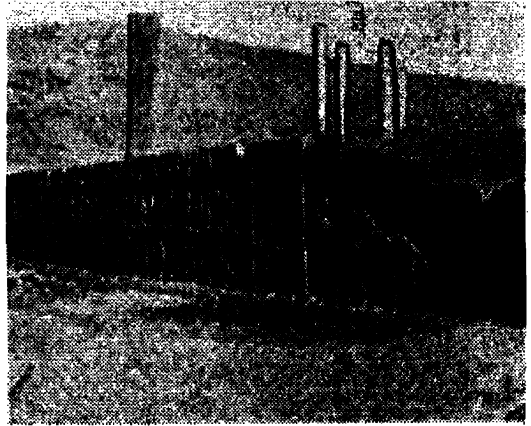
জেরাক্সেসের ভগ্ন প্রাসাদের একাংশ

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের আরব-সাম্রাজ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়। শীঘ্রই দলে দলে সমরপ্রিয় তুর্কীজাতি পূর্ব্বদিক থেকে এসে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করে ও পারস্য তাদের অধিকারে যায়। এ সময়ে গজনীর তুর্কী সুলতান মামুদ এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

এরপরে ইরাণ বা পারস্য **সেলজুক** তুর্কীদের অধীন হয়। তারপর এখানে আর একটি তুর্কীশক্তি, খিভা-রাজ্যের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

শীঘ্রই চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে, মঙ্গোলজাতি যখন দুর্ব্বার গতিতে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করছিল তখন পারস্যও মঙ্গোলদের করতলগত হয়। তুর্কীদের

আলেকজাণ্ডার পার্সেপোলিস সহর অগ্নিদগ্ধ করছেন

রাজত্বের সময় এবং অন্যান্য যুগেও পারসিক সাহিত্যে অনেক বড় বড় কবির আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে ফিরদৌসি, ওমর খৈয়ম, জালালুদ্দিন রুমি এবং হাফেজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৈমুর ও নাদিরশাহ

সামারকন্দের নিষ্ঠুর বিজয়ী তুর্কী বীর তৈমুর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মঙ্গোলদের হাত থেকে পারস্য কেড়ে লন। তিনি ভারতবর্ষের
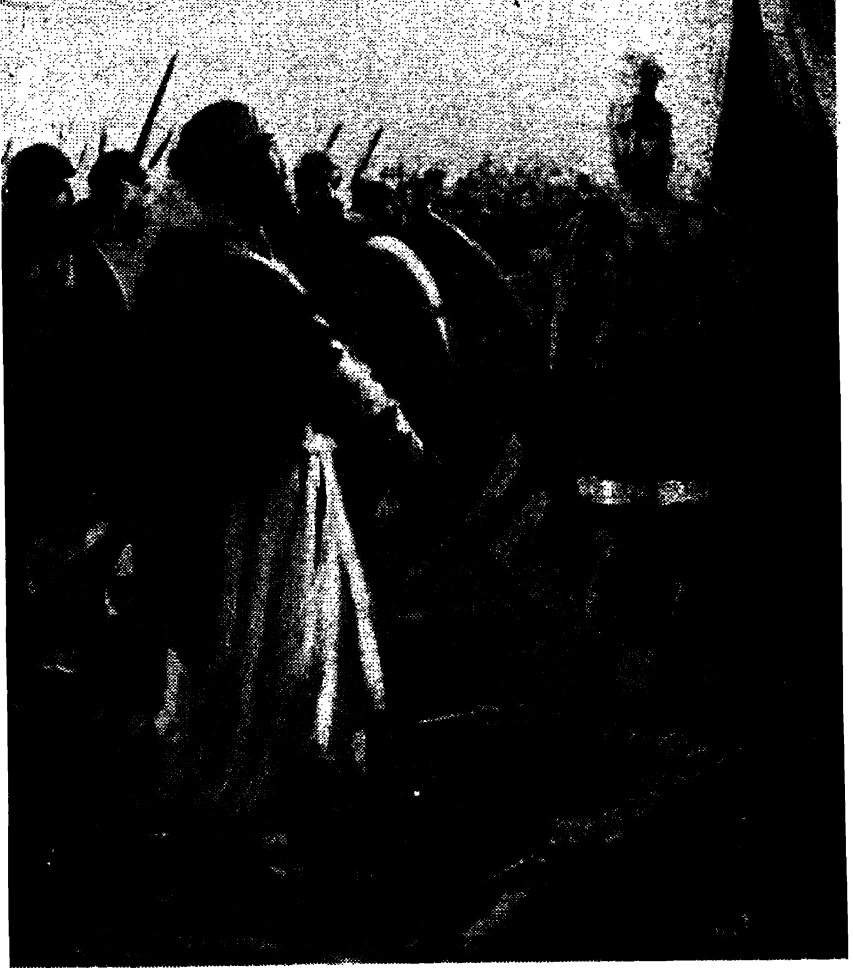
রোম-সম্রাট ভেলিরিয়েন পারস্যরাজ সা-পুরের হাতে বন্দী হলেন

অতুল ঐশ্বর্য্যের সংবাদ শুনে, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। ভারতে মুসলমান সুলতানদের তখন পতন-অবস্থা। তৈমুরকে বাধা দেবার জন্য দেশের হিন্দু ও মুসলমানরা একসঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলো কিন্তু জয়লাভ করতে তারা পারলো না।

দিল্লীর কাছে পৌঁছে তৈমুর অগণিত বন্দীকে হত্যা করলেন। তারপর

তাঁর হিংস্র সৈন্যেরা দিল্লীতে ঢুকে, অবাধে লুঠতরাজ ও হত্যালীলা চালালো। দিল্লীর রাজপথে মানুষের রক্তের স্রোত বইয়ে, তৈমুর দেশে ফিরে গেলেন।

এই নির্দ্দয় অত্যাচারী তৈমুর কিন্তু শিল্পানুরাগী ও লেখাপড়ায় শিক্ষিত ছিলেন। তৈমুরের বংশধরেরা আরও একশত বছর রাজত্ব করেন। এই সময়কে তিমুরিড যুগ বলে। এযুগে ইরাণ, বোখারা, হিরাট প্রভৃতি স্থানে শিল্প ও সাহিত্যচর্চ্চার অভাবনীয় উন্নতি হয়। পারসিক সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন এবং তুর্কী সাহিত্য খুব উৎকর্ষতা লাভ করে। ইরাণের তিমুরিড যুগ ইতালির রেণেসাঁস বা বিদ্যার নবোন্মেষের যুগের সমসাময়িক কাল।

ইরাণ তুর্কী ও মঙ্গোলদের সামরিক অধিকারে যায় কিন্তু নিজের

কবি ফিরদৌসি একটি বালকের মুখে তাঁর নিজের রচিত কবিতা শুনছেন

সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের জয় করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পারস্যে এক জাতীয় জাগরণের ধাক্কায় বিদেশী তিমুরিডগণ বিতাড়িত হন এবং **সাফাভি** নামে দেশীয় এক রাজবংশ ইরাণের সিংহাসনে বসেন। এঁরা ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব-যুগের সমসাময়িক। সাফাভি-বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি **শা আব্বাস** সম্রাট আকবরের সময়ের লোক। তিনি তাঁর রাজধানী **ইসফাহানকে** খুব উন্নত এবং অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ দ্বারা শোভিত করেছিলেন।

সাফাভি-বংশ ১৫০২ হতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্বকাল পারস্যের শ্রেষ্ঠ গৌরবের যুগ। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য সকল

দিকে পারসিকরা অতুলনীয় পারদর্শিতা অর্জ্জন করে। পশ্চিম-এশিয়া, ভারতের মোগল-দরবার সর্ব্বত্র পারসিক ভাষা বিদ্বজ্জনের ভাষায় পরিণত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের অটোমান তুর্কীদের প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণে পারসিকদের

কবি ওমর খৈয়ম

স্থাপত্য আদর্শ বিস্তৃত হয়। এই আদর্শের প্রভাব আগ্রার তাজমহল নির্ম্মাণেও লক্ষ্য করা যায়।

সাফাভি-বংশের পতনের কিছু পর, অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর নাদিরশাহ

পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সম্রাট হবার আগে তাঁর নাম ছিল নাদিরকুলি খাঁ। নাদির বিখ্যাত যোদ্ধা এবং বীর ছিলেন। তিনি আফগানদের ইরাণ থেকে বিতাড়িত করেন।

তারপর তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৈমুরের মত ইনিও দিল্লীর রাজপথে মানুষের রক্তের স্রোত বইয়ে দেন। লুটপাট করে তিনি কোটি কোটি টাকা তো নিলেনই, সম্রাট শাহজাহানের সাধের ময়ূর-সিংহাসনটিও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। দেশে ফিরে নাদিরশাহ রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচারে দেশের লোক এত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে, শেষে তাঁর নিজের দেহরক্ষীদের হাতেই তাঁকে নিহত হতে হয়। নাদিরশাহের মৃত্যুর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারসিক ইতিহাস শুধু গৃহ-বিবাদ, দুর্নীতি ও কুশাসনের কাহিনী।

বিংশ শতাব্দীতে ইরাণ

ঊনবিংশ শতাব্দী হতে, ইরাণের উপর নজর পড়লো সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার। রাশিয়া বহুদিন ধরে পারস্যের উত্তরদিকে চাপ দিচ্ছিলো আর ইংলণ্ড, রাশিয়ার হাত থেকে তার ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করার অভিপ্রায়ে, পারস্য-উপসাগরের দিক দিয়ে ক্রমাগত পারস্যের উপর ধাক্কা দিচ্ছিলো। দুই বড় শক্তির পীড়নে দুর্ব্বল পারস্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরাণের দক্ষিণ অঞ্চলে খুব ভাল তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইংরেজরা সেটা দখল করতে চাইলো। ইরাণের শক্তি কমাতে না পারলে সুবিধা হবে না। খনিগুলো তারা ছাড়তে চাইবে না বুঝে, ইংলণ্ড এবং রাশিয়া একজোট হয়ে ইরাণ দেশটিকে দুই ভাগ করে ফেলবার বন্দোবস্ত করলো। ১৯০৭ সালে ইংরেজরা ইরাণের দক্ষিণ দিক এবং রাশিয়ানরা তার উত্তর দিকটা দখল করে নিল।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে ওঠার সময় ইরাণ চরম দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। ইরাণ যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলো কিন্তু দুর্ব্বলের অবলম্বিত ব্যবস্থার কোন মূল্য নাই। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন পক্ষের শক্তিরা অনবরত পারস্যের উপর দিয়ে তাদের সৈন্য চালনা করতে লাগলো, ইরাণীদের মতামত তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলো।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহে, রাশিয়ার জার যখন সিংহাসনচ্যুত

হলেন, বলশেভিকরা তখন উত্তর-ইরাণের উপর সব দাবী ত্যাগ করে, ইরাণকে রাশিয়ার কবল থেকে মুক্তিদান করলো। ইংলণ্ড দেখলো এই সুযোগ। দক্ষিণ-ইরাণ থেকে ইংরেজরা অমনি সৈন্য চালনা করে ইরাণের দুর্ব্বল শাহকে এমন কোণঠাসা করে ধরলো যে, উপায়ান্তর না দেখে, তিনি ইংরেজদের কর্ত্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তেলের খনিগুলি শোষণ করার

তৈমুরের পারস্য-বিজয়

জন্য ইংরেজরা ইতিপূর্ব্বে **ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী** গঠন করেছিল। তারা পারস্যের তেলের কল্যাণে প্রভূত অর্থলাভ করতে লাগলো। ইংরেজদের মনের ইচ্ছা ছিল, ধীরে ধীরে ইরাণকে সম্পূর্ণরূপে কবলিত করে, তাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে নেওয়া। তাদের এই মতলব কিন্তু সফল হলো না।

রেজা শাহ পাহ্লবী

১৯২০ সালে বলশেভিকরা ইরাণের উত্তরদিকের **জিলান** নামক একটা প্রদেশ জয় করে, সেখানে সোভিয়েট-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে দিল। তারপর তারা মাজান্দেরাণ নামক ইরাণের সব চেয়ে উর্ব্বর স্থানটি আক্রমণ করলো।

এই মাজান্দেরাণে **রেজা খাঁ** নামে এক যুবক ছিলেন। এক কৃষকের ক্ষেতে তিনি কৃষিকার্য্য শিখেছিলেন; কিন্তু বলশেভিকরা মাজান্দেরাণ

আক্রমণ করবার পর, তিনি সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে তাদের সঙ্গে করতে গেলেন।

ইরাণের যে এক মহা বিপদের দিন এসেছে, বিদেশীরা এসে দেশটিকে যে টুকরা টুকরা করে ফেলবার চেষ্টা করছে, সেটা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, আসন্ন বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, একটা শক্তিশালী সৈন্যদল সংগ্রহ করা এবং জীবন পণ করে যুদ্ধ করা দরকার।

ইরাণের তখন যিনি শাহ, তিনি ছিলেন খুব দুর্ব্বলচিত্ত লোক। তাঁর দ্বারা কিছু হবে না বুঝে, রেজা খাঁ নিজেই দেশ রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নেবেন বলে ঠিক করলেন।
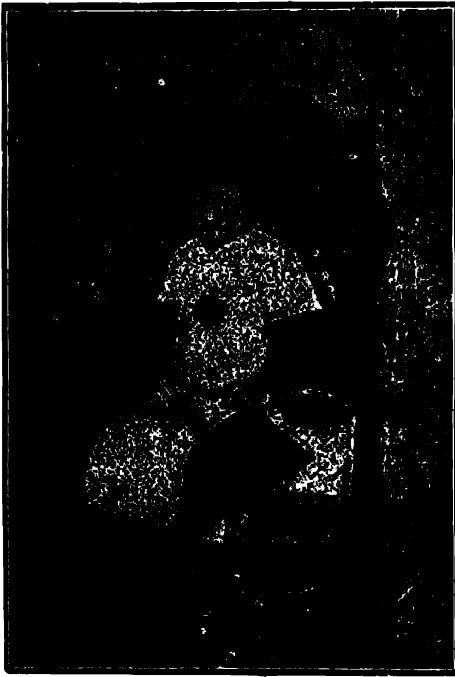
তৈমুরলঙ্গ

তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি রওনা হলেন রাজধানী **তেহরাণে**। সেখানে গিয়ে শাহকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হোক। শাহ বাধ্য হয়ে রেজা খাঁকে প্রধান সেনাপতি করতে রাজি হলেন।

রেজা খাঁ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সবার আগে ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজের সঙ্গে ইরাণের সন্ধি বাতিল হয়ে গেল। তিনি জিলানের সোভিয়েট-গবর্ণমেণ্টও ভেঙ্গে দিলেন। তিন বছরের মধ্যেই তিনি ইরাণের লুপ্ত শক্তি অনেকটা ফিরিয়ে আনলেন এবং নিজে হলেন ইরাণের প্রধান মন্ত্রী। ইরাণের শাহ ইউরোপ বেড়াতে গেলেন, আর ফিরলেন না। দু বছর পর ইরাণের লোকেরা, মস্ত সভা করে, রেজা খাঁকে শাহ নির্ব্বাচিত করলো। সিংহাসনে বসবার পর তাঁর নাম হলো **রেজা শাহ পাহ্‌লবী**।

রেজা শাহ গবর্ণমেণ্ট পরিচালনায় যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের যে সব বড় বড় জমিদার গবর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের

খুসীমত চলতে আরম্ভ করেছিলেন, তিনি তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। ইংরেজরাও তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। রাশিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্ব বজায় থাকলে, তারা একজোট হয়ে, আবার সুযোগ পেলেই অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, এই ভেবে রেজা শাহ বুদ্ধি করে ইংরেজ ও রাশিয়ানদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিলেন।

শা আব্বাস

রেজা শাহের আমলে ইরাণের অনেক উন্নতি হয়েছে। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। রেলওয়ে স্থাপিত হয়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়।

রেজা শাহের শক্তিশালী শাসনে পারস্য ঐক্যবদ্ধ হয়। পরাক্রান্ত সামন্ত-শ্রেণী, যাঁরা বরাবর জনসাধারণকে উৎপীড়ন করতেন তাঁরা গবর্ণমেন্টের দমনে আসেন। দেশে একটা ব্যাপক জাতীয়তাবোধের সাড়া জেগে ওঠে। যে বিদেশীরা পারস্যের তৈল-ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়ে দেশকে দরিদ্র করছিল, তাদের উপরই পারসিকদের বেশী রাগ পুঞ্জীভূত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইরাণ নানাভাবে নিজের শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলো।

নাদিরশাহ

এই ভাবে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত কেটে গেল। কিন্তু ঐ বৎসর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জার্ম্মাণী, রাশিয়া আক্রমণ করবার পর, ইরাণের অবস্থা অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। ইংরেজরা দেখলো যে, জার্ম্মাণী যদি ককেশাস পর্ব্বত অতিক্রম করে ইরাণে এসে পৌঁছায়, তাহলে ভারতবর্ষের বিপদ ঘটবে। তারা রাশিয়ানদের সঙ্গে একত্রে, ইরাণে সৈন্য পাঠিয়ে, তার উত্তর দিকে ঘাঁটি করে, জার্ম্মাণীকে আটকাবার ব্যবস্থা করলো।

ইংরেজ ও রাশিয়ানরা ইরাণে সৈন্য চালনা করবার পর, রেজা শাহ প্রথমটা বাধা দিলেন কিন্তু এবার এরা দুজন, তাঁর চেয়ে বেশী শক্তিশালী বলে, তিনি আর পেরে উঠলেন না।

পারস্যের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লো এই বৈদেশিক আক্রমণে। পারস্যের শাহ সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁর পুত্র আরোহণ করলেন সিংহাসনে।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি, পারস্য যুদ্ধ ঘোষণা করলো জাপানের বিরুদ্ধে। অবশ্য সক্রিয়ভাবে জাপান-যুদ্ধে পারস্যকে কোনদিনই অবতীর্ণ হতে হয় নাই। তবে তার তৈল-সম্পদ দিয়ে মিত্রশক্তির যথেষ্ট সাহায্যই সে করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার অপরাপর উদীয়মান জাতির ন্যায় ইরাণের জনগণের মধ্যেও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষ করে ইংরেজদের

শাহ মহম্মদ রেজা পাহ্‌লবী ও তাঁর মহিষী

বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ বেড়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করলো যে ইংরেজদের অপসারিত করে তাদের অতুল তৈল-সম্পদ নিজেদের হস্তগত করতে না পারলে তাদের দেশের শিল্প, বাণিজ্য কিছুরই উন্নতি হবে না। পারস্য দরিদ্রই থেকে যাবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।

ইংরেজরা পারসিকদের নবজাগরণ লক্ষ্য করে যুদ্ধের পর তেল ব্যবসায়ে পারস্যকে কতগুলি সুবিধা দেয়। কিন্তু পারসিকগণ এতে সন্তুষ্ট হলো না। তারা দেখলো যে, ইঙ্গ-ইরাণ তৈল কোম্পানী বজায় থাকলে সাম্রাজ্যবাদীরা পারস্যের বাণিজ্য ও রাজনীতিতে কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ করবে, তাই তারা

আলেকজাণ্ডারের সহিত পারসিকগণের যুদ্ধ।

তেলের খনিগুলি সম্পূর্ণ দখল করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। দেশব্যাপী জোর আন্দোলন সুরু হলো।

কিছুদিন পূর্ব্বে সোভিয়েট রাশিয়া, পারস্যের উত্তর ভাগে আজারবাইজান প্রদেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, পারস্যের উপর অধিকার বিস্তার ও তেলের খনিগুলোর অংশলাভের চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধতায় রাশিয়া কোন সুবিধা আদায় করতে পারে নাই।

পারস্যের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইঙ্গ-ইরাণ কোম্পানী, তেলের উপর কর্ত্তৃত্ব ভোগ করে চলছিল কিন্তু পারসিক **মজলিস** বা পার্লামেণ্ট ১৯৫১ সালে একটি আইনের দ্বারা সমুদয় তৈল-সম্পদ পারস্যের জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। পারস্যের বর্ত্তমান **শাহ মহম্মদ রেজা পাহ্লবী** ১৯৫১ সালের ২রা মে এই আইনটি মঞ্জুর করেন।

পারস্যের এই আইন পাশ করার ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা অত্যন্ত চটে গিয়েছে। পারস্যের তৈল হাতছাড়া হলে ইংলণ্ডের ভীষণ আর্থিক বিপর্য্যয় হবে। রাশিয়াকে প্রতিরোধ করার জন্যও সুয়েজ খালের মত পারস্য, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির হাতে থাকা দরকার। পারস্যের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদিক, তেলের খনিগুলি কাজে খাটাবার জন্য, আমেরিকার কাছে অর্থ-সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু সেদিকে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নাই। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় পারস্যও ক্রমেই ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদের উপর বিরূপভাবাপন্ন হচ্ছে। পারস্য এখন অর্থের অভাবে রাশিয়ার অভিমুখী হতে পারে, তা'হলে পারস্যের পক্ষে চীনের ন্যায় ক্রমে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

এশিয়া মহাদেশে আকারে ছোট যে কয়টি দেশ আছে, জাপান তাদের মধ্যে একটি; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দেশটিই ছিল এশিয়ার মধ্যে সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

একশো বছরেরও কম সময়ের মধ্যে জাপান এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দূরপ্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পাঁচটি প্রধান ও আরও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে জাপানীদের দেশ। অনেকদিন পর্য্যন্ত তারা নিজেরাও দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেত না, অন্য দেশের কোন লোক এলে তাকেও জাপানে ঢুকতে দিত না। দেশে বড় বড় সব জমিদার অথবা **দাইমিও** ছিল। এরাই ছিল দেশের সব ধন-সম্পত্তির মালিক। এই জমিদারদের ছাড়া আর একদল শক্তিশালী ও ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সম্ভ্রান্ত সামরিক সম্প্রদায় ছিল। তাদের জাপানী ভাষায় বলে **সামুরাই**।

জাপানে একজন রাজা অবশ্য ছিলেন, জাপানী ভাষায় তাঁকে বলে **মিকাডো**। কিন্তু সামুরাইদের প্রতাপ ছিল মিকাডোর চেয়ে অনেক বেশী। এরা সব সময়েই একজন আর একজনের সঙ্গে লড়াই করে জমিদারী বাড়াবার চেষ্টা করতো। সামুরাইদের মধ্যে যে সব চেয়ে বেশী ক্ষমতশালী হয়ে উঠতো, তার পরামর্শ মেনে চলা ছাড়া রাজার কোন উপায় থাকতো না। সামুরাইদের একটা খুব বড় গুণ ছিল, নিজের অথবা দেশের সম্মান রক্ষার

জন্য, দরকার হলে, এরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হতো না। অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এরা আত্মহত্যা করাও ভাল মনে করতো।

জাপানের ইতিহাস প্রায় ২৬০০ বছরের পুরাতন। জাপানীরা মনে করে যে, তাদের সম্রাটবংশ সূর্য্যদেব হতে উদ্ভূত হয়েছে, এবং সেই বংশই ধারাবাহিক ভাবে আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। এইজন্য জাপানীরা চিরকাল দেশের সম্রাটকে দেবতার মত ভক্তি করে।

সম্ভবতঃ জাপানীদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোরিয়া ও মালয় হতে জাপানে আসে। জাপানীরা মঙ্গোল জাতিভুক্ত লোক। দেশের নাম জাপান পরে দেওয়া হয়। প্রথমে জাপানের কতক অংশকে যামাতো বলতো। প্রায় ২০০ খৃষ্টাব্দে জিংগো-নামক এক রাণী যামাতো রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন। কোরিয়ার সঙ্গে যামাতোর নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং কোরিয়ার মারফতেই চীন-সভ্যতা যামাতোতে আমদানী হয়েছিল। চীনের লিখিত ভাষাও কোরিয়ার ভিতর দিয়ে প্রায় ৪০০ খৃষ্টাব্দে জাপানে পৌঁছে।

সামুরাই

জাপানে প্রথমে বড় বড় জমিদারদের হাতেই ক্ষমতা বেশী ছিল, কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা সুসংহত ছিল না। কয়েকটি মুষ্টিমেয় অভিজাতবংশ, অনেক সময় জাপানে প্রকৃত ক্ষমতার মালিক ছিল। প্রথম শোজা-বংশ জাপানে আধিপত্য লাভ করে। এদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে রাজধর্ম্মে পরিণত হয়। শোজা-বংশের কিছু পর একজন বিখ্যাত জাপানী-প্রধান **কামাটোরী** 'ফুজিওয়ারা' নামে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট একরূপ এই বংশেরই হাতের পুতুল ছিলেন। কামাটোরীর আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেকটা

সুসংবদ্ধ হয়। জাপানের প্রথম রাজধানী ছিল নারা। ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কিয়োতোকে করা হয় রাজধানী এবং বর্ত্তমান যুগে, টোকিওতে রাজধানী
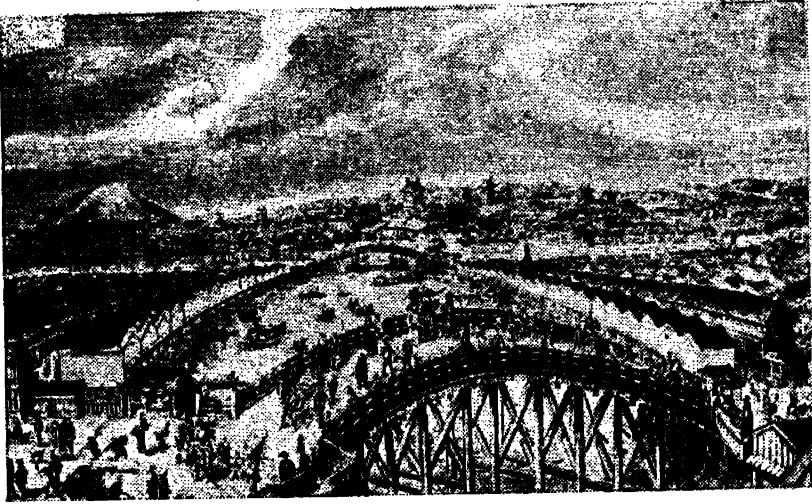
পুরাতন টোকিও নগরী
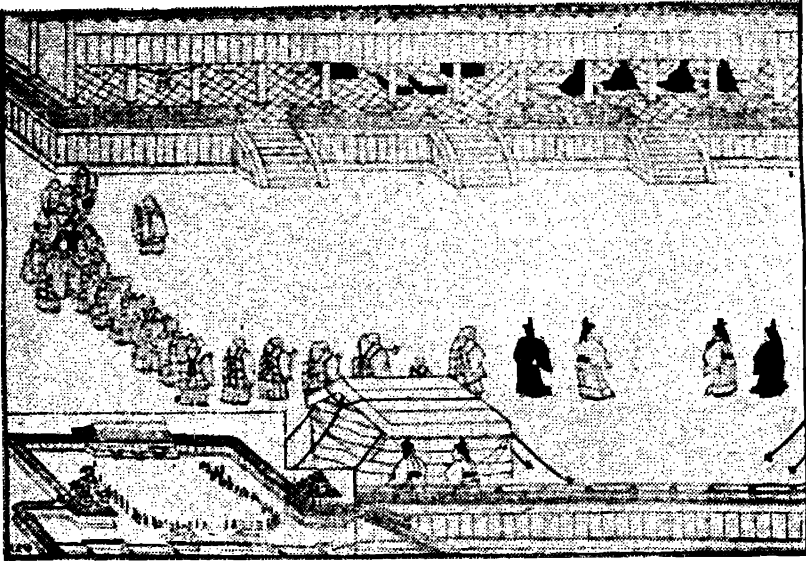
সিন্তোধর্ম্ম বা পূর্ব্বপুরুষদের পূজা

স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, প্রায় ১১০০ বছর কাল ধরে এই কিয়োতোই ছিল জাপানের রাজধানী।

জাপানীরা নিজেদের দেশকে বলে দাই নিপ্পন অথবা 'উদীয়মান সূর্য্যের দেশ'। চীন ও কোরিয়া হতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ

করে। জাপানের প্রাচীন ধর্ম্মকে বলে সিন্তোধর্ম্ম অথবা 'দেবতাদের আচরিত পন্থা'। এই ধর্ম্মে প্রকৃতি ও পূর্ব্বপুরুষদের পূজা করার একটা সংমিশ্রণ-প্রথা দেখা যায়। এ একটি যোদ্ধাজাতির ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের জোরে জাপানে, প্রাচীন রোমের মত, দেশের লোককে সম্রাট ও মুষ্টিমেয় কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য-ভক্তি শেখান হয়েছে। যদিও জাপান তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন ও কোরিয়া থেকে আমদানী করে, কিন্তু জাপানে এসে ঐ
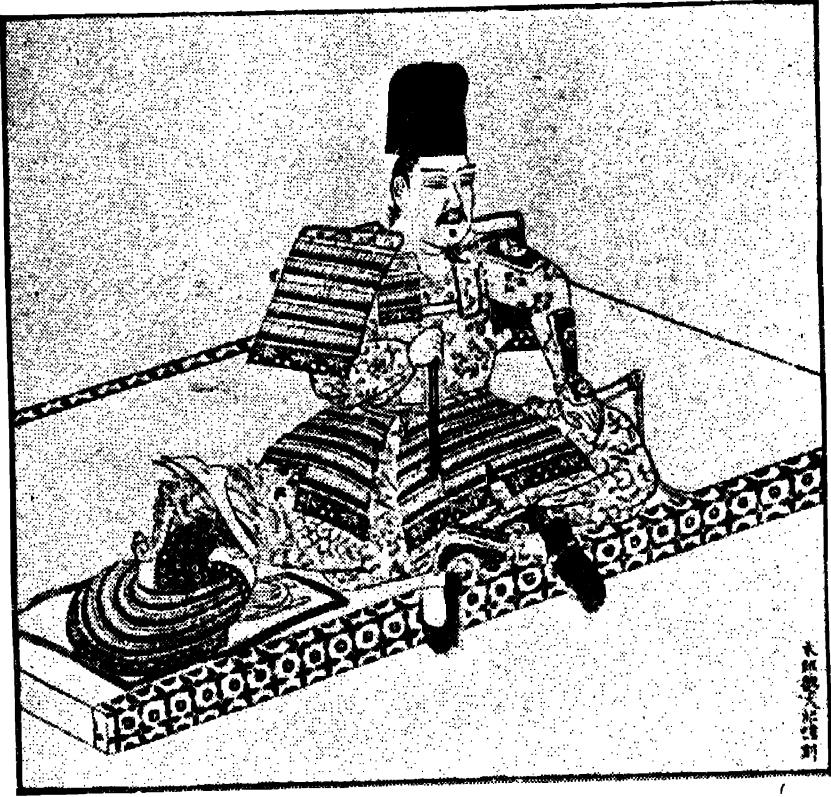
সোগান যুগের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সোগান জোরিতোমো

সভ্যতা নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে। চীনারা সৈনিকদের কোনদিনই সমাজে বড় স্থান দেয় নাই, ব্যবসায়ীদের স্থানই বরাবর সেখানে উচ্চে; কিন্তু জাপানে চিরকাল সৈনিক-শ্রেণীই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে এসেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশের সময় হতে জাপানে শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস সুরু হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানের রাজধর্ম্ম হলেও বর্ত্তমানকালে জাপানীরা সিন্তোধর্ম্মকেই বেশী প্রাধান্য দিত।

সোগান যুগ

প্রায় ২০০ বছর পর্য্যন্ত ফুজিওয়ারা-বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাইরা এবং মিনামোতো নামে দুই ক্ষমতাপন্ন দাইমিও-বংশের উদ্ভব হয়। মিনামোতো-পরিবারের জোরিতোমো নামে একজন লোক এই সময় জাপানে, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্ত্তা হন। তখনকার সম্রাট তাঁকে সোগান অথবা 'প্রধান সেনাপতি' এই উপাধিতে ভূষিত করেন।

জাপানের সম্রাট—তাঁর প্রধান সেনাপতিকে "সোগান' উপাধিতে ভূষিত করছেন

এরপর থেকে এই 'সোগান' উপাধি, উত্তরাধিকারসূত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এখন থেকে এই সোগানই হয় জাপানের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। প্রায় সাতশ বছর পর্য্যন্ত, বিভিন্ন নামজাদা বংশের সোগানরা জাপান দেশকে শাসন করেন। সম্রাটের হাতে এই সময় কোন ক্ষমতা থাকে না। জোরিতোমো, কামাকুরা নামক স্থানে তাঁর সামরিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য এযুগের সোগানদের বলা হয় 'কামাকুরা সোগান যুগ'। এ যুগের শাসনকালে দেশে শান্তি ও সুনিয়ম স্থাপিত হয়।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে আশিকাগা নামে, একটা নতুন সোগান-বংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। এদের সময় চীনে মিঙ্গ-বংশ রাজত্ব করছিল এবং এরা চীনের নিকট হতে চিত্রাঙ্কন, কাব্য, গৃহনির্ম্মাণ, দর্শন-বিদ্যা প্রভৃতি গ্রহণ করে। তারপর কিছুদিন জাপানে খুব জোর গৃহবিবাদ ও কলহ চলে।

অবশেষে তিন জন ব্যক্তি, শত বৎসরের গৃহযুদ্ধ থেকে জাপানকে উদ্ধার করেন। এঁরা হলেন, নোরবুনাগা নামে একজন দাইমিও অথবা জমিদার, দ্বিতীয়, হিদেজোশী নামে একজন কৃষক-সম্প্রদায়ের নেতা এবং তৃতীয়,
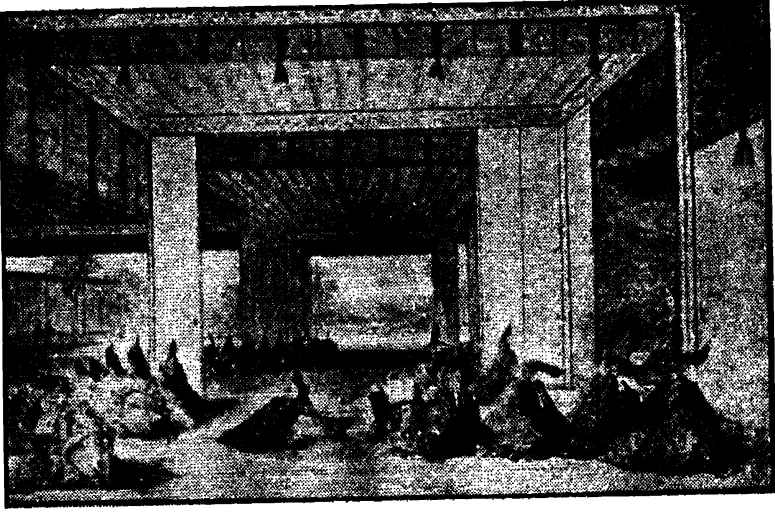
সোগানদের দরবার-গৃহ
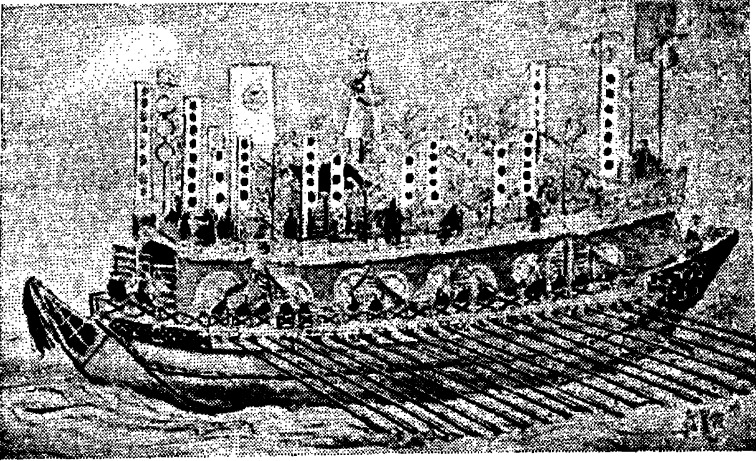
সোগানদিগের যুদ্ধ-জাহাজ (১৮৫০ খঃ)

তোকুগাওয়া ইজেজাশু নামে একজন শক্তিশালী জমিদার। এঁদের মধ্যে ইজেজাশু, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সোগানপদ লাভ করেন এবং ইনি তোকুগাওয়া সোগান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইজেজাশু 'জেদো' নগর নির্ম্মাণ করেন। এই নগরই পরবর্ত্তীকালে টোকিও নামে পরিচিত হয়।

তোকুগাওয়া-বংশের আমলে একজন সোগান একদল পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকদের উদ্ধত আচরণে চটে গিয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছ থেকে জাপানের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তিনি কঠোর ব্যবস্থা করলেন যে, কোন জাপানী বিদেশে যেতে পারবে না এবং বিদেশ থেকেও কোন লোক জাপানে ঢুকতে পাবে না। এইভাবে জাপান, দুই শতাব্দীরও বেশী সময় পর্য্যন্ত, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলো। এ একটা ইতিহাসের অভিনব ব্যাপার! এর ফলে, ঐ সময়ে, অন্যান্য দেশের মত জাপানে উন্নতি হলো না বটে কিন্তু দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রইলো।

অ্যাডমিরাল প্যেরী জাপানে অবতরণ করছেন

অবশেষে জাপান বাধ্য হয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তার দরজা খুলে দিল। জাপানীদের সব কিছুই অদ্ভুত রকমের। এই সময় আবার তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে, আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রগতিতে এক অসাধারণ ব্যাপারকে সম্ভব করলো। শীঘ্রই জাপানীরা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে ছুটে গিয়ে তাদের শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসননীতি ও সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করে, তাদেরই প্রবল সমকক্ষ হয়ে দাঁড়ালো।

আমেরিকার একজন নৌ-সেনাধ্যক্ষ কমোডোর বা অ্যাডমিরাল প্যেরী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এসে জোর করে জাপানে

অবতরণ করেন। আমেরিকার দেখাদেখি ইউরোপীয় জাতিরাও বাণিজ্যের লোভে জাপানে এসে উপনীত হলো। জাপানীরা দেখলো এদের বাধা দেওয়া বৃথা, কিন্তু তারা মনে মনে জ্বলতে লাগলো। কি করে বিদেশীদের উন্নত অস্ত্রবিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া যায় সেজন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। দিকে দিকে

নবীন জাপানের প্রথম সম্রাট—মুৎসিহিতো

জাপানী তরুণদের আধুনিক সামরিক জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য পাঠানো হলো। **প্রিন্স ইতো, ওকুমা, ওকাকুরা** প্রমুখ প্রতিভাবান নেতারা, জাপানের জাতিগত দোষ-ত্রুটিগুলির সংশোধন করে, দেশে নানাবিধ কার্য্যকরী সংস্কার-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে, জাপানে জাতীয়তার আবির্ভাব

হলো। এ পর্য্যন্ত দেশের ক্ষমতা ছিল সোগান, দাইমিও এবং সামরিক শ্রেণীর সামুরাইদের হাতে। অধিকাংশ জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্দ্দশায় কালযাপন করতো। সোগানরা দেশের ভীষণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হওয়ায়, জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হলেন। ফলে, তাঁরা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতা ত্যাগ করলেন এবং জাপানের সিংহাসনে সম্রাটকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো।

প্রথম সম্রাটের নাম **মুৎসিহিতো**। তাঁর সিংহাসনে উপবেশন, জাপানী ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং এরই নাম, **মেইজি** পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'মেইজি' জাপানী শব্দ, তার অর্থ 'নবযুগ'। 'মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা' মানে আবার নবযুগের আরম্ভ। এবার মিকাডো বা সম্রাটের ক্ষমতা, আস্তে আস্তে বাড়তে স্থুরু করলো। দেশের লোকেরা অন্ধভাবে সামুরাইদের অনুসরণ না করে, দেশের রাজাকে সম্মান করতে শিখলো।

নবযুগ

বিদেশীরা জাপানে আসা-যাওয়া আরম্ভ করবার পর, জাপানীরা সেই সব দেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা আরম্ভ করলো। অন্য দেশের যেটি ভাল, সেটিকে নিজেরা গ্রহণ করতে লাগলো। এই সময় জাপানীরা **জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে** জোর আন্দোলন আরম্ভ করে দিল। সেই আন্দোলনের ধাক্কা জমিদারেরা সামলাতে পারলেন না, দেশ থেকে জমিদারী প্রথা উঠে গেল। কৃষকেরা হলো জমির মালিক।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্ত্তন হলো। এতদিন মিকাডো চলতেন সামুরাইদের পরামর্শে। এবার দেশে প্রজাদের প্রতিনিধি নিয়ে **পার্লামেণ্ট** গঠিত হলো। **প্রিন্স ইতো** দেশের শাসনসংস্কারের প্রথম খসড়া তৈরি করেন। এই শাসনসংস্কার অনেকটা প্রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত হলো। জাপানের শাসনসংস্কারে প্রজাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে লোক নিয়ে, একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে, মিকাডোকে পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা হলো। ঠিক হলো, মিকাডো এই সব মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করবেন, আর মন্ত্রীরা সব সময় তাঁদের কাজের জন্য এবং রাজাকে যে সব পরামর্শ দেবেন, তার ফলাফলের জন্য, পার্লামেন্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। তবে দেশের সামরিক বিভাগের উপর রাজার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রইলো।

সৈন্য-বিভাগ এবং নৌ-বিভাগ সম্বন্ধে মন্ত্রীরা, রাজাকে পরামর্শ দিতে পারতেন না, ঐ দুটি বিভাগ রাজা, প্রধান সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে চালাতেন। প্রধান সেনাপতিদের কোন কাজের জন্য, মন্ত্রীরা তাঁদের কৈফিয়ৎ তলব করতে পারতেন না।

নবযুগের আরম্ভের পর, জাপানীদের আর্থিক অবস্থাও অনেক ভাল হতে লাগলো। যারা দেশে কারখানা তৈরি করতো, কিংবা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতো, গবর্নমেন্ট থেকে তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা হতো। জাপানী চাষীদের যাতে শুধু জমির ফসলের আয়ের উপর নির্ভর করে থাকতে না হয়, সেজন্য তাদের রেশম-গুটির চাষ, ফল-ফুলের চাষ এবং নানারকম কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হলো। ঘরে বসে তারা কাপড়-বোনা

ওশাকা দুর্গ

এবং খেলনা, চীনা মাটির বাসন প্রভৃতি তৈরি করে, অবসর সময়ে টাকা রোজগার করতো।

এই নবজাগরণের পর, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান, বিভিন্ন উন্নতিকর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে, শীঘ্রই খুব ক্ষমতাপন্ন দেশ হয়ে উঠলো। চীন ছিল এই সময় অন্তঃকলহে দ্বিধাবিভক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য দেশগুলির অন্যায় হস্তক্ষেপ দ্বারা জর্জ্জরিত। জাপান ইতিমধ্যে, ইউরোপীয় দেশগুলির নীতি অবলম্বন করে প্রবল হয়ে উঠেছিল। শীঘ্রই সে চীনের দুর্ব্বলতা দেখে, নিজের শক্তি প্রসারতাকল্পে, তার সঙ্গে এক যুদ্ধ বাধালো এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে, অনায়াসে এই যুদ্ধ জিতে, চীনদেশের উপর তার ক্ষমতা-বিস্তারের সূত্রপাত করলো। এই যুদ্ধ ১৮৯৪-৯৫ সালের **চীন-জাপান যুদ্ধ** নামে খ্যাত। এই

যুদ্ধে জয়ের ফলে জাপান ফরমোজা ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করলো কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। জাপান অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির ন্যায় চীনে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আদায় করলো।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

জাপানের পাশেই, সমুদ্রের ওপারে, কোরিয়া দেশটি চীনের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল। রাশিয়ার নজর পড়লো এই কোরিয়ার উপর। চীন-জাপান যুদ্ধ-জয়ের ফলে জাপান, কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়াস্থিত **পোর্ট আর্থার** বন্দরে যে অধিকার লাভ করেছিল, রাশিয়া সেখানে বাধা দিল। জাপান বুঝতে পারলো যে, রাশিয়া যদি কোরিয়া দখল করতে পারে, তাহলে সেখান থেকে জাপানকেও সে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারবে; ঘরের এত কাছে একটা সাম্রাজ্যলোলুপ জাতিকে আসতে দিলে, ভবিষ্যতে তারও বিপদ ঘটতে পারে। তাই জাপান ঠিক করলো, রাশিয়াকে কোন মতেই কোরিয়া দখল করতে দেওয়া হবে না।
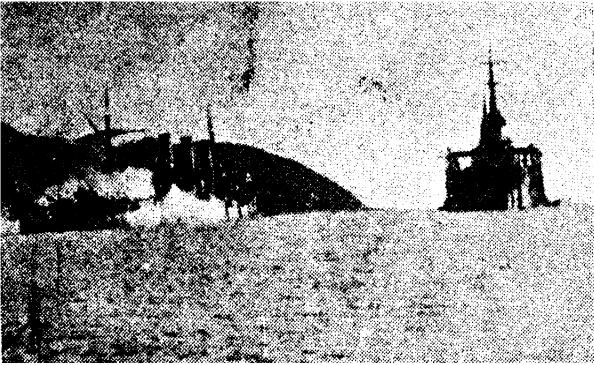
পোর্ট আর্থারে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ

চীনের রাজা তখন দুর্ব্বল, কোরিয়াকে পরের আক্রমণ হতে রক্ষা করবার ক্ষমতা তাঁর নাই। জাপান, চীনের রাজার হাত থেকে কোরিয়া কেড়ে নিল, কিন্তু তাকে জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তখনই করলো না। কোরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করে সে তার অভিভাবকত্ব আরম্ভ করে দিল।

কোরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি বিরাট ভূমিখণ্ড **মাঞ্চুরিয়াও** ছিল কোরিয়ারই মত চীনের একটি প্রদেশ। কোরিয়াকে স্বাধীন করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান, মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে, **লিয়াওটুং** নামক একটি উপদ্বীপ দখল করে নেয়। রাশিয়া এই ব্যাপারে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে জাপানের ব্যবহারের নিন্দা করতে আরম্ভ করলো। জাপান তখন লিয়াওটুং উপদ্বীপটি চীনকে ফিরিয়ে দেয়।

লিয়াওটুং-এর স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না। সে প্রতিবাদ করেছিল এই জন্য যে, কোরিয়া এবং লিয়াওটুং, এই দুটো জায়গা জাপানের হাতে থাকলে তার নিজের অসুবিধা। কাজেই জাপান চীনকে লিয়াওটুং ফিরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া এসে সেটা দখল করে নিল।

সাইবিরিয়ার পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে, রাশিয়ার ভাল বন্দর একটাও ছিল না। **ভ্লাডিভোষ্টক** নামে একটা বন্দর ছিল বটে কিন্তু তার সামনের সমুদ্র, শীতকালে জমে যেত বলে, সারা বছর জাহাজ-চলাচলে অসুবিধা হতো। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য রাশিয়া, লিয়াওটুং উপদ্বীপ দখল করেই সেখানে **পোর্ট আর্থার** এবং **ডেইরেণ** নামক দুটি বন্দর অধিকার করলো।

এই সব ব্যাপার নিয়ে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার ভীষণ ঠোকাঠুকি বেধে গেল। ১৯০২ সালে জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে নিল। ইংলণ্ডও রাশিয়ার অগ্রগতি মোটেই ভাল চোখে দেখছিল না। অবশেষে ১৯০৪ সালে রাশিয়া ও জাপানের বিরোধ চরমে উঠলো এবং শীঘ্রই দুই দেশের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাশিয়া ক্রমাগত হেরে যেতে লাগলো। এই যুদ্ধে জাপান বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়ে জয়লাভ করলো। এ'তে পৃথিবীর সব দেশের কাছেই জাপানের সম্মান অনেক বেড়ে গেল। এসিয়ার ক্ষুদ্র দেশ জাপানের পক্ষে অতবড় ইউরোপীয় রাজ্য রাশিয়াকে পরাজয়, এসিয়ার অবনত জাতিদের মনে প্রচুর উৎসাহ ও উন্মাদনা এনে দিল।

রাজনৈতিক দল

রাশিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে জাপানের শক্তি দ্রুত বাড়তে লাগলো। ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌ-শক্তি, সামরিক বিদ্যা সমস্ত দিকে আধুনিক উন্নত পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের অনুকরণ করে, জাপান অতি সত্বর একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হতে আরম্ভ করলো। পাশ্চাত্য দেশের নীতিতে জাপানে পার্লামেণ্ট ও রাজনৈতিক দল গঠিত হলো। কিন্তু জাপানের নবজাগরণে একটি অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমান জাপানে সংমিশ্রিত হয়েছিল একদিকে যান্ত্রিক ও শিল্পসভ্যতা, আর একদিকে মধ্যযুগীয় সামন্ত-আদর্শ, একদিকে পার্লামেণ্ট

শাসন এবং অপরদিকে স্বৈরাচার ও সামরিক কর্তৃত্ব। সম্রাটকে সম্মুখে প্রতীকস্বরূপ রেখে, তাঁর নামে কতিপয় অভিজাত পরিবার ও সামরিক শ্রেণী দেশে আধিপত্য চালিয়েছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয়

জাপানের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ হীরোবু [illegible]

কয়েকটি শক্তিশালী পরিবারই জাপানের শিল্পে ও রাজনীতিতে অটুট প্রভাব বিস্তার করেছে।

জাপানে প্রথমে দুটো রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল, একটির নাম **সেজুকাই** অপরটি **মিনসিতো**। সেজুকাই দলের ধারণা ছিল যে, বিদেশের সঙ্গে বেশী বাণিজ্য না করে, দেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে, ব্যবসা-বাণিজ্য

করাই ভাল। জাপানীরা কোন কারখানা তৈরি করলে অথবা চাষবাসের জন্য দরকার হলে, সরকারী তহবিল থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা, দেশের পক্ষে ভাল বলে তারা মনে করতো।

জাপানের প্রায় সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই দেশের চারটি পরিবারের হাতের মুঠোয় ছিল। তাদের নাম **মিৎসুই, মিৎসুবিশি, যাসুদা** এবং **সুমিতোমো।** এদের মধ্যে আবার মিৎসুই পরিবারটিই সবচেয়ে বেশী ধনী। এই মিৎসুই-বংশ সেজুকাই দলের নেতা, আর মিনসিতো দলের নেতা হলো মিৎসুবিশি-বংশ।

মিনসিতো দল চাইতেন যে, বিদেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য ক্রমেই বাড়তে থাকুক এবং বাণিজ্য চালাবার জন্য দেশে, বড় বড় জাহাজ তৈরি হোক। এঁদের এই মতের কারণও যে না ছিল, তা নয়। মিৎসুবিশিদের খুব বড় বড় জাহাজের কারখানা ছিল; কাজেই জাপান বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক দিলে, বেশী করে জাহাজ তৈরি হবে এবং এ'তে তাঁদের লাভ বেশী হবে, এই ছিল তাঁদের ধারণা।

সেজুকাই এবং মিনসিতো ছাড়া, জাপানের সৈন্য এবং নৌ-বিভাগের বড় বড় সেনাপতিরা মিলে, আর একটা দল গড়ে তুলেছিলেন। তার নাম সামরিক দল। জাপানে প্রথম পার্লামেণ্ট গঠিত হবার পর, সেজুকাই দলের হাতে দেশের শাসন-ভার চলে আসে। তারপরে প্রবল হয়ে উঠলো মিনসিতো দল; তারা সেজুকাইদের হাত থেকে দেশ-শাসনের দায়িত্ব কেড়ে নিল। ক্রমে সেজুকাই এবং মিনসিতো দুই দলই কোণঠাসা হয়ে গেল।

পরিশেষে দেশের শাসন-ভার এসে পড়লো সামরিক দলের হাতে। দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষা এঁদের মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের চার বছর আগে, কোরিয়াকে [illegible]ান তার নিজস্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। জাপানের উত্ত[illegible] **সাখালিন** নামে একটা দ্বীপ আছে, সেটা ছিল রাশিয়ার। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান, তার অর্দ্ধেকটা আদায় করে নেয়।

১৯১৪ সালে প্র[illegible] মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ামাত্র জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে, জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে চীনে জার্ম্মেণীর অধিকারভুক্ত সাণ্টুং প্রদেশস্থ কিয়উচউ দখল করে। এর অর্থ, এখন থেকে জাপান রীতিমত মূল চীন-ভূখণ্ডে প্রসার করতে সুরু করলো। অন্যান্য শক্তিরা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল দেখে জাপান ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চীনের উপর কুখ্যাত **একুশ দফা দাবী** চাপিয়ে দিল এবং তার কতকটা সে আদায় করেও নেয়। যুদ্ধের

পর কিছুদিন জাপান চীনের প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী-নীতি ও ১৯২২ সালের ওয়াশিংটন চুক্তির ফলে জাপান কয়েক বছর চুপচাপ থাকে, তবে ভিতরে ভিতরে তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান তীব্রবেগেই চলছিল।

অবশেষে সমস্ত ন্যায়, নীতি উপেক্ষা করে, জাপান ১৯৩১ সালে তুচ্ছ অজুহাতের উপর মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। সাংহাইর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেও চীনাদের উপর অযথা বর্ব্বরোচিত আক্রমণ চালায়। এই সময় চীনের বালক ও যুবকগণ নির্ভীক-ভাবে ও অসীম বীরত্বের সঙ্গে জাপানকে বাধা দিয়েছিল কিন্তু চ্যাং কাই-শেকের স্বার্থপর নীতির জন্য, তারা বিশেষ সফলতা অর্জ্জন করতে পারে নাই। জাপান মাঞ্চুরিয়া জয় করে সেখানে **মাঞ্চুকুয়ো** নামে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে।
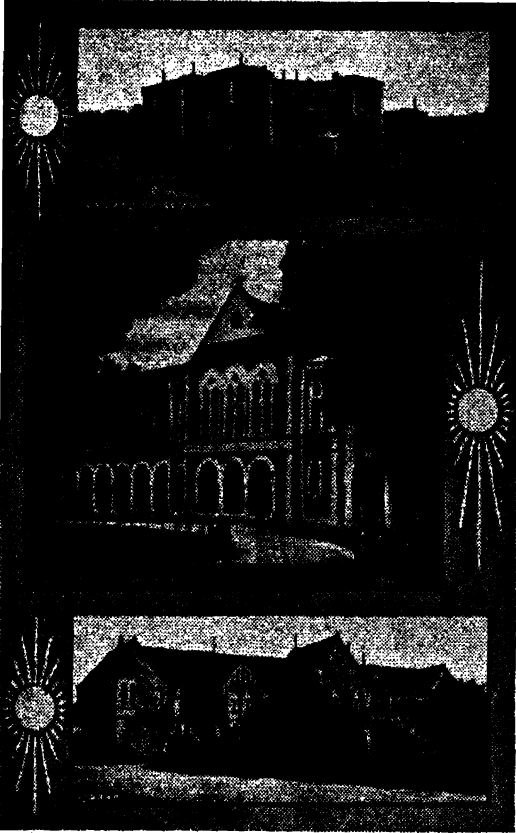
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৭২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত)

এত করে রাজ্য বিস্তার করেও জাপানের লোভ কমলো না। ১৯৩৭ সালে সমস্ত চীনদেশটিকে অধিকার করবার জন্য, অত্যন্ত অন্যায়রূপে সে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করলো। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করবার পর তার নিজেরও যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হলো; কিন্তু তবুও তার সাম্রাজ্যলোভ হ্রাস পেল না। চীনের বিভিন্ন দল এই সময়ে তাদের বিভেদ ভুলে জাপানকে জোর বাধা দিয়েছিল ও জাপানের মাল বয়কট করে তাকে খুব কাবু করেছিল। ভারত তখন নানাভাবে চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখায় ও জাপানের নির্ম্মম আক্রমণ-নীতির নিন্দা করে।
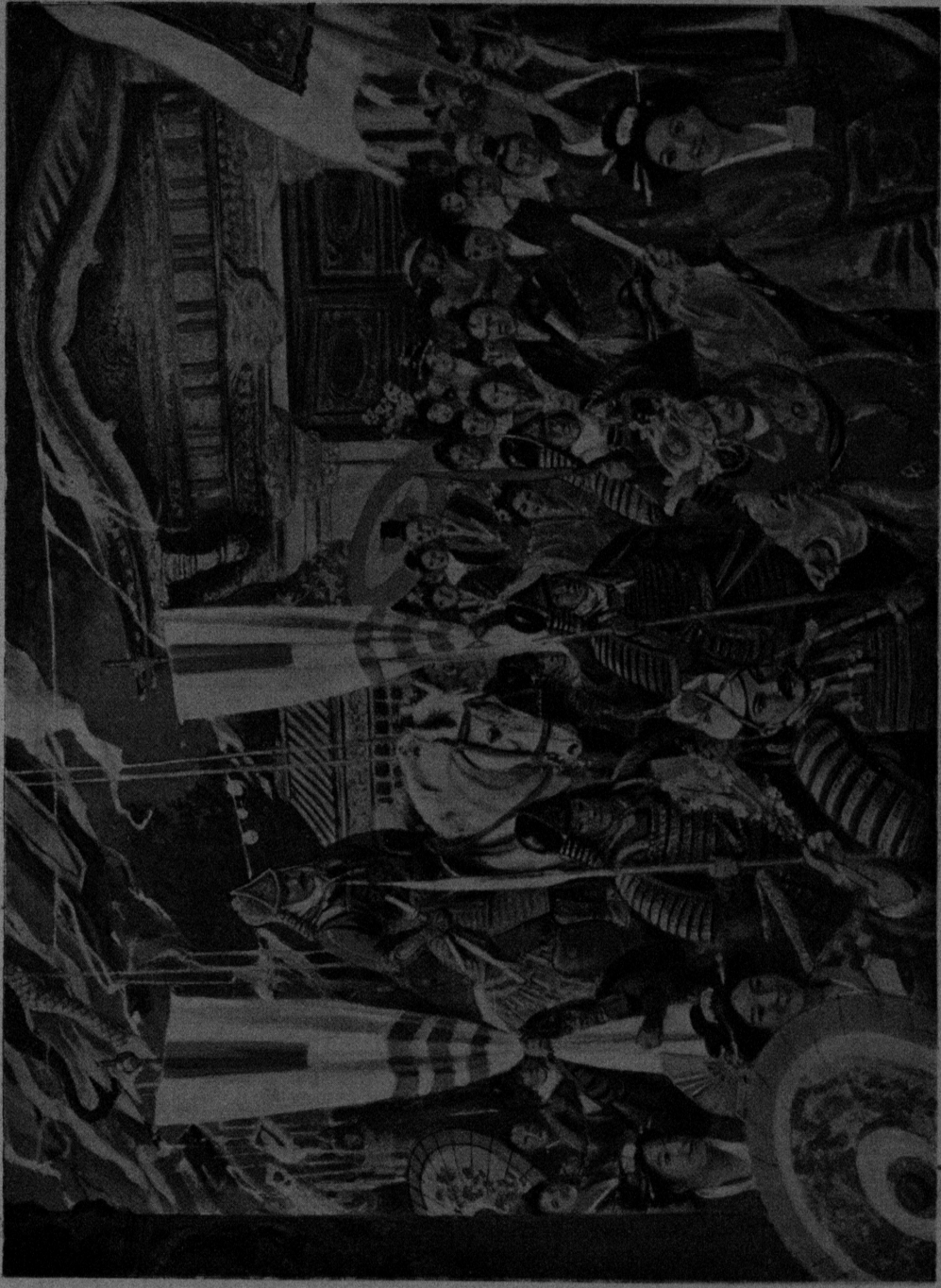
জাপানের প্রথম শোগান জোরিতোমার অভিষেক-শোভাযাত্রা।

দেশের উন্নতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পরের রাজ্য গ্রাস করবার লোভ, জাপানের খুব বেশী ছিল; কিন্তু তাই বলে, নিজের দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতেও সে ভোলে নাই। ক্রমে, জাপানের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির খুব উন্নতি হয়। দেশের শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও তারা যথেষ্ট চেষ্টা করে।

জাপানের মৃৎশিল্প

জাপানের লোকসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে। এর জন্য তাদের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। জাপানীদের সাম্রাজ্য-বিস্তার প্রয়াসের এটা একটা বড় কারণ।

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে জাপানের খুব লাভ হয়েছিল। সেই সময় সে, দেশে খুব বড় বড় অনেক কল-কারখানা স্থাপন করে দেশের অনেক লোকের আয়ের ব্যবস্থা করে। জাপানী কাপড়, জাপানী সিল্ক, জাপানী শাল-আলোয়ান, খেলনা, চীনামাটির বাসন, এমন কি, লোহার কলকব্জা পর্য্যন্তও জাপানীরা, পৃথিবীর সর্ব্বত্র চালান দিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করে।

এইভাবে জাপানের শিল্প-সমৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ার ফলে জাপানের অহমিকা ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। ফলে পৃথিবীর সব-কিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান করা হয়ে উঠলো তার পক্ষে স্বাভাবিক—আর তাই অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নামে পৃথিবীর এক ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে আসে। জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতির ফলে ইউরোপের অনেক দেশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তখনই তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধকালে, ইন্দোচীন এবং ব্রহ্মদেশ, এই দুই দেশের ভিতর দিয়ে চীন-সরকার, অস্ত্রশস্ত্রাদির সরবরাহ লাভ করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মেণীর হাতে ফ্রান্স পরাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান ফরাসী সরকারের নিকট দাবী করলো যে, ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীনের ভিতর দিয়ে এই **সরবরাহ বন্ধ** করতে হবে। পেতাঁার তাঁবেদার সরকার তখনই সম্মত হলো এই প্রস্তাবে। তখন জাপান ইংরেজ সরকারের কাছেও দাবী পাঠালো যে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়েও অনুরূপভাবে রাস্তা বন্ধ করতে হবে। ইংরেজরা তখন যুদ্ধে বিব্রত, কাজেই তারা জাপানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করলো না। তারা তিন মাসের জন্য বর্ম্মা রোড বন্ধ করে দিল।

তিন মাস পরে এই পথ আবার মুক্ত করে দিল ইংরেজ সরকার। এতে জাপান রুষ্ট হলো। ১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, সে জার্ম্মেণী ও ইতালির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলো। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী সামরিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়েই, একযোগে ও একলক্ষ্যে কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হলো এই তিনটি দেশ।

এই সন্ধির বলে জাপান সুদূর প্রাচ্যে একাধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে, এই ছিল তার আশা; কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র যা'তে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে কোনমতে জড়িয়ে না পড়ে, তারই জন্য প্রাণপণ চেষ্টার অন্ত ছিল না জাপানের; কিন্তু তার আত্মম্ভরিতা তখন এতই প্রবল যে, জাপান অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করতো যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার উন্নতির অন্তরায় হলে, তাকেও সে সহজেই পর্য্যুদস্ত করতে পারবে।

ফলতঃ জাপ-সরকারের মতিগতি উত্তরোত্তর এতই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলো যে, ১৯৪১, ৬ই ডিসেম্বর তারিখে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের **প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট** শান্তি কামনা করে, সরাসরি জাপ-সম্রাটের কাছে এক ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ করলেন। কিন্তু তা'তে ফল কিছুই হলো না।

কোন চরম-পত্র প্রদান না করেই, ৭ই ডিসেম্বর সকাল ৭টায় জাপানী বিমানবহর বোমাবর্ষণ করলো মার্কিণ-অধিকৃত **পার্ল হারবার** বন্দরে। ম্যানিলাস্থিত মার্কিণ ঘাঁটিও আক্রান্ত হলো।

এইসব ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার সম-সময়েই, জাপান যুদ্ধঘোষণা করলো

ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ৭ই তারিখেই রাত্রে সে সিঙ্গাপুরে বোমাবর্ষণ করলো, সঙ্গে সঙ্গে জাপ-সৈন্য মালয় ও থাইল্যাণ্ডে অবতরণ করে এক চমকপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি করলো।

ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, সবাই **একযোগে যুদ্ধঘোষণা** করলো জাপানের বিরুদ্ধে। জাপ-সৈন্য, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্থানে স্থানে অবতরণ করলো এবং তারা ইংরেজ জাহাজ **"প্রিন্স অব ওয়েলস"** ও **"রিপাল্‌স্"** ডুবিয়ে দিল।

জাপ-সরকার হংকং বন্দরকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করলো। সে আদেশ প্রতিপালিত হলো না। তখন জাপ-সৈন্য জলে, স্থলে ও ব্যোম-পথে
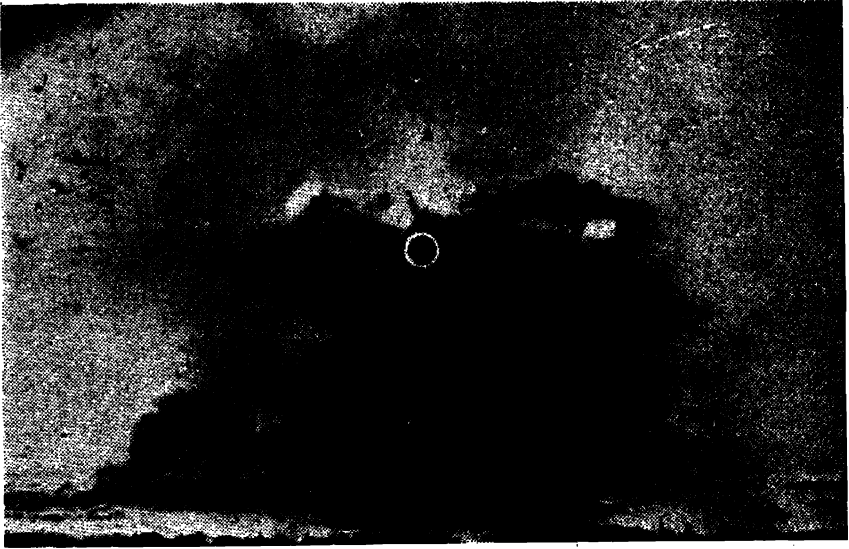
পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ

আক্রমণ করলো হংকং। ২৫শে ডিসেম্বর হংকং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। মালয়ের বহু স্থানে, বোর্ণিওতে এবং পেনাংয়ে যুদ্ধ চললো। সর্ব্বত্রই মিত্রশক্তিকে পশ্চাৎপদ হতে হলো।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী, জাপ-সৈন্য **ম্যানিলা** অধিকার করলো। তারপর তারা **সিঙ্গাপুরে** বোমাবর্ষণ সুরু করলো।

বাতান দ্বীপে, জেনারেল ম্যাকআর্থারের সৈন্যদলের উপর ভীষণ আক্রমণ করলো জাপ-সৈন্য। জাপানের প্ররোচনায় শ্যামদেশও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলো। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হতে

লাগলো। **রেঙ্গুনে** বোমাবর্ষণ করতে থাকলো জাপানীরা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী **সিঙ্গাপুরের পতন** হলো।

(এই সময়ে তারা সিঙ্গাপুরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য ও সেনাপতিগণকে **আজাদ হিন্দ্ বাহিনী** গঠন করবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগলো। ৭ই মার্চ রেঙ্গুন পরিত্যাগ করলো ইংরেজ-সেনা। এদিকে জাভাও আত্মসমর্পণ করলো জাপ-সৈন্যের কাছে। ১২ই তারিখে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইংরেজ-সৈন্য অপসৃত হলো। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক **নেতাজী সুভাষচন্দ্র**, আন্দামান ও নিকোবর অধিকার করে, তাদের নতুন নামকরণ করলেন **'স্বরাজ'** ও **'শহীদ' দ্বীপপুঞ্জ**।)

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত, বাতান উপদ্বীপে, জাপ-সৈন্যের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে উঠলো এপ্রিলের প্রথম দিকেই। মান্দালায় বিধ্বস্ত হলো বোমাবর্ষণে। তারপর সিংহলের রাজধানী কলম্বো, এবং তারপর মাদ্রাজ প্রদেশের বন্দরসমূহ।

১২ই এপ্রিল ইরাণ (পারস্য) জাপানের সঙ্গে কূটনীতিক বন্ধন ছিন্ন করলো।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের নিকটে মার্কিণ নৌ ও বিমানবহর, জাপানী নৌ-বাহিনীকে আক্রমণ করলো। **কোরাল উপসাগরে** জাপানীদের সঙ্গে নৌযুদ্ধ সুরু হলো। তারা উত্তর দিকে অপসৃত হতে লাগলো ধীরে ধীরে। ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো জাপানী নৌবহর।

জাপানীরা চট্টগ্রাম ও আসামে বোমাবর্ষণ করলো। এ আক্রমণের সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কোন সংস্রব ছিল না।

চট্টগ্রামে আবার বোমা পড়লো। **কলকাতায় প্রথম বোমাবর্ষণ** হলো ২০শে ডিসেম্বর।

১৯৪৩ সালে চীন-যুদ্ধে জাপানীদের **বিপর্য্যয় সুরু** হলো। বর্ম্মার রথেডংয়ে তুমুল যুদ্ধ হলো ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে।

মে মাসের প্রথমে বর্ম্মা-যুদ্ধে কিছু সুবিধা হলো জাপ-সৈন্যের। **মংদে-বুথিডং** অঞ্চল থেকে মিত্রশক্তি বারবার অপসৃত হলো।

১২ই অক্টোবর **রবাউল** বন্দরে মিত্রশক্তি, প্রবল বিমান আক্রমণ চালিয়ে ১৭৭ খানা জাপানী বিমান নষ্ট করে দিল। তা ছাড়া, বহু রণতরী ও বাণিজ্য-জাহাজ ধ্বংস হলো জাপানীদের।

১৯৪৫ সালের প্রথম কয়েক মাস, মিত্রশক্তির মনোযোগ প্রধানতঃ জার্ম্মেণীর দিকেই নিবদ্ধ থাকায় সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে চাঞ্চল্যকর

পরিণতি কিছু ঘটতে পারেনি। তবে মার্কিণ সেনাপতি **ম্যাকআর্থার** সর্ব্বত্রই জাপ নৌ ও বিমানবহরের শক্তিকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করে আসছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী **আইওজিমা** অধিকৃত হলো। এপ্রিলের মাঝামাঝি **ওকিনাওয়াতে** হলো তুমুল যুদ্ধ। ৬০০০০ জাপ-সৈন্য মার্কিণ অগ্রগতির প্রতিরোধ করলো। তাদের কামানের বহর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানে যুদ্ধ চললো ৮২ দিন। অবশেষে ওকিনাওয়া অধিকৃত হলো।

নাগাসাকি ও হিরোসিমা বন্দর আণবিক বোমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে

এদিকে চীনে অবস্থিত জাপ-সৈন্য ক্রমে ক্রমে পরাজিত হচ্ছিল। চীনা সৈন্যদল মার্কিণ সমর-শিক্ষকদের কাছে আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করে, জাপানীদের সমকক্ষ হয়ে উঠলো। তারা **কোরেলিন** থেকে জাপ-সেনাদের বিতাড়িত করলো ২৯শে জুলাই।

আবার **রাশিয়া** ওদিকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলো। দ্রুতগতিতে মাঞ্চুরিয়ায় এসে উপস্থিত হলো রুশ-বাহিনী। জাপ-নিয়ন্ত্রিত মাঞ্চুকুয়ো-সরকারের পতন হলো। মাঞ্চুকুয়ো সম্রাট ছিলেন জাপানের ক্রীড়াপুত্তলী, তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল রুশেরা। রুশ-সেনা জাপানে উপস্থিত হলো।

এদিকে মহাযুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি ঘটাবার জন্য **আণবিক বোমা** নিক্ষেপ করলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** বন্দরে।

বন্দর দুটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই সর্ব্বনাশা অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার আর কোন উপায় রইলো না জাপানের। জাপ-সম্রাট হিরোহিতো, নিজে অগ্রসর হয়ে সন্ধি প্রার্থনার উপদেশ দিলেন মন্ত্রিসভাকে। সেই অনুসারে টোকিও উপসাগরে, "মিসৌরী" জাহাজে মিত্রশক্তির কাছে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করলো জাপান (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)।

জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো

তারপর ৯ই সেপ্টেম্বর, চীনস্থিত দশ লক্ষ জাপ-সৈন্য, চীনা সেনাপতি হো-ইং-চীনের কাছে নানকিং সহরে বিনাসর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ করলো।

মিত্রশক্তি জাপানের উপর অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার করলো। হিরোহিতোকে সিংহাসনচ্যুত করা হলো না। মিত্রশক্তির পক্ষ হতে জেনারেল ম্যাকআর্থার হলেন জাপানের শাসনকর্ত্তা। তাঁর নিয়ন্ত্রণে জাপ-মন্ত্রিসভা আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী **তোজো** ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ যুদ্ধাপরাধী হিসাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। জাপানীরা, যুদ্ধের পর থেকে এখনও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীনেই, নিজেদের দেশের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জাপান জেনারেল ম্যাকআর্থারের নির্দ্দেশে, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে এক গণতান্ত্রিক শাসন সংবিধান রচনা করেছে। আমেরিকা দাবী করে যে এই নতুন সংবিধানের প্রেরণায় জাপানীদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং তাদের সামরিক মনোবৃত্তির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমেরিকার সাহায্যে আজকাল জাপানের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা হয়েছে বটে কিন্তু জাপানের জনসাধারণের দুর্দ্দশার লাঘব হয় নাই। জাপানের শিল্পে, বাণিজ্যে এখনও আমেরিকাই আধিপত্য করে।

যুদ্ধোত্তর যুগে, ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধিতা ক্রমেই তীব্র হয়ে ঘনিয়ে উঠছে। এই বিরোধ-দ্বন্দ্বে আমেরিকা, দূরপ্রাচ্যে জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঘাঁটিরূপে পরিণত করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে জাপানীদের সামরিক শৌর্য্যকে জাগিয়ে তোলার জন্য আবার জোর চেষ্টা চলছে। জাপানের লোকেরা কিন্তু অনেকেই এই নীতি এখন আর পছন্দ করে না।

রাশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের অমতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সানফ্রান্সিসকোতে রাষ্ট্রপুঞ্জের এক বৈঠকে (১৯৫১ খৃঃ) **জাপ-শান্তিচুক্তি** প্রস্তাব পাশ করিয়েছে। এই চুক্তির বলে জাপানে আমেরিকার কর্তৃত্ব ও সুবিধা আরও বেড়েছে। আমেরিকা মনে করে এখন সে জাপানকে রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে বেশী কাজে লাগাতে পারবে। ভারত ও এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশ আমেরিকা-নিয়ন্ত্রিত জাপানী চুক্তির ঘোর প্রতিবাদ করেছে। আমেরিকা এখন কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টায় আছে, তা'হলে জাপানের বাণিজ্যিক ক্ষতি হবে এবং এর ফলে আমেরিকার বিপক্ষে জাপানীদের মনোভাব জেগে উঠতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানে কয়েকটি মার্কিণ-বিরোধী হাঙ্গামাও হয়ে গিয়েছে। আমেরিকা অবশ্য স্বভাবতই যুক্তি দেখায় যে এই সব হাঙ্গামার মূলে কম্যুনিষ্টদের উস্কানি ছিল তবে আন্দোলনগুলির মধ্যে যে বহু জাপানী লিপ্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান জাপানী সরকার আমেরিকার নিয়ন্ত্রণেই তাদের স্বাধীনতা চালাচ্ছে। এই সরকারী ব্যবস্থার পশ্চাতে কতদূর জনমতের সমর্থন আছে তা বলা কঠিন। ১৯৫২ সালের নির্ব্বাচনের ফলে প্রধানমন্ত্রী সিজেরু জোসিদার নেতৃত্বে উদারনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই দল এখনও কর্ত্তৃত্ব চালাচ্ছে। কোরিয়া যুদ্ধের সুযোগে এশিয়ার বাজারে জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের আবার প্রসারতা সুরু হয়েছে।

আরবদেশের পশ্চিমে মিশর, উত্তরে সিরিয়া এবং ইরাক (মেসোপোটেমিয়া), একটু পূবে পারস্য অথবা ইরাণ এবং খানিকটা দূরে, উত্তর-পশ্চিমে এশিয়া-মাইনর। আকারে আরবদেশ ইউরোপের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু অধিকাংশই তার ফাঁকা মরুভূমি। দেশটির তিন দিকে শুধু সমুদ্রের তীরে তীরে এবং উত্তর দিকের খানিকটা জায়গায় গাছপালা জন্মায়। সেই কয়টি জায়গাতেই সহর এবং গ্রাম গড়ে উঠেছে। এইগুলি নিয়েই আরবদের দেশ।

আরবদের মধ্যে দুই রকম লোক ছিল। এক ধরণের আরব, ঘরবাড়ী তৈরি করে, চাষ-আবাদের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতো। আর এক ধরণের আরব ছিল যারা, মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াতো এবং তার মধ্যে কোন লোককে পেলেই তার যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করে, তারই দ্বারা জীবনধারণ করতো। আরবদের এক সহর থেকে আর এক সহরে প্রায়ই মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে হয়, কাজেই মরুভূমির দস্যু-আরবদের হাতে পড়বার ভয় খুব বেশী থাকে। মরুভূমির এই আরবদের বলে **বেদুইন**। এদের কোন ঘরবাড়ী নাই, যেদিন যেখানে রাত হয়, সেদিন সেখানেই তাদের বাস।

আরবরা খুব দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক। ঝগড়া, মারামারি এদের মধ্যে লেগেই ছিল। ঘোড়ায় চড়ে, তীর-ধনুক নিয়ে, কত যে যুদ্ধ এরা পরস্পরের সঙ্গে করেছে, তায় ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাই বলে আরবদের অসভ্য বলা

চলে না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল। মাঝে মাঝে এক একটি সহরে বিরাট মেলা বসতো। সেই মেলায় দূর-দূরান্তর থেকে আরবরা আসতো। সেখানে কবিতা-প্রতিযোগিতা হতো। যাদের কবিতা সব চেয়ে ভাল হতো, তারা পুরস্কার পেত। অঙ্ক-শাস্ত্রের চর্চ্চাতেও আরবরা খুব উন্নতি করেছিল। দুই চাকা ও চার চাকার গাড়ী, আরবরা সবার আগে আবিষ্কার করেছিল। সূর্য্যঘড়ি আরবদেরই আবিষ্কার।

যদিও আরব, পশ্চিম-এশিয়ার সভ্য-দেশগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল, তথাপি পুরাকালে ওদেশে সভ্যতার বিশেষ কিছু উন্মেষ হয় নাই।

আরবের মরুভূমিতে সার্থবাহক দল

আরবরা প্রতিবেশী দেশগুলিকে জয় করবার চেষ্টা করেনি; বিদেশীদের পক্ষেও, মরুভূমির এই দুঃসাহসিক, যাযাবর জাতি আরবদের জয় করা খুব সহজ হয়নি। আরবদেশ সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল না এবং বিদেশীদের প্রলুব্ধ করার মত কোন আকর্ষণও ওদেশে ছিল না। সহরের মধ্যে ছিল দু'টি—মক্কা ও জেথ্রিব (মদিনা)। দেশের অন্যান্য প্রায় সব স্থানেই ছিল বিস্তৃত মরুভূমির উপরে নির্ম্মিত সাধারণ কুটীর।

হজরত মহম্মদের অভ্যুত্থানের সময় আরবরা, বিভিন্ন কলহপরায়ণ জাতি, দল ও পরিবারে বিভক্ত ছিল। ঐ সময়েও মক্কা সহর তাদের ধর্ম্মস্থান ছিল। মক্কায় অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। আরবরা বৎসরে একবার সেখানে তীর্থ করতে যেত।

এ একটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে-আরব জাতি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যুগ যুগ ধরে ঘুমিয়েছিল, তারা সপ্তম শতাব্দীতে, ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, কিরূপে নতুন উদ্দীপনা ও

বেদুইন

উন্মাদনায়, জয়ের গৌরবে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে এলো একটা ব্যাপক উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও দুর্জ্জয় সাহস। আরবদের এই মহাজাগরণের জন্য যে মহাপুরুষ দায়ী, তাঁর নাম **হজরত মহম্মদ।**

হজরত মহম্মদ

আরবদের মাঝে, **মহম্মদ** নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। **মক্কা সহরে** তাঁর জন্ম। মক্কা সহরের একটি স্থানে ৩৬০টি পাথরের মূর্ত্তি **ছিল,** আরবরা এই মূর্ত্তিগুলোকে দেবতা বলে পূজা করতো। মূর্ত্তিগুলি যে জায়গায় থাকতো, সেখানকার নাম ছিল **কাবা।** মহম্মদ যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারের হাতে ছিল এই কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার। বৎসরের একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে, চারিদিক থেকে আরবরা মক্কায় কাবা দর্শন করতে এবং এই সব মূর্ত্তির পূজা দিতে আসতো।

মহম্মদ ছেলেবেলা হতেই, কাবার কাছে থেকে আরবদের এই পূজা দেখতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবর জানবার জন্য তাঁর তখন থেকেই অসীম আগ্রহ ছিল। অন্য দেশের লোকেরা কিভাবে তাদের দেবতার পূজা দেয়, সেই সব জানবার জন্য তাঁর খুব কৌতূহল হলো। বিদেশে খৃষ্টান, ইহুদী, পারসিক প্রভৃতি নানা জাতির লোকের সঙ্গে মিশে, তিনি তাদের ধর্ম্ম
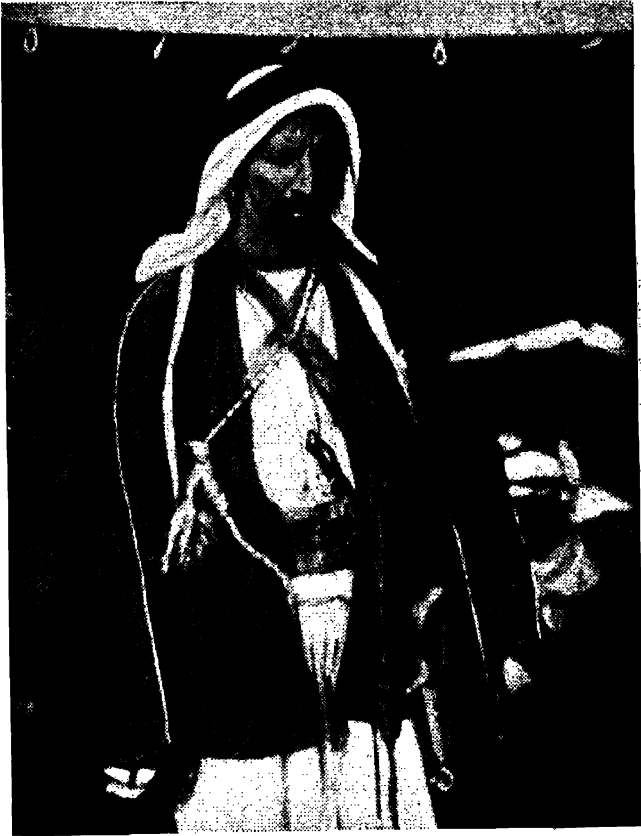
জাতীয় পোষাকে একজন আরব

সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। খৃষ্টান এবং পারসিকেরা এক ভগবানের উপাসনা করে, কোন মুর্ত্তির পূজা তারা করে না, এই মহম্মদের কাছে খুব ভাল লাগলো। তাঁর ধারণা হলো, মুর্ত্তিপূজা ভাল নয় এবং মক্কার কাবায় মুর্ত্তিপূজা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

মহম্মদ দিনরাত শুধু এই সব কথাই চিন্তা করতেন। এমনি যখন তাঁর মনের অবস্থা, তখন একদিন তিনি এক অপূর্ব্ব সত্য উপলব্ধি করলেন। তাঁর মনে বিশ্বাস হলো যে, ঈশ্বর এক; এই ঈশ্বরই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র,

জলবায়ু, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আলাদা এক একটি দেবতার মূর্তি পূজা করলে, এই এক এবং অনন্ত ঈশ্বরকে জানা যাবে না। তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হলো যে, আরবরা ৩৬০টি দেবতার মূর্তিপূজা করে অন্যায় করছে।

এই সত্য উপলব্ধি করবার পর মহম্মদ, তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সবাইকে সে কথা জানালেন এবং বললেন যে, এই নতুন সত্য প্রচারের

আরবের তাঁবু

জন্য, তিনি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন। কেহ কেহ তাঁর কথা বিশ্বাস করলো, অনেকে করলো না।

আবুবকর নামে মক্কার একজন ধনী বণিক, এই নতুন সত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরেই তাঁরা, আরবদের মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করতে লাগলেন এবং এক ঈশ্বরের উপাসনায় মন দেওয়া উচিত, এই কথা প্রচার করতে সুরু করলেন। আরবেরা এতে দস্তুরমত চটে গেল; মহম্মদকে রাস্তায় দেখতে পেলেই তারা, তাঁকে টিটকারী দিত, তাঁকে লক্ষ্য করে নোংরা জিনিষ ছুঁড়তো এবং তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছিল। মহম্মদ সে সব গ্রাহ্যও করলেন না।

মহম্মদের বিপদ কিন্তু কাটলো না। তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁকে হত্যা করবার জন্য, আবার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি তখন আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে, **মদিনা** নামক সহরের দিকে রওনা হলেন।

মক্কা থেকে মদিনা ২৭০ মাইল দূর, মরুভূমির উপর দিয়ে তার পথ। মদিনার লোকেরা মক্কায় কাবা দর্শনে এসে, মহম্মদের নতুন সত্যের কথা শুনে, অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অনেক কষ্টে মরুভূমি পার হয়ে,
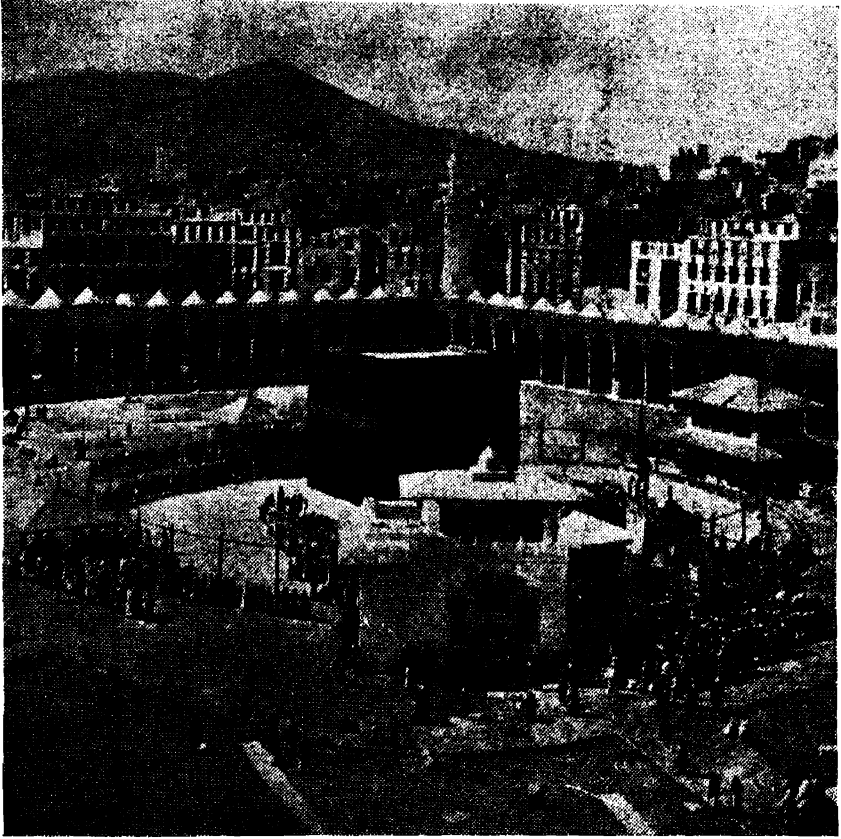
কাবা মসজিদ

যখন তিনি মদিনায় এসে পৌঁছালেন, মদিনার লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিল। মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় গমনকে **হিজিরা** বলে। এর তারিখ ৬২২ খৃঃ। এই সময় হতে মুসলমানদের বৎসর গণনা করা হয়। মদিনার যে-সকল লোক মহম্মদকে সাহায্য করেছিল তাদের নাম হলো আন্‌সার বা সাহায্যকারীর দল।

আরবী ভাষায় ঈশ্বরকে বলে আল্লা। মহম্মদ আল্লার উপাসনার জন্য, মদিনায়

একটি মসজিদ তৈরী করলেন। মাটি এবং পাথর দিয়ে, শিষ্যদের সাহায্যে, মহম্মদ নিজের হাতে এই মসজিদটি নির্ম্মাণ করেছিলেন। দিনের মধ্যে পাঁচবার মদিনার লোকেরা এই মসজিদে আসতো প্রার্থনা করতে। এইখানে থেকেই মহম্মদ তাঁর নতুন সত্যকে **ইসলাম** ধর্ম্ম বলে ঘোষণা করেন। 'ইসলাম' আরবী শব্দ ; তার মানে হচ্ছে, 'ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করা'।

মদিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, মহম্মদ ঠিক করলেন, আরবদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করবার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, শুধু মুখের কথায় আরবদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করা সম্ভব হবে না। এই বুঝে, মহম্মদ অনেক লোকজন নিয়ে, মক্কার দিকে রওনা হলেন সবার আগে মক্কার লোকদের ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য।

কয়েক বৎসর ধরে মক্কার লোকদের সঙ্গে মহম্মদের যুদ্ধ চললো। অবশেষে মক্কার লোকেরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলো শুধু একটি সর্ত্তে যে, মক্কা সহরকেই তিনি তাঁর ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র করবেন। মূর্ত্তিপূজার আমলে, দূর থেকে আরবরা যেমন তীর্থ করতে মক্কায় আসতো, ইসলাম ধর্ম্মের প্রচারের পরেও যেন তেমনি, মুসলমানেরা তীর্থ করতে মক্কাতেই আসে। মহম্মদ এতে রাজি হলেন। মক্কায় প্রবেশ করে, তিনি শিষ্যদের নিয়ে কাবায় গেলেন এবং শিষ্যদের সাহায্যে, সেই ৩৬০টি মূর্ত্তি বাইরে সরিয়ে দিলেন।

মক্কা জয় করবার পর মহম্মদের ধারণা হলো যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করে, সব দেশে ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু তখনও তিনি মক্কা এবং মদিনা, এই দুটি সহর ছাড়া, আরবদেশের আর কোথাও তাঁর নতুন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। তাই তিনি সবার আগে আরবদেশ জয় করতে মন দিলেন। আরব-জয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে, ৬২ বৎসর বয়সে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

ইসলাম ধর্ম্মের বিস্তার

মহম্মদের মৃত্যুর পর, আবুবকর মুসলমানদের খলিফা নিযুক্ত হলেন। মুসলমানদের ধর্ম্মগুরুকে বলে **খলিফা**। আরবে ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পর, আরবরা **জেরুজালেম** এবং **সিরিয়া** জয় করলো। তারপর তারা পারস্য আক্রমণ করে, সেখানকার লোকদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করলো। পারস্যের পর, আরবরা মিশর জয় করে, তথাকার লোকদেরও ইসলাম ধর্ম্মে

দীক্ষিত করলো। মিশরের অতি প্রাচীন সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল, তার জায়গায় উদিত হলো নতুন ইসলাম সভ্যতা ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে। উত্তর-আফ্রিকার সবখানি জায়গা জয় করে আরবরা সেখানেও ইসলামের প্রতিষ্ঠা করলো। তারপর তারা জয় করলো **স্পেন ও পর্ত্তুগাল**। যে আরব সেনাপতি স্পেন জয় করেন তাঁর নাম **তারিক**। তাঁর নাম থেকেই জিব্রালটার নাম হয়েছে।

আরবদের এই অভিযান প্রতিহত হয়েছিল শুধু দুটি জায়গায়।
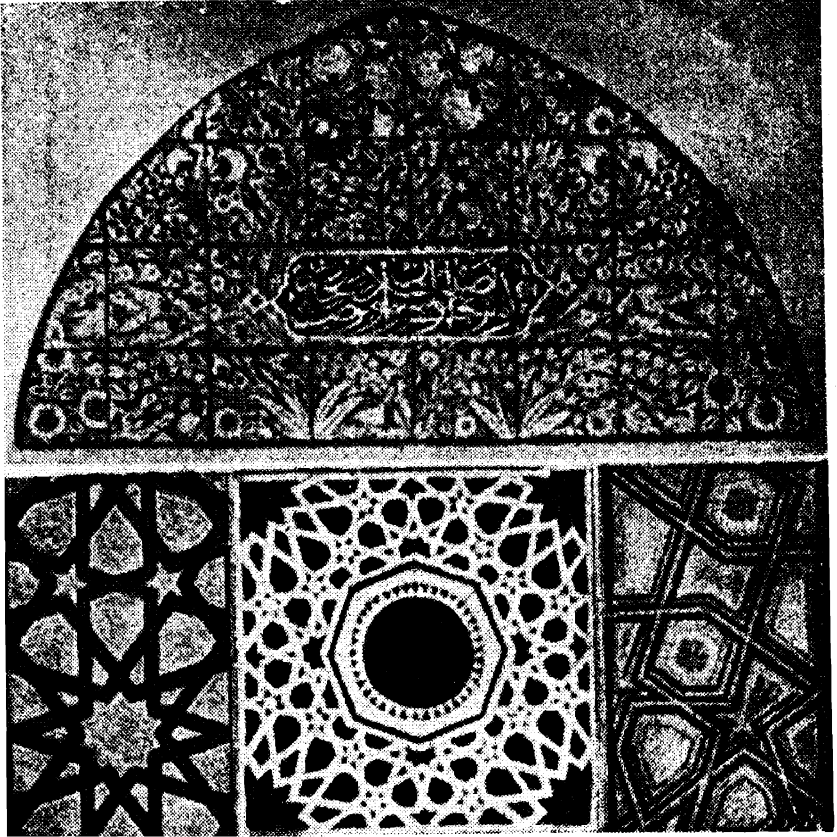
সারাসেনস্-স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন

কনস্টান্টিনোপল সহর আক্রমণ করে অনেক যুদ্ধের পরেও তারা সেটি জয় করতে পারে নাই, এবং স্পেন জয় করবার পর, দক্ষিণ-ফ্রান্সে টুরস্ নামক যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্রাঙ্ক বীর, চার্লস মারটেলের কাছে তারা পরাজিত হয় (৭৩২ খৃঃ)। এই পরাজয়ের ফলেই ইউরোপ আরবদের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়। আরবরা এ-যুগে ভারত আক্রমণ করে সিন্ধুদেশে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

করেছিল। এর বেশী তারা আর এগোয়নি অথবা রাজপুত-শৌর্য্যের জন্য এগুতে পারেনি। পরে তুর্কী-মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে, আরবদের বিজয়-অভিযান, দুর্ব্বার গতিতে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শীঘ্রই মরুভূমির যাযাবর জাতি, একটা বিরাট সাম্রাজ্যের গর্ব্বিত অধিকারীতে পরিণত হলো। পশ্চিমে, সুদূর স্পেন থেকে পূর্ব্বে মঙ্গোলিয়া ভূখণ্ড পর্য্যন্ত তাদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হলো। মরুভূমিবাসী বলে, আরবদের আর একটি নাম, **সারাসেন্‌স্।** আগে তারা সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো। সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারস্য ও কনষ্টান্টিনোপলের প্রভাবে, তারা বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় হয়ে উঠলো। এখন তাদের মধ্যে, শক্তিশালী খলিফা-পদগৌরবের জন্য বিবাদ-বিসংবাদ সুরু হলো। এই খলিফা ছিলেন একাধারে, আরব-সাম্রাজ্যের সম্রাট ও ধর্ম্মগুরু।

আবুবকর এবং **ওমর** যখন খলিফা ছিলেন তখন আরবদের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও গণতান্ত্রিক-ভাব জাগ্রত ছিল। আরব-সাম্রাজ্যের প্রথম একশত বৎসর পর্য্যন্ত **উম্মিয়াদ**-বংশ রাজত্ব করে। সিরিয়ার দামাস্কাস নগরী তাদের রাজধানী ছিল। এখানে ছিল অনেক সৌধ, মসজিদ, কৃত্রিম ঝরণা ও উদ্যান। এই সময় আরবরা, সারাসেন্‌স্-স্থাপত্য নামে একরূপ সহজ শিল্পকলার প্রচলন করে।

উম্মিয়াদ-বংশের পর, **আব্বাসাইড**-বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আরবরা স্পেনে যে রাজ্য ও সভ্যতা স্থাপিত করেছিল, সেখানে উম্মিয়াদ-বংশই মূল আরব-রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে, স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে থাকলো। উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান রাজ্যসমূহও আব্বাসাইড-বংশের অধীনতা মানলো না।

হারুন অল-রসিদ

আব্বাসাইড-বংশের খলিফাগণ সমস্ত মুসলমান জগতের অধীশ্বর রইলেন না বটে কিন্তু তাঁরাও বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। তাঁদের ক্ষমতাও ছিল অসীম। এই বংশের আমলে, আরবদের রাজধানী, ইরাক দেশে, টাইগ্রিস নদীর তীরে, **বাগদাদে** স্থাপিত হয়েছিল। এটি ছিল অসংখ্য সৌধমণ্ডিত এক প্রকাণ্ড নগর। এতে ছিল অনেক বড় বড় অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, দোকান এবং অসংখ্য সুন্দর রাস্তা ও উদ্যান। নগরের বণিকেরা, পূর্ব্বে

ভারতবর্ষ ও অপরাপর দেশ এবং পশ্চিমে ইউরোপের সঙ্গেও জোর ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো।

বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে হারুণ অল-রসিদের নাম সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি ৭৮৬-৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর দরবারে, চীনের সম্রাট ও পশ্চিম-ইউরোপের সম্রাট শার্লামেনের কাছ থেকে, রাজদূতগণ এসেছিলেন। **হারুণ অল-রসিদ** খুব সৌখীন লোক ছিলেন। মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত বিরাট প্রাসাদে তিনি থাকতেন। মণি-রত্ন-খচিত পোষাক পরতেন, সিল্কের পোষাক পরা হাজার হাজার ক্রীতদাস তাঁর সেবা করতো।

হারুণ অল-রসিদ

হারুণ অল-রসিদ রাত্রে খুব কম ঘুমোতেন, গভীর রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর একটা সখ। এইভাবে অনেক রাত্রে তাঁর জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটতো। এমনি সব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অপূর্ব্ব সাহিত্য **আরব্য-উপন্যাসের** সৃষ্টি।
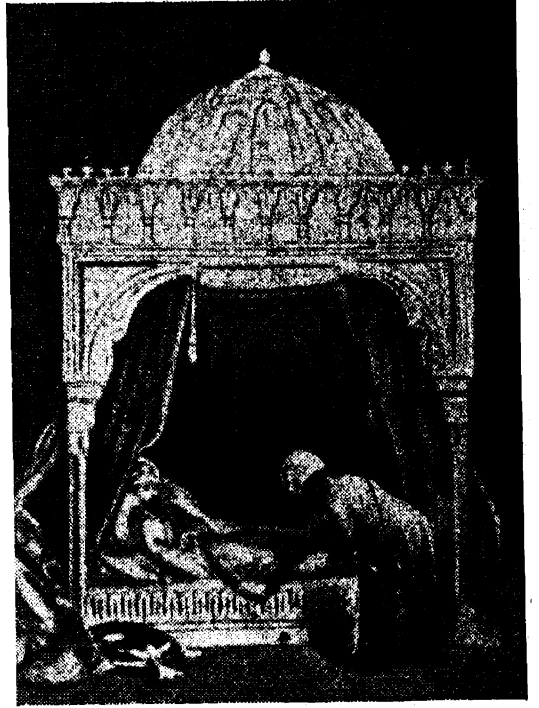
হারুণ অল-রসিদ তাঁর গরীব প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হতেন। যতদূর সাধ্য তাদের তিনি সাহায্য করতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, অনাথাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করতেন। তিনি খুব ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। প্রখর রোদে তেতে ওঠা মরুভূমির বালির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে, প্রতি বৎসর তিনি মক্কায় যেতেন তীর্থ করতে। হারুণ অল-রসিদের মৃত্যুর পর বাগদাদের গৌরব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়।

আব্বাসাইড-খলিফাদের চরম উন্নতির সময়ে বাগদাদ নগর জ্ঞানে, গুণে, গরিমায় ও শিল্প-বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতির পরিচয় দিয়েছিল। আরবদের মধ্যে এই যুগে, ধর্ম্ম-ব্যাপারে কোন গোঁড়ামি ছিল না। সকল সভ্য দেশের

সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গেই তাদের আদান-প্রদান ছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে তারা ভারতীয়দের কাছে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করে। ভারতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ দলে দলে বাগদাদে আসতেন। অনেক আরব শিক্ষার্থীও, উত্তর-ভারতের বিখ্যাত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞান আহরণ করতে আসতেন। আরব পণ্ডিতরা, বিভিন্ন শাস্ত্রের অনেক সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তবে তাঁরা নিজেরাও অনেক বিদ্যায় উন্নত গবেষণা ও আবিষ্কার করেছিলেন।

আরব বা সারাসেন্স্-সংস্কৃতি শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান-সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে, আরব-স্পেনের রাজধানী **কর্ডোবা** এবং **গ্রানাডা** নগরেও আরব-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। কর্ডোবা নগর তখন সভ্যতায় ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যশ সারা ইউরোপে ও পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়িয়েছিল। গ্রানাডা নগরের সে যুগের বিখ্যাত **অল্-হামরাহ প্রাসাদ** আজিও বিদ্যমান আছে।

হারুণ অল-রসিদের প্রাসাদ

হারুণ অল-রসিদের মৃত্যুর পর, অল্পদিনের মধ্যেই আরব-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরলো। প্রাদেশিক শাসকগণ স্বাধীন হয়ে পড়লেন। খলিফাগণ ক্রমেই শক্তিহীন হতে লাগলেন। তাঁদের রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে লাগলো। ইসলামের একতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মিশর, ইরাণ, আফগানিস্থান প্রভৃতি আলাদা আলাদা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হলো।

এই সময়, মধ্য-এশিয়ার তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে দলে দলে পশ্চিম দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আব্বাস-বংশের কাছ থেকে রাজ্যভার কেড়ে নিয়ে, তারা এসে বাগদাদ অধিকার করলো। এদের নাম **সেলজুক তুর্কী**। এদের মধ্যে **সুলতান সালাদ্দিন** সব চেয়ে নামজাদা নৃপতি। ইনি

খৃষ্টানদের সঙ্গে ক্রুজেড বা ধর্ম্মযুদ্ধে খুব কৃতিত্ব ও সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। সেলজুক তুর্কীগণ কিছুকাল বেশ শক্তির সঙ্গে মুসলমান-রাজ্যের প্রভুত্ব চালিয়ে যান। কিন্তু শীঘ্রই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়া
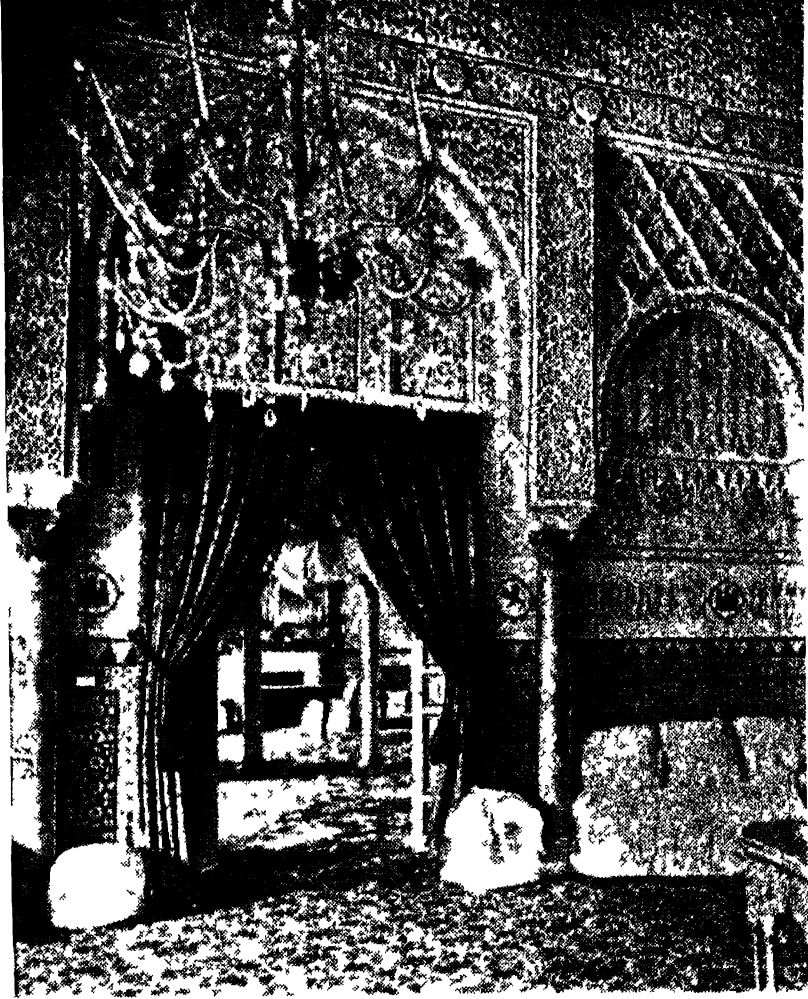
অল-হামবাহ প্রাসাদ

থেকে দুর্দ্দান্ত **চেঙ্গিস খাঁ** এবং তাঁর বংশধরেরা ঝড়ের বেগে এসে, বাগদাদ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন।

বাগদাদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে, পশ্চিম-এশিয়ার আরব-সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল। দূরে দক্ষিণ-স্পেনে গ্রানাডায় আরব-সভ্যতা আরও কিছুদিন চলেছিল। মূল আরবদেশের প্রাধান্য শীঘ্রই একেবারে কমে গেল। কিছু

পরে আরব-রাজ্যগুলি, পশ্চিম-এশিয়ার **অটোমান তুর্কী** সুলতানদের অধীনে চলে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত আরবদেশ এই তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্গতই ছিল। ঐ যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের উস্কানিতে আরবজাতি তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

আরবের লরেন্স

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, আরব দেশগুলো ছিল তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন এবং তুরস্ক ছিল জার্ম্মেণীর পক্ষে। ইংরেজরা বুঝতে পারে যে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারলে তুর্কীদের শক্তি কমে যাবে এবং তাতে ব্রিটিশ পক্ষের লাভ হবে। আরবদের এই বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য যিনি তাদের দেশে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম **কর্ণেল লরেন্স।**

সুলতান সালাদিন

লরেন্স আরবী ভাষা, আরবী কায়দা প্রভৃতি খুব ভাল করে শিখেছিলেন। আরবী পোষাক পরলে তাঁকে ইংরেজ বলে চেনবার কোন উপায়ই ছিল না। লরেন্স তুরস্কের বিরুদ্ধে, আরবদের বিদ্রোহী করে তোলেন এবং আরব-সৈন্য নিয়েই তিনি তুরস্ক আক্রমণ করেন। লরেন্সের এই কাজের ফলে, ব্রিটিশ সৈন্যদের পক্ষে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়া জয় করে, তুরস্ককে কাবু করা সহজ হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আরবদেশ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর, আরবদেশে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। তাদের নাম হেজাজ, প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন এবং সৌদি আরব। এদের মধ্যে একমাত্র সৌদি আরব স্বাধীন হয়। পাশ্চাত্ত্য শক্তিরা, যুদ্ধের সময়কার তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে, আরবদের স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের অভিভাবক হয়ে বসে। প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান এবং ইরাকেব অভিভাবক হলো ইংলণ্ড আর সিরিয়ার অভিভাবক হলো ফ্রান্স। এই কয়টি দেশ পাশাপাশি থাকলেও, এদের কারো সঙ্গে কারো সদ্ভাব নাই। প্যালেস্টাইন নিয়ে আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের ভীষণ গোলযোগ চলে। আরবদের দাবী, প্যালেস্টাইন আরবদের দেশ; ইহুদীরা বলে যে, না, ওটা তাদের দেশ, ওর উপর আরবদের কোন অধিকার নাই। শেষ পর্য্যন্ত, প্যালেস্টাইনকে ভাগ করে এক অংশ আরবদের এবং অপর অংশ ইহুদীদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও গোলযোগ মেটে নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরবদেশে দুজন রাজা ছিলেন প্রধান। একজনের নাম **হুসেন**, অপর জন **ইবন সৌদ**। হুসেন হজরত মহম্মদের বংশধর। তিনি ছিলেন হেজাজের রাজা এবং মক্কায় ছিল তাঁর বাস। মক্কা হেজাজের রাজধানী। তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজদের যখন যুদ্ধ চলছিল তখন তারা হুসেন এবং ইবন সৌদ দুজনের সঙ্গেই ভাব রেখে চলছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, ইংরেজরা হুসেনের পরম শত্রু, ইবন সৌদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এতে ইবন সৌদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ইবন সৌদ হুসেনকে আক্রমণ করে, তাঁকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেন। হুসেন তাঁর বড় ছেলে আলির হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দেন; কিন্তু ইবন সৌদ থামলেন না, তিনি হেজাজ জয় করে মক্কায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। আলি সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং হুসেন পলায়ন করলেন সাইপ্রাস দ্বীপে। সাইপ্রাসে ভগ্নহৃদয়ে হুসেন প্রাণত্যাগ করেন।

হুসেনের অনেক ছেলে ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম **ফৈজল**। ইনি প্রথমে সিরিয়ার রাজা হন, কিছুদিন পরে সেখান থেকে ইরাকে গিয়ে, ইরাকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা ফৈজল, ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে হঠাৎ অসুখ করে মারা যান। তারপর রাজা হন তাঁর ছেলে **গাজী**।

গাজী কিছুদিন পরে মোটর-দুর্ঘটনায় নিহত হন। তখন তাঁর নাবালক ছেলে, **দ্বিতীয় ফৈজল**, ইরাকের রাজা হলেন। হুসেনের আর এক ছেলে **আবদুল্লা** ট্রান্সজর্ডানের রাজা হন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা আবদুল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ট্রান্সজর্ডান রাষ্ট্রকে বর্ত্তমানে জর্ডান বলে।

ইবন সৌদ

আরবদেশে **ইবন সৌদই** সব চেয়ে ক্ষমতাশালী নৃপতি হলেন। এঁর পূরো নাম, আবদুল আজিজ ইবন আবদুর রহমান আল ফৈজল আল সৌদ।

ইবন সৌদ

চেহারাটি তাঁর বিশাল, ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, আর ঠিক সেই অনুপাতে চওড়া।

বাইরে থেকে দেখলে ইবন সৌদকে খুব দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি খুব ধর্ম্মভীরু এবং সাধু প্রকৃতির লোক। মুসলমানদের মধ্যে যেমন **সিয়া** এবং **সুন্নি** বলে দুটো ভাগ আছে, তেমনি **ওয়াহাবী**

বলেও আর একটা শাখা আছে। ইবন সৌদ ওয়াহাবী। সাধু জীবন যাপন করা হচ্ছে ওয়াহাবীদের নিয়ম। তারা মদ খায় না, ধূমপান করে না, জুয়া খেলে না, গয়না পরে না, সিল্কের পোষাক পরে বাবুগিরিও করে না।

আরবের নেজ্‌দ নামক স্থানের এক সহরে ইবন সৌদের জন্ম। **ইবন রশিদ** নামক এক ব্যক্তি তখন নেজ্‌দের রাজা। ইবন সৌদের বাবা রশিদকে তাড়িয়ে, নেজ্‌দের সিংহাসন দখল করবার জন্য যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে ইবন সৌদ এমন বীরত্ব দেখান যে, রশিদকে তাড়াবার পর, তাঁর বাবা সিংহাসনে না বসে, ইবন সৌদকেই নেজ্‌দের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তখন তাঁর বয়স ২৬ কি ২৭ বৎসর।

এর পর থেকে ইবন সৌদ আরবদেশের ছোট ছোট রাজ্যগুলি, একটির পর একটি দখল করে, সেগুলিকে নিয়ে বড় একটি রাজ্য গড়ে তোলেন এবং তারই নাম দেন, **সৌদি আরব**। ইবন সৌদের সুযোগ্য নেতৃত্বে আরবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে, এবং মুসলমান তীর্থযাত্রীদের প্রতিবৎসর জেদ্দা বন্দর হতে মক্কা যাবার পক্ষে অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয়েছে। জেদ্দায় কয়েকটি রাষ্ট্রের দূতাবাস আছে। সৌদি আরবের দুটি রাজধানী —মক্কা ও রিজাদা।

ইরাণ ও ইরাকে যেমন এতদিন বৃটিশ তৈল-কোম্পানী, লাভের একাধিপত্য ভোগ করেছে তেমনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও, সৌদি আরবের তেলের খনির সুবিধা ভোগ করবার জন্য সেখানে তৈল-কোম্পানী খুলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিণ চক্র, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রেতে যেরূপ সৌদি আরবেও সেরূপ সোভিয়েট রাশিয়ার বিপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে।

১৯৪৫ সালে মিশর, ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন এবং ইয়েমেন প্রভৃতি দেশগুলি মিলিত হয়ে, **আরব রাষ্ট্রসঙ্ঘ** নামে একটি ঐক্যসমিতি গঠন করেছে। এর কিছু পরে আরবসঙ্ঘে ভাঙ্গনের সূচনা দেখা দিয়েছিল কিন্তু ১৯৫১ সাল হতে সঙ্ঘের সদস্য-শক্তিসমূহের মধ্যে আবার একতার ভাব বেড়ে উঠেছে। আরব রাষ্ট্রগুলি সকলেই ইহুদীদের ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশেষরূপে বিদ্বেষভাবাপন্ন।

বেশ কিছুদিন থেকে মিশরের সুয়েজখাল অঞ্চল নিয়ে, এবং ইরাণের তেলের খনির অধিকার সম্পর্কে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলির মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সৌদি আরব ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য খুব চেষ্টা করেছিল।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে একটা জায়গায়, চীনদেশের পশ্চিম-সীমান্ত এসে রাশিয়ার সঙ্গে মিশেছে। চীনদেশের এই অংশে একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে, তার নাম **গোবি** মরুভূমি। এই মরুভূমির পশ্চিমে **তুর্কী** নামক একটা ভবঘুরে জাতি এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কিছু দিন তারা সেখানে থাকার পর, **তাতার** নামে একটা দুর্দ্দান্ত জাতি এসে তুর্কীদের সেখান হতে তাড়িয়ে দিল। তাতারদের কাছে তাড়া খেয়ে, তুর্কীরা সোজা পশ্চিম দিকে ছুটলো এবং এসে ঠেকলো একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীরে। এই জায়গাটার নাম **আনাতোলিয়া।** ফাঁকা পেয়ে তারা এবার এখানেই বসবাস সুরু করলো।

আনাতোলিয়ার দক্ষিণেই আরবদের দেশ। আরবরা মুসলমান, তাদের সংস্পর্শে এসে তুর্কীরাও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করলো। আরবরা কিন্তু তুর্কীদের একটু কৃপার চক্ষেই দেখতো, কারণ তারা হলো বনেদী মুসলমান, আর তুর্কীরা মুসলমান হয়েছে পরে। তুর্কীদের অধ্যবসায়, রণদক্ষতা, কূটবুদ্ধি এবং রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তখনকার আরবদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল বলে, তারা অল্পদিনের মধ্যেই, এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুললো।

এশিয়ায়, পারস্য-উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সবখানি জায়গা, আফ্রিকায় মিশর এবং ইউরোপে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীর থেকে আরম্ভ করে

আদ্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত, এতখানি স্থান তারা তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। এশিয়া মাইনর এবং বলকান-অঞ্চলের সবটাই এই তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আরবদেশকে বাদ দিয়ে এশিয়ার পশ্চিম দিকের অবশিষ্ট অংশটিকে বলে **এশিয়া মাইনর** এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশটিকে বলে **বলকান**।

সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ

এশিয়া মাইনর অবশ্য এখনও তুর্কীদের অধীনেই রয়েছে, কিন্তু বলকান এবং মিশর তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে অনেক দিন। তুরস্কের সম্রাটকে বলা হতো **সুলতান**; সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তো তিনি ছিলেনই, তা ছাড়া তিনি মুসলমানদের ধর্ম্মগুরু হিসাবেও সম্মান পেতেন। এই জন্য সুলতান ছাড়াও তাঁকে বলতো **খলিফা**।

যে-তুর্কীরা এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে, তাদের নাম **অটোমান তুর্কী**। তাদের পূর্ব্বে বাগদাদে, যারা
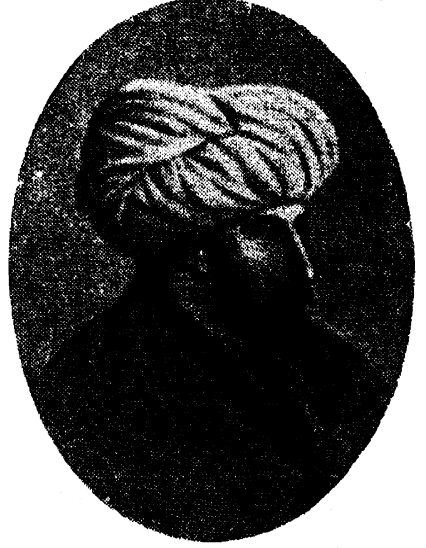
দ্বিতীয় মহম্মদের কনষ্টান্টিনোপল জয়

আরবদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তারা হলো **সেলজুক তুর্কী**। অটোমান তুর্কীরা প্রথমে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মঙ্গোলদের দ্বারা তুর্কীস্থান থেকে বিতাড়িত

হয়ে, এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হয়। তারা তাদের শক্তি এশিয়া মাইনরে ভালরূপে স্থাপিত করবার পর ক্রমে দার্দ্দানেলিজ-প্রণালী পার হয়ে, বলকান-অঞ্চলে, মাসিডোনিয়া, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া জয় করে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান সুলতান, **দ্বিতীয় মহম্মদ,** পূর্ব্ব-রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী, কনস্টান্টিনোপল অধিকার করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে, বিশেষ করে বিখ্যাত তুর্কী-সম্রাট **সোলেমানের আমলে,** তুর্কীরা বাগদাদ, হাঙ্গারী, মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থান জয় করে। তাদের শক্তিশালী নৌ-বহরের জোরে, তারা ভূমধ্যসাগরেও আধিপত্য বিস্তার করে। কিছুদিন ধরে তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা চললো। কিন্তু অবশেষে, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধে অটোমানরা, খৃষ্টান শক্তিদের কাছে হেরে যায়।

বিখ্যাত তুর্কী-সম্রাট সোলেমান

তুর্কীরা খুব দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ও সামরিক কৌশলে সুনিপুণ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ছিল ভীষণ ও নির্ম্মম। **জানিসারিস** নামে একদল রাজকীয় খৃষ্টান-ক্রীতদাসদের দ্বারা গঠিত সেনানী, তুর্কী-সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল। এদের জোরেই তারা অনেকদিন সমরক্ষেত্রে অপরাজেয় ছিল। দেশের শাসক ও রাজপুরুষবৃন্দ যুদ্ধবিদ্যাকেই জীবনের পেশা করতেন। এই ব্যাপারে, তাঁদের প্রাচীন স্পার্টাবাসীদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেশ-শাসন ও রাজ্য-গঠন ব্যাপারে তুর্কী-শাসকগণ কিন্তু পটুতা দেখাতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগের নতুন নিয়ম-প্রণালীর সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলেন না বলে ক্রমে, অষ্টাদশ শতাব্দী হতে তাঁদের পতন আরম্ভ হলো।

তুর্কী-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন

তুর্কী-সাম্রাজ্য বেশীদিন টিঁকলো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব থেকেই তার ভাঙ্গন ধরলো। তুর্কী সুলতানরা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে কোন মনোযোগ দিলেন না, ফলে, দেশে কোন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই। তুর্কীদের স্বভাবে প্রাচীনকালের যাযাবর-বৃত্তির খানিকটা থেকে গেল। অবশ্য তারা

রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ ও প্রাসাদ গড়েছিল ; কিন্তু তারা, তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, বিভিন্ন জাতি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট প্রজাদের আপন করতে পারলো না। বিশেষ করে, খৃষ্টান প্রজাদের মধ্যে একটা ব্যাপক অসন্তোষ বেড়েই যেতে লাগলো। সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরার এইগুলিই প্রধান কারণ।

সোলেমানের রাজত্বের পর তুরস্কের পতন আরম্ভ হলে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, রাজমন্ত্রী **কিউপ্রিলিদের** আমলে তুরস্ক আবার কিছুদিনের জন্য পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বলকান ভূভাগে তাদের অগ্রাভিযান আবার উগ্র হয়ে ওঠে এবং অষ্ট্রিয়া প্রমুখ পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কারা মুস্তাফার নেতৃত্বে তুর্কীরা ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অবরোধ করে। এই সময়ে পোল্যাণ্ডের বীর নৃপতি **সোবিয়েস্কি** খৃষ্টান শক্তিদের সমবেত করে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে জোর আক্রমণ করে, তাদের ভিয়েনা হতে বিতাড়িত করেন। এর পর থেকে তুর্কীরা আর ইউরোপের ভয়ের কারণ হয় নাই, আস্তে আস্তে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বিস্তীর্ণ তুর্কী-সাম্রাজ্যে দুর্ব্বলতা দেখা দিল, পূর্ব্ব-ইউরোপের উদীয়মান শক্তি রাশিয়া তখন তার প্রতি লোলুপ-দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করলো। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ জার বা সম্রাট পিটারের বৈদেশিক অগ্রসর-নীতি হতেই তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান আরম্ভ হয়। জারিণা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রীতিমত তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রসারতা সুরু করেন। তিনি পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তুর্কীদের হটিয়ে দিয়ে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, কাচুক-কাইনারজি সন্ধি দ্বারা কৃষ্ণসাগরের উত্তর অংশ দখল করেন। এইভাবে ক্ষীয়মাণ তুর্কীশক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব্ব-ইউরোপে রাশিয়ার ক্রমাগত অগ্রাভিযান থেকেই **প্রাচ্য-সমস্যার** উদ্ভব হয়।

ফরাসী-বিপ্লবের, মানব-অধিকারের বাণীর ছোঁয়াচ লেগে, বলকান-অঞ্চলের খৃষ্টান জাতিরা, তুর্কী-অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। গ্রীস, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই স্বাধীন হলো। অপরাপর বলকান-জাতিপুঞ্জের ত্রাণকর্ত্তার ভান ধরে, রাশিয়া, সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী, বারবার পূর্ব্ব-ইউরোপের তুর্কী-সাম্রাজ্যের উপর প্রবল হানা দিতে লাগলো।

উন্নত ইউরোপীয় শক্তিগুলির মত তুরস্ক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে অগ্রসর হতে পারে নাই। তাই সে রাশিয়াকে ঠেকাতে

পারে নাই, ক্রমেই হটে যেতে লাগলো। শীঘ্রই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেত কিন্তু ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বাধা-দানের জন্য, রাশিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারলো না এবং ঘুণেধরা তুর্কী-সাম্রাজ্য কোন রকমে টিঁকে গেল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের, তুরস্কের প্রতি কোন দরদ ছিল না। ইংলণ্ড, তার প্রাচ্য-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই তুরস্কের পক্ষ টেনেছে ও প্রবল শক্তিশালী রাশিয়াকে, বলকান-অঞ্চলে অগ্রসরে বাধা দিয়েছে। এই বাধাপ্রদান-নীতি থেকেই **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (১৮৫৪-১৮৫৬ খৃঃ) ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে **বার্লিণ-কংগ্রেস** প্রভৃতির উদ্ভব হয়। হতভাগ্য তুরস্ক তখন দুর্ব্বল ও শতধাবিভক্ত। প্রবল শক্তিদের বিভিন্নমুখী এই স্বার্থান্বেষী সংগ্রামকে বাধা দেবার, তার কোন ক্ষমতা ছিল না। যে কোন সময়ে তার বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে যেতে পারতো। এই সময় তুরস্কের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'ইউরোপের পীড়িত মানব'।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান **দ্বিতীয় আবদুল হামিদ,** তুরস্কের সিংহাসনে বসেন। খৃষ্টান প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করায় তাঁর খুব দুর্নাম ছিল। গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি অনেকেই মনে করতেন, বুলগেরিয়া ও আর্ম্মেনিয়ার অত্যাচারের জন্য ইনিই দায়ী। আবদুল হামিদ মুসলমান জগতের খলিফা বা ধর্ম্মগুরুরূপে একটা সার্ব্বজনীন ইসলাম-আন্দোলনের সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তুর্কী যুবকেরা তাঁর চাল ধরে ফেললো।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কে "তরুণ তুর্কীদল" গঠিত হয়। এরা দেশের শাসন-বিধির ও নিয়ম-কানুনের আমূল পরিবর্ত্তন করতে চায়। কোরাণ এবং হদিসের আইনগুলো সব ভগবান তৈরি করে দিয়েছেন, এ সব আইন বদলাবার অধিকার মানুষের নাই, তাদের চিরকাল এগুলোকেই মেনে চলতে হবে,—তুরস্কের তরুণ দল, এই যুক্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না।

একদল তরুণ তুর্কী, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে লেখাপড়া শিখে তাদের আরও বেশী চোখ খুলে গেল। তারা বুঝলো যে, তুর্কী-সাম্রাজ্য যে ভাবে চলছে, সেই ভাবে তাকে চলতে দিলে, কিছুতেই তাকে টেঁকানো যাবে না। সাম্রাজ্যের মধ্যে খৃষ্টান, মুসলমান এবং ইহুদী এই তিন ধর্ম্মের লোক রয়েছে। এই তিন রকমের লোককে নিয়ে সাম্রাজ্য রাখতে হলে, তিন জনেরই মতামত, তিন জনকে কিছু করে মানতে হবে। তারা ভাবলো যে, ফরাসীদের মত একটা পার্লামেণ্ট

গঠন করে, সেই পার্লামেন্টের হাতে যদি আইন তৈরি এবং দেশ-শাসনের ভার দেওয়া যায়, তাহলে এই সাম্রাজ্য হয়ত টিঁকে যেতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত **সালোনিকা** ছিল তখন তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন। তরুণ তুর্কীরা তাদের নতুন আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সকলের আগে, এই সালোনিকাতে একটা **বিদ্রোহ** ঘোষণা করে, দাবী করলো যে, সালোনিকার জন্য সুলতানকে একটা শাসনতন্ত্র ঠিক করে দিতে হবে।

আবদুল হামিদ তখনও তুরস্কের সুলতান; তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করে,
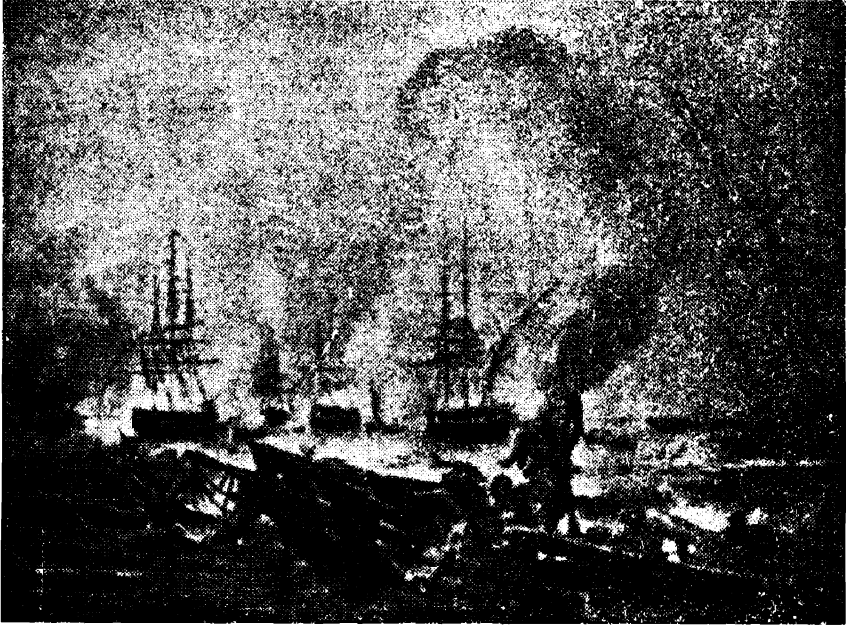
লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধ

চট করে তরুণ দলের এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। এই তরুণদের হাতেই সালোনিকা শাসনের ক্ষমতা চলে এল।

এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত তুর্কী-সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে একটা মহা বিপদের ঝড় বয়ে গেল। সুলতান আবদুল হামিদের দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরে, তুর্কী-সাম্রাজ্যের পাশের সব কয়টি দেশ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। **বুলগেরিয়া** স্বাধীনতা ঘোষণা করে সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেল। **গ্রীস** ক্রীট দ্বীপটি কেড়ে নিল। **অষ্ট্রিয়া** বোসনিয়া এবং হারজেগোভিনা নামক দুটি জায়গা দখল করে নিল।

আরবেরাও বিদ্রোহ আরম্ভ করলো। মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, মক্কা ও নেজদ্ নামক আরব দেশগুলোতে স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ হলো এবং এই

সব কয়টি জায়গাতেই, তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু হয়ে গেল। এখন যে দেশের নাম ইরাক, তখন তারই নাম ছিল মেসোপোটেমিয়া।

তরুণ তুর্কীদল, সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল; কিন্তু এই দল নানারূপ অন্তরায়ের জন্য, কোন কিছু সুবিধা করতে পারলো না। দেশের মধ্যে আর্থিক দুর্গতি এবং বাইরে বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের জন্য, তাদের দেশ-সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সময়, বলকান দেশগুলি একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি করে। তুরস্কের দুর্ব্বলতা ও আভ্যন্তরীণ কলহ লক্ষ্য করে, এই বলকান-সঙ্ঘ, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, তুরস্ক আক্রমণ করে সহজেই তাকে পরাজিত করে। এর কিছুদিন পূর্ব্বে, ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধেও তুরস্ক হেরে যায়। এই ভাবে যখন সমস্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়, তখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী **প্রথম মহাযুদ্ধ** আরম্ভ হয়।

জানিসারিস

যখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধে গেল তখন তরুণ তুর্কীদল ভাবলো যে, তারা যদি যুদ্ধে জার্ম্মেণীর পক্ষে যোগ দেয়, তাহলে জার্ম্মেণী তাদের অস্ত্র-শস্ত্র দেবে। এই অস্ত্রের সাহায্যে তারা বিদ্রোহী আরবদের সায়েস্তা করতে পারবে, চিরশত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নিতে পারবে।

আরবরা তুর্কীদের উল্টো পথ ধরলো। তারা দেখলো যে, যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলেই বরং ভবিষ্যতে কিছু লাভের আশা আছে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য, ইংরেজ সৈন্য এসে যখন মেসোপোটেমিয়ায় ঘাঁটি বসালো, আরবরা তখন তাদের কোন বাধা দিল না। ওদিকে তুর্কীরা এগিয়ে এসে, সিরিয়া দখল করে সেখানকার আরবদের কাবু করে রাখলো। নেজ্‌দের রাজা ইবন সৌদ, যাতে তুর্কীদের পক্ষে যোগ দিয়ে না বসেন সে জন্য, ইংরেজরা তাঁকে একটা মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে নিরপেক্ষ করে রেখে দিল।

এই সব বন্দোবস্ত শেষ করে, ইংরেজরা এবার সোজাসুজি তুরস্কের রাজধানী **কনষ্টান্টিনোপল** আক্রমণ করতে গেল। তুরস্কের রাজধানী এখন হয়েছে **আনকারা,** তখন ছিল কনষ্টান্টিনোপল। কনষ্টান্টিনোপলে পৌঁছতে হলে দার্দ্দানেলিজ-প্রণালী পার হয়ে যেতে হয়। দার্দ্দানেলিজ-প্রণালীর কাছেই **গ্যালিপলি** উপদ্বীপ। তুর্কীরা সেখান থেকে ইংরেজদের বাধা দিল। এই গ্যালিপলিতে ইংরেজদের সঙ্গে তুর্কীদের ভীষণ যুদ্ধ হয়
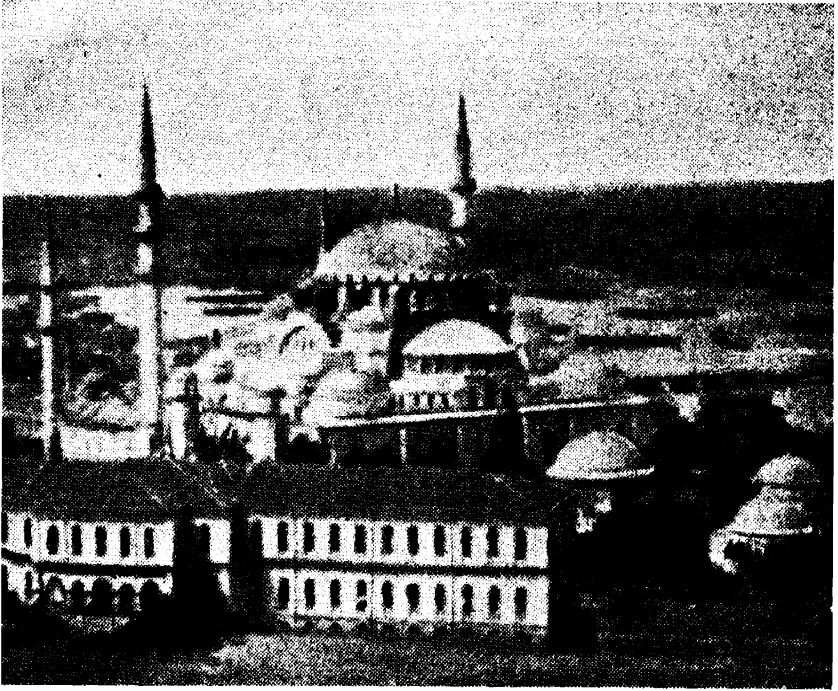
ইস্তাম্বুলের একটি সুদৃশ্য মসজিদ

এবং ইংরেজ হেরে যায়। **মুস্তাফা কামাল** এই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন এবং অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দেন।

এই সময় **হুসেন** নামক মক্কার একজন বড় আরব নেতা তুর্কী-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তুর্কীরা চটে মদিনায় সৈন্য পাঠালো এবং মক্কার উপর কামানের গোলাবর্ষণ করলো। মক্কা এবং মদিনা মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র; তার উপর আক্রমণ হওয়াতে তুর্কীদের উপর আরবদেশের সব মুসলমান ক্ষেপে গেল। হুসেনের তৃতীয় পুত্র ফৈজলের নেতৃত্বে, তারা তুর্কীদের আক্রমণ করলো।

লরেন্স নামক একজন ইংরেজ, আরবদেশে অনেকদিন বাস করে

আরবী ভাষা শিখে, একেবারে আরবদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। ইনি ইংরেজ সেনাপতির কাছ থেকে টাকা এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে আরবদের সাহায্য করতে লাগলেন। ইংরেজরা দুই দিক থেকে তুর্কীদের আক্রমণ করলো। মুস্তাফা কামাল নিজে এই অভিযান ঠেকাবার জন্যে তাড়াতাড়ি এলেন কিন্তু ইংরেজরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তিনি কিছুই করতে পারলেন না। **তুর্কীরা হেরে গেল।**

অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করলো। সন্ধিতে ঠিক হলো যে, মিশরের উপর তুরস্কের আর কোন দাবী থাকবে না। তা ছাড়া, আরব দেশগুলোও তুর্কী-সাম্রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবে। এই ভাবে ১৯১৮ সালের মধ্যে তুর্কী-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে গেল।

তুর্কী-রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা

মুস্তাফা কামাল বুঝতে পারলেন যে, নানা জাতি, নানা ধর্ম্মের লোক নিয়ে, সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা করার চেয়ে শুধু তুর্কীদের একত্র করে স্বাধীন দেশ হিসাবে তুরস্ককে শক্তিশালী করে তোলা ভাল। তিনি সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

মুস্তাফা কামাল নিজে কিন্তু তুর্কী ছিলেন না; তাঁদের দেশ ছিল তুরস্কের বাইরে, আলবেনিয়ায়। ১৮৮১ সালে সালোনিকায় তাঁর জন্ম। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি তুরস্কের সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই তিনি বড় বড় যুদ্ধে লড়াই করেন। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ইংরেজরা, সিরিয়ায় তুর্কীদের হারিয়ে দেবার পর, তুরস্ককে নিরস্ত্র করে রাখবার চেষ্টা করে। তখন তুরস্কের যিনি সুলতান ছিলেন, তাঁর নাম ছিল **ভ্যানেদ্দিন।** আনাতোলিয়ায় সৈন্যদের নিরস্ত্র করবার কাজ কেমন ভাবে চলছে তা তদারক করবার নাম করে, সুলতানের অনুমতি নিয়ে, মুস্তাফা কামাল সেখানে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান সংবাদ পেলেন যে, কামাল আনাতোলিয়ায় গিয়ে, সৈন্যদের নিরস্ত্র তো করেনই নাই, বরং সেখানে তিনি একটা বিদ্রোহের বন্দোবস্ত করছেন। সুলতান আবার ইংরেজদের ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না, তিনি কামালকে ডেকে পাঠালেন। কামাল তো ফিরে গেলেনই না, উল্টে সুলতানকে জানিয়ে দিলেন যে,

তুরস্কের স্বাধীনতা-অর্জ্জন না-করা পর্য্যন্ত তিনি আনাতোলিয়া থেকে এক পা-ও নড়বেন না।

স্থলতান, গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরেজ এই তিন শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। তবু কামাল দমলেন না। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি তুরস্কের জন্য, একটা **জাতীয় পরিষদ** গড়ে তুললেন। দেশের নানা স্থান থেকে প্রতিনিধির দল ছদ্মবেশে এসে সেই পরিষদে যোগ দিলেন, এবং মুস্তাফা কামালকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করলেন। কয়েক মাস পর, আবার সেই পরিষদের সভা তিনি ডাকলেন ; এই সভায় প্রতিনিধিরা তাঁর মন্ত্রি-পরিষদ নির্ব্বাচন করে দিলেন। এইবার কামাল, আনকারা সহরে তাঁর রাজধানী বসিয়ে, সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। সেখান থেকেই তিনি **তুরস্কের স্বাধীনতা** ঘোষণা করলেন।

ইংরেজরা এই সময়, এমন সব ভুল করতে লাগলো যে, কামালের তাতে খুব স্থবিধা হয়ে গেল। তারা এক চাল দিয়ে আনকারায় সংবাদ পাঠালো যে, তুরস্কের স্বাধীনতা এবং তার জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্ব, ইংরেজরা মেনে নিতে রাজী আছে।

এই খবর পেয়ে আনকারায় তুর্কীরা মহা খুসী হয়ে গেল। তারা কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে, জাঁকজমক করে, জাতীয় পরিষদের সভা ডাকবার আয়োজনে মেতে উঠলো। কামাল কিন্তু ইংরেজের মতলবে সন্দেহ করেছিলেন। তিনি তুর্কীদের সাবধান করে দিতে চাইলেন কিন্তু তাঁর কথা একজনও কাণে তুললো না। তুর্কীরা সব ছুটলো কনষ্টান্টিনোপলের দিকে। সেখানে গিয়ে ঘটা করে সভা করবার মাস দুই পরেই, তাদের সব আনন্দ শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন ইংরেজ সৈন্যেরা এসে কনস্টান্টিনোপলের সমস্ত সরকারী বাড়ী দখল করে নিল এবং চল্লিশজন **জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার** করে, তাঁদের মাল্টাদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়ে, বন্দী করে রাখলো।

ইংরেজদের উপর তুর্কীদের মনের ভাব যখন এই রকম, তখন তারা আবার একটি কাণ্ড করে, তুর্কীদের মন আরও বেশী বিষাক্ত করে তুললো। তিনজন তুর্কীকে দিয়ে সই করিয়ে, তারা একটা সন্ধিপত্র বের করে বললো যে, **সেভার্স** নামক জায়গায় এটা ইংলণ্ড এবং তুরস্কের মধ্যে সই হয়েছে।

এই সন্ধিপত্রে, ইংরেজরা দেখালো যে, তুর্কীরা দার্দ্দানেলিজ-প্রণালীর দক্ষিণদিকের স্থানটি ইংলণ্ডকে, পশ্চিমদিকের আঙ্গুর ক্ষেত পরিপূর্ণ জায়গাগুলো গ্রীসকে, এবং তার সব চেয়ে ভাল তূলা যেখানে উৎপন্ন হয়,

সেই স্থানটি ইতালীকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। তুর্কীদের নিজেদের জন্য অবশিষ্ট রইলো শুধু পাহাড়গুলো।

এই ঘটনায় তুর্কীরা একেবারে ক্ষেপে উঠলো। এবার তারা ভাল করেই বুঝে নিল যে, ইংরেজরা তাদের বন্ধু নয়। তুরস্ক স্বাধীন দেশ হয়ে বেঁচে থাকে এটা তারা চায় না। যে-কোন প্রকারে তুর্কীদের দাবিয়ে রাখাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী তখন একজোট হয়ে, গ্রাসকে উস্কিয়ে দিল তুরস্ক আক্রমণ করতে। তুর্কীরা এতেও ভয় পেল না। কামাল পূর্ণ উদ্যমে জাতীয় সৈন্যদল সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই দলে কামান ছিল না, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না বললেই চলে। তবু কামালের এই সৈন্যদল দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় দিল।

আশী হাজার সুশিক্ষিত এবং কামান-বন্দুকে সজ্জিত সৈন্য নিয়ে, গ্রীকেরা, আনকারা দখল করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলো কিন্তু কামালের পঁচিশ হাজার সৈন্যকে তারা কিছুতেই সেখান থেকে হটাতে পারলো না। চৌদ্দ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর গ্রীকেরা আর লড়তে পারলো না, ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পালিয়ে গেল।

ইউরোপের দেশগুলোর চোখ এবার খুললো, তারা স্বীকার করলো যে, তুর্কী জাতিকে ধ্বংস করে ফেলা অসম্ভব। তুরস্কের একটা অংশ এশিয়ায় আর একটা ইউরোপে অবস্থিত। ইউরোপে তার যে অংশ আছে, তার মধ্যে থ্রেস নামক স্থানটি তুর্কীরা ছাড়তে রাজী হয় নাই। সেভার্সের সন্ধিতে ইংরেজরা সেটা গ্রীকদের বিলিয়ে দিয়েছিল। গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর, তুর্কীরা থ্রেস আবার দখল করে নিয়েছিল।

জাতি-গঠন

মুস্তাফা কামাল এবার ঘর গোছানোর দিকে মন দিলেন। ইংরেজরা বুঝলো যে, তুরস্কের সঙ্গে এবার একটা সন্ধি করা দরকার। ১৯২৩ খৃঃ সুইজারল্যাণ্ডের, **লজান** নামক সহরে ইংরেজ ও তুর্কী প্রতিনিধিরা মিলে, **সন্ধিপত্র** রচনা করবেন এই ঠিক হলো। ইংরেজরা কিন্তু লজান-বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য, কামালকে অনুরোধ না করে তুর্কী সুলতানকে সেই অনুরোধ করে পাঠালো।

জাতীয় পরিষদের সদস্যেরা এই অপমানে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন। মুস্তাফা কামাল, দুটি আইন পাশ করে এই অপমানের খানিকটা শোধ নিলেন।

এতদিন তুরস্কের স্থলতান ছিলেন মুসলমানদের ধর্ম্মগুরু খলিফা। জাতীয় পরিষদের প্রথম আইনে ঘোষণা করা হলো যে, স্থলতান আর খলিফা থাকবেন না, শুধু ধর্ম্মগুরুর কাজই করবেন, রাজনীতিতে তিনি হাত দিতে পারবেন না। তারা একজন নতুন খলিফাও নির্ব্বাচন করে দিল। দ্বিতীয় আইনে পাশ হলো যে, তুরস্কের কোন স্থলতানই থাকবেন না। এই আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে, তুরস্কের স্থলতান দেশ ছেড়ে পলায়ন করে, এক ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজে আশ্রয় নিলেন।

ইংরেজদের চাল তো ব্যর্থ হলোই, ফলও হলো উল্টো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তুরস্কের স্থলতানকে নিমন্ত্রণ করে এবং জাতীয় পরিষদকে অবজ্ঞা করে তুর্কীদের দেখানো যে, দেশের বাইরে স্থলতানেরই সম্মান বেশী, জাতীয় পরিষদ কিছু নয়। কামাল সে চাল নষ্ট করে দিলেন। স্থলতানকে সিংহাসন ছেড়ে পালাতে হলো এবং ইংরেজরা জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে লজান-বৈঠকে দেখা করতে বাধ্য হলো।

ইসমেত নামে কামালের এক বন্ধু ছিলেন, তাঁকে নেতা করে কামাল লজান-বৈঠকে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ দলের নেতা ছিলেন লর্ড কার্জ্জন। কার্জ্জন ইসমেতের দাবী মানতে রাজি হলেন না, দুইজনে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হয়ে শেষ পর্য্যন্ত বৈঠক সেবারকার মত ভেঙ্গে গেল।

কয়েক মাস পর আবার সেই বৈঠক আরম্ভ হলো। এবারকার বৈঠকে, কামাল এবং ইসমেত যা চেয়েছিলেন তাই হলো। সেভার্সের সন্ধি উল্টে গেল। সমগ্র আনাতোলিয়া, থ্রেসের পূর্ব্ব-অঞ্চল এবং কনষ্টান্টিনোপল তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ইংরেজরা একথা মেনে নিল। এতদিনে তুরস্ককে আলাদা একটা দেশ হিসাবে স্বীকার করতে ইউরোপের লোকেরা বাধ্য হলো। কামাল আবার জাতীয় পরিষদে আইন পাশ করিয়ে, ঘোষণা করলেন, তুরস্ক আর কোনদিন কোন স্থলতানকে এনে সিংহাসনে বসাবে না। তুরস্ক হবে **প্রজাতন্ত্র,** প্রজাদের প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন।

তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবার পর, মুস্তাফা কামাল তার **প্রথম সভাপতি** নির্ব্বাচিত হলেন। এবার তিনি আর একটা আইন

পাশ করালেন যে, তুরস্কে কোন খলিফা থাকবেন না। তিনি ঠিক করে দিলেন যে, ধর্ম্মের নামে মুসলমান শাস্ত্রের বিধানকে ভগবানের আইন বলে জাহির করে দেশ-শাসন, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তিনি এক সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে দেবেন না। প্রজাদের প্রতিনিধিরা তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আইন পাশ করবেন এবং সেই আইন সবাইকে মেনে চলতে হবে। শাসনকর্ত্তারা জাতীয় পরিষদের তৈরি আইন মেনে দেশ শাসন করবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান যে-যার নিজের ইচ্ছামত ঘরে বসে করবে, তার সঙ্গে রাজ্য-শাসনের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এই ভাবে খলিফার কর্ত্তৃত্ব নষ্ট করে দেওয়ায়, অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা কামালের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালিয়েছিল কিন্তু তাতে তিনি দমেন নাই। তিনি যা করেছিলেন, তার কোন অদলবদল হতে দেন নাই।

মুস্তাফা কামালের সংস্কার

স্বাধীন তুরস্কের শক্তিশালী গবর্নমেণ্ট গঠনের পর, কামাল সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। **কাজির বিচার** তুলে দিয়ে, তিনি বিচারের ভার দিলেন শিক্ষিত বিচারকদের হাতে। **স্কুল-কলেজ** প্রতিষ্ঠা করে, তিনি আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার বন্দোবস্ত করে দিলেন। টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তুর্কীদের তিনি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শেখালেন। তুরস্কে এতদিন এ সব কিছুই ছিল না। শিক্ষা বলতে তুর্কীরা শুধু ধর্ম্মশিক্ষাই বুঝতো। **তুর্কী ফেজ** পরা তুলে দিয়ে তিনি ইউরোপীয় কায়দায় হ্যাট পরা প্রচলন করলেন। মুসলমান হলেই তাকে ফেজ পরতে হবে, তুর্কীদের এই ধারণা তিনি ভেঙ্গে দিলেন।

তুর্কী মেয়েরা **পর্দ্দা-প্রথা** মেনে চলতো, বোরখা না পরে তারা কারও সামনে বের হতো না। কামাল, এই পর্দ্দা-প্রথা তুলে দিলেন। মেয়েরা স্বাধীন ভাবে পথে বেরোতে আরম্ভ করলো, সরকারী চাকুরীও তাদের মধ্যে অনেকে গ্রহণ করলো। পর্দ্দা-প্রথা দূর করতে গিয়ে, কামালকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল কিন্তু কোন বাধা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। মেয়েদের জন্য তিনি স্কুল-কলেজ করে দিয়ে, তাদের লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

তুর্কী ভাষা তখনও লেখা হতো আরবী হরফে। এই দুরূহ হরফের

বদলে কামাল, তুর্কী ভাষা **ল্যাটিন হরফে** লেখবার ব্যবস্থা করলেন। ইংরেজী ভাষা যে অক্ষরে লেখা হয় তাকে বলে ল্যাটিন হরফ। এইভাবে দেশের সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় কামাল আমূল পরিবর্ত্তন এনে দিলেন।

দেশের লোকদের **আর্থিক অবস্থা** ভাল করবার জন্য, কামাল বড় বড়

মুস্তাফা কামাল

রাস্তা এবং রেলওয়ে তৈরি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে দিলেন। চাষের জমিতে খাল কেটে, তিনি বৃষ্টির দিনে জল-নিকাশের এবং অল্পবৃষ্টির সময় জল-সেচনের বন্দোবস্ত করলেন।

ধীরে ধীরে কৃষকদের তিনি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও চাষ করতে শেখালেন। এতে চাষীদের আয় অনেক বেড়ে গেল। কামাল এইভাবে যে-সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছেন, আজও তুর্কীরা সেগুলো মেনে চলছে। কামাল যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনিই ছিলেন তুরস্কের সভাপতি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হলে, তাঁর স্থলে **জেনারেল ইসমেত ইনোনু** অভিষিক্ত হলেন, তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের সভাপতি-পদে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বেজে উঠলো রণ-দামামা। তুরস্ক কালবিলম্ব না করে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হলো। স্থির হলো, যুদ্ধ যদি ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়, তাহলে তুরস্ক যথাসাধ্য সাহায্য করবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের একটা সন্ধি ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই, তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী, **মহম্মদ সারা জোগলু** মস্কো যাত্রা করলেন—এই সন্ধি-বন্ধনকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে স্থাপন করবার জন্য। কিন্তু তাঁর আশা সফল হলো না। রাশিয়া দাবী করলো যে, রাশিয়ার শত্রু-স্থানীয় কোন দেশের কোন জাহাজ যদি দার্দ্দানেলিজ-প্রণালীতে প্রবেশ করতে চায় তবে উক্ত প্রণালীর রক্ষক হিসাবে তুরস্ককে সেই জাহাজ আটক করতে হবে। সারা জোগলু এ প্রস্তাবে রাজী হতে না পেরে দেশে ফিরে এলেন।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দারুণ ভূমিকম্পে, তুরস্কের রাজধানী আনকারা ও তৎসন্নিহিত আনাতোলিয়া-প্রদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য সংক্রমণের বিরুদ্ধে, তুরস্ক ক্রমাগত প্রস্তুত হতে থাকলো।

তুরস্কের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, সে এই যুদ্ধে কোন পক্ষাবলম্বন করবে না, নিরপেক্ষ থাকবে। চার্চ্চিলের প্রাণপণ চেষ্টাও সে-সঙ্কল্প থেকে তুরস্ককে বিচ্যুত করতে পারে নি। রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল এক সময়ে কাইরোতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইনোনুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও মিত্রশক্তির সঙ্গে তুর্কীরা যোগ দেয় নি; কিন্তু ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি, জার্ম্মেনীকে বিপর্য্যয়ের মুখে দেখে, তখন তুরস্ক তার ও জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো। ১৯৪৫-এর ১লা মার্চ্চ এই দুই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করলো।

১৯৫০ সালে তুরস্কে এক সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, তাতে অনেকদিন

পরে, কামাল আতাতুর্ক-সৃষ্ট 'পিপলস্ রিপাবলিকান পার্টি' হেরে যায় এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে, **ডেমোক্রাট দল** জয়লাভ করে। তুরস্কের পার্লামেণ্ট অর্থাৎ গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেমব্লিতে, বর্ত্তমানে ডেমোক্রাট দলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আদ্নুয়ান মেন্দেরেস এখন তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ক্রমাগত অগ্রসর-নীতির ফলে, বিখ্যাত প্রাচ্য-সমস্যার সৃষ্টি হয়। তুরস্কের তখন আগা-গোড়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপক্ষ-মনোভাব ছিল। ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের পর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের মৈত্রীভাব বজায় ছিল। তারপরে সোভিয়েট রাশিয়া আবার ঐতিহাসিক দার্দ্দানেলিজ-প্রণালীর দিকে সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ক্রমে সে তুরস্কের উত্তর-অঞ্চল বরাবর সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম মোতায়েন করে। এর ফলে তুরস্ক নিজের নিরাপত্তার জন্য আতঙ্কিত হয় এবং পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রার্থী হয়। আমেরিকাও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে তুরস্ককে হাতে পেয়ে খুব সুবিধা লাভ করে।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি তাদের পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তুরস্ককে এখন তাদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। আমেরিকা, সভাপতি ট্রুম্যানের সাহায্য-নীতি অনুসারে, তুরস্কে অকাতরে অর্থব্যয় করছে। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নতি হচ্ছে এবং দ্রুতগতিতে সে একটি আধুনিক উন্নত সামরিক শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমেরিকা তুরস্কের রাজধানী আনকারাতে একটি বৃহৎ সামরিক মিশন নিযুক্ত রেখেছে। আমেরিকার পরিচালনাধীনে তুরস্কে অসংখ্য নৌ-ঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। রাশিয়া তুরস্কের কাছে এই সকল জিনিষের জোর প্রতিবাদ করেছে কিন্তু তুরস্কের নীতি এখন সম্পূর্ণ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী।

তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের শক্তিতে খুব বিশ্বাসী নয়। সে এখন ক্রমাগত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিসঙ্ঘের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে। তারাও মধ্য-প্রাচ্যে তুরস্কের উপরই বেশী নির্ভরশীল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক গ্রীসের সঙ্গে উত্তর-আতলান্তিক সঙ্ঘ বা নেটোর সদস্য হয়েছে এবং তখন হতে মধ্যপ্রাচ্য-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে তুরস্ক, গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া এই তিন শক্তিতে মিলে 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপীয় চুক্তি' নামক এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

প্যালেস্টাইন ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম্মজগতের কেন্দ্রস্থল। দেশটি ছোট কিন্তু খৃস্টধর্ম্মের তীর্থক্ষেত্ররূপে, যুগে যুগে এই স্থানটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্যালেস্টাইন, পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলে, আরবের উত্তর-পশ্চিম ও সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা মিশরের সন্নিকটবর্ত্তী দেশ।

মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলের অপরাপর দেশের মত, প্যালেস্টাইনের সভ্যতাও বহু পুরাতন। ইহুদী বা হিব্রুদের ধর্ম্মপুস্তকে আমরা অনেক প্রাচীনকাল থেকে, ইহুদী জাতির প্যালেস্টাইনে বসবাসের উল্লেখ পাই। যতদূর জানা যায়, খৃস্টপূর্ব্ব হাজার বৎসরেরও অনেক আগে থেকে ইহুদীরা, দক্ষিণ-প্যালেস্টাইনের **জুডিয়া** রাজ্যে বসতি আরম্ভ করে। কিছু কাল পরে তাদের রাজধানী হয় **জেরুজালেম** নগরী।

সেকালের আশেপাশের বড় বড় সাম্রাজ্যের সঙ্গে হিব্রুদের ইতিহাস জড়িত। ইহুদীদের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি যে, দক্ষিণে মিশর এবং উত্তরে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল সিরিয়া, আসিরিয়া ও বাবিলন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ওদের নানারূপ কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। প্যালেস্টাইন দেশটি ছিল এশিয়াস্থিত সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে মিশরের যোগাযোগ-পথ।

'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' অর্থাৎ হিব্রু-বাইবেল বা ধর্ম্মপুস্তক লেখার জন্য হিব্রুরা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। এজেকিয়েল, আমোস, ইসায়া প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্ম্মনিষ্ঠ দার্শনিকদের সাহায্যে এই বই লিখিত হয়। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অনেক আইন, কাহিনী, ইতিবৃত্ত, স্তোত্র, উপদেশাবলী, কাব্য, উপন্যাস এবং রাজনৈতিক তথ্যের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকেই খৃষ্টানরা 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' বা হিব্রু-বাইবেল বলে জানে। চ্যালডিয়ান
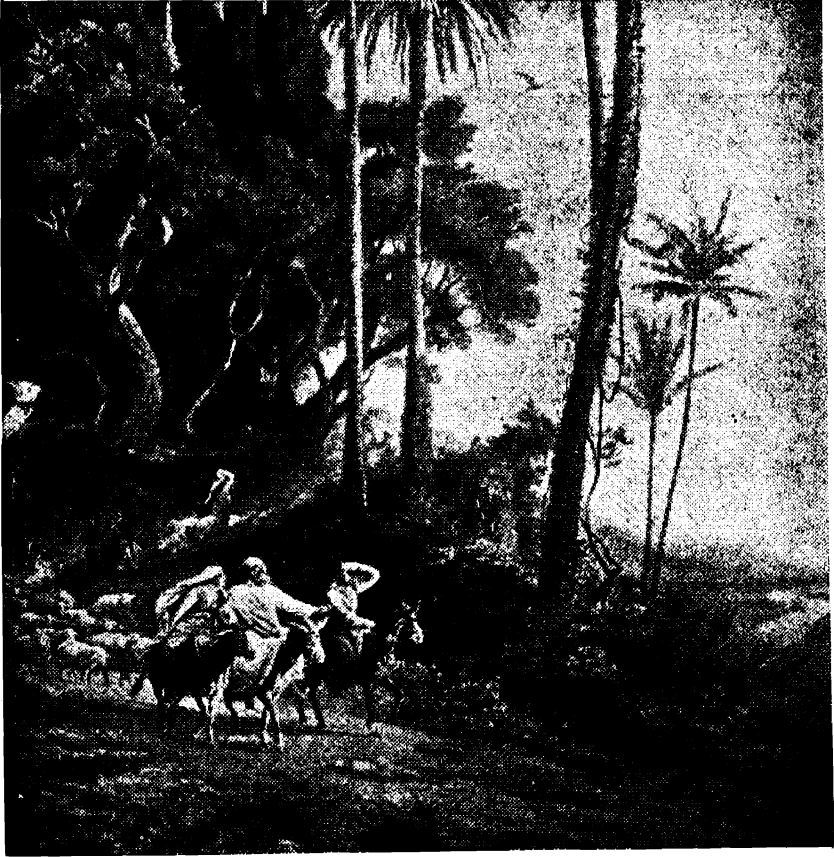
আব্রাহামের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ

রাজশক্তির অধীনে বাবিলনে, বন্দী-অবস্থায় থাকাকালেই বোধহয়, ইহুদী দার্শনিকগণ এই বিরাট ধর্ম্ম-সাহিত্য একত্রে সংগৃহীত করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে আমরা এই সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাই।

উক্ত বিখ্যাত গ্রন্থে, ইহুদীদের ইতিহাসে, আব্রাহামের কাহিনী থেকে ধারাবাহিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। **আব্রাহাম** বোধহয় ছিলেন

বাবিলনের প্রসিদ্ধ নৃপতি হামুরাবীর সমসাময়িক। তিনি সেমিটিক জাতির অন্তর্গত, যাযাবর-দলপতির মত ছিলেন। তাঁর নিজের ভ্রমণকাহিনী, তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির নানা গল্প এবং কি-করে তারা মিশরে বন্দী হয়েছিল, এইসব কথা ওল্ড টেষ্টামেণ্টে পাওয়া যায়। পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে **মোজেস** বা **মুশার** নেতৃত্বে ইহুদী জাতি, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর দক্ষিণ-প্যালেস্টাইনে ক্যানান দেশ আক্রমণ করে অধিকার করে।

এই সময় প্যালেস্টাইনের সমুদ্রের উপকূল-অঞ্চলে **ফিলিষ্টাইন** নামে

সল ও ডেভিড

এক অ-সেমিটিক, ইজিয়ান সভ্যতাভুক্ত জাতি বাস করতো। ফিলিষ্টাইনদের নগরগুলির মধ্যে গাজা, আসদদ, আস্কেলন এবং যোপ্পা সমধিক প্রসিদ্ধ। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আব্রাহামের ইহুদী বংশধরদের সঙ্গে ফিলিস্টাইন, মোয়াবাইটিস ও মিডিয়ানাইটিসদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। **'বুক অফ জাজেস'** গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রথমে হিব্রুগণ, পুরোহিত বিচারকদের শাসনাধীনে ছিল। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে তারা **সল** নামে এক রাজা নির্ব্বাচিত করে। সল বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই। তাঁর উত্তরাধিকারী **ডেভিড** অধিক পটুতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। এই সময় হিব্রুদের উন্নতির

যুগের উন্মেষ হয়। ডেভিডের পুত্র **সলোমনের** রাজত্বকাল জেরুজালেমের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিভিন্নপ্রকারের উন্নতি, আড়ম্বর এবং মন্দির ও সৌধ-নির্ম্মাণের দ্বারা সলোমনের রাজত্ব ইহুদীদের ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হয়। এসময়ে ইহুদীদের উন্নতির প্রধান কারণ, ফিনিশিয়দের সমৃদ্ধিশালী নগরী টায়ারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব। যদিও সলোমন একটি ছোট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন তথাপি মিশরের একজন ফারাও পর্য্যন্ত তাঁর কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।

হিব্রুদের উন্নতির যুগ বেশী দিন ধরে চলতে পারে নাই। ক্রমেই তাদের পতন হতে থাকে। নিজেদের মধ্যে তাদের ঝগড়া ও গৃহ-বিবাদ লেগেই ছিল। তাছাড়া, ইহুদীদের দুইটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, ইসরাইল ও জুডার চারদিকে আসিরিয়া, বাবিলন ও মিশর প্রভৃতি নামজাদা সাম্রাজ্য থাকায়, ইহুদী রাষ্ট্রদ্বয় ক্রমেই হীনবল হতে থাকে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭২১ সালে আসিরিয়গণ, ইসরাইল-রাষ্ট্র পরাভূত করে, ইহুদীদের বন্দী-ভাবে বাবিলনে চালান দেয়। কিছুদিন পর, **নেবুচাডনেজার** নামে চ্যালডিয়ান সম্রাট জুডা রাজ্য বিনষ্ট করেন, জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে পুড়িয়ে দেন এবং অবশিষ্ট ইহুদীদের বাবিলনে বন্দী করে রাখেন।
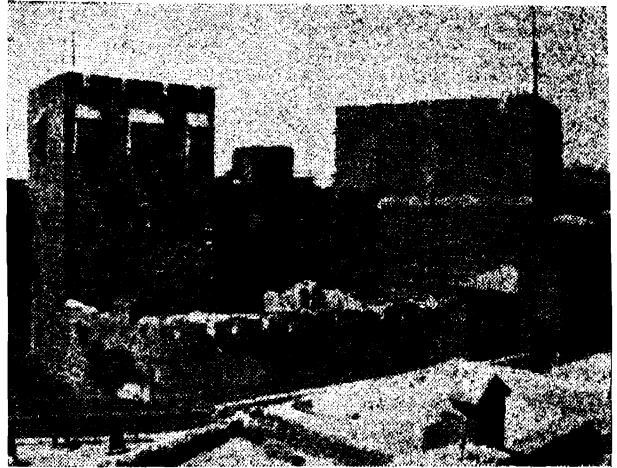
ডেভিডের "টাওয়ার"

তারপর, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন একিমিনিড-বংশের প্রথম সম্রাট **কাইরাস,** পারস্য-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন তখন ইহুদীগণ পুনরায় জেরুজালেম নগরী নির্ম্মাণ করে, সেখানে এসে, আবার বসবাস আরম্ভ করে। এই থেকে বহুদিন পর্য্যন্ত ইহুদীরা পারসিক শক্তির অধীনে থাকে।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, তখন মিশর-অভিযানের পথে, তিনি এই জেরুজালেম নগরী জয় করেন। তারপর থেকে অনেক দিন জেরুজালেম ছিল সেলুকস ও তাঁর পরবর্ত্তী গ্রীক-শাসকদের অধীন। গ্রীকেরা বহুবৎসর ধরে সেখানে রাজত্ব

করেছিল। তারপরে কিছুকাল জুড়িয়া রাজ্য স্বাধীন ছিল কিন্তু এরপর যখন রোমের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়, সেই সময় রোমানদের মধ্যে **পম্পে** নামে এক বড় বীরের অভ্যুদয় হয়েছিল। তিনি প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালিত করেন। তাঁর বিজয়-বাহিনীর কাছে ইহুদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেল, সেনাপতি পম্পে জেরুজালেম জয় করে নিয়ে বিজয়ীর বেশে সগৌরবে নগরে প্রবেশ করলেন।
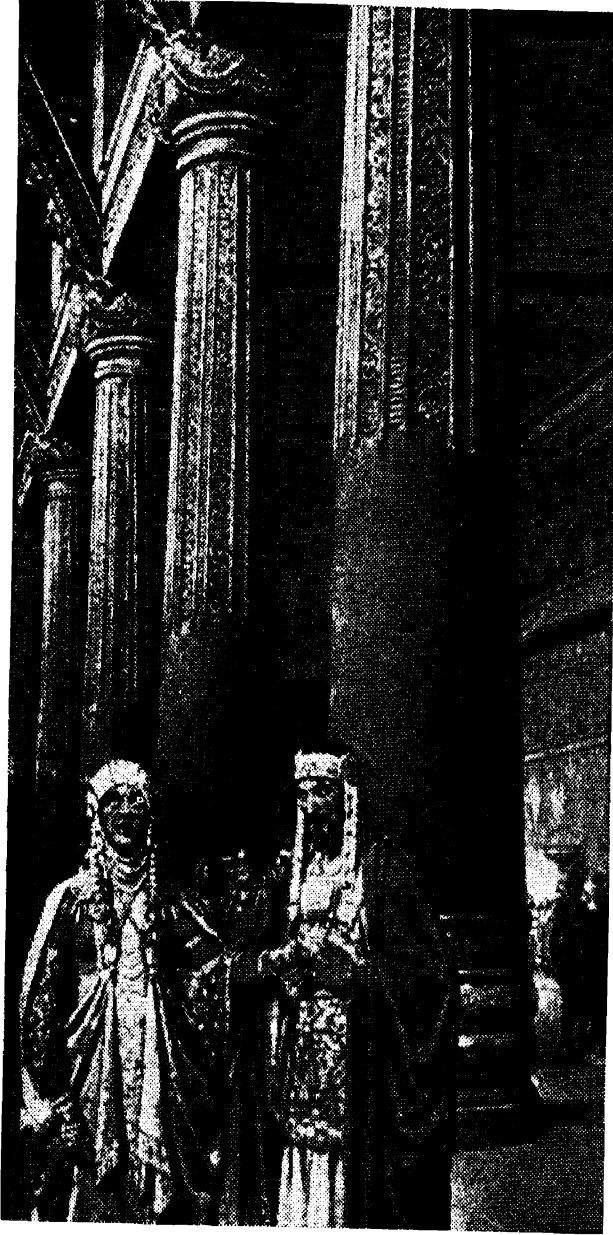
রাজা সলোমন

এরপর ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানগণ জোর করে জেরুজালেম অধিকার করলো এবং ইহুদীদের মন্দির ধ্বংস করে দিল। রোমানরা জেরুজালেমকে বিনষ্ট করে উহা আবার নিজেদের অভিরুচি অনুসারে গঠিত করে। তারা বহুদিন ইহুদীদের ঐ নগরীতে বাস করতে দেয় নাই।

'জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট'

ইহুদীরা এই বিপর্য্যয়ে খুব দুঃখিত হলো এবং আবার কবে স্বাধীনতা পাবে এই চিন্তায় তারা দিন কাটাতে লাগলো। প্যালেস্টাইনে **জর্ডন** নামে একটি নদী আছে। **জন** নামে একজন ইহুদী এই নদীর উপর ঘুরে বেড়াতেন এবং ইহুদীদের আশার বাণী শোনাতেন। তিনি সবাইকে বলতেন,
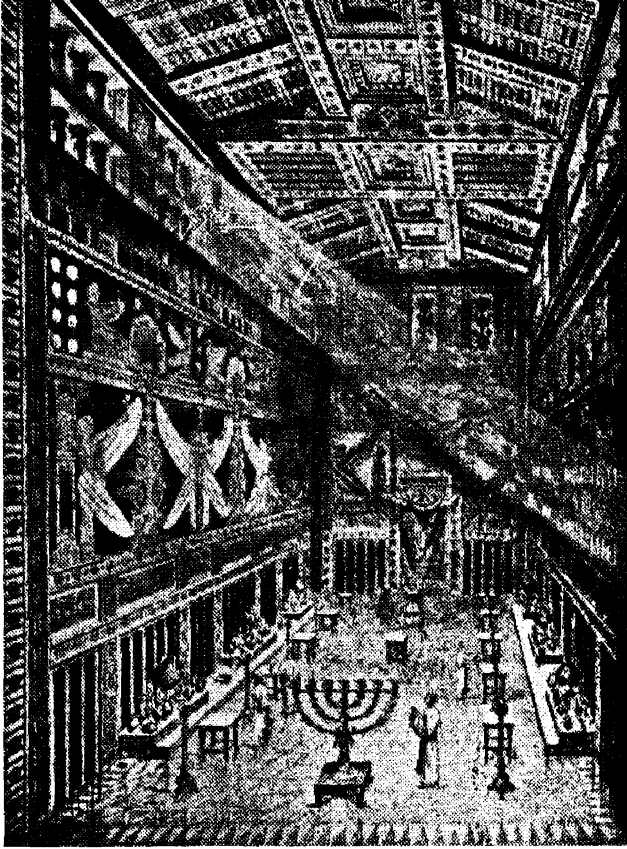
সলোমনের মন্দিরের ভিতরের একটি দৃশ্য

"তোমাদের মনটা খুব পরিষ্কার রেখো, কোন অন্যায় বা অসৎ চিন্তা মনে স্থান দিও না, তাহলে ভগবান তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।"

মন থেকে সব অসংভাব দূর করবার জন্য, তিনি ইহুদীদের জর্ডন নদীর জলে স্নান করতে বলতেন। এই স্নানকে বলা হতো **ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্‌** এবং জর্ডন নদীর জলে স্নান করতে উপদেশ দিতেন বলে জনের নাম হয়ে গেল **'জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট'**।

যীশুখৃষ্ট

একদিন জন যখন সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন, সেই সময় খুব অল্পবয়সের একটি ছেলে এসে সেখানে উপস্থিত হলো জনের উপদেশ শোনবার জন্য। ছেলেটি জনের খুড়তুতো ভাই। সে ছুতোর-মিস্ত্রির কাজ করতো, কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহুদীদের সমস্ত ভাল ভাল বইগুলো সে পড়ে নিয়েছিল। বালকটির নাম **যীশু**, প্যালেস্টাইনের **নাজারেথ** নামক সহরে তার জন্ম। জন তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে দেখলেন যে, যীশুর বয়স অল্প হলে কি হবে,

নেবুচাডনেজার-কর্তৃক জুডারাজ্যের ধ্বংস-সাধন

এই বয়সে সে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। জন, যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাকে আর নাজারেথে ফিরে যেতে দিলেন না।

জনের সঙ্গে কিছুদিন থাকবার পর, যীশু নির্জ্জনে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে, রোমানদের অধীনতা থেকে প্যালেস্টাইনের মুক্তি তাঁকেই আনতে হবে, তিনিই প্যালেষ্টাইনকে স্বাধীন করবেন এবং তার রাজা হবেন, এইটিই ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু দেশকে রোমানদের কবল থেকে মুক্ত করতে হলেই যুদ্ধ করতে হবে, তাতে

অনেক লোক মারা যাবে এবং এইভাবে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করলেও যে তা বেশী দিন রক্ষা করা যায় না, অন্যান্য দেশের বেলায়ও তা দেখা গেছে।

কিন্তু যদি সদুপদেশ এবং ভগবানের বাণী প্রচারের দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়, প্রত্যেক মানুষের মনে যদি ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে সমস্ত পৃথিবীতে এক নতুন পবিত্র সভ্যতার সৃষ্টি হবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না, পরের দেশ কেউ কেড়ে নিবে না, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। অবশ্য এইভাবে মানুষের মনে পরিবর্ত্তন আনতে অনেক সময় লাগবে। যীশু এই ভেবে ঠিক করলেন যে, তিনি সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, সমস্ত পৃথিবীর লোকদের কানে ভগবানের বাণী শুনিয়ে তাদের মধ্যে এক নতুন ধর্ম্মভাব ও মানবতা তিনি জাগিয়ে তুলবেন।

জেরুজালেম নগরীর ধ্বংসাবশেষ

যীশু তখন তাঁর বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। দেশের লোকদের তিনি শোনাতে লাগলেন, "দেখ, আমাদের আইনে বলে নরহত্যা করা নিষেধ, কিন্তু আমি বলি, তোমরা মানুষের উপর ক্রোধ পর্য্যন্ত করো না। সবাইকে যদি তোমরা ভালবাস, তাহলে দেখবে কারও উপর রাগ করবারই দরকার হবে না। যখন তুমি অন্যায় কর, তোমার মনটা হয়ত একটু খারাপ হয়। কিন্তু সে-কথা তোমার মনে থাকে না, নিজেকে তুমি ক্ষমা কর। তেমনি অপরে যদি তোমার প্রতি অন্যায় করে, তাকেও তুমি ক্ষমা করো। তোমাদের যদি কেউ ক্ষতি করে, তাদের প্রতিও তোমরা ক্রুদ্ধ হয়ো না, তাদেরও তোমরা ভাল করো। যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদের ভালবাসা তো সহজ। যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরও যদি ভালবাসতে পার, তাহলে সেটাই হলো আসল প্রেম। ভগবান এতে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।"

যীশুর মুখের এই সব উপদেশ শুনে, বহুলোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলো। এইভাবে প্রচার করতে করতে যীশু তাঁর জন্মস্থান নাজারেথে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তিনি যখন বললেন যে, ইহুদীদের উদ্ধারের জন্য তিনি ভগবানের বাণী প্রচার করছেন, নাজারেথের লোকেরা তখন ভয়ানক চটে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগলো, "এ ত সেই আমাদের মিস্ত্রীর ছেলে। এর বাপ-মা, ভাই-বোন

জেরুজালেম নগরীর পুনর্গঠন

সবাইকে আমরা জানি। এ আবার ভগবানের আদেশ পেল কবে, আমাদের উদ্ধারই বা এই মিস্ত্রীর ছেলে কি করে করবে?"

যীশুকে তারা সোজা জানিয়ে দিল, "নাজারেথ সহর থেকে চলে যাও।"

নিজের আত্মীয়-স্বজন, নিজের সহরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করলো না দেখে, দুঃখিত মনে, যীশু নাজারেথ ছেড়ে চলে গেলেন। নাজারেথ থেকে চলে গিয়ে যীশু তারপর অন্য সব জায়গায় ভগবানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

জেরুজালেমে প্রতি বৎসর খুব বড় একটা উৎসব হতো। চারদিক থেকে ইহুদীরা সবাই সেখানে আসতো। রাজা **হিরড** খুব চমৎকার একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন; সেই মন্দিরের সামনে একটি চত্বরে অসংখ্য পশু বলি দেওয়া হতো।

প্যালেষ্টাইনের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করবার পর, এই রকম এক উৎসবে, যীশু রওনা হলেন জেরুজালেমে। সেখানকার লোকজনেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বিরাট আয়োজন করলো। যীশু আসছেন শুনে সব লোক রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল তাঁকে দেখবার জন্য।

জেরুজালেম সহরে প্রবেশ করেই যীশু সোজা গেলেন উৎসব-মন্দিরে। সেখানে তিনি দেখলেন, অনেক পশু বিক্রী হচ্ছে, ইহুদীরা সেগুলি টাকা দিয়ে কিনছে আর মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে বলি দিচ্ছে। এই সুযোগে চতুর ব্যবসায়ীরা বেশ দু'পয়সা লুটে নিচ্ছে। যীশু এতে ভীষণ চটে গেলেন—ভগবানের মন্দিরে এ সব কি ব্যাপার? তিনি নিজেই এক চাবুক হাতে নিয়ে পশু-বিক্রেতাদের তাড়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যেরা দোকান-পাট সব ভেঙ্গে দিয়ে, মন্দিরের ত্রিসীমানা থেকে তাদের বার করে দিল।

জর্ডন নদী

জেরুজালেমের কোন লোক এতক্ষণ যীশুর বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই। রোমানরাও চুপ করে ব্যাপার দেখছিল। মন্দিরের এই ঘটনায় লোভী ব্যবসায়ীরা যীশুর উপর ভয়ানক চটে গেল। গোলমালের আশঙ্কায় রোমানরাও চিন্তিত হয়ে উঠলো। যীশুর উপর তারা কড়া নজর রাখলো। যীশু মন্দির থেকে তাঁর নতুন বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। মন্দিরের পুরোহিতেরা এ সব পছন্দ না করলেও কিছু বলতে ভরসা পেল না; কারণ, তারা দেখলো, যীশুর পক্ষে অনেক লোক রয়েছে। তারা গোপনে যীশুর বিরুদ্ধে নানা রকম কথা প্রচার করে, তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের মন বিষাক্ত করে তুলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

যীশু এইসব খবর পেয়ে খুব দুঃখিত হলেন। তিনি দেখলেন, ক্রমেই তাঁর শত্রুসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বারজন শিষ্য সর্ব্বদা তাঁর কাছে কাছে

থাকতেন; এঁদের তিনি খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। এর মধ্যে একজনের নাম ছিল **জুডাস ইসকারিয়ট**। যীশু যে ঠিক কি চান, জুডাস তা বুঝতে পারতো না, কাজেই যীশুর বিরুদ্ধে নানা কথা শুনে তাঁর উপর তার ভক্তি টলে গেল। সে ভাবলো যে, যীশুকে মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিছু টাকা রোজগার করাই বরং ভাল। যীশু যে কখন একা থাকতেন, পুরোহিতরা সে খবরটা কিছুতেই বার করতে পারতো না। এই খবরটি একবার পেলেই তারা এসে তাঁকে ধরতে পারতো। জুডাস ঠিক করলো, এই খবর সে তাদের পৌঁছে দেবে।

ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুখৃষ্ট

একদিন রাত্রে এই বারজন শিষ্যকে নিয়ে, খাওয়া শেষ করে, যীশু সহরের বাইরে গেলেন। কয়েকজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে গেল, কিন্তু জুডাস রয়ে গেল। সে গিয়ে খবরটি তুলে দিল পুরোহিতদের কানে। জুডাসের এই বিশ্বাস-ঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনা।

পুরোহিতরা গিয়ে যীশুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল। **পণ্টিয়াস পাইলেট** নামক একজন রোমান তখন জেরুজালেমের গবর্ণর। তিনি এবং পুরোহিতরা যীশুর বিচার করলেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। হুকুম হলো যে, জেরুজালেমের সীমানার বাইরে যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

যীশুকে যখন হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তখনও তিনি ভগবানের কাছে তাঁর শত্রুদের হয়ে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, "হে ভগবান, আমার হত্যাকারীদের ক্ষমা করো। এরা কি করছে, তা জানে না।"

যীশুকে ইহুদীরা তাদের রাজা মনে করতো বলে তাঁকে তারা বলতো 'খৃষ্ট'। 'খৃষ্ট' মানে ইহুদীদের রাজা। যীশু যে নতুন বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই বাণীই আজ পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্ম নামে পরিচিত।

মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইন

রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে, প্যালেস্টাইন নিয়ে, পূর্ব্ব-রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাটগণ ও ইরাণের সাসানিড-বংশের নৃপতিদের মধ্যে বহুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। ইসলাম-শক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইন আরব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরব বা সারাসেন্ রাজারা প্যালেস্টাইনের খৃষ্টানদের তীর্থস্থানগুলি নিয়ে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই। সেলজুক তুর্কীরা যখন প্যালেস্টাইন অধিকার করলো তখন থেকেই খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলি ও তীর্থযাত্রীদের উপর বিশেষ অত্যাচার-উৎপীড়ন সুরু হলো।

প্যালেস্টাইনে খৃষ্টান-তীর্থযাত্রীদের উপর নিগ্রহের কাহিনী ইউরোপে ক্রমাগত ছড়াবার পর ইউরোপীয়দের মধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। রোমের পোপ সমস্ত দেশের খৃষ্টানদের আহ্বান করলেন, প্যালেস্টাইনে গিয়ে তীর্থস্থানগুলি, তুর্কীদের কবল থেকে জোর করে উদ্ধার করবার জন্য। এ-থেকেই একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ সুরু হলো।

প্রথম ক্রুসেডের সময়, ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে, খৃষ্টান নায়কেরা এবং নাইট বা ধর্ম্মযোদ্ধাগণ তুমুল যুদ্ধ করে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার ও জয় করেন। তারপর তাঁরা সেখানে খৃষ্টান জেরুজালেম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আরব ও তুর্কীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে এ-রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মিশরের বিখ্যাত সুলতান, সালাদিন ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করেন। এর থেকে তৃতীয় ক্রুসেডের উৎপত্তি যাতে ইংলণ্ডের বীর রাজা রিচার্ড যুদ্ধ করেন। প্যালেস্টাইন কিছুকাল সেলজুক তুর্কী ও মিশরের মামলুকদের অধীনে থাকবার পর অটোমান তুর্কীদের হস্তগত হয়। অটোমান তুর্কীরা বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশের উপর রাজত্ব করে।

বর্ত্তমান প্যালেস্টাইন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও প্যালেস্টাইন ছিল তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন। মহাযুদ্ধে, ইংরেজরা তুরস্কের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন কেড়ে নেয়। প্যালেস্টাইন নামে স্বাধীন হয় বটে, কিন্তু ইংরেজ থাকে তার অভিভাবক।

হিটলার জার্ম্মেণী থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দেবার পর, ইংরেজরা তাদের প্যালেস্টাইনে স্থান দেয়, কিন্তু আরবরা এতে ভীষণ আপত্তি করে। প্যালেস্টাইনে এতদিন তারাই ছিল সংখ্যায় বেশী, ইহুদীদের আগমন তাদের মনঃপূত হলো না। এই নিয়ে সেখানে ভীষণ দাঙ্গা হয়। তারপর ইংরেজরা প্যালেস্টাইন ভাগ করে তার একদিকে আরবদের, আর একদিকে ইহুদীদের থাকতে বলে।

প্যালেস্টাইনের এক অংশে ইহুদীদের জন্য **ইসরাইল**-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে, ইংরেজ শাসনকর্ত্তা সেখান থেকে অপসৃত হয়ে এলেন। এই ইসরাইল-রাষ্ট্র হয়েছে ইহুদীদের স্বাধীন এবং নিজস্ব দেশ; কিন্তু প্যালেস্টাইনের আরব-অংশ এই ইহুদী-রাজ্যকে স্বীকার করে নিতে রাজী হয়নি কখনও। সমগ্র আরবদেশের সম্মিলিত মুসলিম-রাজ্যগুলি সশস্ত্র হয়ে ইসরাইলকে একযোগে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি। ইত্যবসরে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠান প্যালেস্টাইন-সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেন।

১৯৪৮ সালে, আরবজাতিসমূহের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যালেস্টাইনের এক অংশে **ইসরাইল** বা **ইহুদী-রাষ্ট্র** আইনগত ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন ঐ রাষ্ট্র, স্বাধীন দেশরূপে রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন লাভ করেছে। প্যালেস্টাইনের অধিকাংশই আরবজাতির লোক। দীর্ঘযুগ ধরে ইহুদীগণ পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিল। আরবগণ, বর্ত্তমানে প্যালেস্টাইনে ইহুদী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এই কারণে, ভারতবর্ষ কিছুদিন পর্য্যন্ত ইহুদী-রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকার করে নিতে ইতস্ততঃ করেছিল; কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ তারিখে ভারতও নতুন ইসরাইল-রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্যালেস্টাইনের ইসরাইল-রাষ্ট্র ও আরব-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এখনও গোলযোগ লেগেই আছে।

ইসরাইল-রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ডাঃ ওয়াইৎসম্যান ১৯৫২ সালে পরলোক-গমন করেছেন। প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী-রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। বর্ত্তমানে ইসরাইল রাজ্যের জনসংখ্যা ১১৭০,০০০; তন্মধ্যে ৭১৩,০০০ ইহুদী, ৬৯,০০০ আরব আর বাকি সকলে খৃষ্টান প্রভৃতি। রাজ্যের রাজধানীর নাম **তেল আভিভ**।

ভারতের ইতিহাস শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরাকালে প্রাচীন গ্রীসের মত, ভারতবর্ষও উপনিবেশ বিস্তার ও অসংখ্য ঔপনিবেশিক-রাজ্য নির্ম্মাণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। স্থলপথে ও জলপথে ভারতীয় সদাগর, ধর্ম্মপ্রচারক এবং পরিব্রাজকবৃন্দ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে দূর-দূরান্তে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম ছড়িয়েছিল। সে যুগের ভারতবাসী, তার উদার সভ্যতা দ্বারা, ভারতের আশপাশের বহু দেশকে প্রভাবিত করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম তাদের আদর্শ, প্রেরণা ও শিল্পকলা নিয়ে নানাজাতির লোকের মধ্যে সভ্যতা প্রসারিত করেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য-এশিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চলে, ভারতীয় সভ্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভারত-সংস্কৃতির অধিক প্রসারতা হয়েছিল পূর্ব্বদিকে ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ অঞ্চলে।

যুগে যুগে ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়ীর দল অর্থ ও অজানার মোহে পূর্ব্বভাগের অসংখ্য দেশগুলির আবিষ্কারের জন্য অগ্রসর হয়েছে। ইন্দোচীন, শ্যাম, বর্ম্মা এবং পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিকে ভারতবাসীরা **সুবর্ণভূমি** বা **সুবর্ণদ্বীপ** নামে অভিহিত করতো। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপগুলির মশলাদ্রব্যও তাদের আকৃষ্ট করতো। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে

আরবদের এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের যেসব জিনিষ আকৃষ্ট করেছিল, ভারতীয়রাও প্রাচীনকালে সে সব আকর্ষণের দ্বারাই প্রলুব্ধ হয়ে ঐ দেশগুলিতে ছুটে যেত।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-প্রচারকদের উৎসাহ, ক্ষত্রিয় ও অভিজাতবংশীয় যুবকদের অভিযান-লিপ্সা এবং দুঃসাহসিক নাবিকদের সামুদ্রিক বিচরণের ফলে, ক্রমে
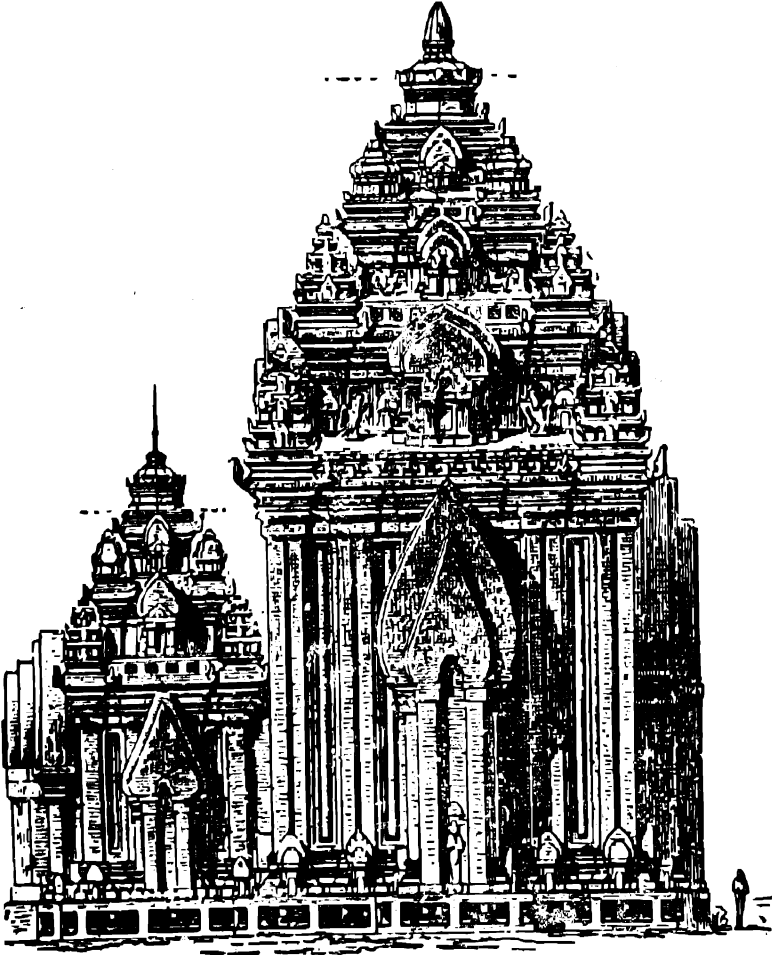
পো-নগরের মন্দির

ইন্দোচীন উপদ্বীপ ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অগণিত ভারতবাসী গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। এদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী ভাবে ঐসব বিদেশে বসবাস সুরু করলো। তারা স্থানীয় স্ত্রীলোকদেরই বিয়ে করতো এবং তাদের উন্নত সভ্যতার প্রভাবে ঐ সব স্থানের সমাজ, রীতিনীতি হিন্দু-আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হলো। হিন্দুসভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য ও ধর্ম্ম স্থানীয় লোকদের মধ্যে ছড়ালো।

হিন্দুরাও সেখানকার লোকদের কিছু কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করলো। কখনো কখনো কোন সামরিক অভিযাত্রিক, জোর করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একটা হিন্দুরাজ্যের পত্তন করতো। এরূপে অনেক ঔপনিবেশিক হিন্দুরাজ্য ও সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ আস্তে আস্তে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে গিয়ে হিন্দু নাম, সংস্কৃত অথবা পালি ভাষা এবং হিন্দুধর্ম্ম ও নিয়ম-প্রথা গ্রহণ করতো।

মালয়, বর্ত্তমান ইন্দোনেশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে দলে দলে ভারতবাসীর অভিগমন ও উপনিবেশ-বিস্তারের ইতিহাস অনেক বৌদ্ধ জাতকগল্প, কথাসরিৎসাগর ও অপরাপর কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক যুগে, ভারতীয়রা প্রথমে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অনতিপূর্ব্বে বা পরে সুবর্ণভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করে। রোমক ঐতিহাসিক টলেমির লেখা হতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয়রা সুবর্ণভূমিতে অনেক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বালি ও বোর্ণিও দ্বীপে মেলা হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। এ রাজ্যগুলির ইতিহাস সংস্কৃত তাম্রশাসন ও চৈনিকদের বিবরণে পাওয়া যায়। এসকল রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, বিশেষ করে শৈবধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকেরা, দীর্ঘ হাজার বছর ধরে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল।

চম্পা ও কম্বোজরাজ্য

ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যও স্থাপিত করেছিল। এসব সাম্রাজ্যের কোন কোনটা, মূল ভারতের হিন্দুরাজ্যের অবসানের পরেও, সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপে তাদের স্বাধীন রাজত্ব চালিয়েছিল। ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুটি শক্তিশালী রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়েছিল।

চম্পারাজ্য বর্ত্তমান আনামদেশে স্থাপিত হয়েছিল। এই রাজ্যের কয়েকজন রাজার নাম উল্লেখযোগ্য, যথা, জয়পরমেশ্বরবর্ম্মদেব ঈশ্বরমূর্ত্তি, রুদ্রবর্ম্মন, হরিবর্ম্মন, মহারাজাধিরাজ শ্রীজয়ইন্দ্রবর্ম্মন এবং জয়সিংহবর্ম্মন। এরা বিখ্যাত বীর ছিলেন এবং কম্বোজ জাতি ও প্রসিদ্ধ মঙ্গোলবীর কুবলাই

খানের আক্রমণ, সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। চম্পারাজগণের চীনাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এ রাজ্য ১৫০ খৃঃ থেকে ১৪৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত তেরশত বৎসরেরও অধিককাল চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মঙ্গোল-জাতীয় আনামীদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে চম্পারাজ্যের অবসান হয়। চম্পায় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু নগর গড়ে উঠেছিল, সুন্দর সুন্দর হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরে সারা দেশটি শোভিত হয়েছিল।

চম্পার উপকূলে **কৌঠার** বোধহয় হিন্দুদের প্রথম উপনিবেশ। চম্পার সবচেয়ে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি কৌঠার কিংবা তার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেই
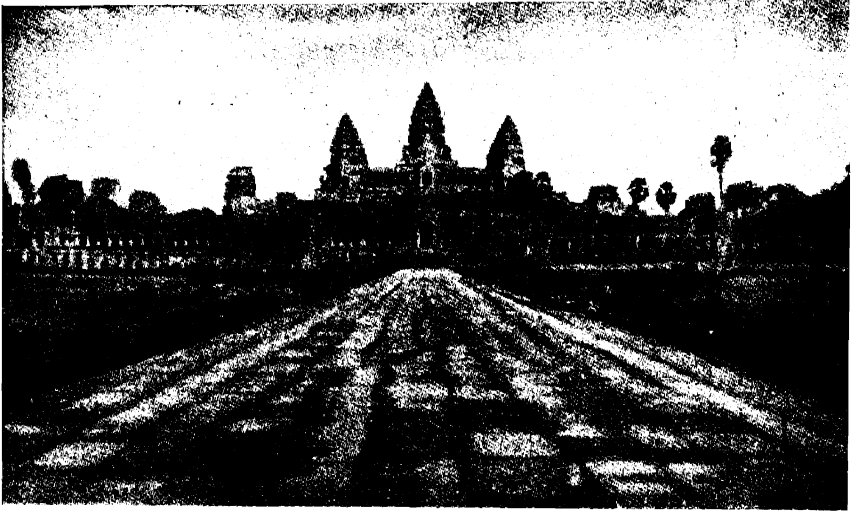
আঙ্কোরভাট

পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশী শিলালিপি পাওয়া গেছে **পো-নগরে**; কারণ সেইটিই ছিল প্রাচীন কৌঠারের রাজধানী।

হিন্দু কম্বোজরাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোজরাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা বর্ত্তমান কাম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছিল, চীনারা একে 'ফু-নান' বলতো। এ রাজ্য খুব প্রতাপশালী হয়ে ওঠে ও অনেক সামন্তরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কম্বোজ সম্বন্ধে একজন চৈনিক লেখক বলেছেন: "ভারত হতে এক হাজারের বেশী ব্রাহ্মণ এসে এখানে বাস করছেন। দেশের লোকেরা তাঁদের ধর্ম্ম অনুসরণ করে আর তাঁদের কাছে নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দেয়। এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ দিনরাত তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি

অধ্যয়ন করেন।" ফু-নানের রাজগণ ভারত ও চীনে তাঁদের রাষ্ট্রদূতগণকে পাঠাতেন।

ফু-নানের একটি সামন্তরাজ্য, কম্বোজদেশ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করে। এই সামন্ত-প্রদেশের নাম থেকেই পরে গোটা রাজ্যের নাম কম্বোজ হয়। কম্বোজের হিন্দুরাজারা নয়শত বৎসর পর্য্যন্ত মহা আড়ম্বরে রাজত্ব করেন। এ রাজ্যের বীর্য্যশালী নৃপতিদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং সপ্তম জয়বর্ম্মন, যশোবর্ম্মন এবং দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মনের নাম উল্লেখ করা চলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বদিক থেকে আনামী জাতি এবং পশ্চিমদিক থেকে থাইদের ক্রমান্বয় আক্রমণে কম্বোজরাজ্যের পতন হয়। বর্ত্তমানে এ রাজ্য ফরাসী পরিচালনাধীনে আছে।

কম্বোজরাজ্য চম্পারাজ্য থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিল। কম্বোজ-সাম্রাজ্যের পূর্ণ পরিণতির সময়ে শুধু বর্ত্তমান কাম্বোডিয়া নয়, কোচিন-চীন, লাওস, শ্যাম, বর্ম্মার কতকাংশ এবং মালয় উপদ্বীপও এর অন্তর্বর্ত্তী ছিল। অনেক সংস্কৃত তাম্রশাসন থেকে আমরা এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত জানতে পারি। জগৎবিখ্যাত **আঙ্কোরভাট** মন্দির, **আঙ্কোরথোমের** মন্দিরসমূহ এবং আরও অসংখ্য মন্দিরের অপরূপ কারুকার্য্যাবলী, কম্বোজবাসীদের অসাধারণ মানসিক উন্নতি ও উৎকর্ষতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য এখনও দিচ্ছে।

আঙ্কোরভাট পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য মন্দির। ইহা একটি বিষ্ণুমন্দির। কম্বোজের রাজধানী যে আঙ্কোরথোমে আবিষ্কৃত হয়েছে তার অনতিদূরেই এই আঙ্কোরভাট অবস্থিত। এ বিরাট মন্দির নানাস্তরে বিভক্ত। প্রধান প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে গেলে, বহু চত্বর ও অলিন্দ অতিক্রম করে, উচ্চ সোপান বেয়ে উঠতে হয়। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে খোদিতচিত্রের অপূর্ব্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। কোথাও রামায়ণের কাহিনী, কোথাও পৌরাণিক কথা, কোথাও বা মহাভারতের কাহিনী প্রভৃতি, ভাস্করের সুনিপুণ হস্তে মূর্ত্তি পেয়েছে। এ মন্দিরে আটটি গগনস্পর্শী চূড়া আছে। এ বিশাল মন্দিরের চারদিক পাথরের দেওয়ালে বেষ্টিত, তার নানা অংশে তোরণ ও গ্যালারী।

শুধু কম্বোজ কেন, সমস্ত হিন্দুজগৎ খুঁজলেও আর আঙ্কোরভাট মন্দিরের তুলনা মিলবে না।. কম্বোজের সমস্ত দুঃখ-ধ্বংসের ভিতরেও এই আঙ্কোরভাট এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় রাজা যশোবর্ম্মনের সময়

(৮৮৯ খৃঃ) আঙ্কোরে রাজধানী স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ নৃপতি সপ্তম জয়বর্ম্মনের সময় এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে বর্ত্তমান আঙ্কোরথোম।

বায়ন মন্দির

আঙ্কোরভাট রাজা দ্বিতীয় **সূর্য্যবর্ম্মনের** রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। সূর্য্যবর্ম্মনের রাজত্বকাল বোধহয় ১১১২ থেকে ১১৬২ খৃঃ।

রাজধানী আঙ্কোরথোমের তখনকার নাম ছিল **যশোধরপুর**। বিশাল প্রাকার—প্রায় নয় মাইল ধরে চতুষ্কোণ যশোধরপুরকে বেষ্টন করে রয়েছে। পাঁচটি দরজা দিয়ে এই নগরে প্রবেশ করা যেত। নগরটির ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে

বায়ন মন্দির অবস্থিত। এখন বায়নের মন্দিরচূড়া মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে, অনেক শতাব্দী ধরে সেখানে আর মঙ্গল-ঘন্টা বাজে না। বায়নের

বায়ন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ স্থাপত্যের নিদর্শন

বাইরের দিকটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও মন্দিরের ভিতরকার অংশ এখনও অনেকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাতে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ন নির্ম্মাণেই বোধহয় কম্বোজের স্থপতিদের নৈপুণ্যের চরম

পরিণতি হয়েছিল। কম্বোজের দুর্ভেদ্য বনানীর ভিতর তার অসংখ্য কীর্ত্তি আজও লুক্কায়িত রয়েছে। ভারত-ইতিহাসের এক বড় গৌরবের কাহিনী কম্বোজের অগণিত ভগ্ন-নিদর্শনের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

শ্রী-বিজয় রাজ্য

সুমাত্রা দ্বীপে অতি প্রাচীন কালে, শ্রী-বিজয় নামে হিন্দুরাজ্য গঠিত হয়। এ রাজ্য বোধহয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর শেষ-ভাগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। চৈনিক পরিব্রাজক **আই-সিং** বলেন যে, দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রী-বিজয় বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চ্চার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল এবং শ্রী-বিজয় রাজ্যের বাণিজ্য-অর্ণবপোতসমূহ ভারতবর্ষ ও শ্রী-বিজয়ের মধ্যে আনাগোনা করতো। আই-সিংএর বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রী-বিজয় নগরী। মালয় উপদ্বীপে, লিগোরে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি থেকে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, শ্রী-বিজয় দ্রুতগতি একটি বড় বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে পরিণত হচ্ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ শ্রী-বিজয়রাজকে তাঁদের অধিরাজ বলে মানতেন।

শ্রী-বিজয় রাজ্য ৬৭৫ থেকে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ কালের মধ্যে অনেক দেশ জয় করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সমস্ত মালয় উপদ্বীপের উপর এর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রী-বিজয়ের উন্নতির সময় চীনের সঙ্গে এ রাজ্যের নিয়মিত দৌত্যকার্য্য চলতো।

সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সুবর্ণদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার

বোর্ণিও, জাভা ও মালয় উপদ্বীপে যে সংস্কৃত শিলালিপিগুলি পাওয়া গিয়েছে তাতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি ওদিককার দেশগুলিতে ব্যাপক ছড়িয়েছিল ও তাদের সম্পূর্ণ জয় করেছিল। পশ্চিম-জাভার সমাজ ছিল হিন্দুপ্রাধান্যপূর্ণ আর তার রাজদরবারে দেখা যায় যাবতীয় হিন্দু-আইন-কানুন। উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় স্থানসমূহের নাম ছড়ানো হতো ;—যেমন, চম্পারাজ্য, চন্দ্রভাগা ও গোমতিনদী প্রভৃতি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি বহু দেবদেবীর অনেক

মূর্ত্তি নানাস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিবিধ মূর্ত্তি ও শিলালিপিগুলি হতে প্রতীয়মান হয়, যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মও সেরূপ এ-সকল অঞ্চলে খুব প্রধান হয়ে উঠেছিল। সুবর্ণদ্বীপের লোকেরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জোর চর্চ্চা করতো। প্রাপ্ত লেখাগুলিতে উন্নত ধরণের নির্ভুল সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। চীন-পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন**-এর লেখায় দেখা যায় যে, সে সময়ে জাভাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তবে কাশ্মীরের রাজপুত্র **গুণবর্ম্মন** প্রভৃতির চেষ্টায় শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্মও জাভায় একটি প্রধান ধর্ম্ম হয়ে উঠে। গুণবর্ম্মন প্রথম লঙ্কাদ্বীপে যান, সেখান থেকে জাভায় গিয়ে তথাকার রাণী-মাতাকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দেশের লোকেরাও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতে থাকে।

গুণবর্ম্মনের নাম ও যশঃ অচিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অনুরোধে চীন-সম্রাট গুণবর্ম্মনকে তাঁর দেশে আমন্ত্রণ করেন। গুণবর্ম্মন নন্দিন নামক হিন্দু বণিকের জাহাজে চড়ে, ৪৩১ খৃষ্টাব্দে, চীনের অন্তর্গত নানকিং নগরীতে উপস্থিত হন। কয়েকমাসের মধ্যেই, পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমিতে বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। নানা কেন্দ্রে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হতো, বিদেশী পণ্ডিতেরাও এসব স্থানে জ্ঞান আহরণের জন্য আসতেন। শ্রী-বিজয় ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে মহাযান বৌদ্ধমত পালিত হতো।

এযুগে ভারত ও তার উপনিবেশগুলির মধ্যে নিয়মিত আদান-প্রদান ও নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন ছিল। ঔপনিবেশিকগণ দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় ভাবধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে যেত। অনেকের ধারণা যে বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতের বাইরে ছড়িয়েছে, হিন্দুধর্ম্ম ছড়ায় নাই, কিন্তু সে ধারণা অত্যন্ত ভুল। বর্ম্মা ও শ্যাম ব্যতীত সুবর্ণভূমির অপরাপর বিস্তৃত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতাই দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সমসমকালে যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, সেই ধর্ম্মধারাই উপনিবেশ অঞ্চলে অধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচলনই বেশী হয়েছিল। ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য এখানেও প্রতিফলিত হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মমতের লোক পাশাপাশি বাস করতো তথাপি তাদের ভিতর কোন বিরোধ-বিসম্বাদ ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম্মপন্থীদের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্প্রীতির ভাব বিদ্যমান ছিল।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য

অষ্টম শতাব্দীতে স্নুবর্ণদ্বীপ বা স্নুবর্ণভূমির অধিকাংশ রাজ্য একটি প্রবল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য চারশত বৎসরেরও অধিককাল **শৈলেন্দ্র-রাজবংশের** অধিকারে ছিল, সুতরাং এই যুগকে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের যুগ বলা চলে। এই সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ আগে মালয় উপদ্বীপে তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন, শ্রী-বিজয় রাজ্যের হাত থেকে লিগোর অংশ জয় করেন এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জাভায় তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের যুগে দ্বীপময় ভারতের বিরাট অঞ্চলে শাসনশৃঙ্খলায় একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়। এ সাম্রাজ্য অসাধারণ গৌরব ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছিল। এ যুগে একটি অভিনব সংস্কৃতি-রীতির প্রবর্ত্তন হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের নতুন উদ্যম এবং জাভাতে চণ্ডি কলসন্ ও **বরবুদার** মন্দিরে যে অপূর্ব্ব শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় তা' শৈলেন্দ্র ভূপতিদের উৎসাহ ও প্রেরণাতেই সম্ভবপর হয়েছিল।

কোন্ বিশেষ স্থানটি শৈলেন্দ্রদের শাসনকেন্দ্র ছিল তা' এখনও ঠিকমত জানা যায় নাই। খুব সম্ভব জাভা কিংবা মালয় উপদ্বীপের কোন জায়গায় এঁদের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত ছিল। অনেক আরব লেখক শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। তাঁরা একে জাবাগ, জাবাজ অথবা মহারাজের সাম্রাজ্য নামে আখ্যায়িত করেছেন। এঁদের লেখা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সাম্রাজ্য যেমন ছিল দূরবিস্তৃত তেমনি এর ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের অবধি ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্রদের নৌ-শক্তি ও বাণিজ্য-প্রতিপত্তি পৃথিবীর নানা জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। অষ্টম শতাব্দীই শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরবের যুগ।

বাংলাদেশের পাল সম্রাটগণের সঙ্গে শৈলেন্দ্র সম্রাটদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জানা যায় যে, ৭৮২ খৃষ্টাব্দে **কুমারঘোষ** নামে একজন বাঙ্গালী মহাযান বৌদ্ধপন্থী শৈলেন্দ্র-রাজগণের রাজগুরু ছিলেন। আরব লেখকগণের মত চৈনিক বিবরণীতেও শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। চৈনিক লেখায় এ সাম্রাজ্য সান-ফো-সি নামে অভিহিত হয়েছে। দশম শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্রদের বহুবার রাজদূত বিনিময় হয়েছিল। এ

সময়ে শৈলেন্দ্রদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি খুব প্রসারতা লাভ করেছিল।

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের শক্তিশালী চোল নৃপতিদের সঙ্গে শৈলেন্দ্রদের দীর্ঘসংগ্রামের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে চোলদের নৌ-সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে। রাজেন্দ্র চোল ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, পালরাজকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের কতকাংশও তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর প্রবল নৌবহর সাগরবক্ষে দূরদূরান্তে গর্ব্বভরে বিচরণ করে বেড়াতো। শীঘ্রই তাঁর যুদ্ধজাহাজবহর শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শৈলেন্দ্রগণ পরাজিত হন এবং তাঁদের সাম্রাজ্যের নানাস্থান চোল সম্রাটের অধীনস্থ হয়।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ ছিল যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ তাদের কর্ত্তৃত্বাধীনেই ছিল। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভুত্ব লাভ করবার মানসেই বোধহয়, চোল সম্রাট শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমরাভিযান প্রেরণ করেছিলেন। যদিও চোলগণ বেশ কিছুকাল শৈলেন্দ্রদের উপর কর্ত্তৃত্ব করেছেন তবু সুদূর সুবর্ণদ্বীপের উপর বেশীদিন আধিপত্য বজায় রাখা তাঁদের পক্ষে সহজ হয় নাই। একাদশ শতাব্দীর শেষদিকেই আবার শৈলেন্দ্রগণ তাঁদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পান। এর পরেও দীর্ঘদিন তাঁদের সাম্রাজ্য ক্ষমতা ভোগ করেছে।

চোল সম্রাটদের হাত থেকে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য তার পূর্ব্ব স্বাধীনতা ফিরে পেলেও পূর্ব্বগৌরব আর বেশীদিন অটুট রাখতে পারলো না। শীঘ্রই চারদিক দিয়ে ভাঙ্গন সুরু হওয়ায় সাম্রাজ্য-গরিমা ম্লান হতে লাগলো। সাম্রাজ্য, উত্তর দিকে, শ্যামের নতুন সামরিক বিজয়ীজাতি থাইদের দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং দক্ষিণ দিকে, নববলীয়ান মলায়ু রাজ্য তাকে বিপর্য্যস্ত করলো। শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব নষ্ট হলো এবং উহা বিগতশ্রী হয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত হলো। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জাভার এক নতুন রাজশক্তি শৈলেন্দ্র-রাজ্য জয় করে। মালয় উপদ্বীপের বর্ত্তমান কেডডাতে যে শৈলেন্দ্রদের একটি ছোট রাজ্য ছিল, তার শেষ হিন্দুরাজা ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের যুগে ইন্দো-জাভা শিল্প অসামান্য উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। পৃথিবীবিখ্যাত বৌদ্ধ বরবুদার মন্দির বোধহয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল। মধ্য-জাভার যে অঞ্চলে **চণ্ডি কলসন,** চণ্ডি সারি এবং চণ্ডি সেবু প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর মন্দির অবস্থিত তারই সন্নিকটে, কেদু
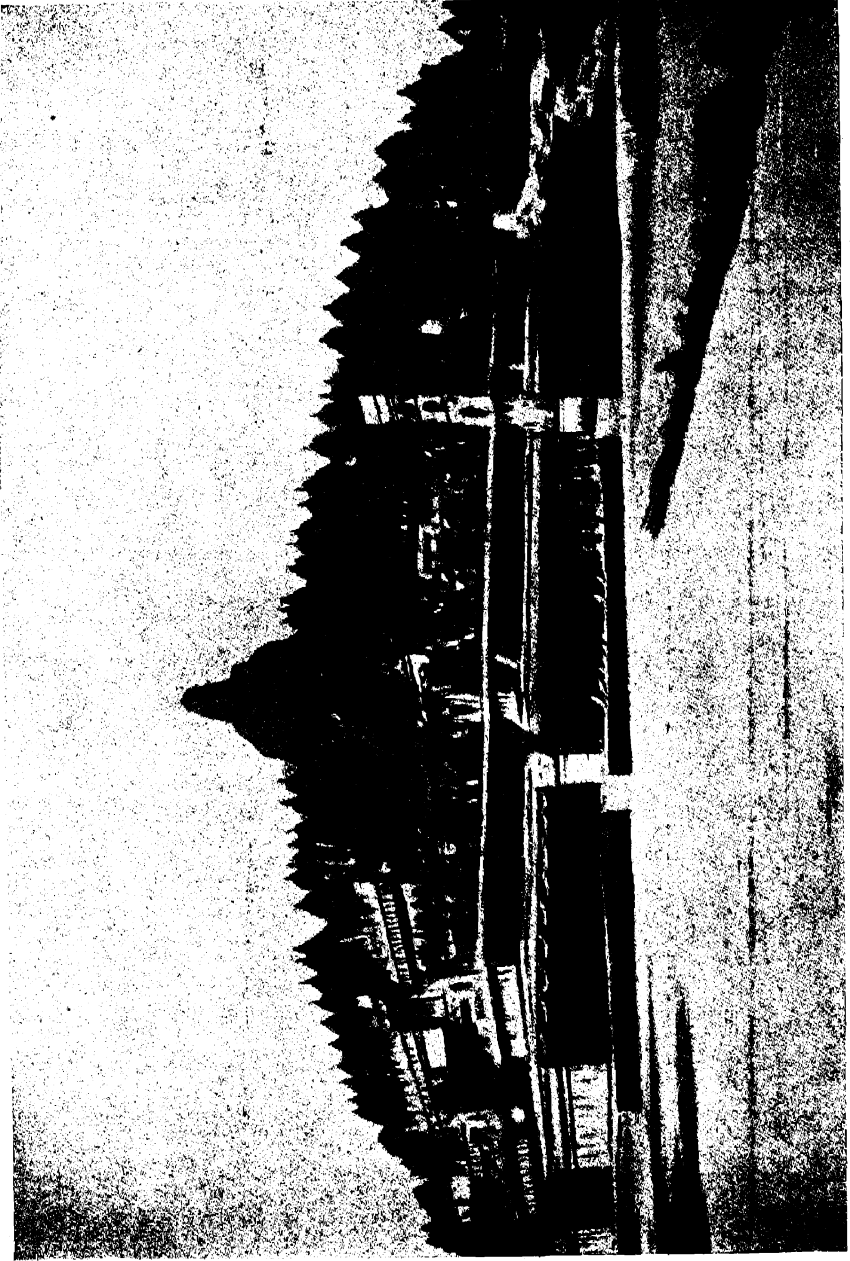
বরবুদার মন্দির

সমতলক্ষেত্রে বরবুদার দণ্ডায়মান রয়েছে। ঐ মন্দিরের বিরাট সুসমঞ্জসতা এবং এর অজস্র অপূর্ব্ব মণ্ডনশিল্পসম্ভারের তুলনা, এক কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট ব্যতীত, পৃথিবীতে আর কোনও মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ।

বরবুদার মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এ পাহাড়টি সবুজ কেদু সমতলভূমির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণীর বেষ্টনী। মহান্ বরবুদার সৌধ পর পর নয়টি স্তরে গঠিত, সর্ব্বোচ্চ স্তরের কেন্দ্রদেশে মুকুটের মত একটি স্তূপ স্থাপিত। সর্ব্বনিম্ন স্তরের দৈর্ঘ্য ১৩১ গজ আর সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্যাস মাপ ৩০ গজ। মন্দিরের ভিতরে অনেক গ্যালারী ও তাদের গায়ে কারুকার্য্যমণ্ডিত অগণিত মূর্ত্তি। মন্দিরে বহু ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। গ্যালারীর প্রত্যেক পাশের মধ্যদেশে সোপানাবলী ও তোরণ আছে। এই সোপান বেয়ে উপরের গ্যালারীতে যেতে হয়। গ্যালারীগুলির অসংখ্য মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে আশ্চর্য্য ভাস্কর্য্য-শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই বুদ্ধের জীবনী ও জাতক-কাহিনীগুলির অবলম্বনে রচিত হয়েছে। বরবুদারের শিল্পরীতি দেখে মনে হয় যে, এর আদর্শ প্রধান-ভাবে ভারতের গুপ্তযুগের উন্নত শিল্পকৌশল থেকেই নেওয়া হয়েছে।

মজাপহিৎ সাম্রাজ্য

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য ব্যতীতও আর কয়েকটি রাজ্য জাভায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে মধ্য-জাভায় মাতারাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে মধ্য-জাভাই ছিল রাজনীতি, জ্ঞান ও বিদ্যার শীর্ষস্থান। মধ্য-জাভা অঞ্চলে শৈলেন্দ্র শাসকবৃন্দের আধিপত্যের ফলে, মূল-জাভার রাজগণ ক্রমেই পূর্ব্ব-জাভায় গিয়ে বাস করা সুরু করেন। আস্তে আস্তে পূর্ব্ব-জাভা প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। দশম শতাব্দীর মাঝা-মাঝি থেকে পূর্ব্ব-জাভা বড় হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। এর পর প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-জাভাই হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতা কৃতিত্বের সঙ্গে ধারণ করে। পূর্ব্ব-জাভায় **কাদিরি** রাজ্য ও **সিংহসারি**-বংশের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য। তারপর রাজকুমার **বিজয়ের** বিচিত্র সংগ্রাম-কাহিনীর সঙ্গে বিখ্যাত মজাপহিৎ রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস জড়িত।

বিজয়ের সুচতুর চক্রান্তে পূর্ব্ব-জাভার একস্থানে একটি নতুন লোকালয় গড়ে ওঠে। এই স্থানই মজাপহিৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথিত আছে যে,

নতুন উপনিবেশবাসীর এক ব্যক্তি একটি মজা বা বিল্বফলের স্বাদ গ্রহণ করেন এবং তিনি ঐ ফলটিকে পহিৎ বা তিক্ত দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এই ঘটনা থেকেই ঐ স্থানটির নাম হয় মজাপহিৎ বা তিক্ত-বিল্ব। এই সময়ে চীন-সম্রাট কুবলাই খাঁ জাভার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। জাভার
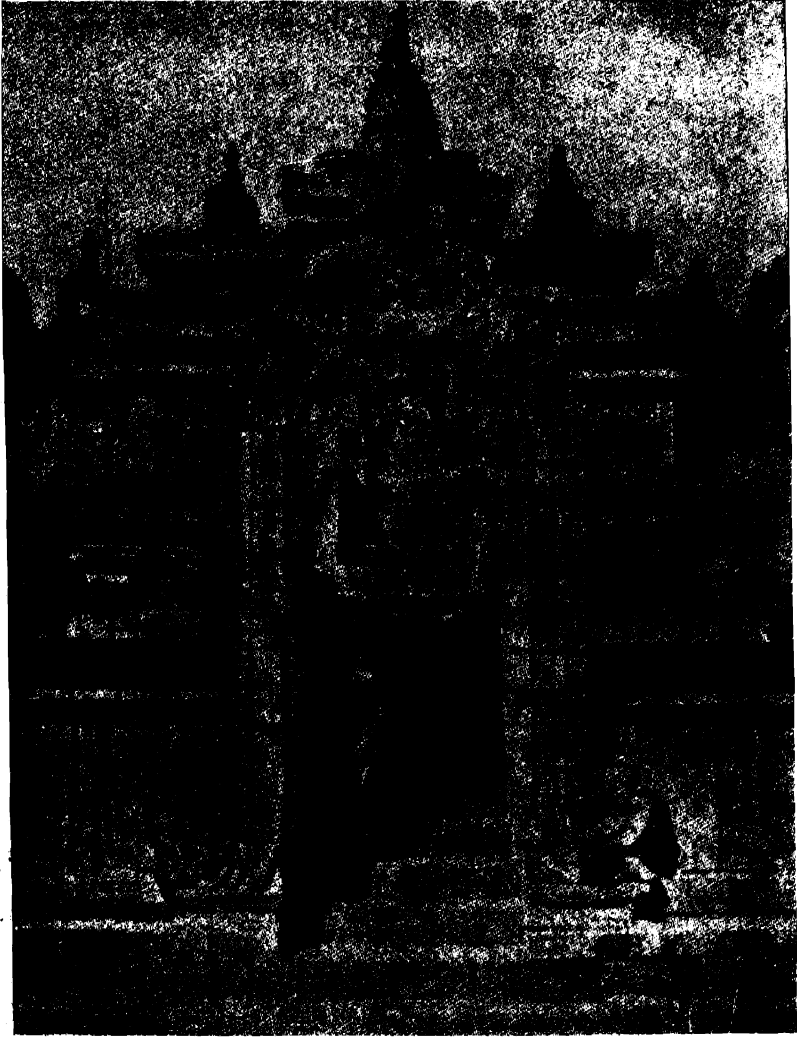
বরবুদার সোপানাবলী

রাজা ছিলেন বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিজয় চীন-অভিযানের সুযোগ নিয়ে মজাপহিতে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। চীনা সৈন্যগণ জাভা ছেড়ে চলে গেলে বিজয় জাভার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু হলেন, মজাপহিৎ নগরী হলো তাঁর রাজধানী। তিনি চীন-সম্রাটের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত করলেন।

বিজয় সিংহাসনে উপবেশন করে কৃতরাজস জয়বর্দ্ধন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধিতে রাজত্ব চালিয়ে ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে মারা যান। কৃত-রাজসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জয়নাগর সিংহাসনে বসেন। জয়নাগরের রাজত্বকালে অনেক বিদ্রোহ হয়, তার মধ্যে কুটি নামক এক ব্যক্তির বিদ্রোহ খুব প্রবল হয়েছিল। **গজামদ** নামক রাজা জয়নাগরের এক বীর, বিশ্বস্ত অনুচরের চেষ্টায় কুটি'র বিদ্রোহ দমিত হয়। এই সময় মজাপহিৎ বা জাভার মহারাজার অসীম ক্ষমতা ছিল, অন্য সাতজন নৃপতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন। জাভা ছিল জনবহুল দেশ ও মূল্যবান্ মশলাদ্রব্যে পূর্ণ। রাজপ্রাসাদ সোনা, রূপা ও নানাপ্রকার মহার্ঘ প্রস্তরাদির দ্বারা শোভিত ছিল।

গজামদ অনেকদিন পর্য্যন্ত জাভা-রাজ্যের শাসনব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপের অনেকগুলি দ্বীপ জয় করেছিলেন। তিনি বালি দ্বীপ অধিকার করেন। এরপর উল্লেখযোগ্য রাজার নাম রাজস-নাগর। এই রাজার আমলে মজাপহিৎ আক্রমণশীল সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করে। এই সময় জাভা, প্রধান দ্বীপগুলি এবং মালয় উপদ্বীপের বৃহৎ অংশের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করে। জাভার নৌবহর খুব শক্তিশালী ছিল। অধীনস্থ রাজন্যবর্গ নিজেদের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বজায় রেখে মজাপহিৎ সম্রাটকে নানারূপ কর ও উপঢৌকন প্রদান করতেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে **'নাগরকৃতগামা'** নামে কবিতা রচিত হয়। এই কাব্যে অধীন রাজাদের বিশদ বিবরণ আছে। এ'তে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে ইন্দোনেশিয়ার যে দ্বীপসমূহের উপর ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য ছিল, তার অধিকাংশ স্থান ও মালয় উপদ্বীপ জুড়ে মজাপহিৎ সাম্রাজ্যের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। এই যুগে জাভা পূর্ণ উন্নতি লাভ করে। তার আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নাগরকৃতগামা কাব্যে আরও জানা যায়, মজাপহিতের দূরদূরান্ত দেশের সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। ঐ সব দেশ থেকে নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণও মজাপহিতে আসতেন। যে সমস্ত দেশ থেকে সর্ব্বদা লোকেরা ওখানে আসতো তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। এই বিদেশীগণ জাহাজে চড়ে দ্রব্যসম্ভারসহ মজাপহিতে আগমন করতো। মজাপহিতের লোকেরা বিদেশী বণিক, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সাদরে অভ্যর্থনা করতো। এই চরম উন্নতির কালে জাভার শাসনপ্রণালী খুব সুনিয়ন্ত্রিত

ও উন্নত ধরণের ছিল। রাজা রাজসনাগরের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের পতন সুরু হয়। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জাভার পতনশীলতা দৃষ্টিগোচর হয়। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বহু রাজ্য এই সময় চীনের সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে।
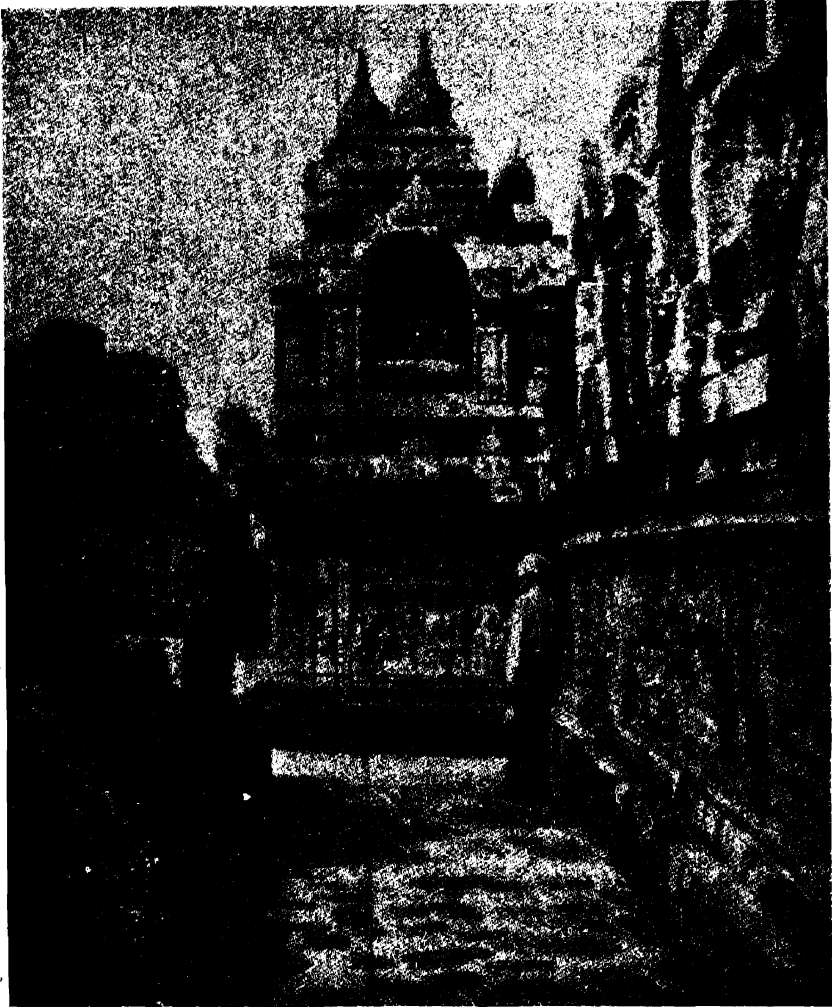
বরবুদারের গ্যালারী

জাভার পরবর্ত্তী দুর্ব্বল হিন্দুরাজাদের রাজত্বের অনতিকালের মধ্যে মুসলমানগণ ঐ দেশ দখল করে।

সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর অংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমাবেশ ছিল। এদের মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকতো। এর থেকেই ক্রমে সুমাত্রায় ইসলাম

ধর্ম্মের প্রবেশের সুবিধা হয় এবং সুমাত্রা হতে ঐ ধর্ম্ম চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম পারলাক্ রাজ্য এবং তারপর সমুদ্র নামে একটি ছোট রাজ্যে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমুদ্র থেকেই ভবিষ্যতে সুমাত্রা নামের উদ্ভব হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে যে সব রাজ্য বড় হয়ে ওঠে তার মধ্যে **মালাক্কা** ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করে। সেকেন্দার শা নামে এক সুলতান মালাক্কার শ্রীবৃদ্ধির পত্তন করেন। তিনি নানারূপ চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা সিঙ্গাপুর হতে মালাক্কায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। এই সময় থেকে মালাক্কা বাণিজ্য ও রাজনীতিতে অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। এই রাজ্য ইসলাম ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এস্থান থেকেই, ঐ ধর্ম্ম মালয় উপদ্বীপের নানাভাগে বিস্তৃত হয়। মালাক্কার দ্বিতীয় রাজা একজন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করেন এবং নিজে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গুজরাট ও পারস্য থেকে অনেক মুসলমান বণিক এসে মালাক্কায় বসবাস করেন। রাজার সাহায্যে তাঁরা দেশের লোকদের ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মালাক্কা কেন্দ্র থেকে ইসলাম ধর্ম্ম শুধু মালয় নয়, জাভা, সুমাত্রা এবং অপরাপর দ্বীপের নানা জাতির মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। মালাক্কার ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিই সুবর্ণদ্বীপে ইসলাম-অভিযানের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

পর্ত্তুগীজদের বিবরণে পাওয়া যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে জাভার কতকগুলি বন্দরে মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজত্ব বর্ত্তমান ছিল। ক্রমে বৈবাহিক ও অপরাপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম-প্রভাব জাভার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করেছিল। হিন্দু রাজপরিবারের অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করায় এবং অনেক সামন্ত-পরিবারের নতুন ধর্ম্মে অনুরক্ত হওয়ার ফলেই, জাভায় মুসলমান ধর্ম্মের প্রসারতার পথ সুগম হয়েছিল।

মজাপহিৎ হাতছাড়া হবার পরেও জাভার হিন্দুরাজা, কিছুকাল পূর্ব্ব-জাভায় নিজের হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা অব্যাহত রেখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে, তিনি বাধ্য হয়ে, দলবলসহ বালি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয়লাভ করেন। বালি দ্বীপের লোকেরা তাঁদের সাদরে আহ্বান করলো। তখন থেকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রধান

কেন্দ্র হলো ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ। আজ পর্য্যন্ত ঐ দ্বীপই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও হিন্দু-সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আসছে আর জাভার

বুদ্ধমূর্ত্তি (বরবুদার)

পুরাতন মহিমা ও গরিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে কেবল এখন তার প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি।

ইউরোপীয়দের আগমন

ইসলাম শক্তির প্রধান আশ্রয় মালাক্কা-সাম্রাজ্য বেশীদিন ক্ষমতা বজায় রাখতে পারলো না। শীঘ্রই বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বণিকের দল পূর্ব্বাঞ্চলের নানা দেশে এসে ভিড় জমাতে সুরু করলো। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিল পর্ত্তুগীজেরা। সুবর্ণদ্বীপেও তারাই আগে এসে হানা দিল। পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে অনতিবিলম্বে মালাক্কা শক্তি ও আরব ব্যবসায়িগণের সংঘর্ষ বেঁধে গেল। পর্ত্তুগীজ নেতা **আলবুকার্ক,** ১৫১১ খৃষ্টাব্দে মালাক্কা অধিকার করে, মুসলমানদের বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করলেন। পর্ত্তুগালের রাজধানী **লিসবন** হলো এখন পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। পূর্ব্ব-দেশগুলি থেকে মূল্যবান্ মশলাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার পর্ত্তুগীজেরাই ইউরোপে বণ্টন করতে লাগলো।

পর্ত্তুগালের পর স্পেন পূর্ব্বদেশপুঞ্জে অগ্রাভিযান করলো। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে স্পেন ফিলিপাইন দ্বীপগুলি গ্রাস করলো এবং সেস্থান থেকে প্রভূত অর্থসম্পদ শোষণ করতে লাগলো। বাণিজ্যব্যাপারে অবশ্য পর্ত্তুগীজগণই স্পানিসদের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধি আহরণ করতে লাগলো। শীঘ্রই ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ, স্পেন ও পর্ত্তুগালের বিপুল অর্থাগম দেখে হিংসাপরবশ হয়ে উঠলো।

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডই প্রথম সুবর্ণদ্বীপ ও দূর-প্রাচ্যে পর্ত্তুগীজদের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত স্থানগুলি ক্রমে ওলন্দাজ কিংবা ইংরেজদের হাতে গিয়ে পড়লো। ইংরেজ ও ডাচ্ বণিকদল তাদের অধিকতর দক্ষতা ও বিচক্ষণতার জোরে, পর্ত্তুগীজদের পৃথিবীবিস্তৃত শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করে, বিভিন্ন স্থানে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলো। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সুগঠিত বণিক-কোম্পানীদল সর্ব্বত্র অবাধগতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো।

ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ পূর্ব্ব-দ্বীপাঞ্চল থেকে পর্ত্তুগীজদের একপ্রকার বিতাড়িত করলো বটে, কিন্তু মহার্ঘ মশলাদ্রব্যের কাড়াকাড়ি নিয়ে, তাদের পরস্পরের মধ্যেই তীব্র বিরোধ বেঁধে গেল। এসময় একবার ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে, মলাক্কাস্ দ্বীপের আম্বয়নার ওলন্দাজ গভর্ণর, নানা অভিযোগ উপস্থাপিত করে, ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ডের বিধান করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা "আম্বয়নার হত্যাকাণ্ড" বলে আখ্যাত। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের ভিতর এই কলহ-সংঘর্ষ বেশীদিন চলে

নাই, কারণ ইংরেজগণ সেখানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে, শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরে আসে। অতএব এরপর থেকে ওলন্দাজগণই সুবর্ণদ্বীপে ব্যবসা, বাণিজ্য ও কর্তৃত্বে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠলো।

জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপসমূহ এইভাবে ওলন্দাজদের অধীনে গেল। এস্থানে হল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হলো। এ সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন চলার পর একেবারে সম্প্রতি এর বিলোপ ঘটেছে। ভারতে ইংলিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের মত, ডাচ্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকগণও, জাভা প্রভৃতি স্থানে অকথ্য শোষণ, অনাচার ও দুর্নীতি চালিয়েছিল। বণিক-সম্প্রদায় ঐসব দেশের জনসাধারণের কল্যাণের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করে নাই। তারা কি করে যাবতীয় অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করে হল্যাণ্ডে নিয়ে যাবে এ নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ওলন্দাজ বণিকগণ ক্রমেই অধিকতর অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে লাগলো। অবশেষে হল্যাণ্ড সরকার ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে, সরাসরি নিজেদের হাতে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে নিলেন। হল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ শাসনেও জাভার লোকদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হলো না। দেশের কৃষককুলের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে লাগলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হল্যাণ্ড সরকার জাভা এবং অন্যান্য দ্বীপে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং কিছু কিছু অপরাপর সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। এ সময় থেকে দেশবাসীর মধ্যে একটি নতুন অধিকার-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীতে এদের মধ্যে জাতীয়তার আন্দোলন সূত্রপাত হয় এবং ক্রমেই এরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জোর দাবী ও সংগ্রাম করতে থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে দ্বীপপুঞ্জে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র বৈপ্লবিক আন্দোলন দেখা দেয়; ডাচ্ সরকারও বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়, কিন্তু কোন কিছুতেই তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নির্ম্মূল করতে সমর্থ হয় না।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভ

পূর্ব্ব-দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের বেশী অংশ বর্ত্তমানে স্বাধীনতা পেয়ে "ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র" নামে পরিচিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার লোক-সংখ্যার মধ্যে জাভায়ই অধিক লোকের বাস। জাভার জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে থাকে, হল্যাণ্ড তাদের কি কিছু অধিকারও

দিয়েছিল কিন্তু সে অতি নগণ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবে চলে। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতরণ করবার পর ঘটনার মোড় ঘুরে যায়।

জাপান দ্রুত যুদ্ধে জয়লাভ করে দ্বীপাঞ্চল অধিকার করে। জাপানীরা ডাচ্ শাসনকর্ত্তাদের বিতাড়িত করে এবং অধিকাংশ ইউরোপীয়দের অন্তরীণ করে আবদ্ধ রাখে। তারা দেশের জনসাধারণ বা ইন্দোনেশীয়দের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে, তাদের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসনদায়িত্ব অর্পণ করে। জাপানীদের পরাজয়ের পর, তারা যখন দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে চলে যায়, তখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদের বেশীর ভাগ ইন্দোনেশীয়দের হাতেই দিয়ে যায়। এর ফলে, ইন্দোনেশীয়দের শক্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, যুদ্ধের শেষে তারা আর বিতাড়িত ডাচ্ সরকারের অধীনতা কখনই স্বীকার করবে না।

যুদ্ধের অবসানে জাপানীদের দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে চলে যাবার সময়, জাভার অধিক অংশের উপর কর্ত্তৃত্ব ও মেলা অস্ত্রশস্ত্রাদি ইন্দোনেশীয়দের হাতেই ছিল। ইন্দোনেশীয়রা ডাচ্ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী করে যে, তখনই তাদের দেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। কিন্তু ডাচ্ সরকার পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে, তাদের ইন্দোনেশিয়ার কর্ত্তৃত্বে পুনরায় বসবার পরেই তবে তারা সাম্রাজ্যের প্রজাদের কতটা অধিকার মঞ্জুর করবে, সে-বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাতে পারে। চরমপন্থী ইন্দোনেশীয়গণ এতে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে।

এরূপ অচল অবস্থা বেশ কিছুকাল চলে, দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এসময় আপোষ-মীমাংসার জন্য কতিপয় যুক্তবৈঠকও বসেছিল এবং সেখানে কয়েকটি শান্তিচুক্তি নিষ্পন্ন হয়, যথা— চেরিবন্ চুক্তি (১৯৪৬) এবং লিঙ্গদ্‌জাতি চুক্তি (১৯৪৭)। এরপরও দীর্ঘদিন নানারূপ গোলমাল চলতে থাকে। অবশেষে, ইংরেজদের মধ্যস্থতায়, ওলন্দাজ সরকার, ১৯৪৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, আমস্টার্ডাম রাজপ্রাসাদে এক অনুষ্ঠান দ্বারা, ইন্দোনেশীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন।

নতুন সংযুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানীর নাম হয়েছে **জাকার্ত্তা** (আগেকার বাটাভিয়া)। প্রাচীন সুবর্ণদ্বীপের অধিকাংশ দ্বীপ নিয়ে বর্ত্তমান ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত অসংখ্য দ্বীপমালার মধ্যে জাভাই সর্ব্ব চেয়ে প্রধান ও কেন্দ্রস্থল। ইন্দোনেশিয়ার বেশীর ভাগ

জনসংখ্যাই মুসলমান। দেশীয় অধিবাসী ছাড়া এখানে অনেক খৃষ্টান, আরব, চৈনিক ও ইউরোপীয় লোকও আছে। বালিদ্বীপের লোকেরা হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের বর্ত্তমান সভাপতি

ডাঃ সোকার্ণো

হয়েছেন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক নেতা **সোকার্ণো**। এম. নাসির এখন দেশের প্রধান মন্ত্রী। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতালাভে, স্বাধীন ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাহায্য ও প্রেরণা দান করেছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতালাভের পর আজ পর্য্যন্ত দেশটি একতাবদ্ধ বা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নাই। দেশের সামরিক শক্তির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের বিরোধ লেগেই আছে। আভ্যন্তরীণ শাসন ও অর্থনীতিতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা চলছে।

বর্ত্তমান বর্ম্মা, শ্যাম, মালয় ও ইন্দোচীন

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ভূখণ্ডে বর্ম্মাদেশ পুরাকালে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ম্মা এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। কখনো কখনো একজন শক্তিমান নৃপতি দুই অংশকে একত্রিত করে, শ্যামদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করতেন। বাংলাদেশ ও আসামের পূর্ব্বাংশের সঙ্গে প্রাচীন-কালে বর্ম্মার নানারূপ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতা বর্ম্মা ও শ্যামদেশেও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সঙ্গে বর্ম্মার বিরোধ সুরু হয়। বর্ম্মার রাজা অধিক সাহসী হয়ে আসাম আক্রমণ করেন এবং উহা জয় করেন। শীঘ্রই ইংরেজদের সাথে বর্ম্মীদের যুদ্ধ বাঁধে। পর পর তিনটি যুদ্ধ হয়, অবশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সম্পূর্ণ বর্ম্মাদেশকে, তার ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে। সম্প্রতি ভারতের স্বাধীনতালাভের অল্প পরেই, বর্ম্মাও আবার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। বর্ম্মা এখন বৃটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

বর্ম্মা জয় করবার পর, ইংরেজরা দক্ষিণে, মালয় উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়। তারা **সিঙ্গাপুর** দ্বীপ অধিকার করে, একে একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ও পোতাশ্রয়ে পরিণত করে। সিঙ্গাপুর থেকে বৃটিশশক্তি উত্তরদিকে মালয়ের অভ্যন্তরে অভিযান করতে থাকে। **মালয়দেশে** অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাদের অধিকাংশ শ্যাম রাজ্যের অধীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে, ইংরেজগণ শ্যামকে কোণঠাসা করে, মালয়-রাজ্যগুলি দখল করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আজ পর্য্যন্ত, ইংরেজ মালয়বাসীকে স্বাধীনতা দেয় নাই, তাই ওদেশে একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব তীব্রভাবে চলেছে। মালয়ে বহু বিভিন্ন জাতির বাস। নতুন-চীনের উৎসাহে এখানে কম্যুনিষ্ট প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ম্মা ও ইন্দোনেশিয়ার মত মালয়েও প্রভূত রবার ও টিন উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার আর সব দেশ যখন ইউরোপীয়দের অধীনে চলে যায় তখন আশ্চর্য্যরূপে একমাত্র **শ্যামদেশই** স্বাধীন থেকে যায়। ইংলণ্ড, শ্যামের পশ্চিমে বর্ম্মা ও দক্ষিণে মালয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আর পূর্ব্বদিকে ফ্রান্স, ইন্দোচীনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই শক্তির হুমকির ফলে, শ্যামকে দু'পাশের অনেক রাজ্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দুই প্রবল বিবদমান শক্তির মাঝখানে পড়ায়, শ্যামের অবশিষ্টাংশ কোনপ্রকারে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায়

রেখেছিল। শ্যামে এখন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শাসন চলছে। এদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বর্ত্তমানেও নানা দিকে লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, ফ্রান্স চীনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে আনাম আক্রমণ করে অধিকার করে। ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে ক্ষমতা বিস্তৃত করে সেখানে বৃহৎ **ফরাসী-ইন্দোচীন-সাম্রাজ্যের** প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স শ্যামের হাত থেকে কাম্বোডিয়া রাজ্য কেড়ে নেয় যেখানে পূর্ব্বকালে গৌরবময় আঙ্কোর-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইন্দোচীনের উত্তরভাগে আনাম ও টংকিংএর আনামীরা চীনাদের সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আনামীরা বৌদ্ধ। এদের ভিতরই প্রথম জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপানীরা ইন্দোচীন পরিত্যাগ করার সময় আনামীরাও তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পায়। পরে চীনারা আনামে **ভিয়েৎমিন** নামক জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। **ডাঃ হো সি মিন** এই দলের নায়ক।

যুদ্ধের পরে, হো সি মিনের নেতৃত্বে, অগ্রসরপন্থী আনামীগণ ইন্দোচীনে ফরাসী-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রবল বাধা দেয়। ফরাসী সরকারও আনামীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালান। ফ্রান্স, হো সি মিনের জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করে, ১৯৫০ সালে, **বাওদাই** নামক এক নরমপন্থী নেতার অধীনে, **ভিয়েৎনাম** গবর্ণমেণ্টের সৃষ্টি করে। এ গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের প্রভাবাধীন। আনাম, টংকিং ও কোচিন-চীন এ-রাষ্ট্রের অন্তর্গত। এর রাজধানীর নাম **হ্যানয়**। বাস্তবিকপক্ষে ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক হো সি মিনের নির্দ্দেশেই চালিত হয়।

চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর, হো সি মিন চালিত ভিয়েৎমিন দলের শক্তি বেড়েই যাচ্ছে। এ-দল এখন কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত। ফ্রান্স ভিয়েৎমিনদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে এখন আমেরিকার সৈন্যসাহায্য নিচ্ছে। ইন্দোচীনে ফরাসী ও আনামীদের মধ্যে সংঘর্ষের এখন পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই।

ভিয়েৎমিন দল দেশের স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এখন তীব্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। ফ্রান্স অনেক যুদ্ধেই বিপর্য্যস্ত হচ্ছে। ইন্দোচীনের বিভিন্ন রাজ্যগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত এখানকার গোলমাল মিটবে বলে মনে হয় না।

গ্রীস ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর পূর্ব্ব-দিকে ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আইওনিয়ান সাগর অবস্থিত। গ্রীসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঐ দেশের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থিতি এর ইতিহাসকে স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে। এর উপদ্বীপস্থ উপকূলের ভগ্নতা, সমুদ্র-সাহচর্য্য, জল-বায়ু ও প্রকৃতির কৃপণতা—প্রত্যেকটিই এর জাতীয় জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। জাতীয় অনৈক্য, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্র-প্রীতি, সমুদ্র-বিলাস ও উপনিবেশ-বিস্তার এবং সভ্যতা ও কৃষ্টি—সব কিছুই গ্রীসের প্রকৃতির দান।

প্রাচীনকালে গ্রীস এক দেশ হলেও এক রাষ্ট্র ছিল না। এখানে অনেক স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। গ্রীসের ইতিহাস বলতে এই সব নগর-রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক কাহিনীর সমষ্টিকেই বোঝায়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদিতে প্রায় সব কিছুই প্রাচীন গ্রীসের দান। গ্রীসের ছোট রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রথম প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করে।

গ্রীকদের উন্নতির বহুপূর্ব্বেই ইজিয়ান সমুদ্রের অঞ্চলে, বিশেষ করে ক্রীট

দ্বীপটিকে আশ্রয় করে এক উচ্চস্তরের সভ্যতা বিরাজ করতো। একে **ইজিয়ান-সভ্যতা** বলা হয়। এই সভ্যতা, বহু পুরাতন যুগের **বাবিলন,** আসিরিয়া, মিশর প্রভৃতি পূর্ব্বকালের সভ্যতার সমসাময়িক। এককালে ইজিয়ান-সভ্যতা দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সভ্যতার অনুরূপ একটি সভ্যতা এশিয়া-মাইনরের **ট্রয়** নগরীতেও বিকশিত হয়েছিল। ইজিয়ান-সভ্যতার শেষের যুগকে **মাইসিনিয়ান**-সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়—এর কেন্দ্র ছিল পেলোপোনেসাস বা দক্ষিণ গ্রীস।

প্রাচীন ইজিয়ান-সভ্যতার একটি দালানের ধ্বংসাবশেষ

পরবর্ত্তী যুগে গ্রীকেরা ইজিয়ান-শক্তির ক্ষমতা খর্ব্ব করে, এই উচ্চাঙ্গের সভ্যতাকে আপন করে লয়। গ্রীক-সভ্যতা ইজিয়ান-সভ্যতার নিকট অনেকাংশে ঋণী।

প্রবাদ অনুযায়ী, গ্রীকেরা **হেলেন** নামে একজন পূর্ব্বপুরুষের বংশধর বলে, নিজেদের বলতো **হেলেনীজ** ও নিজেদের দেশকে বলতো **হেলাস।** গ্রীস ও গ্রীক নামটি পরে রোমানরা দিয়েছিল।

গ্রীসের প্রাচীন উপকথা ও কাহিনীকে আশ্রয় করে, **হোমার** নামক এক প্রসিদ্ধ কবি **ইলিয়ড** ও **ওডিসি** নামে দুটি চমৎকার মহাকাব্যের সৃষ্টি করেন। ট্রয়-যুদ্ধই এই অমর লেখনীর বিষয়-বস্তু। এই মহাকাব্য দুটি পৌরাণিক যুগের গ্রীক-সভ্যতার নিখুঁত ছবি দিয়ে, ঐতিহাসিকদের আদরের বস্তু হয়েছে।

ইলিয়ড ও ওডিসি প্রণেতা
হোমার

যদিও গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল ও সেখানে রাজনৈতিক একতা ছিল না, তথাপি গ্রীকেরা সংস্কৃতিগত একতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এক রক্ত, এক ভাষা ও সাহিত্য, এক সামাজিক আচার-ব্যবহার, এক ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসঙ্ঘ ও একত্রিত হয়ে খেলাধূলা, বিশেষ করে অলিম্পিক-ক্রীড়া—সবে মিলে গ্রীসের জাতীয় সংস্কৃতিকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছিল। তবে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে পারে নাই।
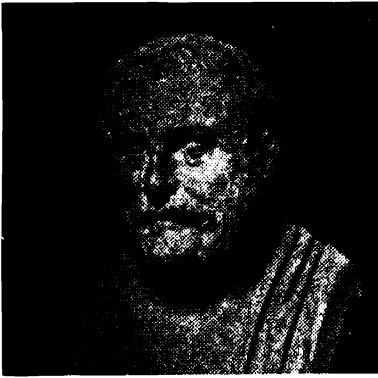
নানা কারণে গ্রীকেরা উপনিবেশ বিস্তারে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহসিকতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা উপনিবেশ-প্রসারের অন্যতম কারণ। সমুদ্র-সাহচর্য্যও গ্রীক-প্রাণে উপনিবেশের প্রেরণা দিয়েছে। গ্রীকেরা সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করতে গিয়ে, নানা সুবিধার লোভে বিদেশেই বসবাস করেছে। এই উপনিবেশ-স্থাপনও গ্রীকজাতির মধ্যে এক ঐক্যবোধ জাগ্রত করেছিল।

থুকিডাইডিস

প্রাচীন গ্রীসের প্রধান প্রধান নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তর-পূর্ব্ব গ্রীসে এথেন্স, দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্টা, করিন্থ, উত্তর গ্রীসে থিবস ও তারও বহু উত্তরে মাসিডন নগরের ইতিহাসই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবাদ আছে যে, **লাইকারগাস** নামক একজন প্রসিদ্ধ আইন-প্রণেতা

স্পার্টায় কতকগুলি নিয়মনিষ্ঠ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। এই সংস্কারগুলিই স্পার্টার অভ্যুদয়ের কারণ।

স্পার্টার বৈশিষ্ট্য হলো কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা। প্রত্যেক স্পার্টান, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক, জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হতো। রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অপরাজেয় সৈন্য সৃষ্টি করা। স্পার্টা ছিল একটি সৈন্যশিবির। সুদক্ষ সৈনিক প্রস্তুত করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। নাগরিকদের শিক্ষা, বিবাহ এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সব-কিছুই কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিলাসিতা ছিল স্পার্টানদের পক্ষে বিষবৎ নিষিদ্ধ। তাদের সরলতা প্রবাদে পরিণত হয়। দেশে যৎসামান্য লেখাপড়া ছাড়া অন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েদেরও বীর-জননী করে গড়ে তুলতে, শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা দেওয়া হতো। এই সামরিক শক্তির জোরে স্পার্টানগণ ক্রমে, **পেলোপোনেসাস** বা দক্ষিণ গ্রীসে প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠলো।
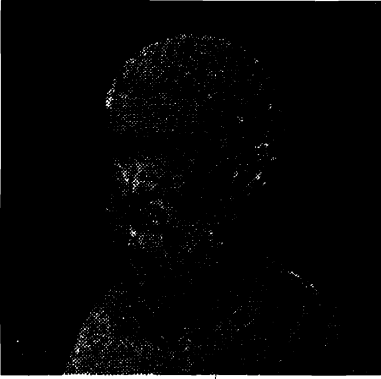
হিরোডোটাস

গ্রীসের অধিকাংশ নগরীর মত **এথেন্সেও** পূর্ব্বে রাজতন্ত্র ছিল এবং পরে ক্রমান্বয়ে অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এথেন্সের সংস্কারকদের মধ্যে **সোলনের** নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। শাসনতন্ত্রের সংস্কার করে **সোলন** ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনিই এথেন্সের গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর আর একজন আইন-প্রণেতা, **ক্লাইস্থিনিস** সোলনের সংস্কারের ভিত্তির উপর গণতন্ত্রের সৌধ নির্ম্মাণ করেন। এই গণতন্ত্রের চরম বিকাশ হয় পরে **পেরিক্লিসের** সংস্কারে।

গ্রীকেরা যখন নগর-রাষ্ট্রে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিল, প্রাচ্যে তখন পারসিকেরা সম্রাট **কাইরাসের** নেতৃত্বে, পূর্ব্বে **মিডিয়া** রাজ্য উচ্ছেদ করে এবং পরে এশিয়া-মাইনরের উপকূলস্থিত **লিডিয়া** রাজ্য গ্রাস করে। পারসিক সম্রাট কাইরাস, লিডিয়া-রাজ ক্রোসাসকে পরাস্ত করে লিডিয়া ত পেলেনই, তা ছাড়া লিডিয়ার অধীন এশিয়া-মাইনরের গ্রীক রাষ্ট্রগুলিও দখলে আনলেন।

পারসিক নৃপতিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ডেরিয়াস বা **দারায়ুস**। তাঁর সময় এশিয়া-মাইনরের গ্রীক উপনিবেশবাসীদের মধ্যে এক ব্যাপক বিদ্রোহের

সৃষ্টি হয়। একে বলে **আইওনিয়ান বিদ্রোহ**। এথেন্স প্রভৃতি গ্রীক নগরীগুলি এই বিদ্রোহে যোগদান করায়, রাজা দারায়ুস ভীষণ চটে যান। তাঁর রাগের
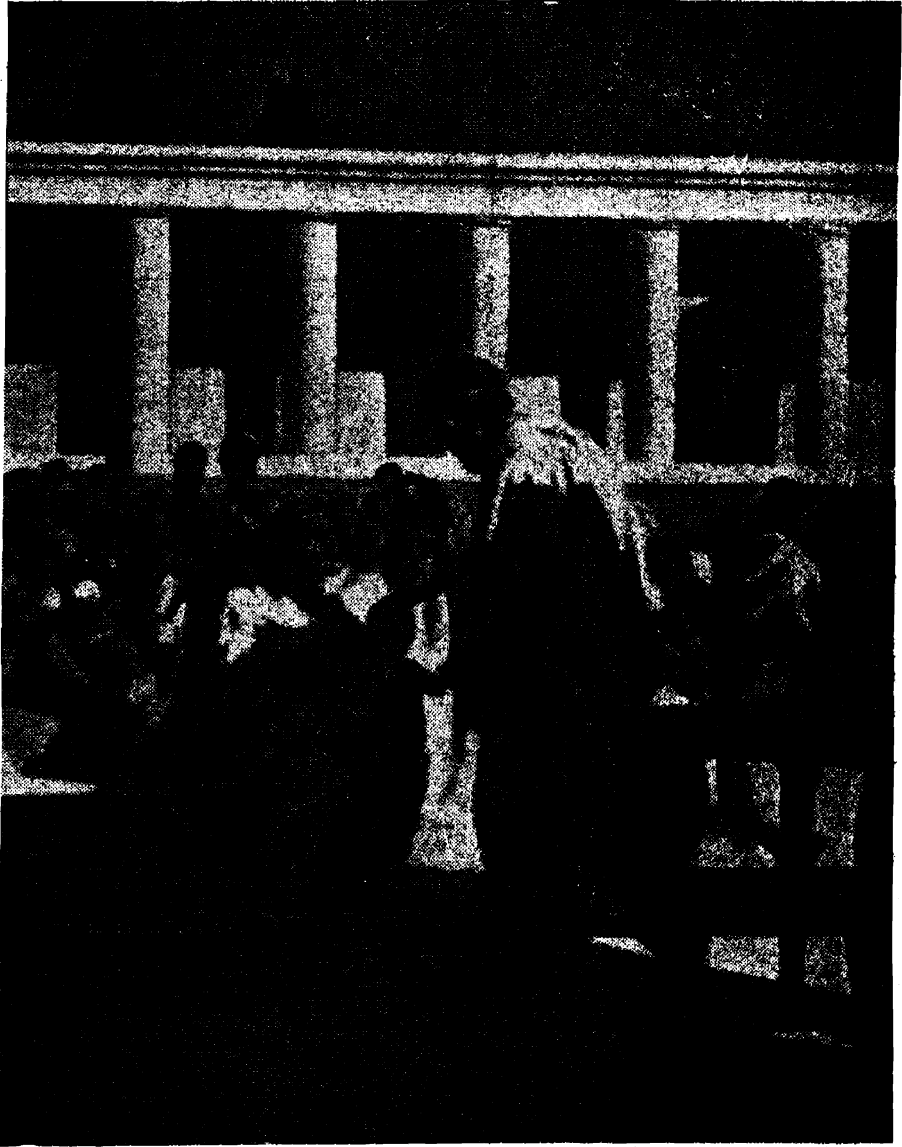
স্পার্টান শিশু-চিকিৎসকের শিশুদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

বিশেষ কারণ, এথেন্সবাসিগণ, পারসিক সাম্রাজ্যের এশিয়া-মাইনর প্রদেশের রাজধানী **সারদিস** নগরী পুড়িয়ে দিয়েছিল। দারায়ুস এথেন্সকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং এ-থেকেই **ম্যারাথন-যুদ্ধের** উৎপত্তি হয়।

ম্যারাথনের যুদ্ধ

এথেন্স জয় করবার জন্য পারস্যরাজ **দারায়ুস** ৬০০ জাহাজে করে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেন। গ্রীস হচ্ছে পাহাড়ে দেশ, তার তিন দিকে সমুদ্র। এথেন্সের ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **ম্যারাথন** নামে একটা জায়গা আছে। দারায়ুসের সৈন্যেরা এসে সেখানে ছাউনি পাতলো। এথেন্সের সৈন্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০০; এই সৈন্যদলই **মিলটিয়াডিস** নামক সুকৌশলী নেতার
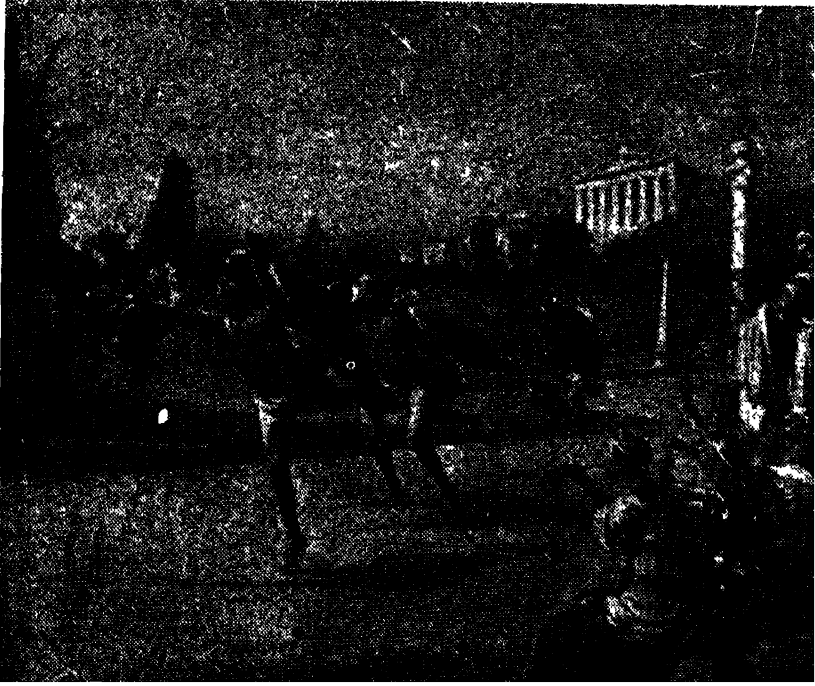
স্পার্টানদের অলিম্পিক-ক্রীড়া

অধীনে, দারায়ুসের ৪০ হাজার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অগ্রসর হলো। পথে প্লেটিয়া সহর থেকেও এক হাজার সৈন্য এসে এদের সঙ্গে যোগ দিল। এই দশ হাজার সৈন্য ম্যারাথনের রণক্ষেত্রে অমিতবিক্রমে পারসিক সৈন্যদের আক্রমণ করলো।

গ্রীকরা যুদ্ধ করলো তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, পারসিকদের অধীনতা-পাশ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য; তারা জীবন-মরণ তুচ্ছ জ্ঞান করে যুদ্ধ করতে লাগলো। গ্রীকদের প্রচণ্ড আক্রমণ পারসিক সৈন্যেরা সহ্য করতে পারলো না। তারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে, কোনরকমে গিয়ে জাহাজে ওঠবার জন্য

সমুদ্রের তীর-অভিমুখে ছুটতে লাগলো। গ্রীকরাও তাদের তাড়া করে বহু পারসিক সৈন্যকে হত্যা করলো। যারা বাঁচলো, তারা জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেল।

থার্মোপলির যুদ্ধ

ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা দারায়ুস ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন ও প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি নিজে যুদ্ধে গিয়ে এথেন্সের উপরে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা

স্পার্টার একটি খোলা ভোজনশালা

হলো না, ম্যারাথনের যুদ্ধের সংবাদ পাওয়ার কিছু দিন পরেই তিনি মারা গেলেন। দারায়ুসের ছেলে **জেরাক্সেস** পারস্যের সম্রাট হলেন।

পিতার অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে, তিনি নিজে রওনা হলেন এথেন্স আক্রমণ করতে। নানাজাতিসমন্বিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে, জেরাক্সেস থ্রেস ও মাসিডোনিয়ার ভিতর দিয়ে, গ্রীসের উত্তরে **থার্মোপলি** গিরিবর্ত্মের সামনে এসে পৌছালেন।

সাত হাজার গ্রীক সৈন্য এই থার্মোপলির গিরিপথে জেরাক্সেসের অগণিত সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই সংবাদ পেয়ে, জেরাক্সেস অল্প কয়েকজন

সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন এই সাত হাজার গ্রীক সৈন্যকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এরা এসে উল্টে গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। জেরাক্সেস আবার একদল সৈন্য পাঠালেন। গ্রীকরা তাদেরও তাড়িয়ে দিল। তারপরে জেরাক্সেস পাঠালেন তাঁর নিজস্ব বাছাই-করা দলটিকে কিন্তু তারাও মার খেয়ে পালিয়ে এল।

জেরাক্সেস ব্যাপার দেখে ভয়ানক ভয় পেলেন। ঐটুকু ছোট গিরিপথে বেশী সৈন্য নিয়ে ঢোকাও যায় না, আবার অল্প সৈন্য পাঠালেও গ্রীকরা তাদের হারিয়ে দেয়। জেরাক্সেস ৯০০ জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন। গ্রীকদের ছিল মাত্র ৩০০ জাহাজ। জেরাক্সেস এই সব জাহাজে করে অন্য পথে, এথেন্সের দিকে একদল সৈন্য পাঠাবার চেষ্টা করলেন। গ্রীকরা এতেও তাঁকে বাধা দিল এবং রাত্রিবেলা এক ভীষণ ঝড়ে তাঁর অনেক জাহাজ ডুবে গেল। এমনি সময় এক বিশ্বাসঘাতক গ্রীক এসে জেরাক্সেসকে সংবাদ দিল যে, সে থার্মোপলি ছাড়া অন্য পথ দিয়ে পারসিক সৈন্যদের নিয়ে যেতে পারবে। জেরাক্সেস খুব খুসী হয়ে তখনই তার সঙ্গে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। এরা ঝোপ-জঙ্গল পার হয়ে, পিছন দিক থেকে ঘুরে এসে, থার্মোপলিতে গ্রীকদের আক্রমণ করলো।
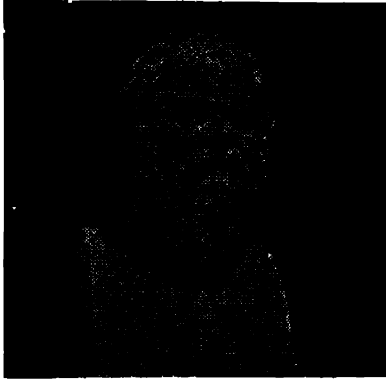
সোলন

পিছন থেকে এইভাবে আক্রান্ত হয়ে গ্রীকরা বুঝলো আর উপায় নাই। গ্রীকনেতা স্পার্টার বীর নৃপতি **লিওনিডাস,** অধিকাংশ সৈন্য গ্রীস রক্ষাকল্পে পশ্চাতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে মাত্র তিনশত স্পার্টান সৈন্য নিয়ে, তিনি অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়ে, অসংখ্য পারসিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পারসিকদের মেলা সৈন্যক্ষয় হলো। মুষ্টিমেয় স্পার্টান সৈনিক নিজেদের নিশ্চিত বিনাশ জেনেও নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে যেতে লাগলো। লিওনিডাসের নেতৃত্বে, অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রতিটি স্পার্টান সৈন্য নিহত হলো। থার্মোপলির যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে গ্রীক জাহাজগুলো ছুটে গেল এথেন্সে। সেখান থেকে সমস্ত স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের তারা সরিয়ে দিল আশে-পাশের দ্বীপগুলোতে। থার্মোপলির যুদ্ধে লিওনিডাসের দুঃসাহসিক রণবীর্য্য, ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কাহিনী হয়ে আছে।

জেরাক্সেস তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এথেন্সে এসে পৌঁছালেন; দেখলেন, সমস্ত সহর অন্ধকার—একটি জনপ্রাণীও সেখানে নাই। শুধু সহরের মাঝখানে ছোট একটি পাহাড়ের উপর একটি মন্দির ছিল। সেখানে কয়েকজন গ্রীক সমবেত হয়ে জেরাক্সেসকে বাধা দিল। পারসিক সৈন্যরা এদের আক্রমণ করে সবাইকে নিহত করলো। ক্রুদ্ধ জেরাক্সেস এথেন্স সহর ধ্বংস করে ফেলবার হুকুম দিলেন।

এদিকে বেশীর ভাগ গ্রীক যে দ্বীপটিতে চলে গিয়েছিল তার নাম **সালামিস**। জেরাক্সেস এই দ্বীপের গ্রীকদের আক্রমণ করবার জন্য তাঁর সমস্ত জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন। গ্রীক জাহাজের সঙ্গে পারসিক জাহাজের

রাজনীতিবিদ সোলনের শাসনতন্ত্রের সংস্কার

ভীষণ নৌ-যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে জয়ী হলো গ্রীকেরা। এথেন্সের কাছে এক পাহাড়ের উপর মার্বেল-পাথরের সিংহাসনে বসে, রাজা জেরাক্সেস স্বচক্ষে এই যুদ্ধ দেখেছিলেন।

সালামিস-যুদ্ধের প্রধান কৃতিত্ব এথেন্সের জননায়ক **থেমিষ্টোক্লেসের** প্রাপ্য। তাঁর চাতুর্য্যের ফলেই, পারসিকদের বাধ্য হয়ে, সঙ্কীর্ণ সালামিস-প্রণালীতে নৌ-যুদ্ধ করতে হয়। এইখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে পারসিকদের মস্তবড় বিপর্য্যয় হয়েছিল। থেমিস্টোক্লেস ছিলেন একজন নামজাদা রাজনীতিজ্ঞ। তাঁরই প্রতিভা ও কৌশলের বলে, এথেন্সের ভবিষ্যৎ নৌ-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপিত হয়।

জেরাক্সেস সালামিসের যুদ্ধে পারসিক সৈন্যদের পরাজয় দেখে, তাড়াতাড়ি

সসৈন্যে এথেন্স ছেড়ে, পারস্য অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি আর কখনও গ্রীসে যেতে পারেন নাই।

পারসিক সম্রাটগণ বারবার চেষ্টা করেও ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রগুলির কোন ক্ষতি

এথেন্সবাসিগণ-কর্তৃক সারদিস নগরী অগ্নিদগ্ধ

করতে পারলেন না, বরং উল্টে তাঁরাই বাধা পেয়ে, আর গ্রীস আক্রমণের বা জয়ের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলেন।

এর পর থেকে এথেন্সের সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হয়। **"ডেলস সঙ্ঘ"** নামে এক গ্রীক রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুযোগ নিয়ে এথেন্স, প্রসিদ্ধ জননায়ক

পেরিক্লিসের পরিচালনায় এক বিস্তৃত নৌ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এথেন্সের প্রতিপত্তি ইজিয়ান-সাগরের দ্বীপগুলি ও তার আশে-পাশের অঞ্চলগুলির উপর ছড়িয়ে পড়ে।

এই যুগকে **পেরিক্লিসের যুগ** বলা হয়। এথেন্স তখন শক্তি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য সমস্ত বিষয়ে গৌরবের উচ্চশিখরে। পেরিক্লিস গণতন্ত্রের পূর্ণ-বিকাশ করেন ও এথেন্স নগরীকে সুন্দর সুন্দর সৌধমালায় সুসজ্জিত করেন। যাবতীয় জ্ঞানী, গুণী তাঁর নিকট উৎসাহ ও প্রেরণা পান। এই সময়কে **এথেন্সের স্বর্ণযুগ** বলা হয়। পেরিক্লিসের সাম্রাজ্যবাদ খুব উন্নত ধরণের ছিল। পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের গুপ্তযুগকে তুলনা করা হয়।

ম্যারাথনের যুদ্ধ

গ্রীকেরা ছিল খুব স্বাধীনতাপ্রিয়। এথেন্সের সাম্রাজ্য-বিস্তারে ও তার আক্রমণাত্মক নীতিতে অন্যান্য গ্রীকেরা, বিশেষ করে স্পার্টা অত্যন্ত চটে গেল। তারা অনেকে মিলে এথেন্সের শক্তি খর্ব্ব করবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করলো। এই যুদ্ধ **পেলোপোনেসাসের যুদ্ধ** নামে বিখ্যাত এবং ইহা দীর্ঘকাল ধরে চলে। এই যুদ্ধে স্থলপথে স্পার্টা বিশেষ নৈপুণ্য দেখায় এবং এথেন্স সমুদ্রপথে খুব কৃতিত্ব দেখায়। অবশেষে এথেন্সের নেতা অলকিবিয়াডিসের উৎসাহে এক বিশাল নৌ-অভিযান সিসিলি দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। স্পার্টা ও সিরাকিউজ নগরীর মিলিত প্রচেষ্টায়, এথেন্সবাসীর এই বিরাট অভিযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর পর থেকেই এথেন্স-সাম্রাজ্যের

পতন সুরু হয়। **সিসিলি অভিযানের ব্যর্থতা**—এথেন্সের জাতীয় জীবনে পরম দুর্দ্দৈবরূপে দেখা দিয়েছিল।

সক্রেটিস

এথেন্সে **সক্রেটিস** নামে একজন মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিস ছিলেন বেঁটে, মোটা এবং অত্যন্ত সাদাসিধা লোক। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদও ছিল অতি সাধারণ। একটা মাত্র কোট তাঁর ছিল, সেটাই তিনি শীত-গ্রীষ্ম সব সময় গায়ে দিতেন। জুতা তো তিনি পায়েই দিতেন না।

দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন

থার্ম্মোপলির যুদ্ধ

এবং যাকে সামনে পেতেন তাকেই ধরে নতুন জ্ঞানের কথা শোনাতেন। এথেন্সের বড় বড় লোকেরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন এবং তাঁর কথা শুনতেন। সক্রেটিস ইচ্ছে করেই সেই পুরান কোটটি পরে, এই সব ভোজ-সভায় যেতেন। তিনি বলতেন, মানুষ বড় হয় জ্ঞানে, পোষাকের পারিপাট্য তার সত্যিকারের পরিচয় নয়।

সক্রেটিসকে একদল লোক সম্মান করতো বটে, কিন্তু আর একদল তাঁর
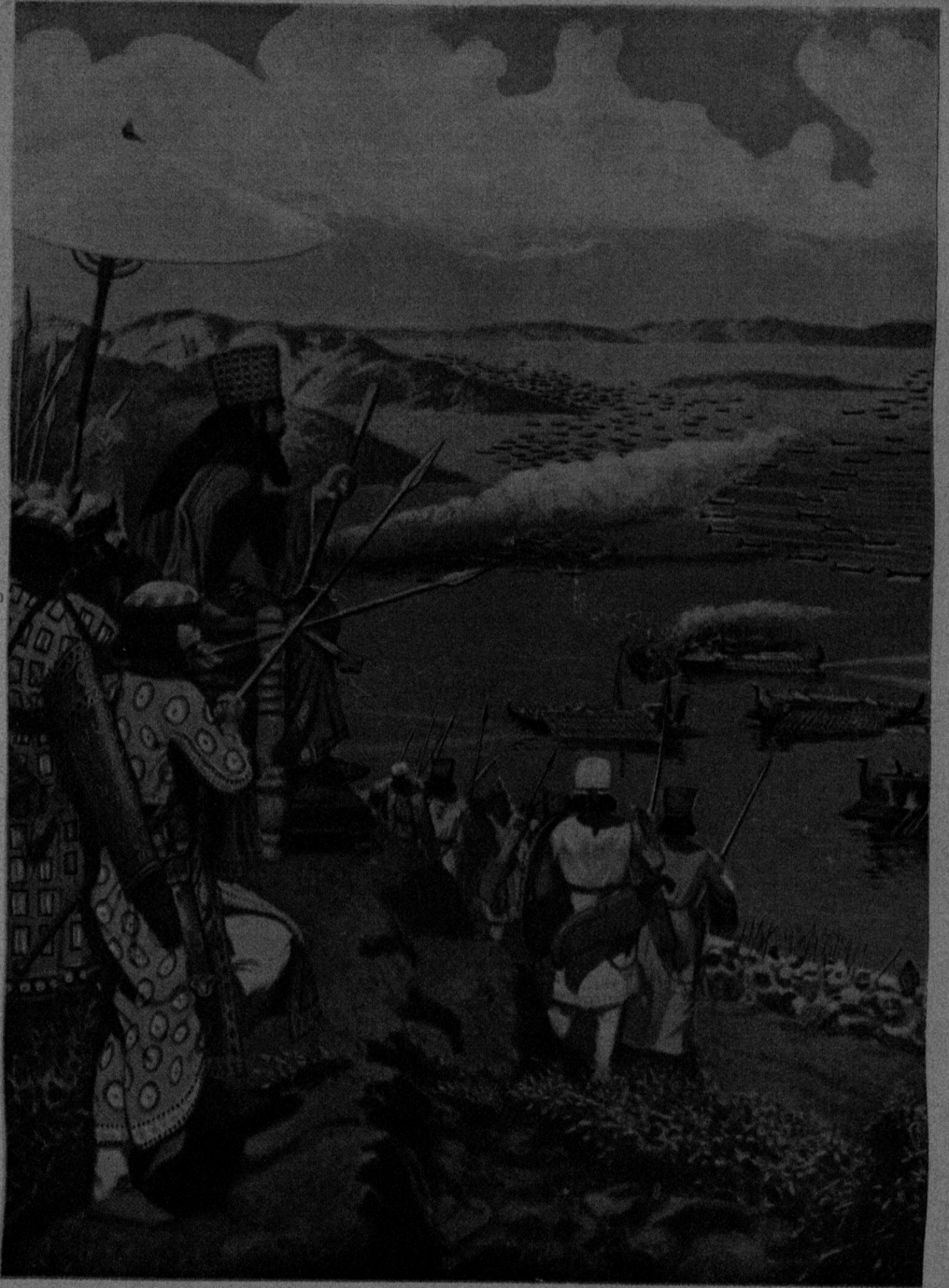
এথেন্সের কাছে এক পাহাড়ের উপরে মার্ব্বেল-পাথরের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা
জেরাক্সেস কর্ত্তৃক যুদ্ধ-পরিদর্শন।

উপর ক্রমেই বিরূপ হয়ে উঠতে লাগলো। সক্রেটিসের কথা তারা মোটেই বুঝতে পারতো না। তাদের ধারণা হলো, তিনি দেশের যুবকদের মাথা **নষ্ট** করছেন, তাদের মাথায় নানারকম রাষ্ট্র ও সমাজ-বিরুদ্ধ স্বাধীন নীতি ও ভুল ধারণা সব ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এরা ঠিক করলো, সক্রেটিসকে শাস্তি দিতে হবে এবং বিষপানে মৃত্যুই হচ্ছে তাঁর উপযুক্ত শাস্তি। সক্রেটিসকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এক মাস কারাগারে বন্দী থাকবার পর তাঁকে বিষ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সক্রেটিস হাসিমুখে সেই বিষ পান করে দেহত্যাগ করলেন।

সক্রেটিসের শিষ্য **প্লেটো** এবং প্লেটোর শিষ্য **এরিষ্টটল** আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে সম্মান পেয়ে থাকেন।

এথেন্সের পতনের পর, কিছুদিনের জন্য স্পার্টা, গ্রীসের শত্রু পারস্যের

সালামিসের জলযুদ্ধ

সাহায্যে, নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল; কিন্তু তার নিজের সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির প্রতি অত্যাচারের ফলে, স্পার্টা বেশীদিন তার প্রতিপত্তি বজায় রাখতে পারলো না।

এর পর উত্তর গ্রীসে **থিবস** নগরী, অল্পকালের জন্য খুব বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। থিবসের নেতা **ইপামিনণ্ডাস** গ্রীসের একজন শ্রেষ্ঠ কৌশলী যোদ্ধা। তাঁর সামরিক প্রতিভার জোরে থিবসের সৈন্যদল দেশের পর দেশ

জয় করতে লাগলো। অন্যান্য গ্রীকদেশ তো দূরের কথা, ইতিহাস-বিখ্যাত স্পার্টার সেনাবাহিনীও যুদ্ধে ইপামিনণ্ডাসের সম্মুখীন হতে পারলো না। এই সময় থিবস-সাম্রাজ্য গ্রীসে সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পিতা মাসিডনের শক্তিশালী রাজা **ফিলিপ,** ইপামিনণ্ডাসের কাছে তাঁর রণ-কৌশলের শিক্ষা নিয়েছিলেন। এই রণ-কৌশলই পরে আলেকজাণ্ডার অবলম্বন করেছিলেন। ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যুর পর শীঘ্রই থিবস-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার

এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতির মত মাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল গ্রীসের উত্তর দিকে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ ছিলেন এই মাসিডনের রাজা। রাজা ফিলিপই সর্ব্বপ্রথম ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে জয় করে, সমগ্র গ্রীসকে একটি মিলিত বড় রাজ্যে পরিণত করেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর **আলেকজাণ্ডার** গ্রীসের রাজা হন। তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। আলেকজাণ্ডার খুব ভাল করে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন, তা ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়েও তিনি জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। রাজা ফিলিপ পুত্রের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন বিখ্যাত মনীষী এরিষ্টটলের হাতে।
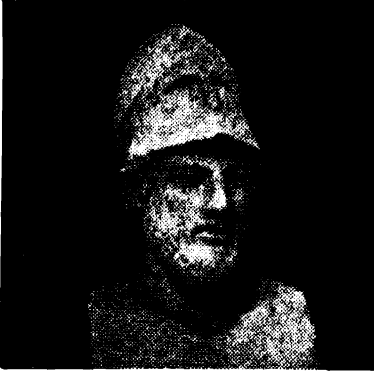
পেরিক্লিস

আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল সমস্ত পৃথিবী জয় করে, গ্রীক সভ্যতা তিনি দেশ-বিদেশের লোকদের শেখাবেন। এই অনুসারে পরে, তিনি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে একটা ভাবের আদান-প্রদান এবং মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। পারস্যের রাজা গ্রীস আক্রমণ করে তাদের অনেক ক্ষতি করেছিলেন; বিশেষতঃ এথেন্সের সুন্দর মন্দিরটি তারা পুড়িয়ে দেওয়ায় পারস্যের উপর আলেকজাণ্ডারের ভীষণ রাগ ছিল। দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে তাই তিনি সবার আগে আক্রমণ করলেন পারস্যকে।

প্রথম যুদ্ধেই আলেকজাণ্ডার জয়লাভ করলেন। পারসিক সৈন্যেরা

গ্রীকদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। গ্রীকরা পারস্যের রাজধানী সুসা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলো।

প্যালেষ্টাইনের উত্তর দিকে একটা জায়গায় আবার পারসিকরা তাদের বাধা দিল। **তৃতীয় দারায়ুস** তখন পারস্যের রাজা। তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করলেন। এই যুদ্ধেও পারসিকরা পরাজিত হলো। সমস্ত সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলো। রাজা নিজেও ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন। ছুটতে ছুটতে তারা গিয়ে থামলো একেবারে বাবিলনে।

টায়ার নামক একটি সহরে পারসিকদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। এবার আলেকজাণ্ডার সেই সহরটি আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধ যখন চলছে সেই

পেরিক্লিসের জ্ঞানী ও গুণী সমাজ

সময় রাজা তৃতীয় দারায়ুস, আলেকজাণ্ডারের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন যে, তিনি যদি আর যুদ্ধ না করেন তাহলে দারায়ুস পারস্য-সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক তাঁকে দিয়ে দেবেন। আলেকজাণ্ডার তাঁকে বলে পাঠালেন, "আমি পারস্যের সবটাই যখন জয় করবার ক্ষমতা রাখি তখন অর্দ্ধেক নিয়ে সন্তুষ্ট হব কেন?"

টায়ারের যুদ্ধ জয়ের পর আলেকজাণ্ডার এলেন **জেরুজালেমে**। সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলো। তারপর তিনি গেলেন **মিশরে**। মিশর তখন পারস্যের অধীন। পারসিকদের অত্যাচারে মিশরীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আলেকজাণ্ডারকে তারাও অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁকে মিশরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে নিল।

তারপর আলেকজাণ্ডার রওনা হলেন **বাবিলনের** দিকে। রাজা তৃতীয় দারায়ুস তখনও বাবিলনেই রয়েছেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের আগমন-বার্ত্তা শুনে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। টাইগ্রিস নদীর তীরে আবার ভীষণ যুদ্ধ হলো। এবারও পারসিকরা হেরে গেল। **পার্সেপোলিস**
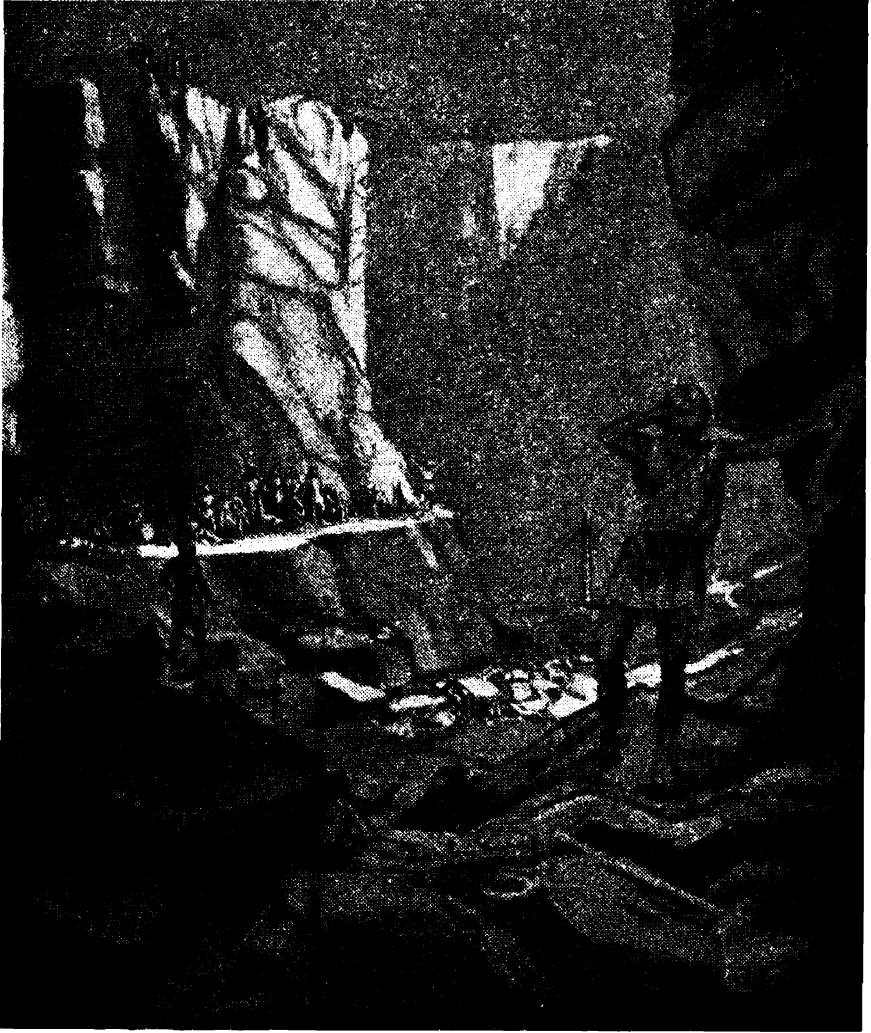
সিসিলিতে এথেনিয়ানদের দুর্দ্দশা

নামক সহর তখন পারস্যের একটি প্রসিদ্ধ নগর। এই সহরে রাজা প্রথম দারায়ুস ইন্দ্রপুরী-তুল্য একটি চমৎকার প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। পার্সেপোলিসে পৌঁছে আলেকজাণ্ডার দারায়ুসের এই প্রাসাদে, নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, এথেন্সের মন্দির পুড়িয়ে দেবার শোধ নিলেন।

পারস্য-জয়ের পর, আলেকজাণ্ডার **ভারতবর্ষে** এসে পৌঁছালেন। **পুরু নামক** একজন রাজা পঞ্চনদীর তীরে তাঁকে বাধা দিলেন। দুইশত হাতী নিয়ে পুরু যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু জয়লাভ করতে তিনি পারলেন না। পুরু বন্দী হলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে নিয়ে, গ্রীক সৈন্যেরা যখন আলেকজাণ্ডারের সামনে উপস্থিত করলেন, আলেকজাণ্ডার তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্দী, তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করো?" পুরু নির্ভীক হৃদয়ে উত্তর দিলেন, "রাজার মত।" আলেকজাণ্ডার তাঁর এই সাহসে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং রাজ্যও ফিরিয়ে দিলেন।

এই যুদ্ধের পরে আলেকজাণ্ডার আরও অগ্রসর হতে চাইলেন; কিন্তু এবার তাঁর সৈন্যেরা আপত্তি জানালো। আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে যেতে রাজী হলেন; কিন্তু যে পথে এসেছিলেন সে পথে না গিয়ে, তিনি এক নতুন পথে রওনা হলেন মরুভূমির উপর দিয়ে। এই মরুভূমি অতিক্রম করবার সময় তাঁর অনেক সৈন্য মারা যায়। আলেকজাণ্ডার অবশেষে এসে পৌঁছালেন বাবিলনে। এখানে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বহু চিকিৎসাতেও কোন ফল হলো না। মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডার দেহত্যাগ করলেন।
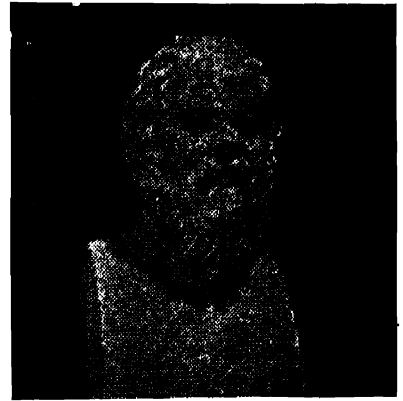
সক্রেটিস

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর, তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য, তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। মিশর, বাবিলন, এশিয়া-মাইনর, জেরুজালেম প্রভৃতি দেশগুলি আলাদা আলাদা ভাবে স্বাধীন হলো। মাসিডন রাজ্যের প্রভাব অনেকটা বজায় রইলো কিন্তু গ্রীসের অপরাপর রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

তুরস্কের অধীনতা হতে মুক্তি

এর পর গ্রীসের পতনের যুগ আরম্ভ হয়। রোমের অভ্যুত্থানের সময় প্রথম গ্রীস, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য মাসিডনের অধীনে যায়। রোমানরা মাসিডনের ক্ষমতা খর্ব্ব করে গ্রীস-রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। গ্রীকেরা তখন আর স্বাধীন অস্তিত্বের উপযোগী ছিল না। রোমানরা অগ্রগতির পথে গ্রীসকেও তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। গ্রীকেরা পরাজিত হবার পরেও নিজেদের ভাবধারা ও সংস্কৃতি দ্বারা

সক্রেটিসের বিষপান

রোমানদের প্রভাবিত করে। পূর্ব্ব-রোমক বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি খুব বেশী ছড়িয়েছিল। অটোমান তুর্কীরা, ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপল জয় করবার পর, শীঘ্রই গ্রীস তাদের অধীনে চলে যায়।

চারশ' বছর তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেও গ্রীকরা কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতা কিছুই ভোলে নাই। দেশকে স্বাধীন করবার ইচ্ছা গ্রীকদের বরাবরই ছিল।

ফরাসী-বিপ্লবের পর, গ্রীকরাও তাদের দেশে বিপ্লব এনে তুর্কীদের তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। তুরস্ক এসময়ে দুর্ব্বল ও পতনশীল। অবশেষে ১৮২১ সালে গ্রীস স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। এই বিপ্লবের নেতার নাম ছিল **আলেকজাণ্ডার হিপসিলানটি**। এঁর পিতা ছিলেন গ্রীসে তুর্কীদের অধীন শাসনকর্ত্তা।

এই বিপ্লব ঘোষণার পর, সাত বছর ধরে, তুর্কীদের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধ চলে। তুর্কীদের পক্ষে মিশর এসে যোগ দিয়েছিল।

ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যু

আর গ্রীকদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখিয়েছিল রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স। সাত বৎসর যুদ্ধের পর, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, গ্রীসের স্বাধীনতা সবাই স্বীকার করে নিল। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরামর্শে গ্রীকরা, ডেনমার্কের রাজকুমারকে এনে গ্রীসের সিংহাসনে বসালো। তাঁর নাম হলো রাজা **প্রথম জর্জ্জ**।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর

প্রথম মহাযুদ্ধে গ্রীস মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। এর দু'বছর আগে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ করে গ্রীস সালোনিকা জয় করে নিয়েছিল। মহাযুদ্ধের পর, গ্রীস একেবারে তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের কাছে পর্য্যন্ত থ্রেস নামক প্রদেশের প্রায় সবটা পেয়ে গেল। এশিয়া-মাইনরের স্মার্ণা নামক স্থান এবং ইজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপও সে পেল; কিন্তু মহাযুদ্ধ

থিবস-এ মাসিডনের রাজা ফিলিপ

শেষ হওয়ার মাত্র তিন বৎসর পর, গ্রীসের সঙ্গে তুরস্কের আবার একটা ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে থ্রেসের পূর্ব্বাংশ এবং স্মার্ণা গ্রীসের হাতছাড়া হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গ্রীস অনেকদিন নিরপেক্ষ ছিল। হঠাৎ ইতালি তাকে আক্রমণ করে বসে। গ্রীকরা, ইতালিয়ান সৈন্যদের উল্টে তাড়া করে

একেবারে আলবেনিয়ার মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়। এমনি সময় জার্ম্মেণী এসে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিল জার্ম্মাণ সৈন্য যুগপৎ গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। ইংরেজ সৈন্য তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতই ছিল। এপিরাস ও মাসিডনস্থিত গ্রীক ও ইংরেজবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত গ্রীস সম্পূর্ণভাবেই পদানত রইলো জার্ম্মেণীর। তার নগরে নগরে জার্ম্মাণ সেনার ঘাঁটি বসলো। রাজা ও মন্ত্রিসভা দেশ ছেড়ে পলায়ন করলেন। কাইরোতে হলো মন্ত্রিসভার আশ্রয়-স্থান। সেখান থেকে তাঁরা মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন।

এদিকে গ্রীসের অভ্যন্তরে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো দেশপ্রেমিকেরা। দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন গেরিলা-দলের ভিতর সৌহার্দ্দ্য বা সমন্বয় ছিল না, কাজেই তারা জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারলো না। ১৯৪৪-এর শেষভাগে জার্ম্মেণীতে হিটলারের বিপর্য্যয় স্বরু হলো, সেই কারণেই গ্রীসের জার্ম্মাণ সৈন্যসমূহও দ্রুতগতি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে লাগলো। এই সময়ে ইংরেজবাহিনীও এসে সালোনিকা বন্দরে অবতরণ করলো।

আলেকজাণ্ডার
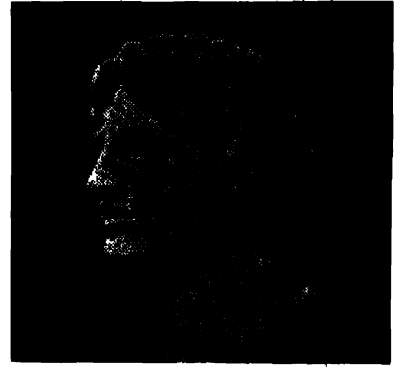
গ্রীসের নির্ব্বাসিত মন্ত্রিসভা রাজধানী এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করলো। **প্যাপেনড্রো** তখন প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু গ্রীসের বিভিন্ন সামরিক ও রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতা তিনি পেলেন না। মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতি **জেনারেল স্কোবি,** গ্রীক গেরিলাদের নিজের আজ্ঞাধীন করবার চেষ্টা করে কতকটা সাফল্য লাভ করলেন। চার্চ্চিল ও ইডেন গ্রীস পরিদর্শনে এলেন এই সময়ে। তাঁদের যুক্তি-পরামর্শেও গ্রীকদের আভ্যন্তরীণ মতদ্বৈধ নিরাকরণ হলো না। চার্চ্চিলের পরামর্শ অনুসারেই গ্রীসের রাজা, গ্রীক ধর্ম্ম-যাজকগণের প্রাইমেট আর্কবিশপ ড্যামাস্কিনোকে রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করলেন। রাজা স্বয়ং বিদেশে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করতে লাগলেন।

গ্রীসের আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দীর্ঘদিন ধরে চলতেই থাকলো। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপে সে-জটিল অবস্থা

ক্রমশঃই জটিলতর হয়ে উঠলো। এখনও গ্রীস সেই দুর্গতির ভিতরই রয়ে গেছে, স্বাধীনতা পেয়েও সে শান্তি পায়নি। বর্ত্তমানে গ্রীস, একদিকে রাশিয়া ও অপরদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার, বিপরীতমুখী কূটনৈতিক চালের আবর্ত্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। শান্তি ও স্বস্তিতে গ্রীস নিজের কোন স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারছে না। ইঙ্গ-মার্কিণ চক্র, পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, তুরস্কের

আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক দুষ্ট ঘোড়া সায়েস্তা

মত গ্রীসকেও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। গ্রীক কম্যুনিষ্ট-বিদ্রোহীগণ অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ও আন্দোলন করে, শেষ পর্য্যন্ত সফলতা লাভ করতে পারে নাই। গ্রীসের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ও ইঙ্গ-মার্কিণ মুখাপেক্ষী। আমেরিকা গ্রীক-সরকারকে প্রচুর সাহায্য করছে।

ইতালির প্রাচীন ইতিহাস বলতে রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসই বুঝায়। বর্ত্তমান ইতালি থেকে পুরাতন কালের রোমের ইতিহাস অনেক বেশী মূল্যবান ও বিখ্যাত। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মত রোমও গোড়ায় মাত্র একটি নগর-রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু রোম তার নিজের শক্তির ও শৌর্য্য-বীর্য্যের বলে ক্রমে, প্রথমে সমস্ত ইতালি দেশ এবং পরে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া, এই তিন মহাদেশের অন্তর্গত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর, নিজের আধিপত্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

রোমের উত্থানের সময় গ্রীসদেশে রাজনৈতিক পতন ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়েছিল। রোমের অগ্রাভিযানের পথে গ্রীসকেও তার জয় করতে হয়েছিল। কিন্তু রোম নিজে, পরাজিত গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। গ্রীসের উন্নত সংস্কৃতি ও রোমের নিজের আইনানুবর্ত্তিতার সংমিশ্রণে, রোমে একটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এই রোমক সভ্যতা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে ও পশ্চিম-ইউরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়।

এই রোমক সভ্যতা, তার চরম উৎকর্ষের সময়, অপরাপর ইউরোপীয় দেশগুলির উপর সংক্রামিত হয়ে পড়ে এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি, অনেক বিষয়ে প্রাচীন রোমের নিকট ঋণী। রোমই গ্রীক সভ্যতার ধারক ও প্রচারক। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের আলোক, প্রথমে রোমে ও পরে

রোম-সাম্রাজ্য থেকেই অন্য সব ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রসারিত হয়। তাছাড়া, রোমই ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের উৎসস্থান ও প্রচার-কেন্দ্র। রোমের পোপই ইউরোপে খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু।

রোম-ইতিহাসের প্রথম যুগকে 'রাজ-পর্ব্ব' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই যুগের রাজাদের কাহিনী অনেকটা উপকথার মত, তবে এসময়ের প্রকৃত

কমিশিয়া কিউরিয়াটা

ইতিহাসও খানিকটা পাওয়া যায়। কথিত আছে, **রোমুলাস** নামে এক ব্যক্তি রোম নগরীর স্থাপয়িতা ও প্রথম রাজা।

রাজ-যুগের শাসকদের মধ্যে নৃপতি **সারভিয়াস টুলিয়াসের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি ল্যাটিনদের সহিত সন্ধি করে রোমের শক্তিবৃদ্ধি করেন। ত্রিশ-নগরী সমন্বিত ল্যাটিন-লীগ গঠন তাঁরই কৃতিত্ব। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে, তিনি প্রজাসাধারণকে জন্মগত না করে ঐশ্বর্য্যগত ভিত্তিতে ভাগ করে সঙ্ঘবদ্ধ করেন।

এইভাবে রোমান প্রজাদের প্রধান পরিষদ **"কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা"**র প্রবর্ত্তন হয়।

রোমানরা মিশ্রিত জাতি। তাদের মধ্যে ল্যাটিন অংশই প্রধান; স্যাবাইন ও বৈদেশিক ইত্রাসকান জাতিও রোমান জাতির মধ্যে মিশে যায়। রাজার যুগে রোমের রাজ্যশাসন-বিধি উল্লেখযোগ্য ছিল। রাজাই রাষ্ট্রগুরু। তিনি যুদ্ধে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মব্যাপারে দেশের প্রধান পুরোহিত। তবে রাজার ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। তাঁকে রাজকার্য্যে পরামর্শ দেবার জন্য **"সেনেট"** বা একটি প্রবীণ-পরিষদ ছিল। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ লোকেরাই এই সেনেটের সভ্য হতেন। এই সময় **"কমিশিয়া কিউরিয়েটা"** নামক রোমক নগরবাসিবৃন্দের এক পরিষদ ছিল। প্যাট্রিসিয়ানগণই এই পরিষদে প্রাধান্য লাভ করতেন।

তখনকার রোমের উচ্চশ্রেণীর লোকদের বলা হতো **প্যাট্রিসিয়ান** এবং সুবিধা-সুযোগ বঞ্চিত সাধারণ জনসমূহকে বলা হতো **প্লিবিয়ান।** রাজা সারভিয়াস এই যুগে, কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে ধনী প্লিবিয়ানদের কতকটা সুবিধা হয়। রাজ-যুগের শেষ রাজা **টারকুইন** অত্যাচারী ও গর্ব্বিত ছিলেন। তখন দেশের লোকেরা বিদ্রোহ করে টারকুইনকে রাজ্য থেকে দূর করে দেয় ও প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করে।

এই প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫১০-৯ সালে।

সাধারণতন্ত্রের যুগ

সাধারণতন্ত্র-যুগের প্রথম দুইশত বৎসরের ইতিহাস, প্যাটিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের পরস্পর সংঘর্ষের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল রোমের আদিম ল্যাটিন অধিবাসী। প্লিবিয়ানগণ গোড়ায় প্যাট্রিসিয়ানদের একান্ত অধীন ছিল, পরে তারা মুক্ত নাগরিকের অধিকার লাভ করেও বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নাই। ক্রমে অনেক বিদেশী এসে রোমে বসবাস করে এই অধিকারহীন প্লিবিয়ান বা জনতার সংখ্যা বাড়ায়। প্লিবিয়ানদের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ ছিল। এই অসুবিধা ও অসমতাসমূহ অর্থনৈতিক, জমি-সংক্রান্ত, আইনগত, সামাজিক, ধর্ম্মগত এবং রাজনৈতিক পর্য্যায়ে পড়ে।

ক্রমাগত প্রায় দুইশত বৎসরের সংগ্রামের ফলে, প্লিবিয়ানগণের অসুবিধাগুলির প্রায় সব কিছুই অপসারিত হয়। বিবিধ আইনের সাহায্যে প্লিবিয়ানরা তাদের শক্তি-সুবিধা আহরণ করে। এই আইনগুলির মধ্যে "দ্বাদশ দফা আইন" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ক্রমে প্লিবিয়ানরা রাষ্ট্রের **কনসাল** বা সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তার পদেরও অধিকারী হয়। এই গৃহবিরোধের প্রকৃতিতে দে়া যায় যে, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সংগ্রাম অতি শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুসম্পন্ন হয়েছিল।

যখন রোমের ভিতরে দুই সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ চলছিল, তখন বাইরের প্রতিবেশী-জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গেও রোমানদের অনেক
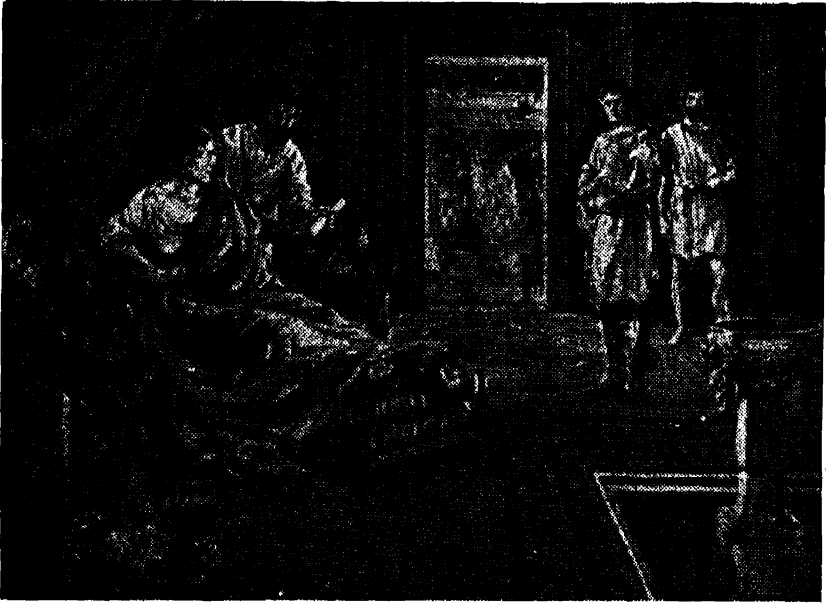
প্যাট্রিসিয়ান ও তার প্লিবিয়ান প্রজা

যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়। যে-সব জাতির সঙ্গে রোমের যুদ্ধ হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভলসি, ইকুই, ইত্রাসকান ও গলগণ প্রধান। এই সকল যুদ্ধে রোমানদের প্রথমদিকে অনেক অসুবিধা ও বিপদ ঘটেছিল; কিন্তু পরে রোমানদের দেশপ্রেম, একতা ও অধ্যবসায়ের বলে তারা, প্রতিবেশী জাতিগণকে পরাভূত করে ও তাদের দেশে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তৃত করে। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে অনেক রোমানের বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বীরদের মধ্যে **সিনসিনেটাস, ক্যামিলাস, কোরিয়োলেনাস** এবং **হোরেসিও**র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে।

এর পর রোমানরা দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়ী জাতি স্যামনাইটদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। এই যুদ্ধ দীর্ঘ অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরে চলে। শেষ পর্য্যন্ত যদিও স্যামনাইটরা হেরে যায়, তথাপি এই পরাক্রান্ত পার্ব্বত্য দলদের পরাজিত করতে রোমানদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

স্যামনাইটদের হারিয়ে দিয়ে, রোম যখন মধ্য-ইতালির অধীশ্বর হয় তখন দক্ষিণ-ইতালিতে, ক্ষমতাপন্ন গ্রীকনগর টারেণ্টামের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ স্থরু হয়। এই যুদ্ধে এপিরাসের গ্রীক রণ-বীর **রাজা পাইরাস** টারেণ্টামকে

ভলসিয়ানদের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ

সাহায্য করেন। কাজেই, রোমানগণ খুব বিপদে পড়ে। তবে রোমানদের সমর-নৈপুণ্য ও দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের জন্য, পাইরাস প্রথম যুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করলেও, তাঁর ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাঁর নিকট, এই নবজাগ্রত রোমক জাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করা সুদূরপরাহত বলে মনে হলো। টারেণ্টামবাসীদের অক্ষমতার দরুণ শেষ পর্য্যন্ত পাইরাসকে বেনিভেণ্টাম যুদ্ধে পরাজিত হতে হলো এবং তাঁর সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হলো।

এরূপে, রোম সমগ্র ইতালির প্রভু হয়ে দাঁড়ালো। রোমানদের এইসব যুদ্ধজয়ের প্রধান হেতু, তাদের অদম্য উৎসাহ, অসীম অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক

স্বদেশপ্রেম। রোমানগণ শুধু বড় যোদ্ধা ও দেশজয়ী ছিল না, রাজ্যগঠনেও তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

হানিবল

ইতালির অধীশ্বর হবার পর, রোমানগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। তখন ইতালির দক্ষিণ দিকস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, উত্তর-আফ্রিকাস্থিত প্রসিদ্ধ **কার্থেজ** নগরী প্রভুত্ব করতো। এই কার্থেজ নগরী ছিল এশিয়াবাসী ফিনিশীয়দের একটি শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ। এই সময় কার্থেজ তার নৌ-শক্তি ও বাণিজ্য-বলে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ধন-সম্পত্তি, বাণিজ্য-

রোমান সেনেট কর্ত্তৃক পাইরাসের সন্ধি-প্রার্থনা অগ্রাহ্য
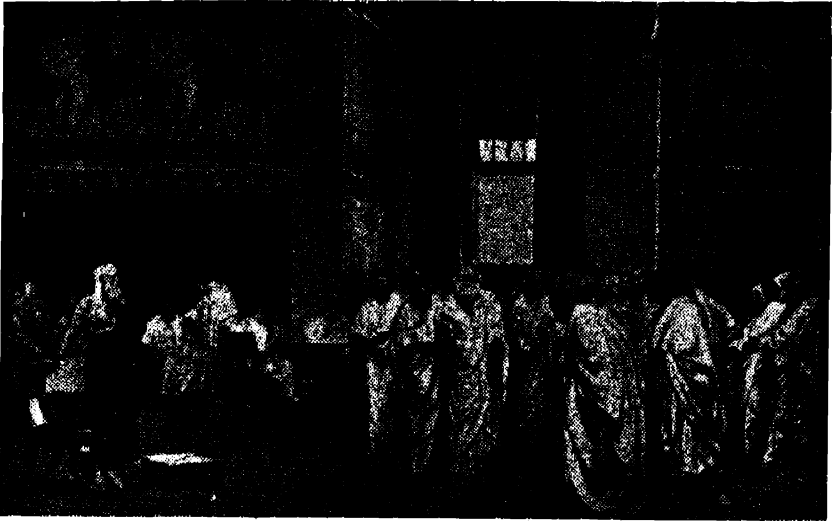
সৌভাগ্য ও সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করে কার্থেজ বিরাট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সিসিলির পশ্চিমাংশও তখন কার্থেজের কুক্ষিগত ছিল।

রোম, এখন তার বিস্তৃতিলাভের পথে, কার্থেজের সঙ্গে অনিবার্য্যরূপে দীর্ঘ জীবন-মরণ সংগ্রামে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। এই সময় কার্থেজের সঙ্গে রোমের তুলনা করতে গেলে, স্থূলদৃষ্টিতে, কার্থেজের বিস্তৃত সাম্রাজ্য, ধন-সম্পত্তি এবং নৌ-শক্তি অনায়াসেই রোমকে ধ্বংস করতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে প্রণিধান করলে উভয়ের শক্তি-তারতম্য ধরা পড়ে।

কার্থেজের বাহ্যিক সমৃদ্ধি ও বলিষ্ঠতার অন্তরালে চরম দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে কার্থেজে বার্কা-পরিবার নামে, এক বিখ্যাত যোদ্ধা-পরিবারের

উদ্ভব হয়। এই পরিবারের বীরদের মধ্যে **হামিলকার** ও তাঁর পুত্র **হানিবলের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই হানিবল সে-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক। কার্থেজের সাথে রোমের যে-সকল যুদ্ধ হয়েছিল, সেগুলিকে বলে **পিউনিক-যুদ্ধ**। এই পিউনিক-যুদ্ধাবলীর মধ্যে, হানিবলের সঙ্গে রোমের যুদ্ধই ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রথম পিউনিক-যুদ্ধ সিসিলি দেশ নিয়ে ঘটে। এই যুদ্ধে কার্থেজই পরাজিত হয়, তবে তার বিশেষ ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের মত কঠিন সংগ্রাম রোমানদের আর কোনদিন করতে হয় নাই। রোমানরা আর কখনও, দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের নায়ক, হানিবলের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয় নাই।

হানিবল, তাঁর পিতার শপথ পালন করবার জন্য, রোমানদের উপর প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি সুযোগমত অসম্ভব ক্ষিপ্র-গতিতে, কার্থেজের নতুন ঘাঁটি স্পেন থেকে রওনা হয়ে, বিষম বিপদের মধ্যে আল্পস পর্ব্বত অতিক্রম করে, সহসা উত্তর-ইতালি আক্রমণ করেন। তারপর তিনি পনের বৎসর ধরে, ইতালি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত মথিত করে, রোমানদের সাথে ক্রমাগত ভীষণ যুদ্ধ করে যান।

রোমানগণ, হানিবলের আকস্মিক দুর্ব্বার আক্রমণে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়। তারা একটার পর একটা যুদ্ধে কেবল হেরেই যেতে থাকে। টিসিনাস, ট্রিবিয়া, ট্রাসিমেন-হ্রদ ও **ক্যানির** যুদ্ধ কেবল রোমানগণের অপরিসীম বিপর্য্যয় ও গ্লানির কাহিনী। অন্যপক্ষে, হানিবল দেখান তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভা, কৌশল, ক্ষিপ্রগতি ও যুদ্ধজয় করার সামর্থ্য। হানিবলের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পেল যে, দক্ষিণ-ইতালিতে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। রোমের চিরশত্রু স্যামনাইটগণ বিদ্রোহ করলো। অধিকাংশ গ্রীক-নগর হানিবলের পক্ষে যোগ দিল। ক্যাপুয়া নগর বিদ্রোহ করলো, তবে রোমের ল্যাটিন প্রজাগণ কিন্তু বিদ্রোহ করলো না।

এর পর থেকে নানা কারণে রোমের অবস্থার উন্নতি হতে লাগলো। ইতালি ব্যতীত স্পেন এবং সিসিলিতেও যুদ্ধ চলতে লাগলো। হানিবল অবশ্য সিরাকিউস এবং মাসিডোনিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু এতে রোমের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হলো না। রোমান সেনাপতি মার্সেলাস সিরাকিউস অধিকার করলেন। ইতালিতে বেনিভেণ্টামের যুদ্ধে হানিবল পরাজিত হলেন। ক্যাপুয়া পুনরায় রোমের পদানত হলো।

স্পেনে, **সিপিও** নামক এক প্রতিভাবান সেনাপতির নেতৃত্বে রোমানগণ সফলতা লাভ করলো। কার্থেজ হতে হানিবল বিশেষ কোন সাহায্য পেলেন না। স্পেন হতে হানিবলের ভ্রাতা **হাসড্রুবল,** সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উত্তর-ইতালিতে এসেছিলেন, কিন্তু তিনিও মেটারাসের অতর্কিত যুদ্ধে, রোমানদের নিকট পরাজিত ও নিহত হলেন। তখন হানিবলের রোমজয়ের আর কোন আশাই রইলো না।

অবশেষে সিপিও সিসিলি জয় করে, আফ্রিকাতে অভিযান করলেন ও কার্থেজের মূলশক্তির কেন্দ্রস্থলে, একটার পর একটা আঘাত হানতে লাগলেন।

ট্রাসিমেন-হ্রদের যুদ্ধ

কার্থেজের বিপদ দেখে চারদিকে প্রজাগণ বিদ্রোহ করে উঠলো। হানিবল এতদিন দক্ষিণ-ইতালিতে প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু কার্থেজের বিপন্ন অবস্থা দেখে, তাঁকে স্বদেশরক্ষার জন্য অগ্রসর হতে হলো। খৃঃ পূঃ ২০২ সালে ইতিহাস-বিখ্যাত **জামা'র যুদ্ধে** সিপিও, হানিবলকে পরাজিত করলেন। কার্থেজ সন্ধি করতে বাধ্য হলো। হানিবলের রোম-জয়ের কল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হলো। কার্থেজ রোমের করদ-রাষ্ট্রে পরিণত হলো।

হানিবল অবশ্য এর পরও, কার্থেজকে পুনর্গঠিত করে রোমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা পোষণ করেছিলেন। তিনি আবার ভবিষ্যৎ

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রোম শঙ্কিত হয়ে কার্থেজের নিকট তাঁর আত্মসমর্পণের দাবী করলো। হানিবল তখন পলায়ন করে সিরিয়া, ক্রীট, বিথনিয়া প্রভৃতি দেশের রাজাদের কাছে যেয়ে, তাঁদের একের পর এক রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন কিন্তু রোমানগণ সর্ব্বত্রই তাঁকে তাড়িয়ে ফিরতে থাকলো। অবশেষে অসহায় হানিবল আত্মহত্যা করে, অপমানের হাত থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

এরপর রোমান-সাম্রাজ্যের দ্রুত প্রসারের পথে আর কোন কণ্টক রইলো না। শীঘ্রই মাসিডোনিয়া, গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, স্পেন এবং আরও অনেক

জামা'র যুদ্ধ

স্থানে রোমান-সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করলো। কিছুদিন পরে গর্ব্বিত, সাম্রাজ্য-মদমত্ত রোমানগণ, তৃতীয় পিউনিক-যুদ্ধে, অত্যন্ত অন্যায়রূপে কার্থেজ নগরীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিল।

রোমের সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির মূলে, রোমের সিনেটের জ্ঞানবৃদ্ধ ও সু-অভিজ্ঞ সদস্যদের অনেকখানি হাত ছিল। তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পারদর্শিতা ও স্বদেশ-প্রেরণার বলেই রোমানগণ, দেশের পর দেশ জয় করতে পেরেছিল। কিন্তু যখন সাম্রাজ্য-প্রসারণের ফলে, নানাদেশ থেকে রোমে ধন-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তখন সিনেট স্বার্থপরায়ণ, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও সমস্ত-ক্ষমতাগ্রাসী হয়ে পড়লো। রোমে সিনেট সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান

হয়ে উঠলো। এখন সে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শক্তির অপব্যবহার করতে লাগলো। রোমের শাসনতন্ত্র ক্রমে, নামমাত্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হলো। আসলে ইহা সিনেটের সদস্যদের অভিজাত-তন্ত্রে রূপান্তরিত হলো।

শস্য-আইন ('করন্ ল')

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের শেষার্দ্ধে, রোমে নানারূপ সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের ফলে, রোমে কৃষিকার্য্যের অবনতি ঘটেছিল, চাষের জমি নষ্ট হয়েছিল এবং গ্রাম হতে লোক সহরে আসতে আরম্ভ করলো। সিসিলি ও মিশর হতে শস্য আমদানী করা হতে লাগলো। রোমের অধিবাসিগণ কৃষিকার্য্যকে অবহেলা করতে শিখলো।

রোমের নাগরিকগণ দাস-শ্রমের উপর নির্ভর করতে শিখলো। লোকের আর্থিক দুর্গতি বৃদ্ধি পেল। রাষ্ট্রের সাধারণ জমিসমূহ বড়লোকেরা এমন-ভাবে নিজেদের ভিতর বিভক্ত করে নিয়েছিল যে, সাধারণ নাগরিকগণ তার কোন অংশই পেত না। ধনী ও দরিদ্রের রেষারেষি রাষ্ট্র-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল।

এই তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেন, **তাইবেরিয়াস** ও **কেইয়াস** নামক সম্ভ্রান্ত বংশজাত গ্রাকাস-ভ্রাতৃদ্বয়। তাইবেরিয়াস অর্থনৈতিক ও কৃষিসংক্রান্ত অ-ব্যবস্থাগুলির আমূল সংস্কার করতে চেষ্টা

সুল্লা ও মেরিয়াস

করেন আর কেইয়াস, সিনেটের প্রভাব খর্ব্ব করে, অপরাপর ধনি-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করতে সচেষ্ট হন। উভয় ভ্রাতাই তাঁদের যুগান্তকারী সংস্কার সম্পাদনে অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু স্বার্থান্ধ সিনেটের উগ্র প্রতিহিংসার ফলে, তাঁরা দুজনেই নিহত হলেন। এই সময় থেকেই রোমে রাজনৈতিক দলাদলিতে হত্যা ও রক্তপাত সুরু হলো।

এখন থেকে রোম-রাষ্ট্রের মধ্যে যে তীব্র দলাদলি আরম্ভ হলো, তার ফলেই প্রজাতন্ত্রের পতন অনিবার্য্য হয়ে উঠলো। রোমের এই অন্তর্বিরোধ ও ক্ষমতালোভী সিনেটের সদস্যদের স্বার্থান্ধতার জন্য, দেশে বিশেষ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন পরপর কয়েকজন শক্তিশালী সামরিক নেতার আবির্ভাব

হলো। এঁদের মধ্যে **মেরিয়াস, সুল্লা, পম্পে** এবং **জুলিয়াস সীজারের** নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

সুল্লা অভিজাত-বংশের সন্তান ছিলেন। সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে, তিনি রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি নানাযুদ্ধে অশেষ কৃতিত্ব দেখান, বিশেষ করে এশিয়া-মাইনরের পরাক্রান্ত নৃপতি **মিথ্রিডাটিসকে** পরাজিত করে তিনি যথেষ্ট গৌরবের অধিকারী হন। অকর্ম্মণ্য সিনেট সুল্লাকে রাষ্ট্রনায়কের অটুট ক্ষমতায় বিভূষিত করে।

সুল্লার নীতি ছিল কঠোর ও নির্ম্মম। তিনি প্রতিপক্ষ মেরিয়াসের দলের বহুলোককে হত্যা করান; ফলে রোমে বিভিন্ন দলের মধ্যে হত্যা ও রক্তপাতের বন্যা বয়ে যেতে সুরু করলো। সুল্লার অনেকগুলি সংস্কার প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলে তা শীঘ্রই উঠে গেল। সুল্লার পর রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে, পম্পে ও সীজারের প্রাধান্যের যুগ আরম্ভ হলো।

জুলিয়াস সীজার

শৌর্য্যে ও বীর্য্যে সীজারের মত লোক তখনকার দিনে বড় একটা ছিল না।
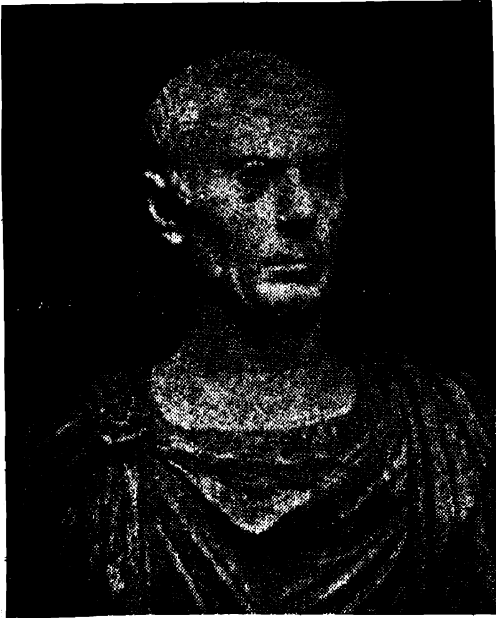
জুলিয়াস সীজার

জুলিয়াস সীজার ফ্রান্স জয় করেছিলেন এবং জার্ম্মেনীরও কতকটা অংশ তিনি রোমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি বৃটেনকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। জুলিয়াস সীজার খৃঃ পূঃ ৫৫ ও ৫৪ অব্দে, পরপর দুইবার বৃটেনে অভিযান করেছিলেন। সীজারের সময়ে, রোমে আর একজন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর নাম **পম্পে**। পম্পে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের এবং পশ্চিম-এশিয়ার অনেক স্থান জয় করেন।

তারপর সীজার এবং পম্পের মধ্যে কে বড় যোদ্ধা, তাই নিয়ে বিরোধ বাধে। দুইজনেরই ইচ্ছা, সমগ্র রোমান-সাম্রাজ্য তাঁর একার ইচ্ছায় পরিচালিত হবে। এই নিয়ে সীজার এবং পম্পে দুজনের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়। এই

পম্পের জেরুজালেম অধিকার

যুদ্ধে পম্পে পরাজিত হন। সীজার জয়লাভ করে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে, রাজ্য-শাসন করতে থাকেন।

রোমে সীজারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে,

প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়ে, একনায়ক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো। সীজার অবশ্য রাজা উপাধি গ্রহণ করলেন না, তবে রাজার সকল ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার অপব্যবহার করেন নি। নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করে তিনি সুশাসনের পরিচয় দিয়েছেন।

সীজার ছিলেন প্রতিভাবান পুরুষ। তাঁর যাবতীয় কাজে একটা মৌলিকতা ও দূরদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, সিনেট স্বার্থান্বেষী ও অপদার্থ হয়ে পড়েছে ও সাধারণতন্ত্র কাঠামোতে ঘূণ ধরেছে। তিনি দেখলেন যে, রোমান সাম্রাজ্যকে রক্ষা ও উন্নত করতে হলে, সাধারণ-তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে, নিরঙ্কুশ একনায়ক-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা দরকার। তাই তিনি প্রকাশ্যে সাধারণতন্ত্র ভেঙ্গে দিবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। তিনি ছিলেন গণ-নেতা এবং সিনেট-বিরোধী।

দরিদ্রের দুঃখ লাঘবের জন্য সীজার অশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মন ছিল উদার ও শিক্ষিত। গল দেশ ও বৃটেনে অভিযান-সমূহের যে ইতিবৃত্ত তিনি লিখে গেছেন, তা-থেকে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করে তিনি সমগ্র মানবজাতির উপকার করে গেছেন। মোটকথা—যুদ্ধে, শাসনে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় সীজার পৃথিবীর ইতিহাস-স্রষ্টাদের অন্যতম।

সীজার তাঁর জনপ্রিয়তা ও নিজের প্রতিভার জোরে রোমান-সাম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েছিলেন। স্বার্থপর সিনেটের সদস্যগণ মোটেই তাঁকে পছন্দ করতেন না; শুধু ভয়ে, তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে গোলামের মত চলতেন। একদল লোক সীজারের একনায়কত্বের জন্য ভীষণ চটে গেল। তারা ভাবতো যে, একনায়কত্বের অবসান করতে না পারলে সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তিরোহিত হবে। **ব্রুটাস** এবং **কেসিয়াসের** নেতৃত্বে এই দল, ষড়যন্ত্র করে সীজারকে হত্যা করলো। সীজারের হত্যা ছিল একটি চরম ভুল। এর ফলে রোমে অনিয়ম ও গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো এবং অবশেষে নিয়তির মত দুর্ব্বার গতিতে, সাধারণতন্ত্র একেবারে বিনষ্ট হয়ে সাম্রাজ্য স্থাপিত হলো।
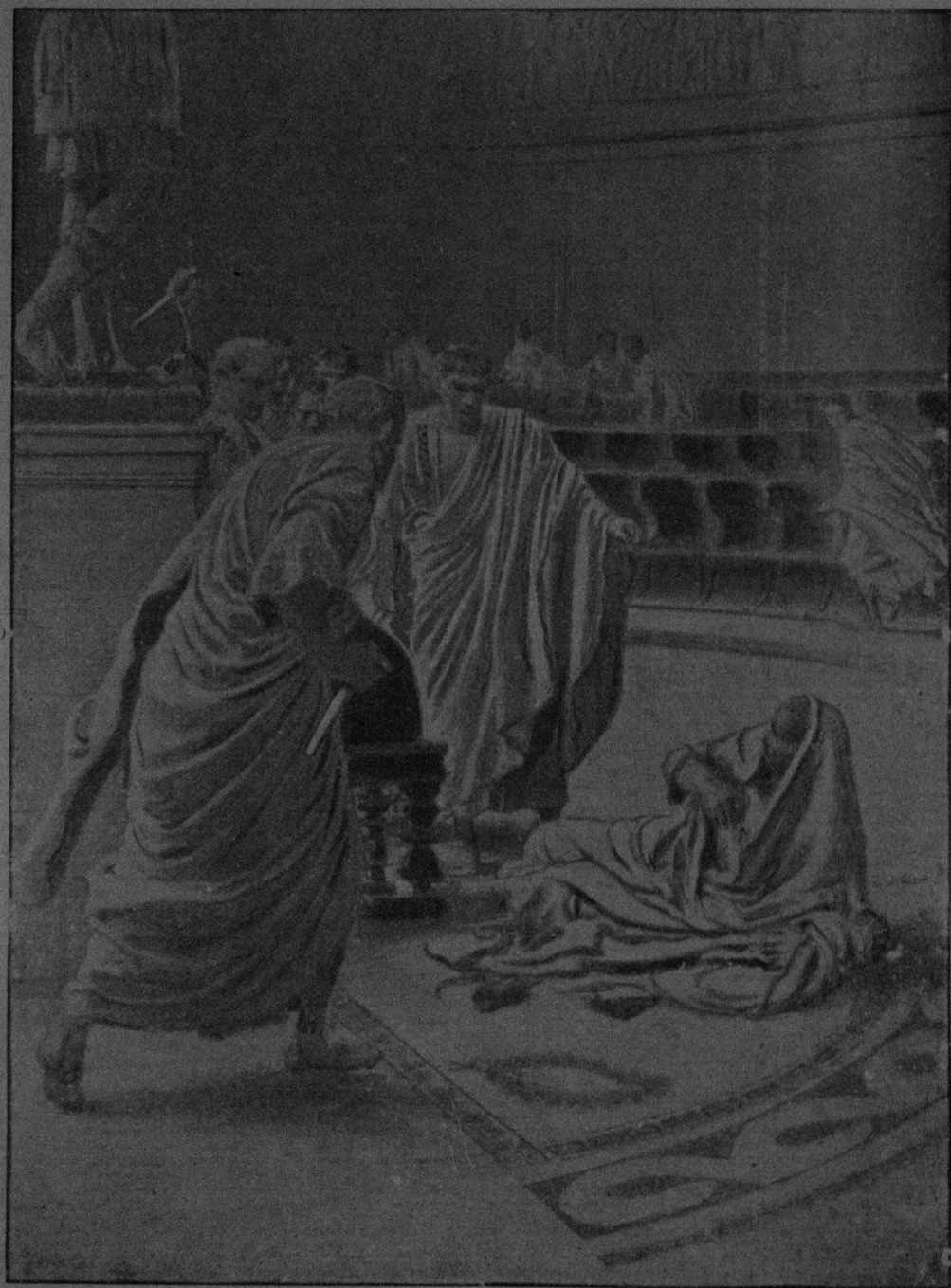
ব্রুটাস ও কেসিয়াসের নেতৃত্বে সীজারের হত্যাকাণ্ড।

সম্রাট অগস্টাস

সীজারের ভাগিনেয় **অক্টেভিয়াস,** "সম্রাট-যুগে" রোমের প্রথম সম্রাট। তিনি সম্রাট হয়ে 'অগস্টাস' উপাধি গ্রহণ করেন। **মার্ক এণ্টনি** নামে

বন্য বরাহ শিকার
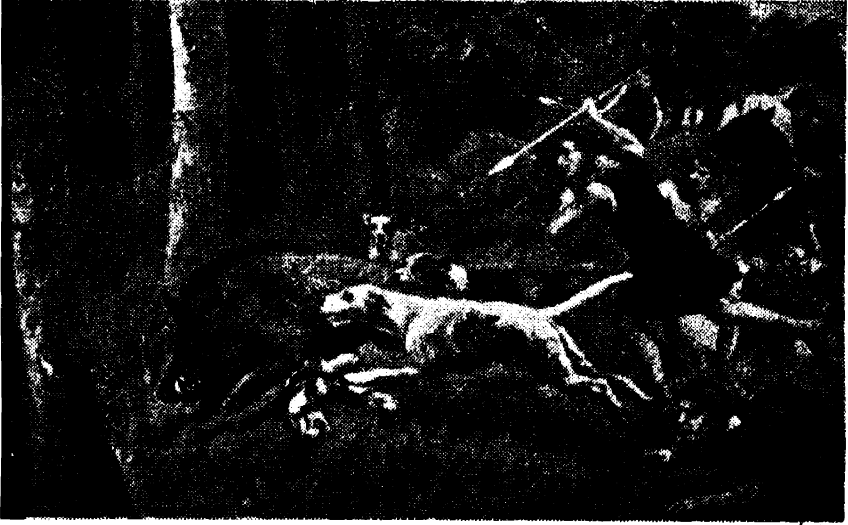
একজন যোদ্ধা অগস্টাসকে বঞ্চিত করে, রোমের সিংহাসন দখল করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই এণ্টনিই মিশরের সুন্দরী **রাণী ক্লিওপেট্রার** রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এ্যামফিথিয়েটার

সম্রাট অগস্টাসের আমলে রোমের অনেক উন্নতি হয়। রোম নগরীতে তিনি খুব সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দির, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার নানাস্থান থেকে অসংখ্য লোক রোমে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসতো। তাদের জন্য তিনি মার্বেল-পাথরে বাঁধানো ভালো ভালো বাজার তৈরী করে দেন।
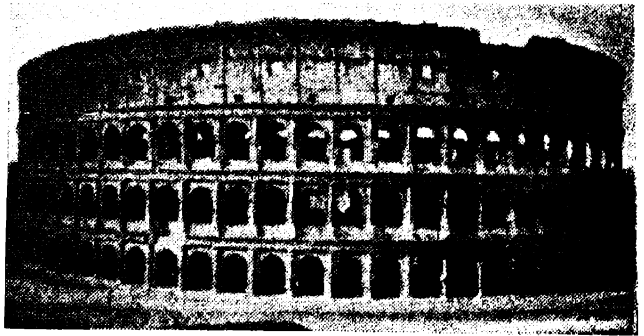
রোমের লোকেরা খেলাধূলা খুব ভালবাসতো। তাদের জন্যও তিনি চমৎকার সব খেলার জায়গা তৈরী করে দেন। এইসব খেলার জায়গা বা এ্যামফিথিয়েটারে ষাঁড়ের লড়াই, সিংহের লড়াই, বাঘের লড়াই প্রভৃতি হতো; তাছাড়া, মানুষের সঙ্গে ষাঁড়ের, সিংহের বা বাঘের লড়াইও হতো। এইসব ছিল রোমানদের খুব প্রিয় খেলা। অগস্টাসের শাসন-পদ্ধতিকে সাধারণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অবগুণ্ঠিত স্বেচ্ছাতন্ত্র বলা যেতে পারে।

দেশে ও বিদেশে অরাজকতা দূর করে, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অগস্টাস সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়ে ঐতিহাসিক **লিভি,** কবি **ভার্জিল,** হোরেস এবং ওভিড সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলেই যীশুখৃষ্ট অবতীর্ণ হন।

সম্রাট নীরো

রোমান সম্রাটদের মধ্যে **নীরো** ছিলেন সবচেয়ে অত্যাচারী। তাঁর রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছর একরকম ভালই কেটেছিল। নীরো ছোটবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলেন **সেনেকা** নামক একজন শিক্ষকের কাছে। সেনেকা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর নীরো সেনেকাকে তাঁর মন্ত্রী করেন। সেনেকার পরামর্শ যতদিন তিনি শুনেছেন, ততদিন তিনি ভালভাবেই রাজ্যশাসন করতে পেরেছেন।

সম্রাট নীরো

কিন্তু পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর মাথা গেল গরম হয়ে। তাঁর ধারণা হলো যে, তাঁর মত বুদ্ধিমান, খেলোয়াড়, সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যবিৎ সারা পৃথিবীতে আর কেউ নাই। সেনেকার উপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। তবুও সেনেকা তাঁকে সৎপথে চলতে পরামর্শ দিতেন। শেষে একদিন নীরো রেগে, বৃদ্ধ সেনেকাকে হত্যা করবার আদেশ দেন। নীরোর মা ছিলেন মহীয়সী নারী। তিনিও ছেলেকে সৎপথে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নীরো মায়ের উপরেও এমন চটে গেলেন যে, মাকে পর্য্যন্ত তিনি হত্যা করলেন।

এরপর থেকে নীরোর অত্যাচারে সারাটা দেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একদিন এক ভীষণ আগুন লেগে রোমের প্রায় অর্দ্ধেকটা পুড়ে যায়। সাত দিন ধরে এই আগুন জ্বলেছিল। কথিত আছে, এই ভয়ানক আগুনে যখন রোমের লোকজন হাহাকার করে ছুটে বেড়াচ্ছিল, নীরো সেই সময় মহানন্দে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন!

নীরোর পরে **হাড্রিয়ান, এণ্টোনিনাস** এবং **মার্কাস অরেলিয়াস** নামক তিনজন সম্রাট রোমকে আবার সমৃদ্ধ করে তোলেন।

সম্রাট হাড্রিয়ান

নিত্য-নতুন-দেশ জয় করবার আগ্রহ রোমানদের খুব বেশী ছিল। সম্রাট হাড্রিয়ান তাদের বোঝালেন যে, আর বেশী দেশ জয় করবার চেষ্টা না করে, সাম্রাজ্যের লোকেরা যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে, যাতে সব লোক সুবিচার পায়, কারও উপর যাতে কোন অন্যায় না হয়, সেই দিকে এবার লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের তিনি অনেক উন্নতি করেন এবং অনেক নতুন সহর তৈরী করে দেন। হাড্রিয়ানের রাজত্বে, রোমান সাম্রাজ্যের প্রজারা শান্তিতে বাস করতে পেরেছিল। ইনি বৃটেনে বহু রাস্তা, সামরিক ঘাঁটি ও প্রসিদ্ধ "হাড্রিয়ান প্রাকার" নির্ম্মাণ করেছিলেন।

সম্রাট হাড্রিয়ান

সম্রাট এণ্টোনিনাস
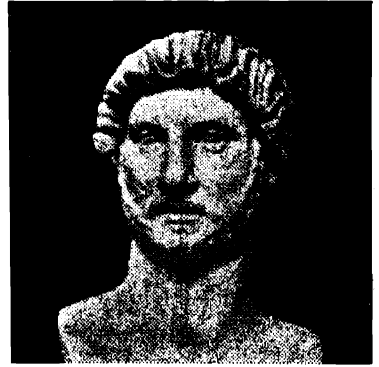
হাড্রিয়ানের পর সম্রাট **এণ্টোনিনাসও** প্রজাদের খুব প্রিয় হয়েছিলেন। তিনি এত ভাল লোক ছিলেন যে, প্রজারা তাঁর নাম দিয়েছিল, 'ধার্ম্মিক এণ্টোনিনাস'। বিচারে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হতো, তারাও যাতে দয়া পায়, তিনি সে ব্যবস্থা করে দেন। সাম্রাজ্যের যে-সব সহরের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, তাদের তিনি অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর আমলে রোমে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছিল। সদাশয়তা ও মহানুভবতার জন্য এণ্টোনিনাসকে ভারত-সম্রাট অশোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস

সম্রাট **মার্কাস অরেলিয়াসও** এণ্টোনিনাসের মত খুব ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি বেশী শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেন নাই। তাঁকে সাম্রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। সীমান্তে বিভিন্ন বর্ব্বর জাতিও রোমক-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল। তাঁর সময় নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধি বিনষ্ট করলো। একটি মহামারীতে বহুলোক প্রাণ হারালো। দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে লোকের দুর্দ্দশার অন্ত রইলো না। রোমানগণ মনে করলো, এইসব প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দৈব-অভিশাপের ফল। তাই দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য তারা খৃষ্টান-দিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলো।

সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস

সম্রাট অরেলিয়াসের অনেক যুদ্ধ করতে হয়। তবে নানাবিধ গোলযোগের মধ্যেও তিনি "মেডিটেশনস" বা "চিন্তালহরী" নামক একখানি পুস্তক রচনা করতে সময় পেয়েছিলেন। এতে তাঁর অন্তরের ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান

মার্কাস অরেলিয়াসের সময় থেকে, খৃষ্টান ও রোমানদের মধ্যে যে বিরোধ সুরু হয়েছিল, সেটা অনেকদিন ধরে চলেছিল। রোমানদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের অন্ত ছিল না, তার উপর জার্ম্মাণ এবং পারসিকদের আক্রমণ। এইসময় সম্রাট **ডায়োক্লিসিয়ান** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করে আবার চারদিকে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এ-বিষয়ে তাঁর চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর একটা কাজে দেশে আবার ভীষণ গোলযোগ সুরু হলো।

ডায়োক্লিসিয়ানের ধারণা হলো যে, তাঁকে যারা পূজা করবে তারাই আসল রাজভক্ত, আর যারা তাঁকে পূজা করতে রাজী হবে না, বুঝতে হবে যে, তারা যে-কোন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। এই ধারণা মাথায় ঢোকবার

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে পূজা করবার আদেশ দিলেন। খৃষ্টানরা ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষকে পূজা করতে রাজী নয় বলে সম্রাটের আদেশপালনে অস্বীকার করলো। ডায়োক্লিসিয়ান এতে ভয়ানক চটে গেলেন এবং তাঁর আদেশে, হাজার হাজার খৃষ্টানকে হত্যা করা হলো। এতেও কিন্তু খৃষ্টানরা দমলো না, তারা আরও উৎসাহের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করতে লাগলো।

সম্রাট কনষ্টানটাইন

ডায়োক্লিসিয়ানের কিছু পরে, **কনষ্টানটাইন** রোমের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি বুঝলেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকই, খৃষ্টানদের উপর অত্যাচারে এবং ডায়োক্লিসিয়ান-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডে

সিংহাসনারূঢ় সম্রাট কনষ্টানটাইন

দুঃখিত ও বিরক্ত হয়েছে। তিনি খৃষ্টানদের অভয় দিয়ে বললেন যে, আর কাউকে হত্যা করা হবে না। কনষ্টানটাইন পরে নিজেও খৃষ্টান হয়েছিলেন।

কৃষ্ণসাগরের তীরে তিনি সুন্দর **বাইজানটিয়াম** সহরে, রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নামানুসারে ঐ সহরটির নাম হলো **কনষ্টান্টিনোপল**। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে রোমান সাম্রাজ্য যখন আকারে বিশাল হয়ে পড়লো, সম্রাটদের পক্ষে তখন এক রোম সহর

থেকে, এই বিরাট সাম্রাজ্য সামলানো কঠিন হয়ে উঠলো। সাম্রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য, তখন থেকে রোম হলো পশ্চিম দিকের অর্দ্ধেকটার রাজধানী আর, কনস্টান্টিনোপল হলো পূর্ব্ব দিকের রাজধানী। ধীরে ধীরে এই দুইদিকের দুই সাম্রাজ্য শাসনের ভার, দুজন করে সম্রাটের উপর অর্পিত হতে লাগলো। এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত রোমান সাম্রাজ্য দুই টুকরো হয়ে গেলো।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন

কনস্টানটাইনের পরে রোমে আর তেমন কোন শক্তিশালী লোক সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। দুর্ব্বল রাজাদের অধীনে, দুই ভাগে বিভক্ত সাম্রাজ্য আরও দুর্ব্বল হতে লাগলো। ওদিকে জার্ম্মাণজাতিরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠে, রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরদিকে আক্রমণ চালাতে লাগলো। জার্ম্মেণীতে তখন অনেক রকম জাতির লোকের বাস ছিল; তাদের মধ্যে **ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, লম্বার্ড, অ্যাঙ্গল** এবং **স্যাক্সন** এই কয়টি উপজাতির লোক ছিল খুব দুর্দ্ধর্ষ।

এদের মধ্যে ফ্রাঙ্করা ফ্রান্স জয় করলো, ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা জয় করে নিল এবং অ্যাঙ্গল ও স্যাক্সনরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড অধিকার করে নিল। এইভাবে ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড এই কয়টি দেশ, রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত এক ইতালি ছাড়া রোমান সম্রাটদের অধীনে আর কিছুই রইলো না।

পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যে, রোমের পোপেরা যথেষ্ট প্রভুত্ব করেছেন। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগুরুকে বলা হয় **পোপ**। মধ্যযুগে রোমের পোপদের অসীম ক্ষমতা ছিল। তাঁরা অনুমতি না দিলে ইউরোপের কোন খৃষ্টান দেশের রাজা সিংহাসনে বসতে পেতেন না। ইউরোপের সর্ব্বত্র অসংখ্য পাদ্রী পোপের মহিমা প্রচার করে বেড়াতেন।

রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইতালি

রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর ইতালি অবশিষ্ট রইলো বটে, কিন্তু তারও একতা নষ্ট হয়ে গেল। প্রভাবশালী সামন্ত জমিদারেরা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে সেখানেই রাজত্ব করতে লাগলেন; কিন্তু ক্ষমতার লোভে তাঁদের নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকতো।

মধ্যযুগে ইতালির রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্য-ভাবে তার গৌরব বেড়ে উঠলো। এইসময় কতকগুলি বিখ্যাত নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই নগরগুলি শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী হয়ে উঠলো। মধ্যবিত্ত লোকদের উৎসাহেই এই নগরগুলি এতটা উন্নত হয়েছিল।

এদের মধ্যে **ভেনিস** নগরী আদ্রিয়াতিক সাগরের উপর একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-রাষ্ট্র ছিল। বিত্তবান লোকেরাই এখানে কর্ত্তৃত্ব করতো। নানারূপ সভ্যতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভেনিস খুব বেশী উন্নতি লাভ করেছিল।
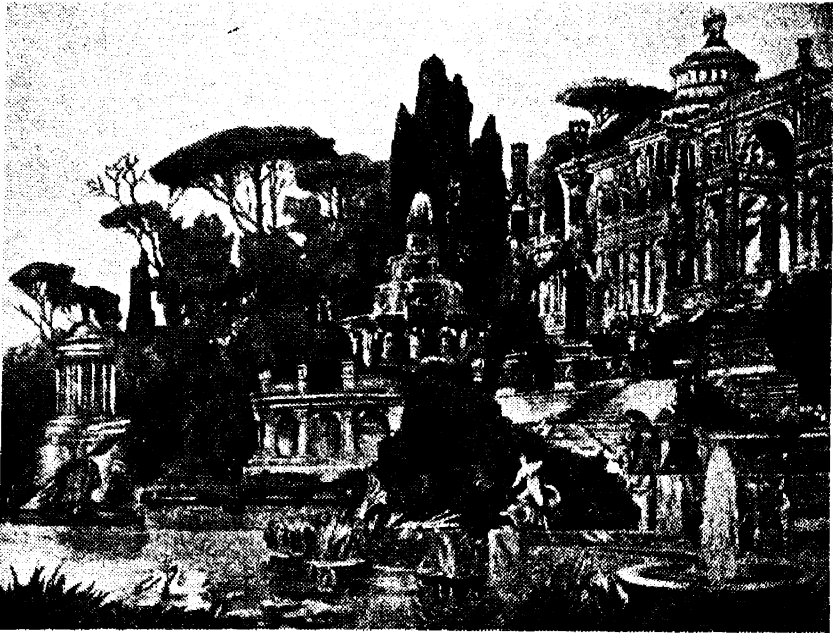
ধনী রোমানদের প্রমোদ-উদ্যান

ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব দেশগুলি হতে ভেনিসে দ্রব্যসম্ভার ও ঐশ্বর্য্য আসতো, এবং সে আবার এইগুলি পশ্চিম-ইউরোপে চালান দিত। ভেনিসের একটি শক্তিশালী নৌ-বহর ছিল ; সেইজন্য তাকে 'সমুদ্রের রাণী' বলা হতো।

অপরাপর নগরগুলির মধ্যে **ফ্লোরেন্স** ছিল খুব প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক নামজাদা শিল্পীর আবির্ভাব হয়। **মেডিসি-পরিবারের** রাজত্বকাল ফ্লোরেন্সে খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। অন্যান্য নগরের মধ্যে **জেনোয়া, মিলান** ও **নেপ্‌লস্‌** খুব উন্নতি লাভ করেছিল।

'রেনেসাঁস' বা জ্ঞানের 'নবযুগ' ইতালিতেই প্রথম আরম্ভ হয়। এই

যুগের ইতালির কবি **দাঁতে, পেত্রার্ক,** শিল্পী **লিয়োনার্দো-দা-ভিঁসি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো** এবং **র‍্যাফেল** পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইতালির নগরগুলি যদিও পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু ঐদেশের রাজনৈতিক একতা বহুদিন পর্য্যন্ত একেবারেই ছিল না। স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ইতালির নানা অঞ্চলে প্রভুত্ব করতো।

ইতালির সব লোকের কিন্তু ভাষা এক; ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসও এক। এই রকম একটি দেশের লোকেরা বেশীদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। তাই ফরাসীবীর **নেপোলিয়ন** এসে, ইতালি জয় করে যখন সমগ্র ইতালিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করলেন তখন তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হলো না। ইতালির উত্তর-দেশগুলি নেপোলিয়নের অধীনে সহজেই এক হয়ে গেল। নেপোলিয়নের ব্যবস্থা ও নীতি ভবিষ্যতে ইতালীয় ঐক্যের পথ সুগম করলো।

নেপোলিয়নের আগমন

নেপোলিয়ন ইতালি জয় করে, তার উত্তর দিকের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্র করে ইতালিতে একতার সৃষ্টি করেন। ফ্রান্সের জন্য তিনি যে আইন ও শাসনপদ্ধতি তৈরী করেছিলেন, ইতালিতেও সেইগুলি প্রবর্ত্তন করেন। ইতালি, ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন হলো বটে, একদেশ এবং একজাতি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সুবিধাটাও সে এবার বুঝতে পারলো। তবে এই একতা বেশীদিন টিঁকলো না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইতালিও আবার আগের মত টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ভিয়েনা-কংগ্রেস

১৮১৫ সালে ভিয়েনায় ইউরোপের বড় বড় রাজনীতিবিদগণ, অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার **মেটারনিকের** নেতৃত্বে একটা কংগ্রেস করেন। ছোট ও দুর্ব্বল দেশগুলিকে নিয়ে কি করা হবে, তাও ছিল এই কংগ্রেসের আলোচনার বিষয়। ইতালি বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল, ভিয়েনা-কংগ্রেসে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবার মত লোক একজনও পাওয়া গেল না।

অষ্ট্রিয়া ছিল তখনকার দিনে একটি বড় ও দুর্দ্ধর্ষ দেশ। বরাবরই তার

ইতালির দিকে নেকনজর ছিল—নিজের সীমান্তের কাছাকাছি ইতালির যে-সব স্থান ছিল, সেগুলোকে সে গায়ের জোরে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে চাইতো। তাছাড়া, ইতালি যাতে শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকেও তার বিলক্ষণ নজর ছিল। অষ্ট্রিয়া বুঝেছিল যে, ইতালিকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল করে রাখতে পারলেই, সে নিজে দক্ষিণ-সীমান্ত সম্পর্কে নিরাপদ থাকতে পারবে। ভিয়েনা-কংগ্রেসে তাই ঠিক হলো যে, **ভেনিসিয়া** এবং **মিলান** নামক রাজ্যদুটি অষ্ট্রিয়ার হাতে থাকবে, অবশিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি ইতালিয়ান রাজবংশের লোকেদের হাতে দেওয়া হলো, অন্যগুলোকে বিদেশী রাজাদের অধীনে তুলে দেওয়া হলো।

নেপোলিয়নের অধীনে একবার এক হয়ে, ইতালিয়ানরা সঙ্ঘবদ্ধতার সুবিধা বুঝতে পেরেছিল। ভিয়েনা-কংগ্রেসের পর আবার তারা সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কাভুর

মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী এবং **কাভুরের** অভ্যুদয় ইতালিকে একতার পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। মাৎসিনির প্রেরণা, গ্যারিবল্ডীর সংগ্রাম-কুশলতা এবং কাভুরের কূটনৈতিক চাল, এই তিনের সমন্বয়ে ইতালির জাতীয় জীবনে নব-জাগরণের দিন এল।

গ্যারিবল্ডী

কাভুর ছিলেন ইতালির অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে বড় রাজ্য, সার্দ্দিনিয়া-পিদমোঁতের প্রধান-মন্ত্রী। তিনি দেখলেন যে, এই রাজ্যটিকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে, অন্য টুকরো রাজ্যগুলোকে একত্র করে, ঐক্যবদ্ধ ইতালি গড়ে তুলতে হবে। এই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, ইতালির সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টাকে অষ্ট্রিয়া কিছুতেই ভাল চোখে দেখবে না, এবং তাকে বাধা দেবার জন্য সব রকমে চেষ্টা
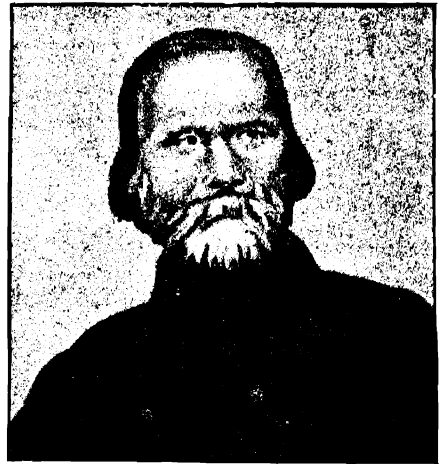
করবে। কাজেই সবার আগে অষ্ট্রিয়াকে জব্দ করে, দুর্ব্বল করে ফেলা দরকার। কাজটা কঠিন এবং একা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে, তিনি ফ্রান্সকে হাত করবার জন্যে চেষ্টা করলেন।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড, ১৮৫৪ সালে রাশিয়ার সঙ্গে যখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো, তিনি গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, ফ্রান্সকে এইভাবে সাহায্য করে, তিনি তাকে সার্দ্দিনিয়া-পিদমোঁতের কাছে ঋণী করে রাখবেন এবং প্রতিদানে, অষ্ট্রিয়াকে জব্দ করবার সময় ফ্রান্সের সাহায্য চাইবেন। ঠিক তাই হলো; চার বৎসর পরে ফ্রান্সের সাহায্যে কাভুর অষ্ট্রিয়াকে উত্তর-ইতালি থেকে বিতাড়িত করবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

ফরাসী সম্রাট **তৃতীয় নেপোলিয়নের** কূটনৈতিক চালের জন্য কিন্তু তাঁর সবটা উদ্দেশ্য সফল হলো না। অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিল দেখেও, তৃতীয় নেপোলিয়ন, কাভুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই হঠাৎ অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে বসলেন। কাভুর অষ্ট্রিয়ার কবল থেকে শুধু **লম্বার্ডি** বের করে নিতে পারলেন, কিন্তু ভেনিসিয়া রয়ে গেল।

একদেশ ইতালি

অষ্ট্রিয়া এইভাবে একটা ধাক্কা খাওয়াতে ইতালিকে একজাতি, একদেশে পরিণত করবার আন্দোলন খুব জোরের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল। মাৎসিনির অগ্নিময়ী বাণী সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে নেপল্‌স এবং সিসিলিতে বিদ্রোহ হলো। গ্যারিবল্ডীর অনুগত হাজার 'রেড সার্ট' নামধারী সৈন্যদল সিসিলিতে অসামান্য বীরত্ব দেখালো। ফরাসী বুর্ব্বন-বংশের রাজারা এই দুটি রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন, তাঁরা আর সেখানে টিঁকে থাকতে পারলেন না। গ্যারিবল্ডীর কাছে তাড়া খেয়ে তাঁরা পলায়ন করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ইতালির সব কয়টি রাজ্য একসঙ্গে মিলিত হলো এবং সার্দ্দিনিয়া-পিদমোঁত-লম্বার্ডির রাজা **ভিক্টর ইমানুয়েলকে,** ইতালির সমস্ত লোক রাজা বলে মেনে নিল। বাকি রয়ে গেল শুধু অষ্ট্রিয়া-কবলিত **ভেনিসিয়া**। কিন্তু তাকেও বেশীদিন ইতালির বাইরে থাকতে হলো না।

ইতালিয়ানরা বুঝেছিল যে, একা তাদের পক্ষে অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে ভেনিসিয়া কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা নজর রাখলো কখন অষ্ট্রিয়া

অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিব্রত হয়। বছর-কয়েকের মধ্যেই সে সুযোগও মিলে গেল। বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে যখন নাজেহাল করে তুলছিল, ঠিক সেই সুযোগে ইতালিয়ানরা আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে এসে ভেনিস দখল করে নিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে, ইতালিয়ানরা রোমও দখল করে নিয়ে সমস্ত ইতালি এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করলো। কাভুর তখন পরলোকে, তাঁর জীবনের সাধনার এই পূর্ণ-পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেন নাই।

রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা

কাভুর তাঁর জীবনে একটা মাত্র ভুল করে গিয়েছিলেন। তিনি দেশে আধুনিক রাজনীতি প্রবর্ত্তন করলেন বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ একটা দল গড়ে
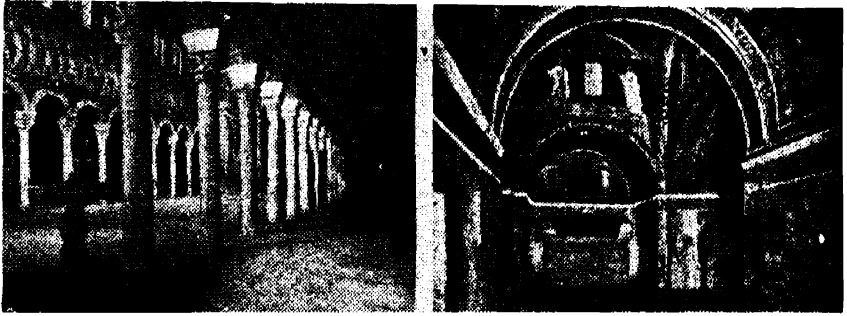
কনষ্টান্টিনোপলে সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি

তোলার চেষ্টা তিনি করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিতে দল অবশ্য-প্রয়োজনীয়। এই দলের সততা ও শক্তির উপরেই সমস্ত দেশের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। কাভুরের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তাই তাঁকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্র হতেন, কিন্তু তাকে একটা সুগঠিত দল বলা চলে না।

কাভুরের মৃত্যুর পর ইতালির একতা আর নষ্ট হলো না বটে, কিন্তু তার রাজনীতিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৮৬৬ সালে ইতালির রাজনৈতিক জীবনে এই যে বিশৃঙ্খলা সুরু হয়েছিল, ১৯২২ সালে মুসোলিনির অভ্যুদয় পর্য্যন্ত তা দূর হয় নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান

এই সময়ের মধ্যে যে-সব প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসন করেছেন, তাঁদের ভিতর একমাত্র **জিওলিতির** নামই উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ইনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইতালিতে একটা **সমাজ-তান্ত্রিক দল** গড়ে উঠেছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বড় বড় সমস্ত কল-কারখানা, রেলওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের হাতে নিয়ে আসা এবং এমন-সব আইন-কানুন তৈরী করা, যার ফলে দেশের কোন লোক খুব বেশী ধনীও হতে পারবে না, আবার খুব গরীব হয়েও থাকবে না।

১৯১৪ সালের যুদ্ধে, ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবার প্রস্তাব করবার পর, এই সমাজতান্ত্রিক দল তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানালো। গবর্ণমেণ্ট সে আপত্তি শুনলেন না; তাঁদের আশা ছিল যে মিত্র-শক্তির দলে থাকলে যুদ্ধ-শেষে, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীকে ঠেঙ্গিয়ে, বেশ কিছু শাঁসালো রকম জায়গা আদায় করে নেওয়া যাবে। কাজেই ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট, ১৯১৬ সালে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলেন। কিন্তু ইতালিয়ান সৈন্যরা যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলো না। মিত্রশক্তি তাদের বীরত্বে মুগ্ধ তো হলোই না, বরং উল্টে যুদ্ধের খরচের চাপে, ইতালিতেই ভয়ানক আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিল।

ভার্সাইয়ের শান্তি-বৈঠকেও ইতালির ভাগ্যে, **ত্রিপোলির মরুভূমি** ছাড়া আর কিছু জুটলো না। সে আশা করেছিল যে, ফিউম বন্দর, ডালমেসিয়ার উপকূল এবং আলবেনিয়া, এই ক'টা জায়গা সে পাবে, কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হলো না। এই খবর দেশে পৌঁছাবার পর লোকে গবর্ণমেণ্টের উপর ভয়ানক ক্ষেপে গেল, সমাজতান্ত্রিক দল প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো।

ফ্যাসিষ্ট দল গঠন

বেনিটো মুসোলিনী ছিলেন এদের দলের নেতা। যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্ন নিয়ে দলের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে যায়। তিনি এই সমাজতান্ত্রিক দল ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধে চলে যান। যুদ্ধে যাবার আগে পর্য্যন্ত তিনি 'আভান্তি' নামক একটি খবরের কাগজের সম্পাদকের কাজ করেন। যুদ্ধের পর, এই মুসোলিনী দেশে সমাজতন্ত্রবাদীদের সবচেয়ে বড় শত্রু

হয়ে উঠলেন। তিনি যুদ্ধফেরৎ সৈনিকদের নিয়ে একটা শক্তিশালী দল গড়ে তুললেন। এরই নাম **ফ্যাসিষ্ট** দল।

সমাজতান্ত্রিক দল তাদের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে এত বেশী বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল যে, দেশের বহু লোক তাদের বিরুদ্ধে মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট-দলে যোগ দিতে আরম্ভ করলো। কালোশার্ট-পরিহিত এই ফ্যাসিষ্ট-দলের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রায় রোজই রাস্তায় ঘাটে মারামারি হতো।

ফ্যাসিষ্ট-দল, সমাজতান্ত্রিক দলের আদর্শ খানিকটা গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঠিক থাকবে, রাষ্ট্রও বজায় থাকবে, দেশে ধনী ও গরীব থাকবে, সবই তারা মেনে নিল। শুধু এইটুকু উন্নতি হলো যে, ধনী যাতে গরীবের উপর অত্যাচার করতে না পারে, মালিক যাতে শ্রমিককে পিষে না মারতে পারে, তার জন্য কড়া কড়া সব ব্যবস্থা হলো। ফ্যাসিষ্ট-পরিকল্পনা ইতালিয়ানদের খুব মনঃপূত হলো।

মুসোলিনী-কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট দখল

১৯২২ সালে মুসোলিনী দেখলেন যে, এবার গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করবার মত ক্ষমতা তাঁর দলের হয়েছে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে চরমপত্র দিয়ে রোম অভিমুখে অভিযান করলেন। এই ফ্যাসিষ্ট-অভিযানের খবর পেয়েই তখনকার দুর্ব্বল গবর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে পদত্যাগ করলেন—বিনা বাধায় মুসোলিনী প্রধান-মন্ত্রীর গদীতে আরোহণ করলেন। পার্লামেণ্টের কাছে তিনি ডিক্টেটরের অধিকার চাইলেন। পার্লামেণ্ট তাঁর প্রার্থিত ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দিলেন, ফলে তিনি ইতালির **সর্ব্বময় প্রভু** হয়ে বসলেন।

এই ক্ষমতা হাতে পেয়েই মুসোলিনী বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করে সেই সব পদে, ফ্যাসিষ্ট-দলের লোক নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন। সমাজতান্ত্রিক দলের উপরে তিনি সব চেয়ে বেশী খাপ্পা ছিলেন; তাদের সমস্ত সঙ্ঘ, সমস্ত সংবাদপত্র তিনি নির্ব্বিচারে বন্ধ করে দিলেন।

মুসোলিনীর আমলে ইতালির আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট হয় এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট একটা সঙ্ঘবদ্ধ সুগঠিত দলের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তার শক্তিও অনেক বেড়ে যায়। ফ্যাসিষ্ট-ইতালির সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও খুব বেশী ছিল। ভার্সাই-সন্ধিতে পাওয়া ত্রিপোলি

এবং ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড নিয়ে সে সন্তুষ্ট হলো না। ১৯৩৬ সালে সে **আবিসিনিয়া** আক্রমণ করে ও আফ্রিকার এই বিরাট দেশটিকে জয় করে নেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিল জার্ম্মেণীর পক্ষে। ফ্রান্স, জার্ম্মেণীর হাতে প্রায় পরাজিত হওয়ার পর, সে তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে।

মুসোলিনী

ইতালি **যুদ্ধ ঘোষণা** করবার পরই, ফরাসী সরকারের তরফ থেকে এল সন্ধির আবেদন এবং কি সর্ত্তে সন্ধি করা যেতে পারে, তারই আলোচনার জন্য **হিটলার** ও **মুসোলিনী** মিলিত হলেন মিউনিক সহরে। জার্ম্মেণীর

সঙ্গে ফরাসীর যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, রোম নগরে ইতালির সঙ্গেও ফ্রান্সকে এক সন্ধি করতে হয়। ফরাসী সীমান্তের নিকটবর্ত্তী আল্পস পর্ব্বতে ফরাসীদের যে সব দুর্গ ও ঘাঁটি ছিল, তা ইতালিয়দের হাতে সমর্পণ করতে হলো।

ইতালি এখন শত্রু-পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ-অবরোধ প্রবল হয়ে উঠলো। মাল্টা দ্বীপের পূর্ব্বদিকে ইংরেজ নৌ-শক্তির সম্মুখীন হয়ে, ইতালির নৌ-বহর পর্য্যুদস্ত হলো।

কিন্তু ইতালিয়রা নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারা সমরসাজে অবতীর্ণ হলো আফ্রিকার প্রদেশে প্রদেশে। তারা ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজ সৈন্যকে বহিষ্কৃত করে দিল সে-দেশ থেকে। লিবিয়াতেও যুদ্ধ চললো। এখানে ইংরেজরা প্রথমটা জয়ী হলেও শেষ পর্য্যন্ত তাদের অপসৃত হতেই হলো। তারপর ইতালিয় সৈন্য মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সোলেম নগর অধিকার করলো।

১৯৪০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, জার্ম্মেণী, ইতালি ও জাপান এই অক্ষশক্তিত্রয়ের ভিতর, **দশ বৎসরের জন্য** এক চুক্তি সম্পাদিত হলো।

২৮শে অক্টোবর আলবেনিয়া-সীমান্ত পার হয়ে ইতালিয় সৈন্য **গ্রীস আক্রমণ** করলো। গ্রীকেরা দৃঢ়প্রযত্নে আত্মরক্ষা করতে লাগলো। ইতালিয় বিমানবহর টেমস নদীর মোহানায় ব্রিটিশ নৌ-বহরকে আক্রমণ করতে এসে, বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে গেল।

গ্রীকেরা সমগ্র সীমান্তরেখা ধরে অগ্রসর হতে লাগলো। সার্দ্দিনিয়ার অদূরবর্ত্তী সমুদ্রে নৌ-যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং তাতে কতকগুলি ইতালিয় জাহাজ বিনষ্ট হলো। আরজাইরোক্র্যাষ্টোর নিকটবর্ত্তী টিলাগুলি গ্রীকেরা দখল করে নিল, তারপর আরজাইরোক্র্যাষ্টো অবরুদ্ধ হলো।

প্রবল যুদ্ধ চললো বারদিয়াতে। ব্রিটিশ বিমানবহর অবিরত হানা দিতে লাগলো দুর্গের উপরে। জার্ম্মাণ বিমানবহর ইতালিতে এল মুসোলিনীর সাহায্যের জন্য। কিন্তু বারদিয়া রক্ষা করা ইতালিয় সেনার পক্ষে সম্ভব হলো না—অষ্ট্রেলিয় সৈন্য দুর্গ অধিকার করলো।

ইতালির সমস্ত নগর ও বন্দরের উপর **ব্রিটিশ বিমান** ক্রমাগত হানা দিতে থাকলো। গ্রীকেরা **ক্লিসুরা দখল** করলো। এদিকে **তোব্রুক অবরুদ্ধ।** যুদ্ধের গতি পর্য্যালোচনার জন্য মুসোলিনী জার্ম্মেণীতে এসে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

ফরাসী জাতীয় বাহিনী **লিবিয়ার** অন্তর্গত মার্জাক অধিকার করলো। **ইরিত্রিয়ার** রাজধানী আগোর্দ্দাৎও অধিকৃত হলো। **বেনগাজী** আত্মসমর্পণ করলো। গ্রীকেরা এদিকে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে চললো। ইতালিয় সোমালিল্যাণ্ডের সমস্ত নগরী পতিত হলো ইংরেজ-হস্তে।

আফ্রিকার যুদ্ধে, ইতালি কোনমতেই আর নিজের প্রাধান্য রক্ষা করতে পারলো না। তবে গ্রীসের যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিল জার্ম্মাণ সৈন্য এসে। হিটলার ইতালিয়দের সাহায্যের জন্য বাহিনী প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইংরেজসেনার হস্তে ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে ইতালিয়রা ফিরে এল। সেখানে নির্ব্বাসিত সম্রাট **হাইলে সেলাসী** পাঁচ বৎসর পরে আবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

ইতালি আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ইতালিয় জনসাধারণ **মুসোলিনীর বিরুদ্ধে** বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের চাপে পড়ে মুসোলিনীকে কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করতে হলো। **মার্শাল বাদোগলিও** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে **মুসোলিনীকে বন্দী** করে রাখলেন এবং জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

এদিকে **ইংরেজ অষ্টম বাহিনী** এসে ইতালির মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করলো। তাদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার কোন উপায় না দেখে ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট **আত্মসমর্পণ** করলো (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩)। ইতালিয় নৌবাহিনীও আত্মসমর্পণ করলো মাল্টাতে।

কিন্তু ইতালিয় ভূখণ্ডের অধিকাংশেই তখন প্রবল জার্ম্মাণ সেনার ঘাঁটি রয়েছে। মুসোলিনীর আমন্ত্রণে তারা এসেছিল ইতালি রক্ষার জন্য। এখন সেই সব সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজবাহিনীর ক্রমাগত যুদ্ধ চললো। নেপ্‌লস্, স্যালার্ণো, পম্পিয়াই প্রভৃতি সহর একে একে ইংরেজবাহিনীর করায়ত্ত হলো।

ইতিমধ্যে ইতালিতে একটি জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা **"ইতালিয় পার্টিজান"** নামে একটি জাতীয় বাহিনীও সংগঠন করেছিল। উত্তর-ইতালি এদেরই অধিকারে এল দেখতে দেখতে। মিত্রশক্তি যখন উত্তর-ইতালিতে এসে পৌঁছাল, তখন সবিস্ময়ে তারা দেখলে, ঐ "ইতালিয় পার্টিজান" দলই সেখানে দৃঢ়ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে।

১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল, মুসোলিনী সুইজার্ল্যাণ্ডে পলায়ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ঐ জাতীয় বাহিনীর লোক তাঁকে ধৃত করে ও তাঁকে **গুলি করে হত্যা** করে।

মুসোলিনীর সহকারী, মার্শাল গ্রাসিয়ানিকেও এরাই বন্দী করে মার্কিণ সৈন্যের হাতে সমর্পণ করে। ইতালিতে, মুসোলিনীর সাহায্যের জন্য হিটলারের প্রভূত সৈন্য অবস্থান করছিল। এরা অগ্রগামী মিত্রশক্তিকে প্রচণ্ড বাধা দিতে থাকলো। র‍্যাডেনা, বোলোনা, ফেরারা প্রভৃতি নগরে দারুণ যুদ্ধ হলো।

১৯৪৫-এর মে মাসে, এই সব জার্ম্মাণসৈন্য **বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ** করলো। ডিসেম্বর মাস থেকে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীগুলি, ইতালি থেকে একে একে অপসৃত হতে থাকলো। ইতালিয়গণ শেষদিকে, জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হিটলার ও মুসোলিনীর বিরোধিতা করেছিল বলেই, মিত্রশক্তির কাছ থেকে সদয় ব্যবহার পেতে লাগলো।

১৯৪৬ সালের ১৩ই জুন, ইতালির **রাজা** ও **রাজ-পরিবার** সিংহাসনের উপর সকল দাবী ত্যাগ করে নির্ব্বাসনে চলে গেলেন। ২৮শে জুন, ইতালির গণ-পরিষদ ইতালিকে সাধারণ-তন্ত্র বলে ঘোষণা করলো। **এনরিকো ডি নিকোলা** প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

ইতালি আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিপর্য্যয় থেকে সেরে উঠে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। এখন সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে। রাজনৈতিক অথবা আর্থিক, কোনদিক দিয়েই ইতালিতে এখন বৈশিষ্ট্য বা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৯৪৮ সালের এক সাধারণ নির্ব্বাচনে "খৃষ্টান গণতান্ত্রিক দল" ইতালির শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তোগলিয়াতির নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট-পরিচালিত "পপুলার ফ্রন্ট দল" অল্প ভোটে হেরে যায়। খৃষ্টান-ডিমোক্রাট দল এখনও গবর্ণমেণ্ট চালাচ্ছে, **গাস্পেরি** এর প্রধান মন্ত্রী আর স্ফোর্জা বৈদেশিক মন্ত্রী।

ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট এখন আমেরিকার প্রভাব-পুষ্ট তবে আমেরিকার প্রভূত অর্থ-সাহায্য, ইতালির দুঃস্থ কৃষকশ্রেণীর বিশেষ উন্নতি বিধান করতে পারে নাই। ইতালির কম্যুনিস্ট-পার্টি খুব শক্তিশালী, সমাজতান্ত্রিক দল তাদের সাহায্য করছে। সম্প্রতি এম্. এস. আই. নামে এক ফ্যাসিস্ট-আন্দোলন আবার ইতালিতে দেখা দিয়েছে।

ইতালির আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশগুলি এখন ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের পরিচালনাধীনে। এই উপনিবেশগুলির নাম লিবিয়া, ইরিত্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ড; এদের মধ্যে লিবিয়া ১৯৫১ সালে স্বাধীন হয়েছে।

ইতালি অতলান্তিক চুক্তি, পশ্চিম-রাষ্ট্রজোট এবং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'ইউরোপীয় স্বাধীনতা রক্ষা সমিতি'তে যোগদান করেছে।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আমলে জার্ম্মেণীতে অনেক দুর্দ্ধর্ম, স্বাধীনচেতা জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজার তাঁর অভিযানকালে, গল দেশের পূর্ব্বে রাইন নদীর সন্নিকটে অর্দ্ধসভ্য বর্ব্বর জার্ম্মাণগণের সংস্পর্শে আসেন। ফ্রাঙ্কস, স্যাক্সন, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি জাতিরা এরূপ দুঃসাহসিক যোদ্ধা ছিল যে, সীজারও তাদের অনেককে পরাভূত করতে পারেন নাই।

ট্যাসিটাস প্রমুখ রোমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে পাওয়া যায় যে, জার্ম্মাণরা তখন অশিক্ষিত বর্ব্বর ছিল বটে কিন্তু তাদের মধ্যে বীরত্ব, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও স্বায়ত্তশাসনবোধ খুব প্রখর ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ফ্রাঙ্কস, লম্বার্ড, ভ্যাণ্ডাল, অষ্ট্রোগথ প্রভৃতি টিউটন বা জার্ম্মাণ জাতি পশ্চিম-ইউরোপ ও উত্তর-আফ্রিকায় অনেক আলাদা রাজ্যের পত্তন করে। এই সময় থেকে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত ইউরোপে এক বিশৃঙ্খলার যুগ চলে। তারপরে অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট শার্লামেন এসে একচ্ছত্র কেন্দ্রগত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ইতিহাসে ফ্রান্সের সম্রাট হলেও জাতিতে জার্ম্মাণই ছিলেন।

মধ্যযুগে ইউরোপের নানাদেশে যখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি শিথিল হয়ে পড়ে, তখন জার্ম্মেণীতে বহু দুর্দ্দান্ত সামন্ত-রাজার অভ্যুত্থান হয়। এঁরা রাজাকে

এবং "পবিত্র রোমক সম্রাট"কে মানতেন না এবং এর পর থেকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, জার্ম্মেণীতে এই সামন্তশ্রেণী এবং ছোট ছোট শাসকগণই কর্ত্তৃত্ব করেন। ফলে ইউরোপের পশ্চিম দেশগুলির মত জার্ম্মেণীতে একটা রাজনৈতিক ঐক্যবোধ গড়তে বাধা পায়। সমস্ত জার্ম্মেণী এক রাষ্ট্রের অধীন হয়েছে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, **বিসমার্কের** আমলে।

মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ সম্রাট শার্লামেনের অনুকরণে, জার্ম্মাণ-সম্রাটগণই "পবিত্র
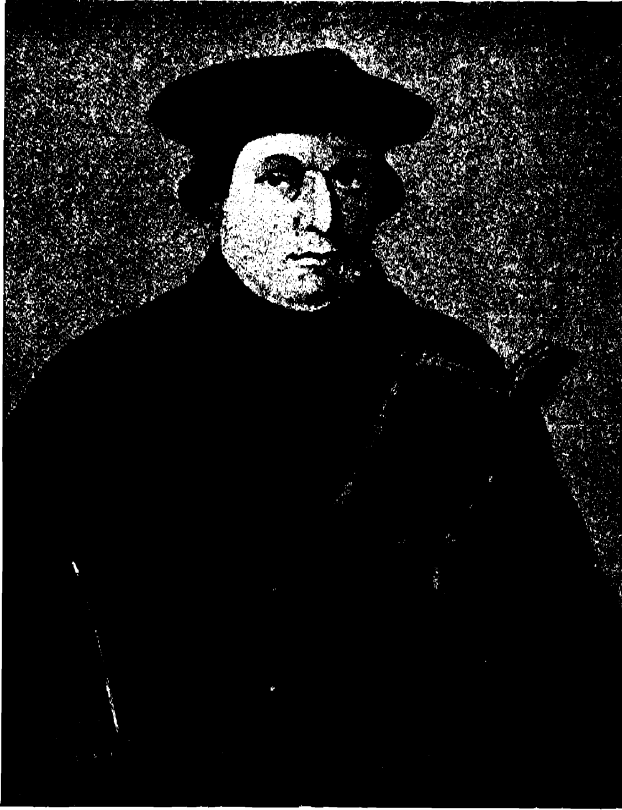
মার্টিন লুথার

রোমক সাম্রাজ্যের" অধীশ্বর বলে পরিচিত হন। জার্ম্মেণীর নৃপতিগণ রোমানসম্রাট হবার উচ্চাভিলাষ ও আলেয়ার পিছনে ঘুরে, নিজের দেশ জার্ম্মেণীর ঐক্যের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ইতালিতেও তাঁরা নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য, জাতীয় ঐক্যবোধের প্রতিকূলতা করেছেন। ফলে জার্ম্মাণ সম্রাটগণেরও সমস্যার অবধি ছিল না এবং জার্ম্মেণী ও ইতালিকেও, অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐক্যহীন, বহুধা-বিভক্ত দেশরূপেই কাটাতে হয়েছে।

শার্লামেনের মৃত্যুর অনতিকাল পরে যখন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায় তখন থেকেই মোটামুটি ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, ইতালি প্রভৃতি আলাদা আলাদা দেশের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, সম্রাট **'ওটো দি গ্রেট'ই** প্রথম, জার্ম্মাণদের অনেকটা এক জাতিতে পরিণত করেন। ক্রুজেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের যুগে জার্ম্মেণীতে অনেক সাহসী যোদ্ধা বা নাইটের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদল টিউটন বা জার্ম্মাণ নাইট সন্ন্যাসীশ্রেণীই পূর্ব্ব-প্রাশিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করেন। পরে জার্ম্মেণীর ব্রাণ্ডেনবুর্গ-রাষ্ট্র এই পূর্ব্ব-প্রাশিয়া থেকেই প্রাশিয়া-রাজ্য নাম লাভ করে। ইউরোপে **রেনেসাঁস** বা বিদ্যার নবোন্মেষের প্রচারের ফলে, যখন ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হয় তখন জার্ম্মেণীতে ধর্ম্ম-প্রতিবাদকারী **মার্টিন লুথারের** নামই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন জার্ম্মেণীতে খুবই ব্যাপক হয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক সামন্ত-শাসকবৃন্দ **প্রোটেষ্টাণ্ট** ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, আর অর্দ্ধেক প্রাচীনপন্থী **রোমান ক্যাথলিক** থেকে যান।

এরপর থেকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, জার্ম্মেণীতে বিভিন্ন প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থীদের মধ্যে ভীষণ কলহ, বিরোধ ও যুদ্ধ চলতে থাকে। এতে দেশে শুধু অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলাই চলতে থাকে। এই ধর্ম্মসংক্রান্ত কলহের ভীষণ পরিণতি হয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে **"ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে"**। এই যুদ্ধে জার্ম্মেণীর ধ্বংসকারী ক্ষতি হয়েছিল।

এই যুদ্ধ প্রথম জার্ম্মেণীর বোহেমিয়া রাজ্যে সূত্রপাত হয় এবং আস্তে আস্তে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জার্ম্মেণীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ক্রমে ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তি নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য এই যুদ্ধে যোগদান করে। বিদেশী শক্তিদের স্বার্থপর রাজনীতির ফলে, এই ত্রিশ-বৎসরের যুদ্ধ অনিবার্য্যভাবে চলতেই থাকে অথচ জার্ম্মাণদের আর এর উপর কোন হাত ছিল না। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে **ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি** দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স ও সুইডেনের সাম্রাজ্য-প্রসারতা সুরু হয় কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্ম্মেণী। তার কৃষি, শিল্প ধ্বংস হয় এবং দেশের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ আরও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনশতের উপর ছোট-বড় সামন্তরাজ, যাঁর যাঁর রাজ্যে একরূপ স্বাধীনভাবেই বিরাজ করতে থাকেন। ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণ দেশের একতা সুদূরপরাহত স্বপ্নে পরিণত হয়।

জার্ম্মেণীর খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল **ব্রাণ্ডেনবুর্গ; হোহেনজোলার্ণ**

রাজবংশ এখানে রাজত্ব করতেন। জার্ম্মেণীর অন্তর্ভুক্ত সব কয়টি রাজ্য ও জমিদারীর মধ্যে এই ব্রাণ্ডেনবুর্গ ই হয়ে ওঠে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী। এই ছোট রাজ্যটি আকারে ও শক্তিতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে, **'গ্রেট ইলেক্টরে'র** শাসনকালে বেশ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পূর্ব্ব-প্রাশিয়ায়, হোহেনজোলার্ণ রাজবংশের একটি শাখা ছিল। কালক্রমে ব্রাণ্ডেনবুর্গ যখন শক্তিমান রাজ্যে পরিণত হয় তখন এর নাম হয় **প্রাশিয়া।**

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, প্রসিদ্ধ **ফ্রেডারিক দি গ্রেট** প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্রমাগত সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে অষ্ট্রিয়ার
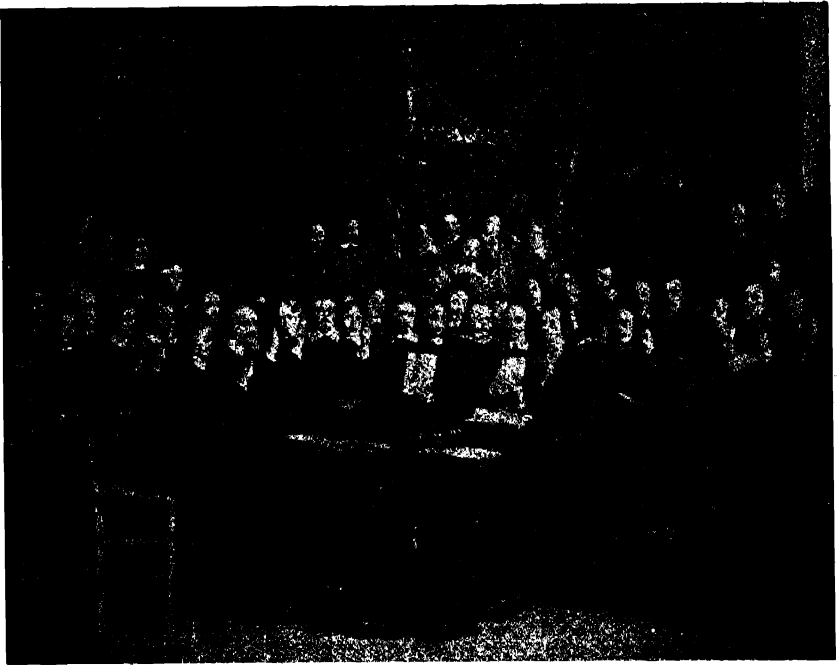
'ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে'র পরিসমাপ্তি

কাছ থেকে সাইলিসিয়া প্রদেশটি কেড়ে নিয়ে, ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার আয়তন আরও অনেক বাড়িয়ে ফেলেন। পোল্যাণ্ড ভাগ করে পশ্চিম-প্রাশিয়াও তিনি অধিকার করেন। ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির দিকে খুব মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে সেখানকার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি, আশেপাশের দেশগুলির কাছে রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রেডারিক ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বে প্রাশিয়ার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হয়েছিল। তাঁর

গৌরবপূর্ণ রাজ্য-চালনার ফলস্বরূপ, প্রাশিয়া একটি ছোট রাজ্য হ'তে, ইউরোপের প্রথমশ্রেণীর শক্তিগুলির পর্য্যায়ভুক্ত হয়। জার্ম্মেণীর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠতার পথ ফ্রেডারিকই তৈরী করে গিয়েছিলেন।

গ্রেট ইলেকটর

নেপোলিয়নের জার্ম্মেনী জয়

ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাঁর স্থান পূর্ণ করবার মত শক্তিশালী দূরদর্শী লোক জার্ম্মেণীতে কেউ ছিলেন না। দুর্ব্বলচিত্ত সব লোকদের হাতে গবর্ণমেণ্ট গিয়ে প'ড়লো। শক্তিমান অধিনায়কের অভাবে সৈন্যদলের বিশেষ অবনতি হতে লাগলো।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন দুর্ব্বারগতিতে দেশ-বিদেশ জয় করে বেড়াচ্ছেন তখন তিনি দেখলেন, জার্ম্মেণী জয় করবার এই সুযোগ। ১৮০৬ সালে তিনি প্রাশিয়া আক্রমণ করলেন এবং বিখ্যাত **জেনা'র যুদ্ধে** জয়লাভ করে বার্লিণ নগরী অধিকার করলেন। নেপোলিয়নের হুকুমে, তাঁরই সমস্ত সর্ত্তে রাজী হয়ে প্রাশিয়া সন্ধি করলো। জার্ম্মেণীতে অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ সম্রাটদের "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে"র যেটুকু চিহ্ন তখনো বাকি ছিল, নেপোলিয়ন তাও নিঃশেষে মুছে দিলেন এবং প্রাশিয়ার প্রায় অর্দ্ধেক তিনি কেড়ে নিলেন।

কিন্তু জার্ম্মেণী জয় করেও তিনি তার সবচেয়ে বড় উপকার করলেন এই হিসাবে যে, জার্ম্মেণীর রাইন নদীর পার্শ্ববর্ত্তী অনেক ছোট ছোট রাজ্য ও জমিদারীগুলোকে এক করে নাম দিলেন, **রাইন কনফেডারেশন**। ছোট ছোট কতকগুলো রাজ্য, নিজেদের ঘরোয়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং অর্থনীতির বড় বড় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যখন একমত হয়, তখন তাকে বলে 'কনফেডারেশন' স্থাপন করা।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

নেপোলিয়নের প্রাশিয়া-জয়ের পর, প্রাশিয়ার লোকদের ভিতর এক নবজাগরণ ও জাতীয়তার সঞ্চার হয়। নেপোলিয়ন হুকুম দিয়েছিলেন যে, তিনি জার্ম্মাণ সৈন্যদলের জন্য যে সংখ্যা ঠিক করে দেবেন তার বেশী সৈন্য রাখা চলবে না। পরাজিত প্রাশিয়া দেখলো, এই হুকুম অমান্য করে লাভ নেই; তা করতে গেলে নেপোলিয়নের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করতে হয় এবং যুদ্ধ করতে গেলে তারা পেরে উঠবে না। অথচ দেশের সৈন্য না বাড়ালে ভবিষ্যতে কোনদিন নেপোলিয়নকে তাড়াবার উপায়ও আর হবে না। কাজেই তারা ঠিক করলো যে, দেশের সমস্ত সবল, সুস্থদেহ যুবককে সামরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেই নেপোলিয়নের এই আদেশকে ফাঁকি দিতে হবে। দেশের সমস্ত যুবক যদি যুদ্ধবিদ্যা শিখে রাখে, তাহলে সুযোগ পেলেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যদল গড়ে তোলা কঠিন হবে না।

নেপোলিয়ন যে কনফেডারেশন তৈরী করে দিয়েছিলেন, তার কল্যাণে

জার্ম্মাণরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে, সমস্ত লোক নিজেদের এক জার্ম্মাণ জাতি বলে ভাবতে শিখলো এবং জাতি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকা যে নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থের জন্যই দরকার, তাও বুঝতে পারলো। রাইন-কনফেডারেশন জার্ম্মেনীর পরবর্ত্তী ঐক্যের পথের সূচনা করে দিয়েছিল। ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ে, ডিউক ওয়েলিংটনের সঙ্গে, প্রাশিয়ার সৈন্যগণ একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল।

বিসমার্কের অভ্যুদয়

ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, প্রাশিয়া তার হৃত অংশ ফিরে পেল বটে, কিন্তু দেশে তখন কোন শক্তিশালী রাজা বা নেতা না থাকায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নিজেদের ভিতর ঝগড়া চললো। অষ্ট্রিয়ার **হ্যাপসবুর্গ**-বংশীয় সম্রাট তখন জার্ম্মেনীতে আধিপত্য করতেন।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, প্রাশিয়া ও জার্ম্মেনীতে যে জাতীয়তার জাগরণ হয়েছিল তাতে করে দেশে একটা ঐক্যের চেষ্টা এসেছিল। ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের বিপ্লব জার্ম্মেনীতেও তুমুল সাড়া তুলেছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার প্রধান নেতা মেটারনিকের পীড়নমূলক নীতির

জন্য, জার্ম্মেণীতে জাতীয় ঐক্য-আন্দোলন সার্থক হতে পারলো না। আর এক কারণ, এসময়ে প্রাশিয়াতে বিচক্ষণ, জবরদস্ত রাজনীতিজ্ঞ বিসমার্কের অভ্যুদয়। বিসমার্ক গণতন্ত্রবিরোধী ছিলেন। তিনি জার্ম্মেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কিন্তু গণমতের ভিত্তিতে নয়। তিনি সঙ্কল্প করেন, প্রাশিয়াকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে, জার্ম্মেণীকে এক দেশ করবার জন্য। তিনি দেখলেন, অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মেণী থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে জার্ম্মেণী এক মিলিত দেশ হতে পারে না।
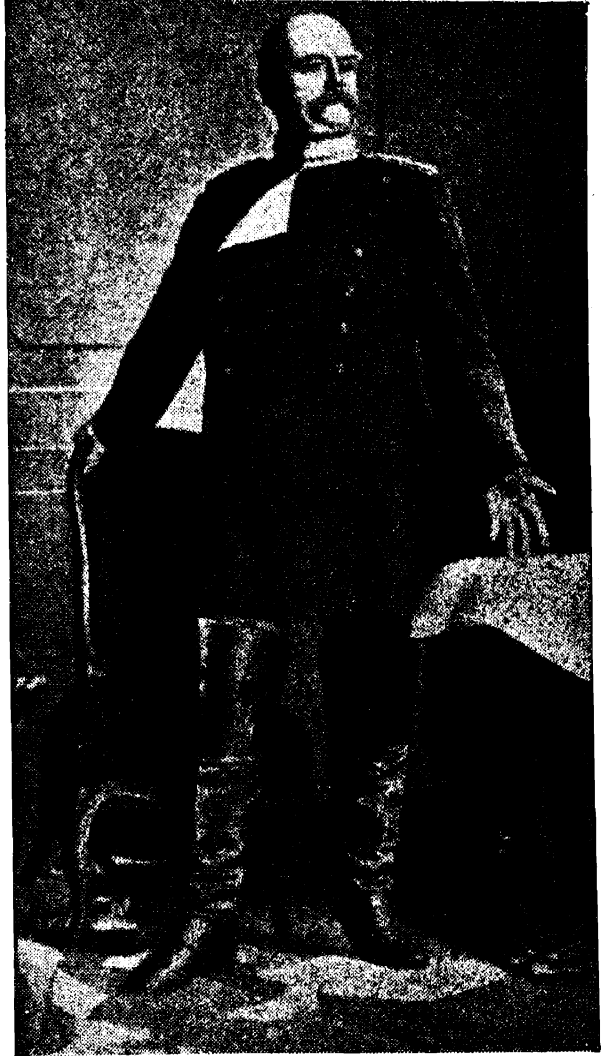
বিসমার্ক

বিসমার্ক বুঝলেন যে, অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধ না করে জার্ম্মেণী থেকে তাড়ানো যাবে না। কিন্তু অষ্ট্রিয়া তখন ছিল খুব শক্তিশালী দেশ। এত শক্তিমান একটা দেশকে যুদ্ধ করে হঠাতে হলে যে ক্ষমতা দরকার, জার্ম্মেণীর তা ছিল না। তাই প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ কাউন্ট বিসমার্ক এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে এলেন।

১৮৬২ সালে বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন, এবং রাজাকে বুঝিয়ে দেন যে, পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে না দিলে কোন কিছুই করা যাবে না। যুদ্ধ করে অষ্ট্রিয়াকে তাড়াতে হলে এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে, বিরাট জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য

গড়ে তুলতে হলে, গোপনে এমন অনেক কাজ করতে হবে যা, প্রকাশ্যে জানাজানি হয়ে গেলে ভয়ানক ক্ষতি হবে। অথচ পার্লামেণ্ট বজায় থাকলে তার সদস্যেরা কথায় কথায় কৈফিয়ৎ চাইবেন এবং সব কাজ পণ্ড করবেন। তার চেয়ে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে নিজেরা একমনে কাজ করা ভাল। রাজাও তাই বুঝলেন এবং পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিলেন।

এরপর, চার বৎসর বিসমার্ক অপ্রতিহত প্রতাপে দেশ শাসন করে প্রাশিয়াকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। ১৮৬৪ সালে, তিনি কূটনৈতিক চালের জোরে অষ্ট্রিয়াকে ঠকিয়ে দিয়ে, ডেনমার্কের কাছ থেকে স্লেজউইগ, হলষ্টিন দুটো সামন্ত-রাজ্য কেড়ে নিলেন। এই দুই রাজ্য নিয়েই আবার তাঁর সাথে অষ্ট্রিয়ার ঝগড়া বেধে গেল এবং তা থেকেই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধ।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

১৮৬৬ সালে **অষ্ট্রিয়া আক্রমণ** করে বিসমার্ক ক্ষিপ্রগতিতে তাকে পরাজিত করে দিলেন। অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে কোন প্রদেশ তিনি কেড়ে নিলেন না, শুধু তাকে জার্ম্মাণ কনফেডারেশন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের আয়তন-বৃদ্ধির চেয়ে, জার্ম্মাণ জাতির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই ছিল বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য। অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে তিনি জার্ম্মেণীর উত্তরভাগের রাজ্যগুলিকে প্রাশিয়ার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করে, উত্তর-জার্ম্মাণ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করলেন।

জার্ম্মেণীর ঐক্য-প্রতিষ্ঠার এই আয়োজন দেখে, ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ভয়ানক ভয় পেলেন। তিনি ভ্রান্ত নীতির বশে প্রাশিয়ার অভিযানকে সময়মত বাধা দেন নাই। এখন তিনি দেখলেন যে, জার্ম্মেণী একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হলে ফ্রান্সের মহাবিপদ; কারণ সুযোগ পেলেই সে ফ্রান্সকে নাজেহাল করে তুলতে পারবে। তাই জার্ম্মেণীর জাতীয়

ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় নেপোলিয়ন তলে তলে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নীতিতে শুধু ভুল করতে লাগলেন, কিছুই সুবিধা করতে পারলেন না। বিসমার্ক বুঝেছিলেন যে, ফ্রান্সকে পরাজিত করতে না পারলে সম্পূর্ণ জার্ম্মেণীকে একদেশে পরিণত করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। সেইভাবে স্থিরচিত্তে তিনি নিজের কূটনীতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

১৮৭০ সালে বিসমার্ক সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে চালে হারিয়ে দিয়ে, **ফ্রান্স আক্রমণ** করেন। **সিডানের যুদ্ধে** ফ্রান্সের ভীষণ পরাজয় হলো। বিসমার্ক ফ্রান্সের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দুটো প্রদেশ, **আলসেস** ও **লোরেন** কেড়ে নিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের নামে, বহু কোটি টাকা তার কাছ থেকে আদায় করলেন। এই টাকায় জার্ম্মেণী তার শিল্প-বাণিজ্যের অনেক উন্নতি করে নিল। প্রাশিয়ার রাজা **প্রথম উইলিয়ম,** সমস্ত সম্মিলিত জার্ম্মাণ দেশের প্রথম সম্রাট হলেন। এতকাল পরে জার্ম্মেণী এক ঐক্যবদ্ধ দেশে পরিণত হলো।

বিসমার্কের কূটবুদ্ধি

বিসমার্কের কূটবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, দেশই ছিল তাঁর ধ্যান, ধারণা ও ধর্ম্ম। এই জন্য তিনি গায়ের জোরে কোন কোন কাজ করলেও শেষ পর্য্যন্ত তার ফল ভালই হতো; কারণ এই সব কাজ করবার সময় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য থাকতো দেশের উন্নতি। রাজা প্রথম উইলিয়ম বিসমার্কের এই নীতি বুঝতেন, তাই তিনি তাঁকে কোনদিন কোন কাজে বাধা দেন নাই।

বিসমার্ক কখনও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করতেন না, **শান্ত, সমাহিত চিত্তে,** দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি বিচার করতেন এবং তার সমাধানের জন্য সর্ব্বরকমে প্রস্তুত হতেন। তাঁর সামরিক নীতি ছিল একসঙ্গে একটার বেশী যুদ্ধ কখনও করবেন না। এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ডেনমার্ককে একসঙ্গে আক্রমণ করেন নাই, তিনবারে তিনটা যুদ্ধে, তিনজনকে হারিয়ে দিয়েছেন। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ফ্রান্সকে খুসী রেখেছেন, আবার ফ্রান্সকে ঠেঙ্গাবার সময় অষ্ট্রিয়াকে হাত করেছেন। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের সঙ্গে তিনি সব সময় ভাব রেখে চলতেন এবং দেখাতেন যেন এরা তাঁর মস্ত বড় বন্ধু, তিনি বিপদে পড়লেই অমনি তারা ছুটে আসবে। জার্ম্মেণীর শত্রুরা এতে অনেকটা ঠাণ্ডা থাকতো।

১৮৮৮ সালে প্রথম উইলিয়ম মারা গেলে, তাঁর বড় ছেলে **ফ্রেডারিক, কাইজার** হলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক তখন ভয়ানক অসুস্থ ছিলেন, কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হলো। **দ্বিতীয় উইলিয়ম** তখন রাজা হলেন।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

দ্বিতীয় উইলিয়মের বয়স তখন বেশী ছিল না, তা ছাড়া তিনি দাম্ভিক, ভাবপ্রবণ এবং অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিসমার্কের সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁর খিটিমিটি বেঁধে গেল। বিসমার্ক বেশীদিন এঁর প্রধানমন্ত্রী রূপে টিঁকতে পারলেন না, দুই বৎসর পরেই তাঁকে বিদায় নিতে হলো। উদ্ধত-প্রকৃতির কাইজার বিসমার্কের একাধিপত্য বরদাস্ত করতে পারলেন না। বিসমার্কও কারও হুকুম মানতে অভ্যস্ত ছিলেন না। নীতিতেও দুইজন বিভিন্ন-পন্থী। জার্ম্মেণী যখন এক অখণ্ড শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হলো তখন বিসমার্ক আর তার অধিকতর প্রসারতার পক্ষপাতী থাকলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য আরও বাড়াতে গেলে ইউরোপের প্রবল শক্তিদের শত্রুতা বরণ করতে হবে।

কাইজার বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রিত্ব হতে সরিয়ে দিলেন
(ড্রপিং দি পাইলট, ১৮৯০ খৃঃ)

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ছিলেন অস্থির কল্পনাবিলাসী ও দুরন্ত

উচ্চাশাপরায়ণ। তিনি জার্ম্মেণীকে দুর্জ্জয় শক্তিতে উন্নীত করে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে মেতে উঠলেন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ বিসমার্ক যখন দেখলেন, অস্থিরমতি, তরুণ কাইজারকে কিছুতেই তাঁর নিজের মতে আনতে পারবেন না, তখন তিনি বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব থেকে বিসমার্কের এই বিদায় নেওয়ার ঘটনাটি ইতিহাসে **"ড্রপিং দি পাইলট"** নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

বিসমার্কের তৈরী জার্ম্মেণী ক্রমে, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ইউরোপ কেন, সমগ্র পৃথিবীতে একটি প্রধান শক্তিশালী দেশে পরিণত হলো। কাইজার তীব্রগতিতে ও ব্যাপকরূপে বৈজ্ঞানিক সমরাস্ত্র বাড়াতে আরম্ভ করলেন এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখতে আরম্ভ করলেন। শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও জার্ম্মেণী ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। আগে ইংলণ্ড জার্ম্মেণীর অগ্রগতিতে নিরপেক্ষ ছিল কিন্তু কাইজার যখন বিরাট নৌশক্তি-বৃদ্ধির পরিকল্পনায় হাত দিলেন তখন ইংলণ্ডও জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলো। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সময় জার্ম্মেণীর সবল অভ্যুদয় ইউরোপের অনেক দেশই সুনজরে দেখলো না।

প্রথম মহাযুদ্ধ

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত সময়কালকে 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতার যুগ' বলা হয়। এই সময়, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে যুদ্ধের কালো মেঘ, ভয়াল ভ্রূকুটি নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে কিন্তু তা কোনপ্রকারে ঠেকানো হয়। অবশেষে সার্বিয়ায়, **অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড** উপলক্ষ্য করে, পৃথিবীজোড়া এক বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সালের ১লা আগষ্ট এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ সালের ১১ই নবেম্বর শেষ হয়। এই যুদ্ধে জার্ম্মেণীর পক্ষে ছিল তিনটি মাত্র দেশ—অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া, আর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল তেইশটি দেশ। এছাড়া আমেরিকাও শেষের দিকে এসে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মেণী পরাজিত হয় এবং ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন, ফ্রান্সের **ভার্সাই** নগরীতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর

পরাজিত দেশগুলি থেকে অনেক জায়গা কেড়ে নিয়ে, বিজয়ী দেশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে আঁকা হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং আলবেনিয়া, এই কয়েকটি **নতুন দেশের সৃষ্টি** হয়। পোলাণ্ডকে আলাদা ক রে দেওয়া হয় এবং জার্ম্মেণীর **ডানজিগ** বন্দরকে একটি স্বাধীন সহরে পরিণত করে, পোলাণ্ডকে সেই বন্দর মারফৎ বৈদেশিক বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়। ডানজিগে পৌঁছাবার জন্য

বার্লিন নগরীর দৃশ্য

তাকে জার্ম্মেণীর খানিকটা অংশও ছেড়ে দেওয়া হয়। এটাই **পোলিশ করিডর** নামে বিখ্যাত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। হাঙ্গেরীকে অষ্ট্রিয়া থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। জার্ম্মেণীর সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ, জার্ম্মেণীর কাছে একটা মোটা রকমের টাকা দাবী করা হয়। বার্ষিক কিস্তিতে তা পরিশোধ করে চললে, ১৯৮০ সালের আগে সে টাকা শোধ হবার সম্ভাবনা ছিল না।

জার্ম্মেণীর অন্তর্বিপ্লব

জার্ম্মেণী রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধেও সে হারে নাই। তবুও তাকে ভার্সাই সন্ধিতে ইংরেজ, ফ্রান্স ও আমেরিকার নির্দ্দেশমত সর্ত্তে রাজি হতে হয়েছিল ; তার কারণ, জার্ম্মেণীর **অন্তর্বিপ্লব**। বৃটিশ অবরোধের ফলে জার্ম্মেণীতে খাবার জিনিষের ভয়ানক অভাব ঘটে এবং তার জন্য দেশে অশান্তি দেখা দেয়। জার্ম্মেণীর আর একটা মস্ত অসুবিধা ছিল এই যে, তার দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি ছিল **ইহুদীদের হাতে।** বড় বড় সরকারী চাকুরীরও অনেকগুলি তারা দখল করে বসেছিল। যুদ্ধের সুযোগে ইহুদীরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করে এবং যুদ্ধের শেষের দিকে, জার্ম্মেণী হেরে যাবে এই ভয়ে, তারা বহু টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে ; ফলে দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

কাইজার এই সব অনাচার ও অসুবিধা দূর করতে পারলেন না। ক্রমে ক্রমে স্থল-সৈন্য, নৌ-সৈন্য এবং কারখানার শ্রমিকেরা ক্ষেপে উঠতে লাগলো। পার্লামেন্টেও ভয়ানক গোলযোগ দেখা দিল। সমাজতান্ত্রিক সদস্যরা যুদ্ধের খরচ মঞ্জুর করতে রাজি হলেন না। অবশেষে ১৯১৮ সালের ৩০শে অক্টোবর, **উইলহেল্‌ম্‌সহাভেন** নৌ-বহরের সৈন্যেরা **বিদ্রোহ** ঘোষণা করলো। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন কীল, হামবুর্গ, ব্রিমেন, বার্লিণ প্রভৃতি বড় বড় সহরে ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাডনের প্রিন্স ম্যাক্স তখন চ্যান্সেলার, তিনি কাইজারকে **সিংহাসন ত্যাগ** করবার পরামর্শ দিলেন। কাইজারও তাই করলেন। সমাজতান্ত্রিক নেতা **এবার্ট** জার্ম্মেণীর **প্রথম সভাপতি** হলেন।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে **কার্ল লিবকেনেক্ট** এবং **রোজা লুক্সেমবুর্গের** একটা দল ছিল। এবার্ট সভাপতি হবার পর, এই দলের সঙ্গে তাঁর গোলমাল বেঁধে গেল। এবার্ট বুঝেছিলেন জার্ম্মেণীর পরাজয় আসন্ন, তাই তিনি চাইলেন যুদ্ধ-বিরতির আগেই একটা প্রজাতন্ত্র-গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে, এই আশায় যে, কাইজারের জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি যতটা কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে পারবে, প্রজাতান্ত্রিক জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে তা পারবে না। এবার্ট দলে ভারী ছিলেন। তিনি সাধারণ নির্ব্বাচন ঘোষণা করে জাতীয় পরিষদ আহ্বান করা এবং প্রজাতন্ত্রের শাসনবিধি প্রণয়ন করা দরকার বলে মনে করলেন।

লিবকেনেক্টের দল বুঝেছিলেন যে, এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হচ্ছে ধনী ব্যবসায়ীদের দুর্জ্জয় লোভ। এক একটি দেশের বড় বড় বণিকেরা একজোট হয়ে, অপর দেশের ব্যবসায়ীদের, বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হটাবার জন্য যে তীব্র প্রতিযোগিতা চালিয়েছিলেন, যুদ্ধ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। দেশের প্রতি ধনী ব্যবসায়ীদের বিন্দুমাত্র মায়া থাকে না, গরীবের কথা একটিবারের জন্যও ভাবে না; তাদের একমাত্র লক্ষ্যই থাকে নিজেদের বিপুল অর্থ আরও বেশী করে বাড়ানো। লিবকেনেক্ট বললেন যে, এই পাপ দূর করতে হলে ধনীদের উচ্ছেদ করতে হবে। তাদের সমস্ত সম্পত্তি, কল-কারখানা প্রভৃতি কেড়ে নিতে হবে; এবং তা করতে গেলে সাধারণ নির্ব্বাচনে নামলে চলবে না, **কম্যুনিষ্ট ডিক্টেটরশিপ** প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯১৯ সালের ৬ই জানুয়ারী, লিবকেনেক্ট জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট হস্তগত করবার

কাইজার-দম্পতী সেনাপতিদের পরিদর্শন করছেন

উদ্দেশ্যে, বার্লিনের কয়েকটি সরকারী আফিস এবং সংবাদপত্র-আফিস জোর করে দখল করলেন। এবার্টের গবর্ণমেণ্ট লিবকেনেক্ট এবং রোজা লুক্সেমবুর্গকে **গ্রেপ্তার** করবার আদেশ দিলেন। পুলিশ এঁদের শুধু যে গ্রেপ্তার করলো তাই নয়, জেলে নিয়ে যাবার পথে তাঁদের দুজনকেই হত্যা করলো।

নতুন শাসনতন্ত্র

এই সব ভয়ানক গোলযোগ ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়েইমার নামক সহরে জার্ম্মাণ প্রজাতন্ত্রের শাসনবিধি, প্রজাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত জাতীয় পরিষদে গৃহীত হলো। স্থির হলো যে, ১৮ বছরের বেশী বয়সের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভোট দেবার অধিকার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আক্রান্ত জলযান
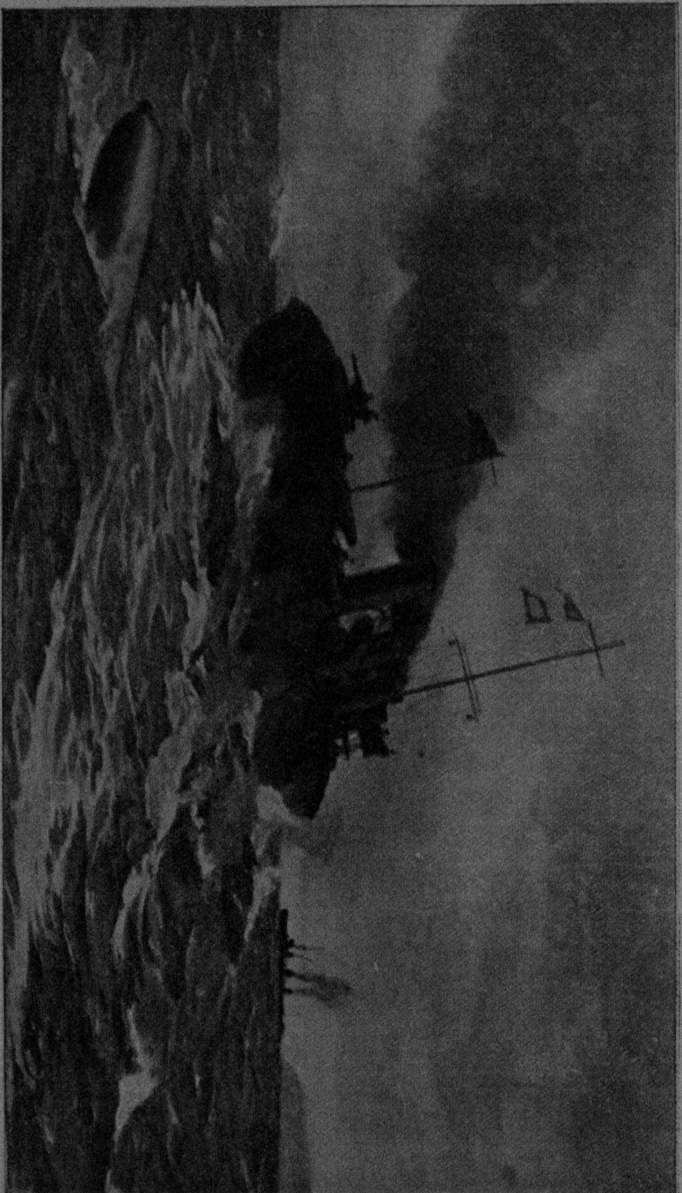
থাকবে। তাদের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিসভা গঠিত হবে। জার্ম্মাণ ভাষায় এই প্রতিনিধিসভাকে বলে **রাইশষ্ট্যাগ।** সাত বৎসরের জন্য একজন **সভাপতি** নির্ব্বাচিত হবেন এবং তিনি রাইশষ্ট্যাগের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শে চলবেন। প্রধানমন্ত্রীকে বলা হবে **চ্যান্সেলার।** সাধারণ অবস্থায় সভাপতিকে মন্ত্রীদের পরামর্শ মানতেই হবে, কিন্তু দেশে কোন প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, নিজে অর্ডিনান্স জারী করে দেশ শাসন করতে পারবেন।

রাইশষ্ট্যাগ ছাড়া জার্ম্মাণ রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে একটা **রাইশরাট** থাকবে। এঁদের হাতে কার্য্যকরী ক্ষমতা কিছুই থাকবে না; এঁরা শুধু রাইশষ্ট্যাগ যাতে কোন অন্যায় আইন পাশ না করে বসে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন। **রাইশষ্ট্যাগ** আর **রাইশরাট** এই দুটি হলো জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের দুই অংশ।

ভার্সাই-সন্ধির পর

ভার্সাই-সন্ধি জার্ম্মাণ জাতির উপর বিধি-নিষেধের এবং যুদ্ধের দেনা-শোধের বহু কঠোরতা আরোপ করেছিল। জার্ম্মাণরা সেটা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করলো; কিন্তু তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্য মিত্রশক্তির তরফ থেকে বিধিমত চেষ্টা হতে লাগলো। জার্ম্মেণীর ভাল ভাল জায়গা, আলসেস, লোরেন, সাইলিসিয়া প্রভৃতি হাতছাড়া হওয়ায় তার লোহা এবং কয়লার খনিগুলি বেরিয়ে গেল। উপনিবেশগুলিও সব কেড়ে নেওয়া হলো। দেশের **সম্পদ** অনেক **কমে গেল** কিন্তু **ক্ষতিপূরণের বিরাট দাবী** উঠলো।

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ঘর গুছিয়ে নেবার জন্য তিন বৎসর সময় চাইলো। **লয়েড জর্জ্জের** ইচ্ছা ছিল সময় দেবার কিন্তু ফরাসী প্রধানমন্ত্রী **পঁয়কারে** কিছুতেই রাজী হলেন না। জার্ম্মাণরা সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে কয়লা ও লোহা দিতে দেরী করছে এই অজুহাতে পঁয়কারে, জার্ম্মেণীর খনিপ্রধান অঞ্চল **রূঢ়** দখল করে নিলেন। তার সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল হয়ে উঠবার উপক্রম হলো। ট্রেণগুলো পর্য্যন্ত সময়মত চলতো না। ভার্সাই-সন্ধির সর্ত্ত, কড়ায়-গণ্ডায় জার্ম্মেণীর ঘাড়ে চাপাবার যত চেষ্টা হতে লাগলো, সন্ধির পর তার জনসাধারণ ততই বেশী করে চটতে আরম্ভ করলো।

লোকার্ণো চুক্তি

ইংলণ্ড এবং আমেরিকা বুঝলো যে, এ ভাবে টাকা আদায় হবে না। জার্ম্মেণীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং সেজন্য তাকে, তার শিল্প-বাণিজ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে

নাৎসী প্রধানগণ

আনবার সুযোগও দিতে হবে। জার্ম্মেণীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য, **চার্লস ডজ** নামক একজন বড় ব্যাঙ্কারের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করা হলো। **ডজ-কমিটি**ও এই কথাই বললেন যে, জার্ম্মেণীকে তার শিল্প-বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ না দিলে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় হবে

না। জার্ম্মেণীকে টাকা ধার দেবার জন্য, কমিটি মিত্রশক্তিকে অনুরোধ করলেন। তদনুসারে ইংরেজ এবং আমেরিকানরা জার্ম্মেণীকে অনেক টাকা ধার দিল।

হের ষ্ট্রেসম্যান তখন জার্ম্মেণীর চ্যান্সেলার, তিনি এবার ঘর গুছাবার দিকে মন দিলেন। ইতিমধ্যে ফরাসী সাধারণ-নির্ব্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পঁয়কারে হেরে গিয়েছিলেন; মঁঃ হেরিও এবং মঁঃ ব্রিয়াঁ নামক ফ্রান্সের বিখ্যাত দুজন উদারনৈতিক নেতা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এঁরাও জার্ম্মেণীকে গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করার চেয়ে তার জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে সাহায্য করে, আস্তে আস্তে টাকাটা কিস্তিবন্দী হিসাবে আদায় করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন।

১৯২৫ সালে **লোকার্ণো** সহরে এক চুক্তি হলো যে, ফ্রান্স এবং জার্ম্মেণী দু'পক্ষই, ভার্সাই-সন্ধিতে তাদের যে সীমান্ত ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তাই মেনে নেবে এবং এ বিষয়ে আর ঝগড়া করবে না। জার্ম্মেণী আলসাস-লোরেনের উপর কোন দাবী রাখবে না এবং ফ্রান্সও জার্ম্মেণীর রাইন-অঞ্চল দখল করবার চেষ্টা করবে না। ইংরেজ প্রতিশ্রুতি দিল যে, ফ্রান্স যদি গায়ে পড়ে রাইনল্যাণ্ড কেড়ে নেবার জন্য জার্ম্মেণীকে আক্রমণ করে, তাহলে সে জার্ম্মেণীকে সাহায্য করবে; আর জার্ম্মেণী ফ্রান্সকে আক্রমণ করলে সে ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করবে। লোকার্ণো চুক্তিতে কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে গেল; পোলিশ-করিডর সম্বন্ধে কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা মেনে নিতে জার্ম্মেণী কিছুতেই রাজি হলো না।

লোকার্ণো চুক্তির পর জার্ম্মেণী একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আমেরিকা ও ইংলণ্ড হতে টাকা ধার এনে সে তার লোহা, রাসায়নিক ও ইলেকট্রিক কারখানাগুলোকে আবার আগের মত বিরাট করে জাঁকিয়ে তুললো। বিজ্ঞান-শিক্ষায় জার্ম্মেণী বরাবরই যথেষ্ট অগ্রসর। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে দেশের কয়লা কম পড়ে গেছে দেখে, জার্ম্মেণী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সে অভাব পুষিয়ে নিতে লাগলো। জার্ম্মাণ জাতির বিশেষত্ব এই যে, তাদের শৃঙ্খলা এবং জাতীয় মর্য্যাদাবোধ খুব প্রবল; দেশের মঙ্গল এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের জন্য তারা যে কোন অসুবিধা, যে কোন বিপদ হাসিমুখে বরণ করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই কারণেই ডজ-কমিটির সুপারিশের পর তারা যেটুকু সুযোগ পেয়েছিল, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে অসন্তোষ

ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ কিন্তু কিছুতেই দূর হলো না। দেশের সাধারণ অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেলেও তার ফল যে স্থায়ী হবে না এটা সবাই বুঝতে পারলো, কারণ ক্ষতিপূরণের জন্য অনেক টাকা বিদেশে

ভন হিণ্ডেনবুর্গ

বেরিয়ে যাচ্ছিলো। জার্মেনীতে নানারকম দল গড়ে উঠতে লাগলো, তার মধ্যে **ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট** দল একটি। এই দলকেই বলা হয় **নাৎসী** দল।

১৯১৯ সালে, সাতটি লোক নিয়ে মিউনিকের এক বিয়ারের আড্ডায় এই দলের সৃষ্টি হয়। **হিটলার** ছিলেন তার নেতা। দশ বছরের মধ্যেই এর

সদস্য-সংখ্যা হয়ে গেল ১৭৮০০০। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মেণীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী, এরা তাদের অবস্থার উন্নতি করবার আশা দিয়ে এত লোক দলে জোগাড় করে। এদের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনটি—(১) ভার্সাই-সন্ধি বাতিল করবো; (২) ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো এবং (৩) উপনিবেশগুলো ফিরিয়ে আনবো। নাৎসীদলের মত সুগঠিত সঙ্ঘবদ্ধ দল পৃথিবীতে খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতি **হিণ্ডেনবুর্গের** দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচনের সময়, নাৎসী নেতা হিটলার তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গেলেন। তারপর থেকে তিনি চ্যান্সেলার হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী সভাপতি হিণ্ডেনবুর্গ, হের হিটলারকে **জার্ম্মেণীর চ্যান্সেলার** নিযুক্ত করেন।

হিটলারের অভ্যুদয়

চ্যান্সেলার হবার পরই হিটলার, ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার আয়োজন আরম্ভ করলেন। তারপর একটি একটি করে তিনি ভার্সাই-সন্ধির সর্ত্তগুলোকে অমান্য করতে লাগলেন। ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে জার্ম্মেণীর সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষের বেশী হবার উপায় ছিল না; হিটলার এই এক লক্ষ সৈন্যকে এমনভাবে সুশিক্ষিত এবং এমন-সব আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত করলেন যে, এদের মধ্যে যে কোন ৫০০ জন এক একটা যুদ্ধ জয় করে আসতে পারে।

এ ছাড়া, দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করে তিনি প্রত্যেক যুবককে যুদ্ধবিদ্যা শেখালেন। যুবকদের কষ্টসহিষ্ণু করবার জন্য তিনি নিয়ম করেছিলেন যে, প্রতি শনিবার স্কুল-কলেজ ছুটির পর প্রত্যেক ছাত্র একটা ছোট্ট তাঁবু, ছোট বিছানা এবং কিছু খাবার নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়বে। শনিবার সারা বিকাল হেঁটে যেখানে সন্ধ্যা হবে, সেইখানে তাঁবুটি খাটিয়ে শুয়ে পড়বে। পরদিন ভোরে আবার হাঁটা সুরু করবে এবং সারাদিন হাঁটবে। সন্ধ্যাবেলা কাছাকাছি যেখানে ট্রেণ পাবে সেখানেই ট্রেণ ধরবে এবং বাড়ী ফিরে আসবে। দল বেঁধেই হোক আর একাই হোক, প্রায় প্রত্যেক যুবক এই নিয়ম পালন করতো। হিটলারের আমলে জার্ম্মেণীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হয়েছিল যে, দেশে একজন লোকও বেকার ছিল না; প্রত্যেকে কাজ করবার এবং টাকা রোজগারের সুযোগ পেত।

হিটলার দেশে বহুসংখ্যক এরোপ্লেন, মোটরকার, জাহাজ প্রভৃতির কারখানা গড়ে তুললেন। এই সব কারখানায় অসংখ্য লোক কাজ পায়। জার্ম্মেণীতে লক্ষ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, এতেও অনেক লোকের

হিটলার

কাজ জোটে। তা ছাড়া, জার্ম্মেণীতে রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, কাগজ, খেলনা প্রভৃতি নানারকম নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের বড় বড় কারখানা সৃষ্টি হয়। এই সব কারখানায়ও অসংখ্য লোক কাজ পায়। শিল্পবিদ্যা শিখে, কোন লোক

নিজে ছোটখাট কারখানা করতে চাইলে, সে সুযোগও তারা পেত। জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলো এদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। এই রকম ব্যবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর নতুন নিয়মে দেশে খুব ধনী কেউ ছিল না, খুব গরীবেরও কিছু না করেও থাকবার উপায় ছিল না; সকলেই সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা চালাবার সুযোগ পেয়েছিল। সভাপতি হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার নিজেই সভাপতি ও চ্যান্সেলার হয়ে **ফুরার** উপাধি গ্রহণ করলেন।

দেশকে একবার সঙ্ঘবদ্ধ করে নিয়ে হিটলার ধুয়া তুললেন যে, জার্ম্মেণীর বাইরে যত জার্ম্মাণ আছে, সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য জায়গাও বেশী দরকার, কাজেই ইউরোপের জার্ম্মাণপ্রধান অঞ্চলগুলো জার্ম্মেণীর ভিতর ঢুকিয়ে নিতে হবে।

অষ্ট্রিয়াকে তিনি জার্ম্মেণীর অন্তর্ভুক্ত করলেন (১৯৩৮ খৃঃ) ; **মিউনিক-চুক্তির** (১৯৩৮ খৃঃ) পর চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যাণ্ডকেও তিনি জার্ম্মেণীর ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর ঝগড়া বাধলো পোলিশ-করিডর নিয়ে।

ভার্সাই-সন্ধির আগে এই জায়গাটা জার্ম্মেণীর ছিল, এখানকার লোকেরাও প্রায় সকলেই জার্ম্মাণ। পোলাণ্ডকে বালটিক-সমুদ্রে যাবার সুযোগ দেবার জন্য ভার্সাই-সন্ধিতে এটা পোলাণ্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। হিটলার দাবী করলেন যে, **পোলিশ-করিডর** তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পোলাণ্ড এতে রাজী হলো না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলো সেই অশুভ দিনে। জার্ম্মাণ বাহিনী পোলাণ্ড আক্রমণ করলো।

ডানজিগ নগরী পোলাণ্ডের সীমার ভিতর অবস্থিত হলেও চিরদিনই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে এসেছে। এর লোকসংখ্যার অধিকাংশই জার্ম্মাণ, এবং স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারেও এই জার্ম্মাণদের প্রভুত্ব ছিল চিরদিনই অটুট। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পূর্ব্বে, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টেরই অনুবর্ত্তী থাকতে হতো ডানজিগকে, কিন্তু ভার্সাই-সন্ধিতে এর পররাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ে পোলাণ্ডের উপরে। এ ব্যবস্থা ডানজিগের জার্ম্মাণ জনগণ কোনদিনই প্রসন্ন অন্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে নি। কাজেই হিটলারের অভ্যুদয়ের

সঙ্গে সঙ্গেই তারা আশা করতে সুরু করেছিল যে, অচিরেই তারা পোলাণ্ডের কবলমুক্ত হয়ে আবার জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হতে পারবে।

১লা সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণ সেনার প্রথম সক্রিয়তা **ডানজিগে** প্রকট হলো। ঐ দিনই ডানজিগের নাৎসী নেতা, আলবার্ট ফোরষ্টার ঘোষণা করলেন
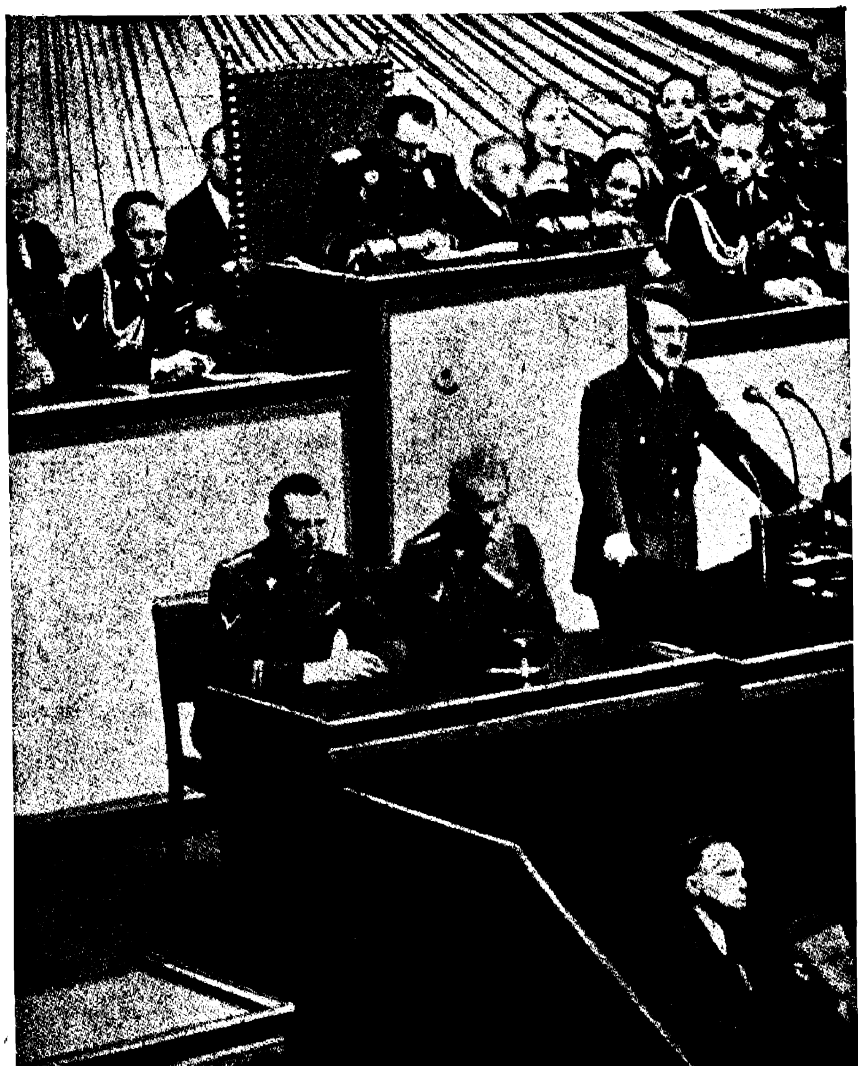
হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণা

যে—"আমাদের বিশ বৎসরের আশা আজ সফল হয়েছে। ডানজিগ আজ আবার মহান জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হলো।"

ডানজিগের পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পোমোজ বা পোমেরেনিয়া প্রদেশ চিরদিনই জার্ম্মাণ-ভাষাভাষী লোকের বাসভূমি। ভার্সাই-সন্ধিতে এই প্রদেশটিকে

পোলাণ্ডের হাতে সমর্পণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল—চারিদিকে পররাষ্ট্রীয় ভূভাগ-বেষ্টিত পোলাণ্ডকে সমুদ্রতীরে পৌঁছোবার একটুখানি পথপ্রদান। তদনুযায়ী এই প্রদেশটিকে নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল—**"পোলিশ-করিডর"** বা "পোলদের রাস্তা"। এই করিডরেরও অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জার্ম্মাণ, এবং হিটলারের অভ্যুদয়ে তাদেরও আনন্দ কম হয়নি। জার্ম্মাণ সেনা করিডরে প্রবেশ করামাত্র সেখানকার জার্ম্মাণ অধিবাসীরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিল।

২রা সেপ্টেম্বরই পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স নগরে জার্ম্মাণ বিমান থেকে ছয়বার বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। তুমুল যুদ্ধ চললো জার্ম্মাণ-পোল সীমান্তে। ব্রিটেন পূর্ব্বাপর মুক্তকণ্ঠেই বলে এসেছে যে, পোলাণ্ডের উপর জার্ম্মেণীর কোন অত্যাচারই সে নীরবে সহ্য করবে না। এখন বাধ্য হয়েই (৩রা সেপ্টেম্বর) ব্রিটেনকে জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলো**। ফ্রান্সও ব্রিটেনের সঙ্গে যোগ দিল, কারণ জার্ম্মেণীর শক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সেটা সর্ব্বদাই ফ্রান্সের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও যুদ্ধ ঘোষণা করলো জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে।

পোলাণ্ডের সমৃদ্ধিশালী বন্দর জিডনিয়া অধিকার করে জার্ম্মাণরা এবার **ওয়ার্সর দিকে** ধাবিত হলো। এই সময়ে একান্ত আকস্মিক ভাবে, সোভিয়েট-রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী এসে প্রবেশ করলো পোলাণ্ডের পশ্চিম-সীমান্তে। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মেণীর সঙ্গে রাশিয়ার একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল; কিন্তু জার্ম্মেণীর সাহায্যের জন্যই রাশিয়া এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, এটা মনে করলে ভুল করা হবে। পোলাণ্ডের কোন কোন অংশ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অনেকদিন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেইগুলি পুনরুদ্ধার করবার জন্যই রাশিয়ার এই সমরোদ্যম।

দুই দিকে দুটি প্রবল শক্তি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে **পোলাণ্ডের** আর আত্মরক্ষার কোন আশা রইলো না। ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্স নগরী **আত্মসমর্পণ** করতে বাধ্য হলো। স্বাধীন রাষ্ট্র-হিসাবে পোলাণ্ডের আর অস্তিত্ব রইলো না। রাশিয়া ও জার্ম্মেণী—এই দুই বিজয়ী দেশ পোলাণ্ডকে বিভক্ত করে নিল নিজেদের ভিতর। পোলাণ্ডের নির্ব্বাসিত দেশ-নায়কেরা প্যারী নগরীতে গিয়ে নতুন পোল-গবর্ণমেণ্ট গঠন করলেন।

অতঃপর হিটলার পশ্চিম-সীমান্তের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেবার সুযোগ পেলেন। তাঁর বিমান-বাহিনী ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে ও ফ্রান্সে বোমাবর্ষণ করতে লাগলো।

সমুদ্রে ব্রিটিশ আধিপত্য চিরদিনই বর্ত্তমান। ইংরেজের অপরাজেয় নৌ-শক্তির জন্যই নেপোলিয়ন ও কাইজারের মত দিগ্বিজয়ীরাও কোনদিন ইংলণ্ড আক্রমণ করতে সক্ষম হননি। এই নৌ-শক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য হিটলার গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য **ইউ-বোট।** এদের আক্রমণে ইংরেজ নৌ-বাহিনীর ক্ষতিও হয়েছিল মারাত্মক। কিন্তু ইউ-বোট-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতেও ইংরেজদের বিলম্ব হয়নি।

উপরে যে মারণাস্ত্রের কথা বলা হলো, তার নাম **ডেপথ-চার্জ্জ** বা গভীর জলের বিস্ফোরক। ময়লা-ফেলার ডাস্ট-বিন যেন এক একটা, অবশ্য দুই মুখ বন্ধ। ওর ভিতর সাংঘাতিক বিস্ফোরক সব পদার্থ থাকে। জাহাজ থেকে সমুদ্রের ভিতর ফেলে দেওয়া হয় এই ডেপথ-চার্জ্জ। নামতে নামতে ফেটে যায় এগুলি। জলের তলায় যদি সাবমেরিণ থাকে তবে তা সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর আঘাতে।

ব্রিটেনের নৌ-শক্তিই হিটলারের বিশ্ববিজয় অভিযানের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। জার্ম্মেণীর চারদিকে এক দুর্ভেদ্য লৌহ-বেষ্টনী রচনা করলো ইংরেজ রণতরী। জার্ম্মেণীর আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হলো। খাদ্য, বস্ত্র, লৌহ, রাসায়নিক উপকরণ—জীবনধারণ ও যুদ্ধপরিচালনায় অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বস্তুরই অভাব পরিলক্ষিত হতে লাগলো জার্ম্মেণীতে। নবাধিকৃত চেকোশ্লোভাকিয়া, বোহেমিয়া বা পোলাণ্ড থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই পেল না জার্ম্মেণী।

এই সময় থেকেই ওলন্দাজ সীমান্তে জার্ম্মাণ সেনা সক্রিয় হয়ে উঠলো। ওলন্দাজ সরকার ইতিপূর্ব্বেই তাঁদের পূর্ব্ব-সীমান্তের অনেকটা স্থানকে অবরুদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছিলেন। **বেলজিয়ামের রাজা** লিওপোল্ড ও **হল্যাণ্ডের রাণী** উইলহেলমিনা মিলিতভাবে চেষ্টা করছিলেন ইউরোপে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ; কিন্তু তাঁদের নিজেদের রাজ্যই এখন বিপন্ন হয়ে উঠলো দেখে তাঁরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যথাসাধ্য জার্ম্মাণ প্রতিরোধ করবেন।

হল্যাণ্ডের উপর জার্ম্মাণ আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হতে লাগলো। হিটলারের উদ্দেশ্য—হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হওয়া। ফ্রান্সের পূর্ব্ব-সীমান্তে দুর্ভেদ্য **ম্যাজিনো-লাইন** অবস্থিত, ঐ সুরক্ষিত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হিটলারের অভিপ্রেত ছিল না। হল্যাণ্ডের পথ সুগম ও অরক্ষিত, তাছাড়া হল্যাণ্ড অধিকার করতে পারলে তার পশ্চিম উপকূল থেকে ইংলণ্ড আক্রমণ করারও সুবিধা অনেক।

কিন্তু ওলন্দাজেরা কখনই নিজেদের দেশকে অরক্ষিত বলে বিবেচনা করেনি। ফ্রান্সের ম্যাজিনো-লাইন বা জার্ম্মেণীর **সিগফ্রিড-লাইনের** মত অভেদ্য দুর্গশ্রেণী তাদের দেশে নেই বটে, কিন্তু তাদের আছে অনতিক্রম্য "ওয়াটার-লাইন" বা জলবেষ্টনী। হল্যাণ্ড দেশ অতি নীচু জায়গা। অনেক

বিমান আক্রমণ

জায়গাতেই বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের জল আটকে রাখতে হয়। সেই বাঁধ খুলে দিলে দেখতে দেখতে সারা দেশটা সমুদ্রে পরিণত হয়ে যেতে পারে, যার ভিতর সৈন্য-চলাচল হবে একেবারে অসম্ভব। এই ওয়াটার-লাইনের ভরসাতেই ওলন্দাজেরা হিটলারের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছিল।

৯ই এপ্রিল (১৯৪০) জার্ম্মেণী আক্রমণ করলো **নরওয়ে** এবং **ডেনমার্ককে।** ডেনমার্ক সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসমর্পণ করলো, কিন্তু নরওয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো বিমান ও নৌ-বহর নিয়ে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল রকম সম্ভাব্য উপায়ে নরওয়েকে সাহায্য করবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। নার্ভিকের সন্নিকটে জার্ম্মাণ ও ব্রিটিশ নৌ-বহরের তুমুল যুদ্ধ হলো। এখানে জার্ম্মাণরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তথাপি যুদ্ধে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো বেশী।

কিন্তু শেষরক্ষা করা মিত্রশক্তির পক্ষে সম্ভব হলো না। তার কারণ, সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপে তাঁদের যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডে নাৎসী-আক্রমণ আসন্ন বলে অনুমিত হচ্ছিল। কাজেই প্রয়োজনের অনুরূপ অস্ত্রবল নরওয়েতে প্রেরণ করা ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব হলো না। নরওয়ে অচিরেই জার্ম্মেণীর পদানত হলো।

নরওয়েতে মিত্রশক্তির পরাজয়ে ইংলণ্ডে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার উপর দেশের লোক আগে হতেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এবারে পার্লামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনে প্রকাশ্যে বিরূপ সমালোচনা হলো গবর্ণমেণ্টের—অগত্যা **চেম্বারলেন পদত্যাগ** করলেন। তাঁর স্থলে **প্রধানমন্ত্রী** হলেন **উইনষ্টন চার্চ্চিল।**

১০ই জুন (১৯৪০) তারিখে চার্চ্চিল তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। ঐ দিনই হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে। ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো-লাইন অতিক্রম করবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করার চাইতে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলেন। তাই এই নিরপেক্ষ দেশত্রয়ের উপর আক্রমণ।

ওলন্দাজেরা আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল জার্ম্মাণ সেনার গতিরোধ করেছিল ইসেল নদীর তীরে; কিন্তু এবারে তারা পশ্চাদপসরণ করে সমস্ত খালের মুখ খুলে দিল চারিদিকে। প্রবল বেগে সমুদ্র-জল এসে সমগ্র হল্যাণ্ডকে ডুবিয়ে দিল শত্রুসৈন্যের অনতিক্রমণীয় করে।

মিউজ নদীর তীরে যে বেলজিয়ান বাহিনী ছিল, তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো। ওলন্দাজ-রাজপরিবার **লণ্ডনে পলায়ন** করলেন।

রটারড্যাম শত্রুহস্তে পতিত হলো। তখন অগত্যা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন ওলন্দাজ-সরকার। তাঁদের গবর্ণমেণ্টও স্থানান্তরিত হলো লণ্ডনে।

মিউজ নদী পার হয়ে জার্ম্মাণরা ফরাসী সৈন্য-ব্যূহের ভিতর প্রবিষ্ট হলো। হেগ, **আমষ্টার্ডাম** এবং অন্যান্য নগরী জার্ম্মাণ-কবলিত হলো।

ফ্রান্সের সীমান্তে আততায়ীকে সমাগত দেখে ফরাসী জনসাধারণ সর্ব্বাধিনায়ক গামেলাঁর উপর আস্থা হারিয়ে ফেললো। গামেলাঁর স্থলে **জেনারেল ওয়েগাঁ** অভিষিক্ত হলেন প্রধান সেনাপতি-পদে।

বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। মিত্রশক্তি দ্রুতবেগে সমুদ্রতীরের দিকে ধাবিত হলো; কারণ, তখন তারা তিন দিকেই শত্রু-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। **লর্ড গর্ট** তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পলায়নের পথ পাচ্ছেন না। সমুদ্র-পথে যদি অপসৃত হতে না পারেন তিনি, তবে সমগ্র ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডানকার্ক বন্দর থেকে অভিযাত্রী-বাহিনী জাহাজে করে পার হতে লাগলো ইংলিশ চ্যানেল। ইংরেজ সেনার অপসরণ সমাপ্ত হলো দীর্ঘ ছয় দিনে। সমস্ত সমরসম্ভার পশ্চাতে পড়ে রইলো জার্ম্মাণদের করায়ত্ত হবার জন্য।

১০ই জুন তারিখে ইতালি হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করলো ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। ওদিকে নরওয়েতে যে ছোটখাট যুদ্ধ তখনও চলছিল, তার অবসান করে দিয়ে মিত্রশক্তি একেবারে সরে এলেন সেখান থেকে। নরওয়ের রাজ-পরিবার আশ্রয় নিলেন এসে লণ্ডনে।

ডিভিশনের উপর ডিভিশন জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক-বাহিনী, সীন নদীর বিভিন্ন সেতুপথ দিয়ে অগ্রসর হলো প্যারী অভিমুখে। অবশেষে ১৪ই জুন (১৯৪০) সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণ সেনাদল প্যারীতে প্রবেশ করলো। ওদিকে ভার্দ্দুন দুর্গও অধিকৃত হলো। সারব্রুকেনের নিকটে ম্যাজিনো-লাইনও অতিক্রম করলো জার্ম্মাণরা। ১৬ই জুন রেনোঁ-মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হলো, **মার্শাল পেতাঁ** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

নতুন মন্ত্রিসভা, সর্ব্বপ্রথমেই যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন ও জার্ম্মাণদের কাছে সন্ধিভিক্ষা করে দূত পাঠালেন। মিউনিক নগরে হিটলার ও মুসোলিনী মিলিত হলেন ফ্রান্সের প্রার্থনা সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য।

কম্পিয়েনের অরণ্যে জার্ম্মাণ ও ফরাসী প্রতিনিধিদল মিলিত হলেন সন্ধিসর্ত্ত আলোচনা করবার জন্য। এইখানেই ১৯১৮ সালে জার্ম্মাণ ও ফরাসীরা মিলিত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে। যে রেলগাড়ীর ভিতর সেবার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এবারেও হলো সেই গাড়ীরই ভিতর। সেবারের অপমানের পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিল এবার জার্ম্মেণী।

এদিকে রোম নগরে ইতালির সঙ্গে পৃথক্ যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষর করলো ফ্রান্স। ২৫শে জুন যুদ্ধ বন্ধ হলো ফ্রান্সে। পেতাঁ-গবর্ণমেণ্ট **ভিচীতে** গিয়ে

রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁদের অধীনে ফ্রান্সের সামান্য অংশই রইলো; প্যারী সহর সহ ফ্রান্সের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলি জার্ম্মেণীর অধিকারভুক্ত হলো। ভিচীতেও পেতাঁ-গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে জার্ম্মেণীর তাঁবেদার হয়ে অধিষ্ঠান করতে লাগলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন পেতাঁ।

ফ্রান্সের যুদ্ধ শেষ হলো এই ভাবে। সমগ্র ইউরোপে হিটলার অপরাজেয় দিগ্বিজয়ী বলে সম্মানিত হলেন। সমগ্র জার্ম্মেণী উৎসব-মুখর হয়ে উঠলো। হিটলার এবার **ব্রিটেন জয়ে** যত্নবান হলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান নিশিদিন হানা দিতে লাগলো ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশে। পোর্টল্যাণ্ড, ওয়েমাউথ, লণ্ডনের বেলুন-বেষ্টনী, কেণ্ট-উপকূল—সর্ব্বত্রই বিমান-আক্রমণ হতে লাগলো। ইংরেজ বিমান-বহরও নিষ্ক্রিয় ছিল না। উভয় পক্ষেই শত-শত বিমান নষ্ট হতে লাগলো। টেমস নদীর মোহানায় ও ডোভারে **প্রচণ্ড বিমান-যুদ্ধ** হয়ে গেল। ইংরেজ বিমান-বহরও বার্লিণ পর্য্যন্ত গিয়ে আক্রমণ চালাতে লাগলো মাঝে মাঝে। ২৭শে সেপ্টেম্বর জার্ম্মেণী, ইতালি ও জাপান দশ বৎসরের জন্য **সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ** হলো।

ইতালি গ্রীস আক্রমণ করে নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এদিকে। উপরন্তু যুগোশ্লাভিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এই উভয় কারণে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে, জার্ম্মাণ-বাহিনী যুগপৎ যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করলো। ১৭ই এপ্রিল যুগোশ্লাভিয়া আত্মসমর্পণ করলো, ২২শে এপ্রিল ইংরেজ সেনা গ্রীস ত্যাগ করতে স্রুরু করলো।

এদিকে **ক্রীট** দ্বীপে অবতরণ করে ভীষণ যুদ্ধের পর ক্রীট অধিকার করে নিল জার্ম্মাণরা। ভূমধ্যসাগরস্থ অন্যান্য ইংরেজ ঘাঁটিও একে একে আক্রমণ করতে লাগলো তারা।

আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ সেনা সাফল্যলাভ করলেও **সোলম** নগর আবার অধিকার করে নিল জার্ম্মাণরা। **তোব্রুকের** উপরও তারা অনবরত আক্রমণ চালাতে থাকলো।

২২শে জুন (১৯৪১) জার্ম্মেণী **রাশিয়া আক্রমণ** করলো। পূর্ব্ব-প্রাশিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার ভিতর দিয়ে জার্ম্মেণীর বিভিন্ন সৈন্যদল প্রবেশ করলো রাশিয়ার অভ্যন্তরে। পোল-সীমান্ত অতিক্রম করে তারা ব্রেষ্টলিটভস্ক, কার্ডনাম ও ভিলনা অধিকার করলো। লিথুয়ানিয়াতেও জার্ম্মাণরা অগ্রসর হতে লাগলো। ল্যাটভিয়াতে ডুইনস্ক্ নগরও তারা ভীষণ যুদ্ধের পরে অধিকার করে নিল।

রুশ-বাহিনী লিথুয়ানিয়ায় পশ্চাৎপদ হলো, দক্ষিণ-সীমান্তে প্রিমিজল্ থেকে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত তারা কোনরূপে আত্মরক্ষা করে টিঁকে রইলো।

নরওয়ে থেকে নতুন জার্ম্মাণ সেনা এসে **মারমানস্ক্** আক্রমণ করলো। জার্ম্মাণরা রীগা ও লাক্ অধিকার করে অগ্রসর হলো **লেনিনগ্রাডের দিকে।**

লেনিনগ্রাডের পথে পেখব ও পোরখবে ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো জার্ম্মাণ সেনাকে। **মস্কো নগরে বোমাবর্ষণ** করলো জার্ম্মাণরা।

মহাযুদ্ধের একটি দৃশ্য

১লা সেপ্টেম্বর **মার্শাল টিমোশেঙ্কোর** নেতৃত্বে রুশ-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালালো গোমেল-অঞ্চলে। লেনিনগ্রাডের আশে-পাশে তীব্র যুদ্ধ চললো। **মার্শাল ভোরোশিলভ** পরিচালনা করছিলেন লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে জার্ম্মাণ বোমারু-বিমান হানা দিতে লাগলো লেনিনগ্রাডে। এদিকে কীভের পতন আসন্ন হয়ে উঠলো দিনে দিনে, অবশেষে ১৯শে সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণ সেনা কীভ নগরে প্রবেশ করলো। কীভের পূর্ব্বদিকেই রুশ-সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো।

ক্রিমিয়াতে জার্ম্মাণ প্যারাশুট-বাহিনী অবতীর্ণ হলো। সেখানে চললো ভীষণ যুদ্ধ। খার্কভের দিকে অগ্রসর হলো জার্ম্মাণ সেনা। আজব-সাগরের

উত্তরে রুশ-প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠলো। ইউক্রেণেও রুশ-সৈন্যের অবস্থার উন্নতি দৃষ্ট হলো। এদিকে মস্কো অভিমুখে সাঁড়াশী-অভিযান চালালো জার্ম্মাণরা।

রুশ-বাহিনীর পরিচালক-মণ্ডলীর ভিতর গুরুতর অদল-বদল ঘটলো। উত্তর-অঞ্চলের অধিনায়কত্ব অর্পিত হলো মার্শাল জুকভের উপর। দক্ষিণ-অঞ্চলে রইলেন টিমোশেঙ্কো। জার্ম্মাণরা খার্কভ অধিকার করলো। সমগ্র ক্রিমিয়া ও ইউক্রেণে চললো তাদের অব্যাহত অগ্রগতি।

এদিকে **লিবিয়াতে** চলেছে প্রবল যুদ্ধ। সিদ্দি-রেজেগ ইংরেজদের করায়ত্ত হলো। রোমেল-চালিত ট্যাঙ্ক-বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ হলো ইংরেজ সেনার সঙ্গে। তোব্রুকের অবরুদ্ধ দুর্গরক্ষীরা বেরিয়ে এসে সিদ্দি-রেজেগের ইংরেজ সেনার সঙ্গে মিলিত হলো।

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে রোষ্টভে প্রবেশ করলো জার্ম্মাণরা। এদিকে মিশর-সীমান্ত পার হয়ে, জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক-বাহিনী পশ্চিম দিক ঘুরে, ইংরেজ সেনার পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করলো।

৯ই ডিসেম্বর (১৯৪১) **চীন** জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** করলো। ১১ই জার্ম্মেণী ও ইতালি একসাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলো মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণরা পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করলো। ৮ই জানুয়ারী রোমেল পশ্চাদপসরণ করলেন আফ্রিকায়।

জার্ম্মাণ ষোড়শবাহিনী রুশ-সৈন্যের দ্বারা ষ্টারায়া-রাশাতে পরিবেষ্টিত হলো। তারপর প্রায় চারমাস কাল রুশ বা জার্ম্মাণ কোন পক্ষই, বিশেষ অগ্রসর হতে পারলো না কোনদিকে। মে মাসের প্রথমদিকে **কার্চ্চ উপদ্বীপে** আক্রমণ স্থুরু করলো জার্ম্মাণরা। রুশ-সৈন্য ধীরে ধীরে সেখান থেকে অপসৃত হতে লাগলো। ২২শে মে (১৯৪২) কার্চ্চ অধিকার করে নিল জার্ম্মাণরা।

লিবিয়াতে চলেছিল তুমুল যুদ্ধ। নাইটসব্রিজে ইংরেজ সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। জাতীয় ফরাসী-বাহিনীর অধিকৃত বীর হাসিমেও জার্ম্মাণরা আক্রমণ চালালো। তোব্রুক অধিকৃত হলো।

ইংরেজ সেনা আশ্রয় গ্রহণ করলো মিশরে গিয়ে। সেখানেও দুইদল জার্ম্মাণ সেনা তাদের অনুসরণ করে, সোলম, সিদ্দি-ওমর প্রভৃতি অধিকার করে নিল। ইংরেজরা **মার্শামেব্রুতে** অপসৃত হলো, কিন্তু সেস্থানও শত্রুপক্ষ অচিরে অধিকার করে নিল।

ওদিকে রাশিয়ার যুদ্ধে—**সিবাষ্টোপোলে** ভীষণ আক্রমণ করলো জার্ম্মাণরা, এবং খার্কভ থেকেও রুশদের অপসৃত হতে হলো।

জার্ম্মাণরা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে ষ্টালিনগ্রাডের নিকট পৌঁছালো—মার্শাল টিমোশেঙ্কো পশ্চাৎপদ হয়ে **ডন** নদীর অপর পারে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। ওদিকে **লেনিনগ্রাড** এবং এদিকে **ষ্টালিনগ্রাডে** তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

জার্ম্মাণরা ক্রমশঃ কৃষ্ণসাগরের তীরে উপনীত হলো। তামান-উপদ্বীপে অবতীর্ণ হলো তারা আলাপা দখল করবার পরে।

এদিকে আফ্রিকার যুদ্ধ সমানতালেই চলেছে। ব্রিটিশ অষ্টম-বাহিনীর আক্রমণে জার্ম্মাণ ঘাঁটিসমূহ বিপন্ন হতে লাগলো।

৩রা নবেম্বর ষ্টালিনগ্রাডের উপর জার্ম্মাণদের **পাঁচ পাঁচবার আক্রমণ ব্যর্থ হলো।** এর পর থেকে ক্রমাগতই নিষ্ফল হতে লাগলো তাদের সমস্ত প্রয়াস। ষ্টালিনগ্রাডের অভ্যন্তরে যে দুটি স্থানে তারা ঘাঁটি বসিয়েছিল, সেখান থেকেও তারা বহিষ্কৃত হলো।

ওদিকে আফ্রিকায় মার্শামেত্রু আবার ইংরেজ সেনার করগত হলো। সমগ্র মিশরে জার্ম্মাণদের আর উল্লেখযোগ্য বাহিনী কিছু রইলো না।

ভিচী-গবর্ণমেন্টের অধিকৃত ফরাসীদেশের ভূখণ্ড এবং ফরাসী উপনিবেশগুলি—বারদিয়া, সোলম, তোব্রুক, গাজালা—এ-সব আবার ইংরেজ অধিকারে চলে গেল।

ককেশাস-অঞ্চলে জার্ম্মাণরা ভয়ানক রকম পরাস্ত হলো। ডন নদীর মধ্যভাগে রুশ-সৈন্য অগ্রগামী হতে লাগলো, জার্ম্মাণরা ক্রমশঃ হটতে লাগলো।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের গোড়া থেকেই, রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সেনার **ভাগ্যবিপর্য্যয়** আরম্ভ হলো। কালমাক-সোভিয়েটের রাজধানী এলিস্টা রুশরা দখল করে নিল। ষ্টালিনগ্রাডের শিল্পাঞ্চলে যেখানে যত জার্ম্মাণ ঘাঁটি ছিল, একে একে রুশ-সেনার কবলে পতিত হতে লাগলো। জার্ম্মাণরা লেনিনগ্রাডের অবরোধ তুলতে বাধ্য হলো। ওরা ষ্টালিনগ্রাডের অবরোধও তুলে সরে এল।

ষ্টালিনগ্রাডে ষষ্ঠ জার্ম্মাণ-বাহিনী (৩,৩০,০০০ সৈন্য) একেবারে **ধ্বংস** হয়ে গেল। জার্ম্মাণদের খার্কভ হারাতে হলো।

টিউনিসিয়াতে জেবেল, টিউনিস, বিজার্ত্তা, জেদিদা—সবই জার্ম্মেণীর হস্তচ্যুত হলো, অবশেষে টিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্ব্বাংশ **বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ** করলো।

উত্তর-ইতালির ভেরোনাতে হিটলার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎ হলো ১৯শে জুলাই।

এদিকে ইতালির জনসাধারণ মুসোলিনীর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজ-বাহিনী ইতালি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে, ইতালির জনসাধারণ **মুসোলিনীকে পদত্যাগে** বাধ্য করেছিল (২৫শে জুলাই)। **মার্শাল বাডোগলিও** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। জার্ম্মেণীর প্ররোচনাতেই ইতালি যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিল, এই ধারণায় নতুন ইতালিয় গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ১৩ই অক্টোবর।

ইউক্রেণী সেনার আক্রমণে জার্ম্মাণ-বাহিনীকে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছিল জার্ম্মেণীর দিকে। কীভের দিকে কিছু অগ্রসর হলো বটে জার্ম্মাণ সেনা, কিন্তু সে-সাফল্য একান্তই সাময়িক। দুর্ব্বার বেগে বিভিন্ন দিক দিয়ে **অগ্রসর হয়ে এল লালফৌজ,** নীপার নদীর বাঁকে দশ ডিভিশন জার্ম্মাণ সেনাকে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চিহ্ন করলো তারা। ষ্টারায়া-রাশাও রুশহস্তে পতিত হলো।

রুশসৈন্য ক্রমশঃ নীষ্টার নদীর তীরে উপস্থিত হলো, জার্ম্মাণরা পশ্চাৎপদ হতে হতে হাঙ্গারী-সীমান্তে এসে দাঁড়ালো, তখন হাঙ্গারীতে প্রবেশ করে সেই দেশে ঘাঁটি স্থাপন করতে সচেষ্ট হলো তারা।

৪৫,০০০ হাজার জার্ম্মাণ স্কালার্তে রুশসৈন্য-দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। ইয়াল্‌টা ও বালাক্‌লাভা রুশ-অধিকারে এসে গেল।

ইতালিতে ক্যাসিনো মিত্রশক্তির অধিকৃত হলো, রোমও পতিত হলো তাদের হস্তে। রুমাণিয়াতে রুশসেনা জার্ম্মাণ-বাহিনীকে বহিষ্কৃত করলো।

২০শে জুলাই **হিটলারকে হত্যা** করবার একটা **চেষ্টা** হয়, কিন্তু হিটলার রক্ষা পেয়ে যান।

মিত্রশক্তি ফ্রান্সের বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্ব্বার গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। নগরের পর নগর জার্ম্মাণদের অধিকার থেকে মুক্ত হতে লাগলো, অবশেষে প্যারী ত্যাগ করতেও বাধ্য হলো জার্ম্মাণরা। হিটলারের আজ্ঞাবহ **ভিচী-গবর্ণমেণ্টের পতন** হলো। জেনারেল দ্য'গল ফ্রান্সে ফিরে এসে নতুন **জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা** করলেন। ২৩শে অক্টোবর (৯৪৪) তারিখে ঐ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক স্বীকৃত হলো।

এদিকে ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী ও কানাডিয়ান বাহিনীগুলি বিভিন্ন পথে জার্ম্মেণীর দিকে অগ্রসর হলো। জার্ম্মাণ সেনা ক্রমাগত পরাজিত হতে হতে রাইন নদী পার হয়ে গেল। সিগ্‌ফ্রিড-লাইনও বিচূর্ণ হলো। মার্কিণদের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম-বাহিনী প্রবেশ করলো জার্ম্মেণীর অভ্যন্তরে। ওদিকে জার্ম্মেণীর পূর্ব্ব-সীমান্তে রুশ-বাহিনী অগ্রসর হতে লাগলো বার্লিণের

দিকে। তাদের বাধা দেওয়ার আর কোন সামর্থ্যই রইলো না হিটলারের। গ্রীস, ইতালি, নেদারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে যত জার্ম্মাণ সৈন্য ছিল, তারা অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলো জার্ম্মেণীতে। ওডার নদীর তীরে রুশ সেনাকে বাধা দেবার জন্য **শেষ চেষ্টা করলেন হিটলার**; কিন্তু তাতেও অক্ষম হয়ে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লেন তিনি।

২২শে এপ্রিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, ২৯শে এপ্রিল করেন **আত্মহত্যা**। তাঁর মৃতদেহ চ্যান্সেলারী-ভবনের ভিতরেই বেজিনে ভিজিয়ে দাহ করা হয়। রুশ সেনা তখন বার্লিণের প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করে বসে আছে।

হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই **অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস** তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন রাষ্ট্র-নায়করূপে। তাঁর প্রথম চেষ্টাই হলো মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা। ৮ই মে (১৯৪৫) তারিখে বার্লিণের কার্লস্‌হার্স্ট পল্লীতে এক বিদ্যালয়-ভবনে, জার্ম্মেণী **বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ** করে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলো। মিত্রপক্ষে রুশ-সেনাপতি **মার্শাল জুকভ** এবং **এয়ার-মার্শাল টেডার** স্বাক্ষর করেন এই চুক্তিতে। জার্ম্মাণপক্ষে স্বাক্ষর করেন **ফিল্ড-মার্শাল কাইটেল** এবং আরও দু'জন সেনাপতি।

অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসকে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার সুযোগ দেওয়াই হলো না। আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই তাঁকে বন্দী করা হলো।

বার্লিণ সহ সমগ্র জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের শাসনভার, সম্মিলিত রুশ, মার্কিণ, ইংরেজ ও ফরাসী-বাহিনী গ্রহণ করলো। সমগ্র জার্ম্মেণীকে চারি ভাগে বিভক্ত করে, এক একটি অংশকে, এক এক জাতির শাসনের অধীনে ছেড়ে দেওয়া হলো। **বার্লিণ সহরকেও চার ভাগে** ভাগ করে ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণ পক্ষ থেকে **জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে** প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হলো। রুশপক্ষে শাসনকর্ত্তা রইলেন **মার্শাল জুকভ**। এই বিধি-ব্যবস্থাকে বলে মিত্রশক্তি-চতুষ্টয়ের কোমানদাতুরা-শাসন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে জার্ম্মেণীর শাসন-ব্যাপার নিয়ে, রুশ-কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে অন্য তিন শক্তির ভীষণ মনোবিবাদ এখনও চলছে। আইসেনহাওয়ার ও জুকভ অনেকদিন হলো নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। এখন জার্ম্মাণ সমস্যার মীমাংসার ভার রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত আছে।

হিটলারের সহকারী নাৎসী-নেতৃগণ যুদ্ধাপরাধীরূপে **নিউরেমবার্গ-বিচারালয়**-কর্ত্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। কারও প্রাণদণ্ড হয়েছে, কারও বা হয়েছে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড।

জার্ম্মেণীর শাসন-বন্দোবস্ত নিয়ে, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ক্রমেই বিরোধ এত তীব্রভাবে বেড়ে চলে যে, এখন আর কোমানদাতুরা-শাসনের অস্তিত্ব নাই বললেও চলে। যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং ফরাসী-অংশকে মিলিত করে এখন সংযুক্ত পশ্চিম-জার্ম্মেণী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। **বন্** নগরী এই রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল। রাশিয়ার অধীনস্থ অঞ্চলের এখন নাম হয়েছে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণ রাষ্ট্র। অবশ্য পূর্ব্ব-জার্ম্মেণীর প্রকৃত নাম, "জার্ম্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র"। এই রাষ্ট্রের সভাপতি হয়েছেন বৃদ্ধ কম্যুনিষ্ট নেতা উইলহেল্ম পিয়েক। পূর্ব্ব-জার্ম্মেণী সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন এবং পূর্ব্ব-ইউরোপীয় কমিনফর্ম্ম বা কম্যুনিস্ট-রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক-প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম-জার্ম্মেণী যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান চ্যান্সেলার বা রাষ্ট্রনায়কের নাম **ডাঃ কনরাড আদিনাউয়ের**। আমেরিকা, জার্ম্মাণদের সামরিক শক্তির পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যস্ত। আমেরিকা ও রাশিয়া, যার যার নিজের নীতি-আদর্শ অনুসারে, গোটা জার্ম্মাণদেশকে আবার এক অভিন্ন রাষ্ট্ররূপে গঠন করে তুলতে চেষ্টা করছে। সম্প্রতি, পশ্চিম-জার্ম্মেণীর সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সমস্ত জার্ম্মেণীকে এক মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্য বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত পার্থক্যের জন্য জার্ম্মেণীর সমস্যার কোন আশু সমাধান পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

রোমক যুগে ফ্রান্সদেশ **গল** নামে পরিচিত ছিল। প্রসিদ্ধ রোমানবীর জুলিয়াস্ সীজারের আমল হতে বহুদিন পর্য্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যের অধীন থাকা সত্ত্বেও, এই দেশ কখনও শান্তভাবে বৈদেশিক প্রভুদের পদানত হয়ে থাকেনি।

রোমের পতনের পর গলদেশ স্বতন্ত্র হয়ে গেল। তখন বর্ব্বর জার্ম্মাণরা পশ্চিম-ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, জার্ম্মাণ ফ্রাঙ্কজাতি বিশিষ্ট **মেরোভিঞ্জি**-বংশের একজন নায়ক **ক্লোভিস,** গলের অধিকাংশ সীমানার উপর আধিপত্য করতেন। তাঁর বিশাল রাজ্য, অস্ট্রেসিয়া ও নিউসট্রিয়া অর্থাৎ মোটামুটিভাবে যথাক্রমে বর্ত্তমান জার্ম্মেণী ও ফ্রান্স এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বভাগে টিউটন সভ্যতার প্রাধান্য আর পশ্চিম-ভাগে ক্রমে রোমক-সভ্যতার প্রভাব বেড়ে ওঠে। ফ্রাঙ্কজাতি থেকে পরবর্ত্তী কালে **ফ্রান্স** নামের উৎপত্তি। ক্লোভিস প্যারিসকে প্রথম রাজার বাসস্থান করে প্যারিস নগরীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেন।

ফ্রাঙ্কদের রাজ্যের দুই অংশ, অস্ট্রেসিয়া ও নিউসট্রিয়ার মধ্যে, গোড়া থেকেই একটা বৈরীভাব গড়ে ওঠে। এ থেকেই পরে জার্ম্মাণ ও ফরাসী

জাতির মধ্যে চিরকালের মত বিরোধের সূত্রপাত হয়। ক্রমে অস্ট্রেসিয়ার দুর্গস্বামীরা মেরোভিঞ্জি-রাজাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করে, নিজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে ওঠেন। এই দুর্গস্বামীদের ভিতর **চার্লস মার্টেলের** নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭৩২ খৃষ্টাব্দে, দক্ষিণ-ফ্রান্সের টুরস্ রণক্ষেত্রে, স্পেনের আরবদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করে, পশ্চিম-ইউরোপকে ইসলাম-শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। চার্লস মার্টেল যে-বংশের লোক তাকে বলে **কার্লোভিঞ্জি**-বংশ। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম, মহামতি চার্লস অথবা **শার্লামেন**। রোমক-সাম্রাজ্যের অবনতির পর যে দীর্ঘ বিশৃঙ্খলার যুগ চলেছিল শার্লামেনই সেখানে আনেন শান্তি, শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘবদ্ধতা।

শার্লামেন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সমগ্র দেশকে

শার্লামেনের রাজ্যাভিষেক

নিজের ছত্রচ্ছায়ার তলে আনয়ন করে দেশের অবিসম্বাদী নৃপতি হয়ে বসলেন। তাঁর সৈন্যবল এত দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তিনি দিগ্বিজয়-যাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। অতঃপর পশ্চিম-ইউরোপের বহু ভূখণ্ড তিনি জয় করে নিলেন। অর্দ্ধেক ইউরোপ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। তখন রোমের পোপ, ৮০০ খৃষ্টাব্দে, তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, অভিষিক্ত করলেন "পবিত্র রোমক-সাম্রাজ্যের" সম্রাট-পদে। কার্লোভিঞ্জি-বংশ ছিলেন টিউটন জাতিভুক্ত।

তাঁরা গলের উন্নতি বিধান করেন ও বর্ত্তমান ফ্রান্স ও জার্ম্মেণী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

শার্লামেনের মৃত্যুর পর, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও উত্তরাঞ্চল থেকে দুর্ম্মদ দিনেমার ও নর্মান জাতিদিগের ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে জোর আক্রমণের ফলে শীঘ্রই কার্লোভিঙ্গি-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরলো। এর পরে **ক্যাপেট**-বংশের এক কাউন্ট, **হিউগ ক্যাপেটের** ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে, ফরাসী সিংহাসনে উপবেশনের সময় থেকেই, স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ফ্রান্সের অভ্যুদয় হলো। হিউগ ক্যাপেটের রাজত্বেই **প্যারিস** ফ্রান্সের রাজধানীতে পরিণত হয়। ক্যাপেট-রাজবংশের আর দু'জন শ্রেষ্ঠ নৃপতি **ফিলিপ অগষ্টাস** ও **নবম লুই।** এঁদের সময় সামন্ত-জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং ফ্রান্স ইউরোপে একটি সম্মানজনক রাজ্যের আসন লাভ করে। ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধগুলি ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধিতে খুব সাহায্য করে। ক্যাপেট-বংশের রাজত্বের পর, ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে, ষষ্ঠ ফিলিপ **ভ্যালয়**-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভ্যালয়-বংশের রাজত্বের কালে ফ্রান্সের ও ইংলণ্ডের মধ্যে **"শতবার্ষিক যুদ্ধ"** নামে দীর্ঘকালস্থায়ী এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রথমে ইংলণ্ড জিততে থাকে। তখন ফ্রান্সের খুব দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছিল। পরে ফরাসী কৃষক-বালিকা, **জোয়ান অব আর্কের** অলৌকিক উৎসাহ ও প্রেরণায়, এবং ফরাসীদের মধ্যে জাতীয়তাভাবের জাগরণের ফলে, শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সই জয়লাভ করে।

এর পর থেকে ফ্রান্সে, রাজারা বিশেষ করে বিচক্ষণ ও শক্তিমান **একাদশ লুই** ও **অষ্টম চার্লস,** জমিদারদের দুর্দ্দান্ত ক্ষমতা খর্ব্ব করে, কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। অষ্টম চার্লস প্রথম বিচ্ছিন্ন ইতালিতে আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করেন। ভ্যালয়-বংশের পর **বুরবন**-রাজবংশের স্থাপয়িতা **চতুর্থ হেনরি** রাজনীতিজ্ঞতা ও যোগ্যতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। চতুর্থ হেনরির পর রাজা হন **ত্রয়োদশ লুই।** এই রাজারই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ রিসল্যু। **রিসল্যুর** সময় হতেই ফ্রান্সের সবদিকে উন্নতি সুরু হয়। এই উন্নতি ও রাজ্যের প্রসারতার পূর্ণবিকাশ হয় **চতুর্দ্দশ লুইএর** রাজত্বকালে।

চতুর্দ্দশ লুই

চতুর্দ্দশ লুই খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি ছিলেন এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধাবলীর দ্বারা রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়িয়েছিলেন। **ভার্সাই নগরীতে** ছিল তাঁর রাজ-

জোয়ান অব আর্কের অরলিয়ন্স অধিকার

প্রাসাদ। এই অতুলনীয় প্রাসাদ একদিকে যেমন ছিল বিলাস ও আড়ম্বরের লীলা-নিকেতন, অপরদিকে আবার ইহা ছিল তখন সমস্ত ইউরোপের জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। চতুর্দ্দশ লুই ছিলেন যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন

তেমনি স্বেচ্ছাতন্ত্রপরায়ণ। তিনি রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা অটুটভাবে নিজের হস্তগত করেন এবং জনসাধারণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করেন।

তাঁর সারা রাজত্বকাল ধরে যুদ্ধের ফলে, জনসাধারণের অর্থনৈতিক দৈন্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। রাজা ও ব্যারনেরা বিলাসের সাগরে যখন সন্তরণ দিচ্ছিলেন, তখন কৃষক ও শ্রমিকদের কারও একটু কালো রুটিও জুটছিল না। চতুর্দ্দশ লুই 'রাজসূর্য্য' বা 'মহান ভূপতি' আখ্যায় ভূষিত হতেন। তাঁর প্রতিভা ও অনলস শ্রমশীলতার জন্য প্রজারা তাঁর প্রতি অনুরক্তই ছিল, তবে তাঁর শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রমুখিতার জন্য, গবর্ণমেণ্টের পেছনে জনগণের কোন সমর্থন ছিল না। তাঁর বৈদেশিক আক্রমণ-নীতির বিরুদ্ধে, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের রাজা **তৃতীয় উইলিয়ম** একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভবিষ্যতে ফরাসী-বিপ্লবের জন্য, চতুর্দ্দশ লুইয়ের নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিকতা পরোক্ষভাবে দায়ী।

চতুর্দ্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে, **পঞ্চদশ লুই** রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্ত ব্যাপারে পতন, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। এসময় দেশের লোকেরা, বিশেষ করে **'তৃতীয় শ্রেণী'র** অর্থাৎ কৃষক, মজদুর ও মধ্যবিত্তদের আর্থিক দুর্গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। বৈদেশিক নীতিতে 'সপ্তবার্ষিক যুদ্ধে' ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার কাছে ফ্রান্সের ঘোরতর পরাজয় হয়। দেশে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে এবং রাজতন্ত্রের সম্মান নষ্ট হতে আরম্ভ করে।

পঞ্চদশ লুইয়ের সময়ে প্রজাদের দুর্গতি চরমভাবে বেড়ে উঠতে লাগলো। করাত-গুঁড়োয় মেশানো ঘাসের রুটি খেতে হতো তখন দরিদ্র প্রজাদের। এইরকম একদা দেখতে পেয়ে রাজা কিছুক্ষণ হঠাৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারপরে সে দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠে বলেছিলেন, "থাকগে! আমার দিন এই ভাবেই কেটে যাবে, তার পরে প্রলয় আসে ত আসুক!"

প্রলয় অবশেষে এলই। পঞ্চদশ লুইয়ের পরে রাজা হলেন **ষোড়শ লুই।** তিনি তখন যুবক মাত্র। তিনি লোক খারাপ ছিলেন না। তিনি অভিজাত-বর্গের অবৈধ অধিকারভোগের কতকটা সঙ্কোচন করতে চেষ্টা করেন এবং দরিদ্র প্রজার দুরবস্থার উপশমের জন্য যত্নবান হন। কিন্তু তিনি দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন ও তাঁর নীতিতে আস্থা-স্থাপন করা যেত না, তাই তিনি দেশের সমস্যাকীর্ণ অচল অবস্থার কোনই সমাধান করতে পারলেন না। ঘটনাচক্রে পঞ্চদশ লুইয়ের দুর্নীতি, ভোগবিলাস ও পাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো হতভাগ্য ষোড়শ লুইয়ের।

ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই দেশে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিল। **রুশো, ভলটেয়ার** প্রভৃতি মনীষী লেখক, জ্বলন্ত ভাষায় যে-সব মতবাদ তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো দেশের নিপীড়িত জনসাধারণ। এই দার্শনিক লেখকগণ **সাম্য, মৈত্রী** ও **স্বাধীনতার** বাণী প্রচার করেছিলেন। **মিরাবো** নামে এক নেতা এসে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুললেন। কিন্তু তাঁর নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা সত্ত্বেও, বিপ্লব যখন ভেঙ্গে পড়লো তখন তা বাঁধনহারা গতিতে অনিয়মের বন্যা বইয়ে দিল। শীঘ্রই যত্রতত্র ছোট-খাট দাঙ্গা ঘটতে লাগলো। অবশেষে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, প্যারিসের উন্মত্ত

রাজনীতিজ্ঞ রিসল্যুর সভা

অধিবাসিগণ রাজ-কারাদুর্গ **ব্যাষ্টিল** অধিকার করে, সেখানে আবদ্ধ রাজ-বন্দীদের মুক্ত করে দিল।

এইভাবে ফ্রান্সে ইতিহাস-বিখ্যাত **ফরাসী-বিপ্লব** আরম্ভ হলো।

এই ধ্বংসকারী বিপ্লব কয়েকটি বৎসর ধরে ফ্রান্সে ঝড় বইয়ে দিল। **জেকোবিন পার্টির** ড্যানটন, ম্যারাট, **রোবসপিয়ার** প্রভৃতি এই বিপ্লবের উগ্র নেতা ছিলেন।

বিপ্লবীরা শুধু জেলখানা ভেঙ্গেই ক্ষান্ত হলো না। তারা রাজবংশের হাত থেকে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিল। বিপ্লবীদের উগ্রতা বেড়েই চললো। তারা ইউরোপের

দেশে-দেশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলো। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি শক্তিগণ ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তখন বিপ্লবীগণ মরিয়া হয়ে উঠে, দেশের অভ্যন্তরে বিপক্ষবাদীদের নির্ম্মমভাবে প্রাণনিধন করতে লাগলো। বিপ্লবের ঝটিকাবর্ত্তে, রাজা ষোড়শ লুই ও অসংখ্য জমিদার কুখ্যাত গিলোটিন-যন্ত্রের নীচে মাথা রেখে প্রাণ দিলেন। তারপরে সুরু হলো বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা ও বিভীষিকার রাজত্ব।

ফরাসী-বিপ্লবে জমিদারী-প্রথা লুপ্ত হয়ে গেল। বড় বড় ধনী পাদ্রীদের

যুদ্ধক্ষেত্রে চতুর্দ্দশ লুই

সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হলো। উপাধি গ্রহণ করে মানুষে মানুষে ভেদ-সৃষ্টির যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এই ফরাসী-বিপ্লব শুধু যে ফ্রান্সের অসংখ্য প্রজাকে মুক্তির সন্ধান দিল তাই নয়, পৃথিবীর অগণিত জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথও এই বিপ্লবই সূচিত করলো।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুদয়

বিপ্লবের এই ভাঙ্গনের পরে এল গড়নের পালা। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হলো বটে কিন্তু দেশের প্রজাতন্ত্র কি রকম হবে, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা কি ভাবে তৈরী করলে তা দেশের সকলের পক্ষে সমান কল্যাণ-জনক হবে, বিপ্লবী নায়কেরা সে সম্বন্ধে একমত হতে পারলেন না।

অনেক রকম শাসন-বিধি রচিত হলো কিন্তু কোনটিই দেশের সব লোকের মনের মত হলো না। শেষ পর্য্যন্ত ১৭৯৯ সালে অর্থাৎ বিপ্লবের দশ বৎসর পরে, ফরাসীরা বিজয়ী যোদ্ধা **নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে** প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসাল বা নেতা বলে মেনে নিল এবং তাঁরই হাতে দেশ-শাসনের সকল ক্ষমতা তুলে দিল।

পঞ্চদশ লুই

ফরাসী-বিপ্লবের সঙ্গে নেপোলিয়নের কোন যোগ ছিল না; তিনি ফ্রান্সের রাজনীতিতে যোগ দেন বিপ্লবের পরে। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি দেশের শ্রদ্ধার পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। নেপোলিয়নের দ্রুত প্রভাববৃদ্ধির কারণ এই যে, তিনি ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি শক্তির বিরুদ্ধে, একটার পর একটা যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেন। ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দৃপ্ত-সৈনিকদের সহযোগে, তিনি দেশের পর দেশ মথিত, পর্য্যুদস্ত করে, ফরাসীদের মনে আনলেন বিজয়গৌরবের উদ্দীপনা এবং নিজে হলেন ফ্রান্সের অবিসম্বাদী নায়ক। তখন নেপোলিয়ন দেশকে দৃঢ়ভাবে গঠনের দিকে মনোযোগ দিলেন।

দেশের সব লোকে মিলে-মিশে দেশ শাসন করতে পারবে নেপোলিয়ন এ-কথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে, আইন তৈরীর সময় প্রজা-প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা ভাল, তাদের হাতে কিছু ক্ষমতাও দেওয়া চলে, কিন্তু রাজ্যশাসনের আসল ক্ষমতা থাকা উচিত অল্প কয়েক জনের হাতে।

দেশের নেতৃত্ব হাতে নিয়েই নেপোলিয়ন তাঁর এই ধারণা অনুসারে নতুন রাজ্যশাসন-বিধি জাহির করলেন। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, কয়েক বৎসরের মধ্যেই, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে, তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের রাজত্বে এবং আগেকার বুরবন-বংশের রাজাদের রাজত্বের মধ্যে তফাৎ রইলো অনেকখানি। আগেকার রাজাদের আমলে আইন-কানুন বলে কিছু ছিল না। নেপোলিয়ন সমস্ত দেশের জন্য **এক রকম আইন** তৈরী করে দিলেন। নেপোলিয়নের তৈরী সেই আইন-গুলো এত ভাল হয়েছিল যে, সামান্য অদল-বদল করে আজকের ফ্রান্সেও সেই সব আইনই চলছে।

নেপোলিয়নকে কেবল একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলে মনে করলে ভুল করা হবে, তাঁর মত **দূরদর্শী** ও **বুদ্ধিমান** শাসনকর্তা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সাহস ও শক্তি ছিল তাঁর দুর্জ্জয়। নেপোলিয়নের তরবারি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের কাছে ফ্রান্স অনেকখানি ঋণী।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-বিস্তার

নেপোলিয়ন দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মিশর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে রাশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত ফরাসী-সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে দিয়ে, ফ্রান্সকে জগতের **শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে** পরিচিত করেছিলেন। নেপোলিয়নের অগণিত যুদ্ধের মধ্যে, অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে **অষ্টার-লিজের** যুদ্ধ ও ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার বিপক্ষে **জেনা**-র যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সঙ্কটময় দীর্ঘ যুদ্ধের কালে ইংলণ্ড তার নৌশক্তির জোরে, দেশকে বিশ্বজয়ী নেপোলিয়নের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল। বিখ্যাত নৌ-বীর **নেলসনের** রণকৌশলে ইংলণ্ড, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে **ট্রাফালগার** নৌযুদ্ধে ফরাসী রণতরীবহরকে ভীষণভাবে পরাভূত করে। স্থলশক্তিতে নেপোলিয়ন অজেয় থেকে যান। ১৮০৮ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপে তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে জোর করে স্পেনের সিংহাসনে বসান। এতে স্পেনবাসীদের মধ্যে আক্রমণকারীর

বিরুদ্ধে, একটা প্রবল জাতীয়-জাগরণের উন্মেষ দেখা দেয়। তারপর চলে ফরাসীদের সঙ্গে স্পানিশদের আপ্রাণ দীর্ঘ সংগ্রাম। এই যুদ্ধ **পেনিনসুলার যুদ্ধ** নামে খ্যাত। ইংলণ্ডের সুযোগ্য সেনানায়ক আর্থার ওয়েলেসলি (পরবর্ত্তী **ডিউক অব ওয়েলিংটন**) এই যুদ্ধে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। পেনিনসুলার যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতনের সূত্রপাত হয়। তারপর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানেই তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

মস্কো গিয়ে নেপোলিয়ন মহা বিপদে পড়েন। রাশিয়ানরা নেপোলিয়নের সামনে থেকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে পালাতে থাকে এবং পালাবার সময় বাড়ীঘর ক্ষেত-খামার সব-কিছু জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ষোড়শ লুই

তখনকার দিনে তো আজকের মত সর্ব্বত্র রেলগাড়ী ছিল না, কাজেই বাইরে থেকে খাবার এনে সৈন্য-দলকে খাওয়াবারও উপায় ছিল না। এদিকে শীতকাল এসে পড়লো। রাশিয়ার শীত অতি প্রচণ্ড। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন, সেই শীতে অনাহারে ও শীতবস্ত্রের অভাবে সৈন্যদলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। এমনি সময় মস্কোর কাছাকাছি এসে তিনি দূরে রুশ-সম্রাটের সৈন্যদল দেখতে পেলেন। তখন বিকেল হয়ে এসেছে, নেপোলিয়ন ভাবলেন পরদিন সকালে তিনি রাশিয়ার সৈন্যদলকে আক্রমণ করবেন।

ফরাসী-বাহিনীকে শিবির সন্নিবেশ করতে দেখে রুশ-সম্রাট বা জার মনে মনে হাসলেন! তিনি বুঝলেন, রাশিয়ার কুয়াসা যে কি পদার্থ, নেপোলিয়ন তা জানেন না।

রুশ-সম্রাটের ধারণাই সত্য হলো, সেদিন সন্ধ্যায় যে কুয়াসা আরম্ভ হলো পরদিন অনেক বেলাতেও নেপোলিয়ন দেখলেন যে, সে কুয়াসার ঘোর আর কাটে না। সে কুয়াসা এমন ভয়ানক যে, দশ হাত দূরের জিনিষও দেখতে পাওয়া যায় না, যুদ্ধ করা তো দূরের কথা! বিকেলের দিকে কুয়াসা যখন কাটলো, রুশ-সৈন্যদলের তখন চিহ্নমাত্র নাই!

নেপোলিয়ন রুশ-সম্রাটের ফন্দীটা বুঝতে পারলেন। রাশিয়া আকারে

রাজ-কারাদুর্গ ব্যাষ্টিল দখল

অতি প্রকাণ্ড দেশ। এত বড় দেশে রুশ-সম্রাটের পিছনে তাড়া করে যাওয়া অসম্ভব, নেপোলিয়ন তাও বুঝতে পারলেন। তা-ছাড়া, শীতে তাঁর সৈন্যদল অবশ হয়ে উঠছিল। এই সব দেখে তিনি তাদের দেশে ফিরবার হুকুম দিলেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শীতে ও তুষারের পীড়নে নেপোলিয়নের বহু সৈন্য মারা যায়।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ

ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীদের এই সময় ভয়ানক শত্রুতা চলছিল। ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়ন ইউরোপের সব কয়টি দেশকে এক-জোট করে, ব্রিটেনকে ব্যবসায়, বাণিজ্যে **বয়কট করে** জব্দ করবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু এতে বেশী ক্ষতি হলো তাঁরই।

নেপোলিয়নের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ।

তাঁর বিশ্বজয়ের উন্মাদ-কল্পনায় উদ্ব্যস্ত হয়ে, প্রতিপক্ষ-শক্তিগুলি অবিরাম তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে লাগলো। অবশেষে ১৮১৫ সালে বেলজিয়মের অন্তর্গত **ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে** নেপোলিয়ন, ইংরেজ সেনাপতি **ডিউক অব**

রোবসপিয়ারের বিচার

ওয়েলিংটনের হাতে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। বন্দী নেপোলিয়নকে আটকে রাখা হলো আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে, **সেণ্ট হেলেনা** নামক দ্বীপে। সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

অষ্টাদশ লুইয়ের শাসন

ওয়াটালু্র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, নেপোলিয়নের গড়ে-তোলা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল। এবার পুনরায় আগেকার বুরবন-রাজবংশের রাজা **অষ্টাদশ লুই** রাজা হলেন। নতুন রাজা ভাল করেই বুঝলেন যে, প্রজাদের ক্ষেপিয়ে রাজত্ব করা আর চলবে না। তিনি তাই কতকটা ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসনবিধির অনুকরণে ফরাসী শাসনতন্ত্র তৈরী করলেন।

রাজা অষ্টাদশ লুইএর পর নতুন রাজা হলেন **দশম চার্লস**। ইনি এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা তৈরী করলেন যে, প্রজারা বিরক্ত হয়ে উঠলো। জনসাধারণের সভা দাবী করলো যে, এই মন্ত্রীদের সরিয়ে দিয়ে তাঁদের জায়গায় অন্য ভাল লোক নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু জবরদস্ত

রাজা কোন কথাই শুনলেন না, পুরাণো মন্ত্রীদেরই কাজে বহাল রাখলেন। ছয় বৎসর এইভাবে বিরোধ চলবার পর, প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

নেপোলিয়ন

আবার একটা ছোটখাট বিপ্লব হয়ে গেল। এই বিপ্লবকে বলা হয়, ১৮৩০এর **"জুলাই বিপ্লব"**। বুরবন-বংশের শেষ রাজা, দশম চার্লস **সিংহাসন ত্যাগ** করতে বাধ্য হলেন।

লুই ফিলিপের শাসন

এই সব ব্যাপারে ফরাসীরা বুরবন-বংশের উপরেই ভয়ানক চটে গেল। তারা এবার অর্লিয়ন্স-বংশের **লুই ফিলিপকে** এনে সিংহাসনে বসালো।

ফ্রান্সের লোকেদের ধারণা হয়েছিল যে, দেশ এখনও প্রজাতন্ত্রের উপযুক্ত হয় নাই; রাজা থাকা ভাল কিন্তু রাজা যাতে প্রজাদের মনের ভাব এবং ইচ্ছা বুঝে, সেই অনুসারে চলতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রজারা দেখেছিল যে, বুরবন-বংশের রাজারা কিছুতেই তাঁদের অহঙ্কার এবং জিদ্ ছাড়তে পারেন না, দেশের লোকের প্রতিনিধিদের পরামর্শে চলতে তাঁরা যেন কুণ্ঠিত হন! এই জন্যই ফরাসীরা, দশম চার্লসের সিংহাসন-ত্যাগের পর লুই

নেপোলিয়নের বার্লিণ প্রবেশ

ফিলিপকে ডেকে আনলো এবং তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে, দেশের লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ তিনি করতে পারবেন না।

এই ব্যবস্থার ফলও ভাল হলো না। ফ্রান্সে দলাদলিটা একটু বেশী। কে মন্ত্রী হবেন এই নিয়ে দলের নেতাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকতো। যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁরাও কাজ করবার সময় পেতেন না। পার্লামেণ্টে যখন যে-সব দল থাকতো, নেতাদের মন জোগাতেই তাঁদের সমস্ত সময় কেটে যেত। কাজেই

রাজ্যশাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগলো। লুই ফিলিপেরও যোগ্যতা ছিল না তাই তিনি এঁদের সামলাতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত প্যারিসে আবার **বিপ্লবের আগুন** জ্বলে উঠলো। ফিলিপ **সিংহাসন ত্যাগ** করে বাঁচলেন। সেটা ১৮৪৮ সাল। এই বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপের নানা রাজ্যে প্রবল বিপ্লব ও বিদ্রোহের আন্দোলন জেগে উঠেছিল।

লুই নেপোলিয়নের শাসন

ফরাসীরা এবার রাজতন্ত্রের উপরেই ক্ষেপে গিয়ে ঠিক করলো যে, কাউকেই আর রাজা করবার দরকার নাই। আবার সেই প্রথম বিপ্লবের পরের প্রজাতন্ত্রের

মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হবার পর হঠাৎ সেখান হতে পালিয়ে নেপোলিয়নের ফ্রান্সে আগমন

মত শাসন-বিধিই তৈরী করা যাক। তাই ঠিক হলো যে, ফ্রান্সে আর **রাজা থাকবে না।**

শাসন-বিধি তো ঠিক হলো, কিন্তু গোলমাল বেধে গেল সভাপতি-নির্ব্বাচন নিয়ে। সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র **লুই নেপোলিয়ন** তখন ফ্রান্স থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে ইংলণ্ডে দিন কাটাচ্ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সভাপতি করাই ঠিক হলো এবং বিপুল ভোটের জোরে, তিনি নির্ব্বাচিত হয়ে গেলেন।

লুই নেপোলিয়ন কিন্তু সোজা লোক ছিলেন না। সভাপতি হয়ে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। সম্রাট হবার বাসনা তাঁর মনে খুব প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। তিন বৎসর তিনি চুপচাপ কাটিয়ে গেলেন এবং এই সময়ের মধ্যে চেষ্টা করে, সৈন্যদলটিকে হাত করে নিলেন।

চতুর্থ বৎসরে তাঁর সভাপতিত্বের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসবার কথা, তখন হঠাৎ একদিন ভোরবেলা তিনি তাঁর বিরোধী দলগুলির সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, আরও দশ বৎসর তিনি সভাপতি থাকবেন। এই চাল দেবার বছর খানেক পরেই তিনি সোজাসুজি **নিজেকে সম্রাট** বলে ঘোষণা করলেন (১৮৫২ খৃঃ)।

এখন তিনি সম্রাট **"তৃতীয় নেপোলিয়ন"** উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি সৈন্যদল, পাদ্রী, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ—সকলের সঙ্গেই ভাব রেখে চলতেন; সকলকেই কিছু না কিছু সুবিধা করে দিতেন। তাঁর আমলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থাও অনেক ভাল হয়েছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন, বেগবান বৈদেশিক নীতিদ্বারা, আবার কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। ফ্রান্স ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগদান করেছিল। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন পররাষ্ট্র-নীতিতে পদে পদে ভুল করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর পতন হলো, বিসমার্কের চালে, প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে।

১৮৭০ সালে তিনি প্রাশিয়া আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ **ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি জার্ম্মাণদের হাতে বন্দী হলেন। যুদ্ধ-শেষে জার্ম্মাণরা তাঁকে মুক্ত করে দিল বটে, কিন্তু দেশে আর তিনি ফিরতে পারলেন না। ভগ্নহৃদয়ে তিনি ইংলণ্ডে চলে গেলেন এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে জার্ম্মাণদের হাতে **বন্দী** হয়েছেন, এই খবর প্যারিসে পৌঁছামাত্র, সেখানে আবার রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করা হলো। প্যারিসে জাতীয় পরিষদ গঠিত হলো এবং জার্ম্মাণদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে, তাদের ফ্রান্স থেকে বিদায় করবার ভার পড়লো এডলফ্ থিয়েরের উপর। ফ্রান্সের লোহার খনি, আলসাস এবং লোরেণ, এই দুটি প্রদেশ জার্ম্মেণীকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং পাঁচ বৎসরে

নগদ পঞ্চাশ কোটি সোনার ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, এই সর্ত্তে জার্ম্মাণরা ফ্রান্স ছেড়ে চলে গেল। তিন বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্স এই সমস্ত টাকা দিয়ে দিল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসর দেশে কোন্ ধরণের শাসনতন্ত্র প্রচলন করা হবে তাই নিয়ে ঝগড়া চললো। শেষ পর্য্যন্ত ১৮৭৫ সালে, **তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসন-বিধি** তৈরী হলো। স্থির হলো যে, দেশের পার্লামেণ্টের মধ্যে প্রধান এবং দূরদর্শী লোকদের নিয়ে একটা সিনেট থাকবে, আর প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা প্র তি নি ধি-প রি ষ দ থাকবে। সাত বৎসরের জন্য প্রজাদের ভোটে একজন করে সভাপতি নির্ব্বাচিত হবেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য একটা মন্ত্রিসভা থাকবে। সভাপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে পারবেন না এবং মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন।

রাজা অষ্টাদশ লুই

এই শাসন-বিধি অনুসারেই ফ্রান্স ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত চলে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প সব-কিছুরই যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে, জার্ম্মাণদের কাছ থেকে তার আলসাস এবং লোরেণ সে আবার উদ্ধার করেও নিয়েছিল। ফ্রান্সের লোহার কারখানা, কাপড়ের কল, কয়লার খনি এবং পশমের কলগুলো সবই প্রায় এই আলসাস-লোরেণ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। ফ্রান্সের রাস্তাগুলি খুব চমৎকার, প্যারিস থেকে অসংখ্য পাকা রাস্তা, সোজা ভাবে দিকে দিকে বেরিয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সে যত পাকা রাস্তা আছে, ফ্রান্স থেকে প্রায় পনেরো গুণ বড় আমাদের এই ভারতবর্ষে, তার আট ভাগের এক ভাগও নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

ভার্সাই-সন্ধির সর্ত্তাবলী উপেক্ষা করে, জার্ম্মেণী ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করতে আরম্ভ করলো যখন, তখনই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সমভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। অবশেষে হিটলারের **পোলাণ্ড আক্রমণ** স্বরু হওয়া মাত্রই ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি, একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করলো জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে।

ফ্রান্স বা ইংলণ্ড যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবার পূর্ব্বেই, জার্ম্মেণী-কর্ত্তৃক **পোলাণ্ড ধ্বংস** হয়ে গেল এবং রাশিয়ার আক্রমণে পর্য্যুদস্ত হয়ে ফিনল্যাণ্ড, রাজ্যাংশ পরিত্যাগের সর্ত্তে, অপমানজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো। ফরাসী বাহিনী যখন অবশেষে সুসজ্জিত হয়ে, ইংরেজ-সেনার সাহায্যে জার্ম্মেণী আক্রমণের মত অবস্থায় উপনীত হলো, তখন জার্ম্মেণীও পূর্ব্ব-সীমান্তের যুদ্ধ-বিগ্রহ মিটিয়ে ফেলে, পশ্চিম-সীমান্তের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেবার সুযোগ পেয়েছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে, ইতিপূর্ব্বেই ফরাসী দেশের পূর্ব্বদিকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্ম্মিত হয়েছিল, এর নাম **ম্যাজিনো-লাইন**। এই দুর্গগুলির অধিকাংশই ভূগর্ভে নির্ম্মিত হয়েছিল, কাজেই মাটির উপর থেকে কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না যে, পায়ের তলায় কী বিরাট মারণ-যজ্ঞের আয়োজন হয়ে রয়েছে!

ম্যাজিনো-লাইন ভেদ করবার চেষ্টা যে জার্ম্মেণী করবে না, এ বিষয়ে ফরাসীরা নিঃসন্দেহ ছিল। ফ্রান্স আক্রমণ করতে হলে একমাত্র জার্ম্মেণীর উপায় হলো উত্তরে, বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে বা দক্ষিণে, সুইজারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু সে দুটি হলো নিরপেক্ষ দেশ; ওদের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কাজ জার্ম্মেণী কখনই করতে পারে না; করলে সেটা আন্তর্জ্জাতিক আইনে অপরাধ বলে গণ্য ত হবেই, উপরন্তু ঐ দেশ দুটিও, সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মেণীর শত্রু-পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে।

কাজেই ফ্রান্সের মনে হলো যে, তার নিজের তরফ থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা কিছুই নেই। সে নিশ্চিন্ত মনে, জার্ম্মেণীর ভিতরে সৈন্য-চালনায় প্রবৃত্ত হলো।

ম্যাজিনো-লাইনের মুখোমুখি জার্ম্মেণীরও এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী ছিল, তার নাম **সিগফ্রিড-লাইন**। এই দুর্গশ্রেণীর দিকে অভিযান করলো ফরাসীরা।

একমাসের ভিতর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ কোথাও হলো না। সেপ্টেম্বরের

শেষ দিকে, ফরাসী সৈন্য জার্ম্মাণ সীমান্তের একাংশ অধিকার করে বসলো। ইংলণ্ড থেকে অভিযাত্রী-সৈনিকেরা দলে দলে এসে পৌঁছাতে লাগলো ফ্রান্সে।

আমেরিকা থেকেও সামরিক সাজসজ্জা ও উপকরণ আসতে লাগলো প্রভূত পরিমাণে। বিমান-পোতের কথাই প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। ফ্রান্সের চাহিদামত কার্টিস-বিমান তৈরী করে পাঠাতে লাগলো মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র। এদের গতিবেগ ঘন্টায় তিনশত মাইল।

সমুদ্রপথেও **ফরাসী নৌ-শক্তি** নিষ্ক্রিয় ছিল না। কিন্তু জার্ম্মেণীর ইউ-বোটের আক্রমণে প্রথম প্রথম বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল ফরাসীদের। সমুদ্রপথে জার্ম্মেণীর মাল-চলাচল রুদ্ধ করবার জন্য বহু ফরাসী জাহাজ নিযুক্ত ছিল। ফরাসী নৌ-সেনার প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল দার্লাঁ এই সময়ে ইংলণ্ডে যান।

লুই নেপোলিয়ন

ফরাসী সাবমেরিণ, সীপ্লেন এবং ক্রুজারসমূহ অতি উন্নত-প্রণালীতে নির্ম্মিত ও পরিচালিত হতো।

যুদ্ধ খুবই মন্থর গতিতে অগ্রসর হলো। কিন্তু ফ্রান্সের কারখানাগুলি কাজ করে চললো অবিশ্রান্তভাবে। বোমা, শেল, টর্পেডো, বিমান-পোত, জাহাজ, ছোট-বড় প্রত্যেকটি জিনিষ তৈরী হলো দিবারাত্রি।

জার্ম্মাণ বিমান-আক্রমণের ভয়ে, তখন ফরাসীদেশের নগর, পল্লী সবই নিষ্প্রদীপের শাসন নতশিরে বহন করে চললো।

যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে **মসিয়েঁ দালাদিয়ের** ছিলেন ফ্রান্সের প্রধান ও যুদ্ধ-সচিব। এই সময়ে তিনি পদত্যাগ করলেন। **মসিয়েঁ রেনো** হলেন প্রধান মন্ত্রী। তাঁর অনুরোধে দালাদিয়ের পূর্ব্ববৎ যুদ্ধসচিব-পদে কাজ করে যেতে রাজী হলেন। তখনও প্রধান সেনাপতি-পদে **গামেলাঁ** এবং সহকারী সেনাপতি-পদে **জর্জ্জেস** অধিষ্ঠিত রয়েছেন, কিন্তু জনমত ক্রমশঃ গামেলাঁর প্রতিকূলে যেতে সুরু করেছে।

কূটনীতিজ্ঞদের সমস্ত আশ্বাস ও আশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে, ১৯৪০ সালের ১০ই মে তারিখে, জার্ম্মাণ সেনা হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গ আক্রমণ করলো। অমনি ফ্রান্সে আরম্ভ হলো তার বিপুল প্রতিক্রিয়া।

বেলজিয়ম বা হল্যাণ্ড যে জার্ম্মেণীর দ্বিগ্বিজয়ী বাহিনীকে বাধা দিতে সক্ষম হবে না এবং বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে, জার্ম্মাণ-আক্রমণ যে ফ্রান্সের উপর এসে পড়বে, অচিরেই সে বিষয়ে আর কারও সন্দেহ রইলো না। তখনই ফ্রান্স থেকে ফরাসীসেনা ও ইংরেজ অভিযাত্রীবাহিনীর কিয়দংশ ছুটে এল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম রক্ষার জন্য।

কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে **হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম** যেমন নিঃশেষে আত্মাহুতি দিয়েছিল জার্ম্মেণীর ধ্বংসযজ্ঞে, এবারে তারা আর তা করলো না, কিছু পরিমাণ যুদ্ধের পরেই তারা **আত্মসমর্পণ** করে আত্মরক্ষা করলো। এতে তাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো ইংরেজ ও ফরাসীরা, কিন্তু ঐ দুটি দেশ অল্পের উপর দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেল।

১০ই জুন **ইতালি** অকারণেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** করলো। ১১ই, জার্ম্মাণ সেনা, সীন নদী পার হয়ে ফরাসী দেশে প্রবেশ করলো। তারপর একের পর এক, ফরাসী নগরীগুলি পতিত হতে থাকলো শত্রুর হাতে। ফরাসীরা বীরের জাতি বটে কিন্তু জার্ম্মাণদের মত রণ-নৈপুণ্য ছিল না তাদের। কাজেই তারা ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো।

১৬ই জুন তারিখে **মার্শাল পেতাঁ** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেই সন্ধি প্রার্থনা করলেন জার্ম্মেণীর কাছে। **কম্পিয়েনের** অরণ্যের এক রেল-গাড়ীর কামরার ভিতরে **সন্ধিপত্র** স্বাক্ষরিত হলো। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানেও ঠিক এই স্থানেই, এই গাড়ীর ভিতরে বসেই, যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষর করেছিল জার্ম্মাণ ও ফরাসীরা। সেবারে ফরাসীরা ছিল বিজয়ী, এবারে তারা বিজিত। ২৫শে জুন রোম নগরে ইতালির সঙ্গেও ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিরতি স্বাক্ষরিত হলো।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট, ফ্রান্সদেশের অধিকাংশ জার্ম্মাণবাহিনীর করে সমর্পণ করে, **ভিচীতে** অপসৃত হলো। সেখানেও জার্ম্মেণীর তাঁবেদার হিসারেই অবস্থান করতে লাগলো তারা।

ইংরেজেরা প্রস্তাব করেছিল যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্স ত্যাগ করে উপনিবেশ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাক। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুই দেশকে একত্র
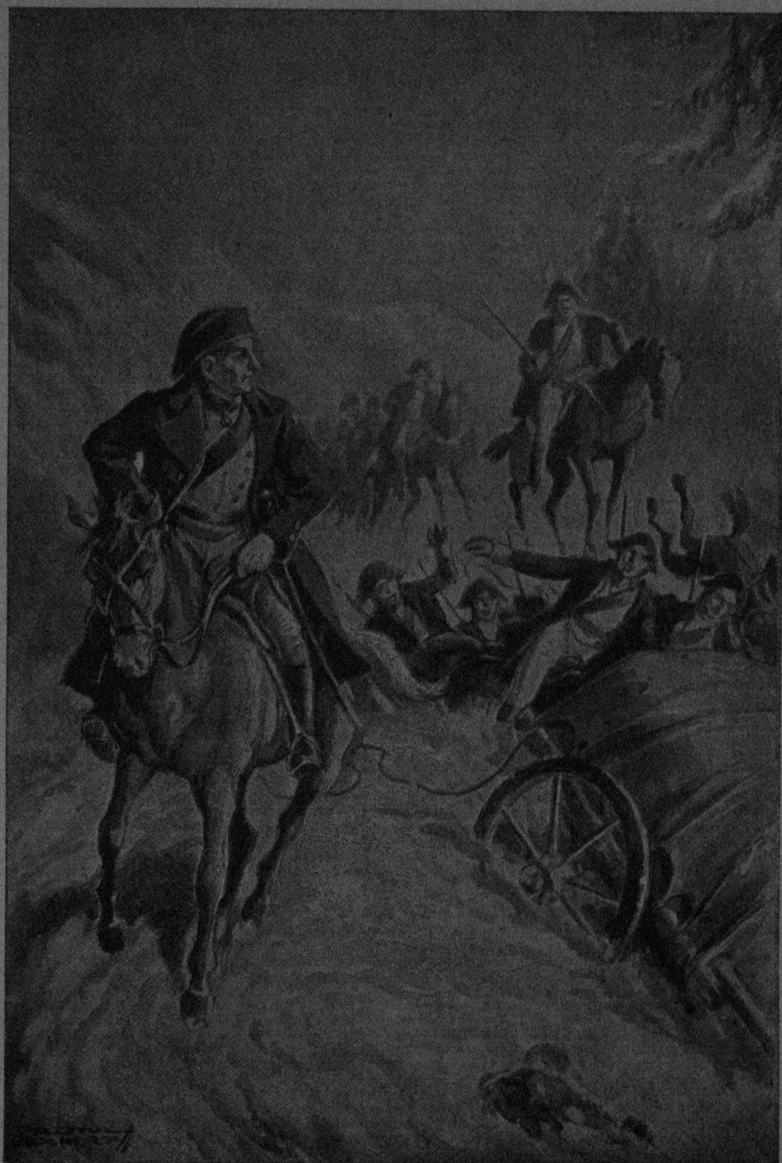
তুষার, তুষার, তুষার !···এরই ভিতর দিয়ে হাজার হাজার ফরাসী সৈন্ত···
—রাশিয়া অভিযানের ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে নেপোলিয়নের
ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন।

মিলিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন চার্চ্চিল; কিন্তু কোন কথাই পেতঁ্যার মনঃপূত হয় নি। উত্তরকালে এর জন্য তিনি নিন্দিত ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

জেনারেল দ্য গল ইংলণ্ডে গিয়ে নির্ব্বাসিত ফরাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন, জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

ভিচীতে অধিষ্ঠিত হয়ে **পেতঁ্যা-গবর্ণমেণ্ট** সর্ব্বপ্রকারে হিটলারের আনুগত্য করতে লাগলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ফরাসী নৌ-বাহিনীকে করায়ত্ত করে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে সুরু করলেন। যে-সব ফরাসী রণতরী মিত্রশক্তির কোন বন্দরে ছিল, তাদের আর বেরুতে দেওয়া হলো না। যারা বাহিরে ছিল, তাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। আলেকজান্দ্রিয়া, ওরাণ প্রভৃতি বন্দরে অনেক ফরাসী-জাহাজ এইভাবে বিনষ্ট হলো। তবুও কিছুসংখ্যক ফরাসী রণতরী জার্ম্মাণহস্তে পতিত হলোই।

তারপর উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ মরক্কো, টিউনিশিয়া প্রভৃতি ইংরেজ ও মার্কিণ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলো। ভিচী-সরকারের আধিপত্য নির্ম্মূল হলো এ-সব উপত্যকা থেকে। জেনারেল হিরো জাতীয়তাবাদী ফ্রান্সের প্রতিনিধিরূপে, আলজিয়াম নগর থেকে শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করলেন দ্য গলের সঙ্গে মতদ্বৈধ ঘটায়।

১৯৪৫এর মার্চ্চ মাসে, পশ্চিম-ইউরোপে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ইংরেজ ও মার্কিণ বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে, দ্য গল-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ফরাসীগণও এসে ফ্রান্সে অবতরণ করলো। ভিচী-গবর্ণমেণ্ট তাদের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারলো না।

জেনারেল দ্য গল স্বাধীন ফ্রান্সের নতুন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করলেন। ইংলণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অনুমোদন অচিরেই লাভ করলো এই গবর্ণমেণ্ট। বার্লিণের পতনের পর, সমগ্র **জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র চারিভাগে** বিভক্ত করে, তার এক ভাগ ফ্রান্সের করে সমর্পণ করা হলো। জার্ম্মেণীর শাসন-ব্যাপারে ফ্রান্স মিত্রশক্তির তুল্য অংশীদার হলো।

মার্শাল পেতঁ্যাকে দেশদ্রোহ-অপরাধে কারাদণ্ডে **দণ্ডিত** করা হলো। জেনারেল দ্য গল কিন্তু বেশীদিন স্বাধীন ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের নায়কত্ব করতে পারেন নি। সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর পদে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটছে। ফ্রান্স **অতলান্তিক চুক্তি** ও **ইউরোপীয় পরিষদের** সদস্য।

নানাভাবে পর্য্যুদস্ত হবার ফলে, জার্ম্মেণীর পুনঃজাগরণ সম্বন্ধে ফ্রান্সের একটা স্বাভাবিক ভীতি আছে। কিন্তু মার্কিণ-রাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপের দরুণ, পশ্চিম-জার্ম্মেণীর পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থানে, ফরাসীরা এখন সম্মতি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বৈদেশিক ব্যাপারে, রাশিয়ার প্রতিপক্ষ ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রের সঙ্গে যোগদান করে ফ্রান্সের একত্রে চলতে হচ্ছে।

সুদূর প্রাচ্যে ফরাসীর যে সাম্রাজ্য আছে, তাতে বহুদিন ধরে ঘোরতর বিপ্লব চলছে। ইন্দোচীনে **ভিয়েৎনাম** রাষ্ট্রের আনামীরা স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্ব্বস্ব-পণ করেছে, অথচ তাদের স্বাধীনতা দিতে ফ্রান্স অনিচ্ছুক। আনামীদের নেতা ডাঃ হো সি মিন নতুন কম্যুনিষ্ট চীন-সরকারের সাহায্যপুষ্ট হয়ে, ভিয়েৎ-নামের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ফ্রান্স তাঁকে যুদ্ধে কাবু করবার জন্য, আমেরিকার সহায়তায় জোর চেষ্টা করছে কিন্তু সে বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না।

ভারতবর্ষে পাঁচটি ক্ষুদ্র স্থান ফরাসী অধিকারে ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে **চন্দননগর** ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। পণ্ডিচেরী প্রভৃতি অন্য চারিটি উপনিবেশের ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত। তবে পরিণামে তাদেরও যে ভারতের সঙ্গে মিশে যেতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় উপনিবেশসমূহের অভ্যন্তরে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

ফ্রান্সদেশে রাজনৈতিক দলাদলির অন্ত নাই। মন্ত্রিত্বের পরিবর্ত্তন লেগেই আছে। ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে শুধু ইন্দোচীন নয়, মরক্কো, টিউনিশিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলেও তীব্র গণবিক্ষোভ ও সংগ্রাম চলছে।

রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে আকারে সবচেয়ে প্রকাণ্ড দেশ। ইউরোপ এবং এশিয়া, এই দুইটি মহাদেশের অনেকখানি জায়গা, একা রাশিয়াই দখল করে রেখেছে। রাশিয়ার জনসংখ্যা সতের কোটি, কিন্তু এরা সবাই এক জাতির লোক নয়। ইংলণ্ডের সব লোক যেমন ইংরেজ, ফ্রান্সের যেমন ফরাসী, জার্মেণীর যেমন জার্মাণ, রাশিয়ার সব লোক তেমন রাশিয়ান নয়। এখানে রাশিয়ান ছাড়া পোল, ইহুদী, লেট, তাতার, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি অনেক জাতির লোক বাস করে। এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার যে অংশ অবস্থিত, তাকে বলে সাইবিরিয়া ; এখানে প্রায় সারাটি বছরই শীত থাকে, শীতকালে তো বরফে একেবারে সবটা দেশ ঢেকে যায়। ইউরোপে রাশিয়ার যে-অংশ আছে, সেখানেও প্রচণ্ড শীত পড়ে।

রাশিয়া ইউরোপীয় দেশ হলেও, বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তার পশ্চিম-ইউরোপের সভ্য দেশগুলির সঙ্গে কোন সংস্পর্শ ছিল না। রাশিয়া অনুন্নত, অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ দেশ ছিল।

উত্তরদেশীয় সুইডেনবাসী **রুরিক** নামক এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, দলবলসহ, প্রায় ৮৫০ খৃষ্টাব্দে, ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের সন্নিকটে, রাশিয়া-রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন। স্কানডিনেভিয় ঔপনিবেশিকদের 'রস্' নাম থেকে এই দেশের রাশিয়া নামের উৎপত্তি। উত্তর দেশাগত বিজেতাগণ,

ক্রমে বিজিত শ্লাভজাতিদের সঙ্গে, সভ্যতা ও রীতিনীতিতে এক হয়ে মিশে যায়। রুরিকের বংশধরগণ আশে-পাশের দেশ জয় করতে করতে, উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ শ্লাভ জাতিদের প্রায় সকলকে তাঁদের ক্রম-প্রসারমান রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন।

রুরিকের বংশের একজন নৃপতি **ভ্লাদিমির** যেমন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তেমনি আইন-প্রণেতা ছিলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে তিনি ইংলণ্ডের আলফ্রেড ও জার্ম্মেণীর অটো দি গ্রেটের ন্যায় বিখ্যাত হয়ে আছেন। ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ভ্লাদিমির

চেঙ্গিস খানের আক্রমণ

খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই রাশিয়া গ্রীক খৃষ্টধর্ম্ম পন্থার প্রধান সাহায্যকারী হয়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে, রাশিয়া রাজ্যের শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই গোলযোগ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, দুর্ব্বারগতি মোঙ্গলজাতি, চেঙ্গিস খান ও তাঁর বংশধরদের দুরন্ত নেতৃত্বে, পূর্ব্ব-ইউরোপ ও রাশিয়ায় ঘন ঘন হানা দিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে মোঙ্গলেরা মধ্য-এশিয়ায় বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শীঘ্রই রাশিয়া তাদের অধিকারে চলে যায়।

রাশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ, এর পর প্রায় আড়াইশো বছর পর্য্যন্ত, পশ্চিম মোঙ্গল-সাম্রাজ্যের অধিপতিকে বশ্যতা ও কর দান করেন। এই দুর্দ্দৈবের জন্য শ্লাভজাতিদের জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে বহু বিলম্ব হলো।

অবশেষে মোঙ্গল-সাম্রাজ্যে দুর্ব্বলতা দেখা দিলে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মস্কোর শক্তিশালী সামন্ত-জমিদার, **আইভান দি গ্রেট**, মোঙ্গলদিগকে করপ্রদানে অস্বীকার করেন। আইভানকেই রাশিয়ার প্রথম স্বাধীন নৃপতি বলা চলে। তাঁর পৌত্র, **আইভান দি টেরিবল** খুব নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। ইনিই প্রথম রাশিয়ার "জার" বা সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন।

মস্কোর রাজশক্তি স্বাধীন হলেও, এঁদের সময়ে শিক্ষা-দীক্ষা বা শাসন-প্রণালীর কোন উন্নতি হয় নাই। রাশিয়ার আইন-কানুন তখনও অনেকটা পুরাতন মোঙ্গল প্রথায়ই চলতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, পশ্চিম-ইউরোপে রাশিয়ার কোন নাম বা প্রতিপত্তি ছিল না।

আইভান দি টেরিবল

রোমানফ্-রাজবংশের, **পিটার দি গ্রেট** ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার জার হন। তাঁর সময় থেকেই রাশিয়া একটি প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইনিই সর্ব্বপ্রথম রাশিয়ার লোকদের ইউরোপীয় সভ্যতা শেখাবার চেষ্টা করেন। ইনি খুব বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন। ইনি স্থির করেন যে, পশ্চিম-ইউরোপের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করবেন এবং দেশের অশিক্ষিত কুসংস্কারপূর্ণ রীতি-নীতি রহিত করে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও রীতি-নীতি সমস্ত দেশে প্রবর্ত্তন করবেন। পিটার রাশিয়ার সমস্ত সনাতনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন।

রাশিয়ানদের মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা খুব কড়া রকমের ছিল, মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ বলে গণ্য হতো। রাশিয়ানরা লেখাপড়া শিখতে চাইতো না, দেশ ভ্রমণ করে জ্ঞান সঞ্চয় করাতেও তাদের মহা আপত্তি ছিল। তারা লম্বা লম্বা দাড়ি রাখতো, বেশভূষাও ছিল কদর্য্য।

পিটার এই সব কুপ্রথা দূর করে, রাশিয়ানদের সভ্য করবার দিকে মনোযোগ দিলেন। দাড়ি না কামালে তাঁর দরবারে কারও যোগ দেবার ক্ষমতা ছিল না। দেশের মধ্যে যাঁরা বড় বড় লোক বলে পরিচিত, পিটার তাঁদের দাড়ি কামাতে, দেশ ভ্রমণ করতে এবং লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করলেন। রাজ-

প্রাসাদে কোন উৎসব হলে তিনি তাতে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁর রাণী এই রকম একটি প্রকাশ্য উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে, পিটার রাণীকে ছোট একটা ঘরের মধ্যে অনেকদিন ধরে বন্ধ করে রেখে দেন।

পিটার দি গ্রেট ভয়ানক নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। কর্ত্তব্য বলে যা তিনি বুঝতেন, তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য তিনি কোন বাধাই মানতেন না। সমাজ-সংস্কার কাজে তাঁকে কেউ বাধা দিলে তিনি তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি খুব উদ্যমী ও উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতার জন্য প্রাশিয়া, হ্যানোভার, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছদ্মবেশে বেড়িয়েছিলেন। তিনি ঐ সব দেশে যে সকল উন্নত বিধান-প্রণালী লক্ষ্য করেছিলেন সেগুলি ব্যাপকভাবে রাশিয়ায় প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি রাশিয়ার পশ্চিমভাগে, বালটিক সাগরের নিকটে **পিটার্সবুর্গ** নগরে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগর যেন পশ্চিম-ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার বাতায়ন-পথ হলো। প্রাশিয়ার মত রাশিয়ায়ও, ফরাসীভাষা দরবারের ভাষা হলো।

বৈদেশিক নীতিতে পিটার, সুইডেনের ক্ষমতা খর্ব্ব করে, বালটিক অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করেন আর দক্ষিণে, তুরস্ক-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, বলকান অঞ্চলে অগ্রসর-নীতির সূত্রপাত করেন।

প্রথম শাসন-সংস্কার

পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে, রাশিয়ানরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করলো, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনও একটু একটু করে দেখা দিতে লাগলো। রাশিয়ার কৃষকেরা ছিল জমিদারদের দাস, এই দাস-প্রথা দূর করবার দাবী ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। রাজারা প্রজাদের এই সব দাবীতে কান দিতেন না। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। পিটারের মৃত্যুর কিছুকাল পর একজন নামজাদা জারিণা বা **সম্রাজ্ঞী** রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তাঁর নাম, **ক্যাথারিণ দি গ্রেট**।

ক্যাথারিণ ছিলেন জার্ম্মাণ মহিলা। তিনি যেমন সুদক্ষ, শক্তিমতী, তেমনি নিষ্ঠুর ও ক্রূর শাসক ছিলেন। ভার্সাই রাজদরবারের ফরাসী সংস্কৃতির অনুকরণে, তিনি তাঁর দরবারে সভ্যতার ও আদব-কায়দার প্রচলন করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি পিটারের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করতে

ব্রতী হয়েছিলেন। অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সহযোগে পোল্যাণ্ডকে বারবার বিভাগ করে, এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে, তিনি রাশিয়ার সাম্রাজ্য অনেক বেশী বাড়িয়ে তোলেন।

কিন্তু পিটার বা ক্যাথারিণের শক্তিশালী রাজত্বে কৃষকদের কোনই উপকার হলো না। ক্যাথারিণের পরবর্ত্তী জারদের আমলেও দেশের জনসাধারণের দাসত্ব কঠোরভাবেই চলতে লাগলো।

ক্যাথারিণের পর, জার **প্রথম আলেকজাণ্ডারের** রাজত্বকালে রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধ হয়। রাশিয়াতে "মস্কো অভিযানে" নেপোলিয়নের বাহিনীর বিরাট বিপর্য্যয় ঘটেছিল। রাশিয়ার সম্রাটদের, তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান-অঞ্চলে অগ্রসর-নীতির ফলে, **প্রাচ্য-সমস্যার** উদ্ভব হয় এবং এর থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** হয়। এই যুদ্ধে রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের কাছে হেরে যায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়ার লোকের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। তখন জার **দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার** দেশে কিছু কিছু সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন।

পিটার দি গ্রেট

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে কৃষকদের অবস্থারও একটু উন্নতি দেখা গেল। ইনি দাসপ্রথা তুলে দেন। দাসপ্রথা উঠে যাবার পর, রাশিয়ার কৃষকেরা সর্ব্বপ্রথম জমির ফসল নিজেদের ইচ্ছানুসারে ভোগ করবার অধিকার পেল।

জার আলেকজাণ্ডার প্রজাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল করে দিলেও, দেশশাসন ব্যাপারে তাদের হাত দিতে দেন নাই। জেলা-বোর্ড গঠন করে

গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি, স্কুল চালানো প্রভৃতি ক্ষমতা তাদের তিনি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেশের পার্লামেণ্ট গঠন করে, আইন তৈরির অধিকার, তিনি তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাতেই রাশিয়ার শাসন-কার্য্য চলতে লাগলো।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

চীনদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে মাঞ্চুরিয়া এবং তার দক্ষিণে কোরিয়া অবস্থিত। এই দুইটি জায়গার উপর রাশিয়ার যেমন নজর ছিল, জাপানেরও তেমনি ছিল।
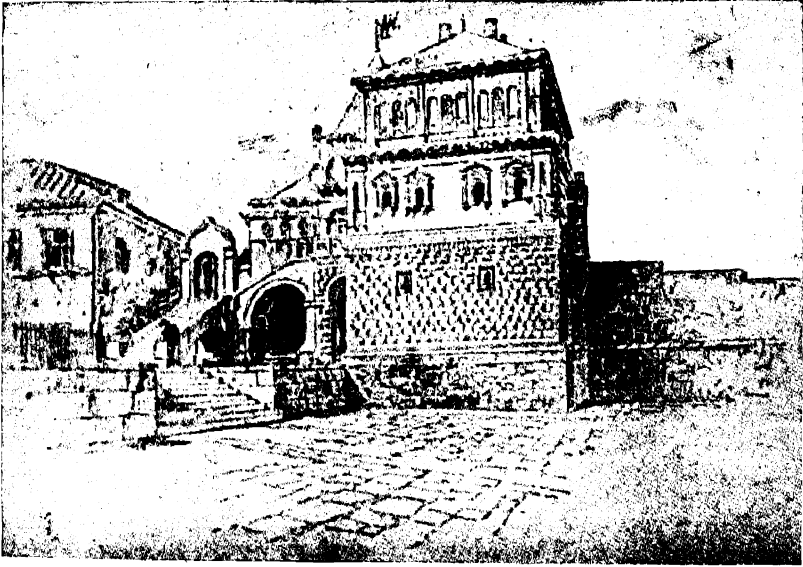
জারের প্রাসাদ

রাশিয়া এবং জাপান দু'পক্ষই, ঐ দুটি জায়গাকে নিজের অধীন আনবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। এই নিয়ে দুপক্ষে বিরোধ আরম্ভ হলো। এই বিরোধ ক্রমে চরমে উঠে দুই দেশে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯০৪ সালে এই **রুশ-জাপান যুদ্ধ** আরম্ভ হয়।

এশিয়ার কোন দেশ যে যুদ্ধে ইউরোপের কোন দেশকে পরাজিত করতে পারে, রুশ-জাপান যুদ্ধের আগে পৃথিবীতে কেউই তা বিশ্বাস করতো না। এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা বুঝতে পারে যে, এশিয়াকে আর তুচ্ছ করা চলবে না।
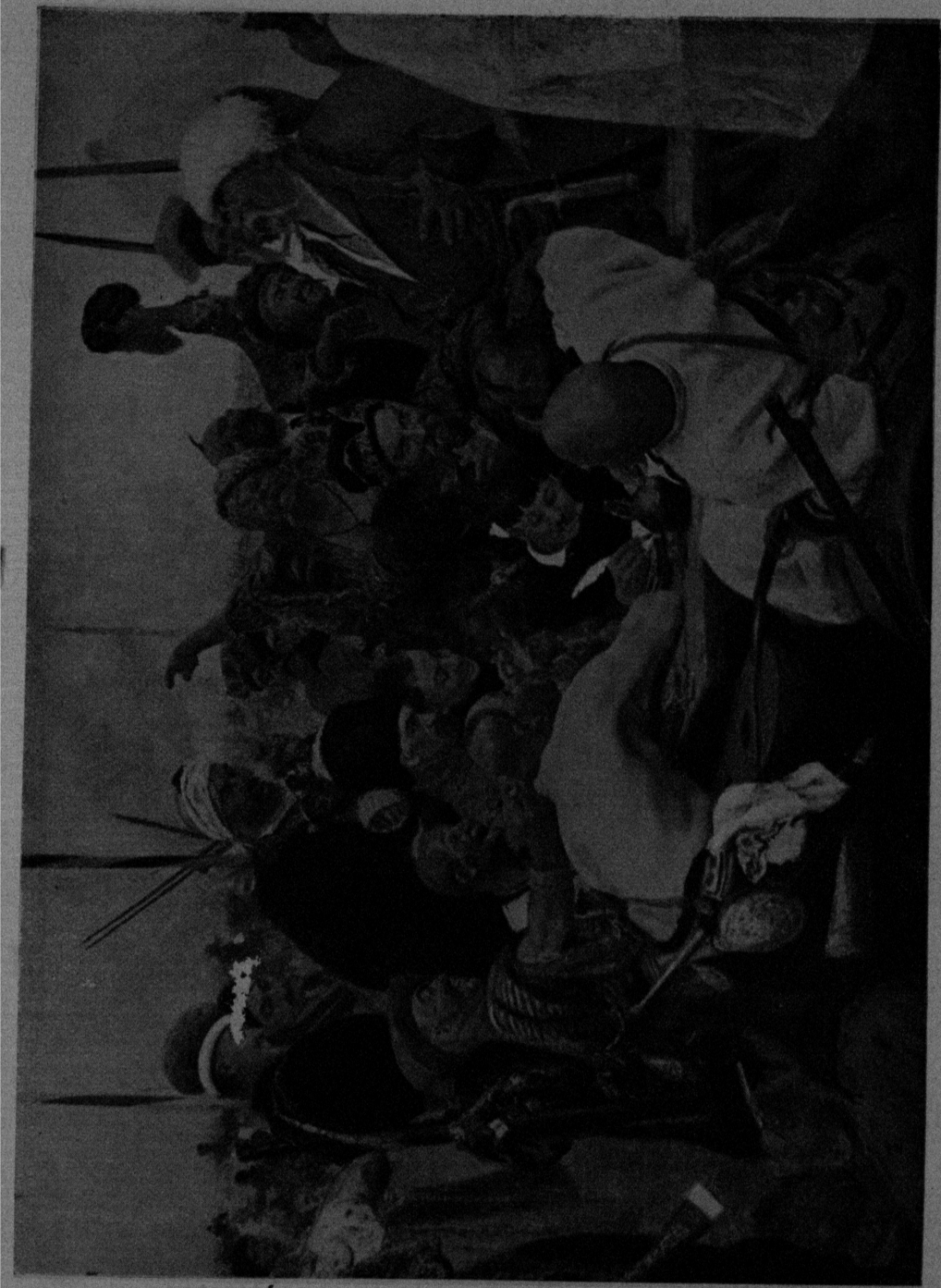
আইভান্ দি গ্রেট্ কর্ত্তৃক মোঙ্গলদের করপ্রদানে অস্বীকৃতি।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় মাঞ্চুরিয়ার বন্দর পোর্ট আর্থারে এবং সাইবিরিয়ার বন্দর ভ্লাডিভস্টকে, রাশিয়ার দুটো বড় বড় নৌবহর ছিল। এক একটা নৌবহরে অনেকগুলো করে যুদ্ধ-জাহাজ থাকে। জাপান পোর্ট আর্থার বন্দরের চারটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল এবং অন্যগুলোকে এমন ভাবে সেখানে কোণঠাসা করে রেখে দিল যে, তাদের আর ঘাঁটি ছেড়ে বেরোবার উপায় রইলো না। ভ্লাডিভস্টকের জাহাজগুলোকেও জাপান হারিয়ে দিল। ওদিকে স্থলযুদ্ধেও জাপানী সৈন্যেরা রাশিয়ানদের ঠেলে পিছনে হটিয়ে নিয়ে চললো।

জাপানী **জেনারেল নোগি** পোর্ট আর্থার বন্দর ঘিরে ফেললেন রাশিয়ান **জেনারেল কুরোপাটকিন** পোর্ট আর্থার, জাপানীদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। সাত মাস অবরোধের পর, পোর্ট আর্থার দুর্গের রাশিয়ান সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করেছিল।

রাশিয়ান রমণীদের পুরাণ যুগের পোষাক

রাশিয়ানরা জাপানীদের কাছে জলে এবং স্থলে দুইরকম যুদ্ধেই হারতে লাগলো। দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রাশিয়ার জার। তিনি বাল্টিক সমুদ্র থেকে অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ভ্লাডিভস্টকের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। জাপানী সেনাপতি **এডমিরাল টোগো** এই সংবাদ পেয়ে তাদের আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

বাল্টিক সমুদ্র থেকে জাহাজ আসতে হলে, তাদের ইউরোপ ঘুরে, ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। কাজেই টোগো প্রস্তুত হবার অনেক সময় পেলেন। অবশেষে, এই নৌবহর জাপানের কাছাকাছি এসে পৌঁছাবার পর, টোগো রাশিয়ার বাইশটি জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন এবং ছয়টিকে দখল করলেন। রাশিয়া এই পরাজয়ে দস্তুরমত দমে গেল। দেশেও নানা রকম অশান্তি দেখা দিল।

থিওডোর রুজভেল্ট তখন আমেরিকার সভাপতি। ইনি আমেরিকার পরবর্ত্তী সভাপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পিতামহ। রুজভেল্ট রাশিয়ার জার এবং জাপানের মিকাডো দুজনকেই সন্ধি করবার জন্য অনুরোধ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে পিটার দি গ্রেট

তাঁরা দুজনেই সে অনুরোধ রক্ষা করে সন্ধি করলেন। সেদিন থেকে পৃথিবীর সব দেশ বুঝে নিল যে, জাপানকে ছোট্ট দ্বীপ বলে আর অবহেলা করা চলবে না।

১৯০৫ সালের বিপ্লব

রাশিয়ায় **নিহিলিষ্ট দল** নামে একটি শক্তিমান বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। জারের অনেক কর্ম্মচারী এদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এমন কি, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে, এই নিহিলিষ্ট দলেরই বোমার আঘাতে প্রাণ-ত্যাগ করতে হয়েছিল। নিহিলিষ্ট দলের উদ্দেশ্য ছিল, জারের রাজত্বের উচ্ছেদ করে, দেশে প্রজাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর, এই দলের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার চলতে আরম্ভ করে যে, এরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

রাশিয়ায় **সমাজতান্ত্রিক দল** নামে আরও একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের হাত থেকে

রাশিয়ান বিবাহ-উৎসব (সপ্তম শতাব্দী)

দেশ শাসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। দেশের কোন লোক খুব বড় ধনী হতে পারবে না, একজন লোকও গরীব থাকবে না, সকলেই উপার্জ্জন করবার, লেখাপড়া শেখবার এবং সুখে-শান্তিতে বাস করার সুযোগ পাবে, এই ছিল এদের লক্ষ্য। দেশের ও সমাজের সব লোকের সুবিধা-অসুবিধার কথা এরা চিন্তা করতো বলে এদের বলতো সমাজতন্ত্রবাদী, আর এদের দলের নাম হলো সমাজতান্ত্রিক দল।

নিজেদের এইসব মতবাদ প্রচার আরম্ভ করতেই, জার এই দলকে কঠোর ভাবে দমন করবার হুকুম দিলেন। রাশিয়ার পুলিশ বড় সাংঘাতিক ছিল; এদের ভয়ে দেশের লোক সন্ত্রস্ত থাকতো। সমাজতন্ত্রবাদীরা সভা করতে পারতো না, বক্তৃতা দিতে পারতো না, এমন কি পুস্তিকা ছাপিয়ে যে বিলি করবে তারও উপায় ছিল না। পুলিশ একবার টের পেলেই তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিত। বিচারের বালাইও বড় একটা ছিল না।

এতেও কিন্তু এরা দমলো না। গোপনে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে সভা হতে লাগলো। গুপ্ত ছাপাখানায় পুস্তিকা প্রভৃতি ছাপিয়ে, গোপনে সে-সব বিলি করাও চলতে থাকলো। দু-চারজন যারা ধরা পড়ে যেত, তাদের আর কোন অব্যাহতি ছিল না; হয় ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হতো, না হলে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনে যেতে হতো।

জারিণা ক্যাথারিণ দি গ্রেট

এই সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ছিলেন তিন জন—সব চেয়ে বড় নেতা **লেনিন**। তাঁর পরে ছিলেন **ট্রটস্কী** এবং **ষ্টালিন**। লেনিন একবার ধরা পড়ে তিন বছরের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হলেন। সেখান থেকে তিনি রাশিয়ার বাইরে চলে গেলেন, কারণ তাঁর আবার ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল। ট্রটস্কীর বয়স যখন মাত্র আঠারো বৎসর, তখন ওডেসা নামক সহরে একটা শ্রমিক দল গঠনের অভিযোগে, তাঁকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ষ্টালিনের প্রায় বারোবার জেল হয় এবং বারোবারই তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান। অবশেষে তাঁকে চার বছরের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়।

১৯০৫ সালে এই তিনজনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় একটা বড় রকমের বিপ্লব হয়। দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রাশিয়ার জার। ট্রটস্কী শ্রমিকদের সাহায্যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সহর দখল করলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পরে নাম হয় পেট্রোগ্রাড, আবার এই পেট্রোগ্রাডেরই আজকাল নাম হয়েছে লেনিনগ্রাড। বর্ত্তমান রাশিয়ার রাজধানী হলো মস্কো, তখন রাজধানী ছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ। শ্রমিকরা মস্কো সহরটিকেও দখল করবার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হলো না।

এই সব বিদ্রোহে ক্ষেপে উঠে জার ভীষণ অত্যাচার সুরু করে দিলেন।

নেপোলিয়নের মস্কো হতে প্রত্যাবর্ত্তন

বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। ১৯০৫ সালের এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বিপ্লবই **প্রথম বলশেভিক বিপ্লব** বলে পরিচিত।

এই বিপ্লবের দু'বছর আগে, সমাজতান্ত্রিক দলে দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদলে বেশী লোক ছিল, আর একদলে ছিল কম লোক। যে দলে বেশী লোক ছিল, তাকে বলা হতো **'বলশেভিক'** অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের দল, আর যে দলে কম লোক ছিল, তার নাম হলো **'মেনশেভিক'**। মেনশেভিক কথার মানে অল্পসংখ্যক লোক। এই বলশেভিক দলেরই নেতা ছিলেন লেনিন।

১৯০৫ সালের ২২শে জানুয়ারী, রবিবার, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে একটা ভীষণ

ঘটনা ঘটে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর দেশের চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল; গরীব লোকদের আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য, **পাদ্রী গ্যাপন** নামক একজন ধর্ম্মযাজক, কয়েক হাজার লোক নিয়ে শোভাযাত্রা করে, জার নিকোলাসের কাছে দেশের দুঃখ জানাবার জন্য যান। এই শোভাযাত্রীদের মধ্যে পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকা সব রকম লোকই ছিল। তাদের কারও হাতে কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না।

এই শোভাযাত্রা জারের প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছবামাত্র, কসাক সৈন্যেরা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

তাদের চাবুক মেরে ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করে। লোকেরা সেই মার খেয়েও সেখান থেকে যখন নড়লো না, তখন তাদের উপর নিষ্ঠুর ভাবে গুলি চললো। শত শত লোক মারা গেল, হাজার হাজার লোক আহত হলো, সমস্ত রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেল। এই ভয়াবহ কাণ্ডের পর বিপ্লবী দল আরও ক্ষেপে গেল! চারিদিকে সুরু হলো ধর্ম্মঘট।

ডুমা গঠন

জার দেখলেন মহা বিপদ। এই প্রবল অসন্তোষ এবং বিপ্লব শান্ত করতে হলে দেশের প্রজাদের রাজনৈতিক দাবী অন্ততঃ খানিকটা মেনে নিতেই হবে। ১৯০৫ সালে জার ঘোষণা করলেন যে, একটি রাশিয়ান পার্লামেন্ট গঠিত হবে, তাকে বলা হবে **ডুমা**।

বৃটিশ পার্লামেন্টের মত রাশিয়ান ডুমাতেও দুইটি সভা থাকবে। তার একটিতে দেশের বড়লোক, জমিদার প্রভৃতির প্রতিনিধিরা থাকবেন, আর একটিতে থাকবেন দেশের প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দল। দেশের সামরিক এবং বৈদেশিক বিভাগের উপর ডুমার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না। দেশের সাধারণ সব আইন পাশ করবার সময় জার এই ডুমার সম্মতি গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই বন্দোবস্ত সফল হলো না, প্রজা এবং রাজা দুজনেরই দোষে। এত বেশী ক্ষমতা হঠাৎ হাতে পেয়ে প্রজাদের মাথা গোলমাল হবার উপক্রম হলো, জার নিজেও প্রজাদের বিশ্বাস করতে পারলেন না।

প্রজাদের মধ্যে নানা দল হয়ে গেল। একদল এই শাসন-সংস্কারকেও ভুয়া বলে ক্ষেপে উঠলো। তারা দাবী করলো যে, জারের যাঁরা মন্ত্রী থাকবেন তাঁদের সব কাজের জন্য ডুমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সব কথা ডুমার সদস্যদের জানাতে হবে। তা ছাড়া, এরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করলো। নিহিলিষ্ট-দলের হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা তখন কারাগারে বন্দী ছিলেন। জার এই দুইটি দাবীর একটিও মেনে নিতে রাজী হলেন না। দুইটি অধিবেশনের পরই এই ডুমা ভেঙ্গে গেল।

জার ভাবলেন যে প্রজাদের হাতে এত বেশী ক্ষমতা দিলেই গোলযোগ হবে। তাই তিনি আবার নতুন আইন জারী করে, আর একটা ডুমা গঠন করলেন। এই ডুমার ক্ষমতা আগেকার চাইতে তিনি অনেক কমিয়ে দিলেন। এমন ভাবে তিনি ডুমা গঠনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন যে, সেটা যেন দেশের সাধারণ প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে না পড়ে, জমিদার এবং বড়লোকদের মুঠোর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে।

১৯০৭ সালে তৃতীয় ডুমা গঠিত হলো। পাঁচ বছর পর আবার সেই নিয়মেই চতুর্থ ডুমার অধিবেশন হলো। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত, এইভাবেই রাশিয়ার শাসনকার্য্য চলতে লাগলো।

১৯১৭ সালের বিপ্লব

১৯১৪ সালে ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়ে গেল, রাশিয়া তখন দূরে থাকতে পারলো না। সে এসে যোগ দিল ইংরেজের পক্ষে। জার্ম্মেণী রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তাকে যখন প্রায় কাবু করে ফেলবার উপক্রম করলো, রাশিয়ানদের মধ্যে তখন ভীষণ অসন্তোষ দেখা দিল।

১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে, সেন্ট পিটার্সবুর্গে এক **বিরাট ধর্ম্মঘট** হলো, তিন দিনের মধ্যে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা আড়াই লক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। ধর্ম্মঘটীরা রাজধানীর পথে পথে শোভাযাত্রা করে বেড়াতে লাগলো। জার এদের সায়েস্তা করবার জন্য রাশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ কশাক-সৈন্য পাঠালেন। জারের অধীনে সৈন্যদের খাটুনী ছিল অনেক বেশী, তা ছাড়া মাইনেও তারা রীতিমত পেত না। সৈন্যেরা জারের বিরুদ্ধে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল, তারা উল্টে ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গেই এসে যোগ দিল। জার আরও সৈন্য পাঠালেন, তারাও এসে ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে একত্র হয়ে, দেশের থানাগুলো দখল করতে লাগলো।

জার নিকোলাস তখন রাজধানীর বাইরে ছিলেন, তিনি নিজে রাজধানীতে ফিরে এসে দেখলেন, সহরে ঢোকবার উপায় নাই। ধর্ম্মঘটী বিদ্রোহীরা সমস্ত পথ-ঘাট, রেল-ষ্টেশন প্রভৃতি আগলে রয়েছে। জারের গবর্ণমেণ্ট অচল হয়ে উঠলো।

রাশিয়ায় তখন যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁরা এত বড় বিপ্লব সামলাতে পারলেন না। দেশের নেতৃত্ব গিয়ে পড়তে লাগলো মেনশেভিকদের হাতে। মেনশেভিকরা ছিলেন বড়লোক, বিপ্লব তাঁরা চাইতেন না। কাজেই বিপ্লবের নেতৃত্ব তাঁদের হাতে পড়বার মানে হচ্ছে বিপ্লবের অবসান।

লেনিন তখন সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক সহরে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তিনি এই খবর পেয়ে রাশিয়ায় রওনা হলেন। সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবীরা তাঁকে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো! উপযুক্ত নেতার অভাবে তাদের সব কাজ, সমস্ত স্বার্থত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিলো। দেশের সমাজতন্ত্রবাদী-দের প্রবল শত্রু ছিল যে-সব মেনশেভিক ধনী ও জমিদার, গবর্ণমেণ্ট তখন

তাদের হাতের মধ্যে চলে গিয়েছে। **কেরেনস্কী** নামক একজন বড় উকিল ও বাগ্মী এই গবর্ণমেণ্টের নেতা হয়ে বসলেন।

লেনিন এই সব ব্যাপার দেখে, সকলের আগে, নিজের দল গুছিয়ে নিলেন। অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, বোমা এবং লোকজন জোগাড় করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। অবশেষে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর, ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর, আসল **বলশেভিক বিপ্লব** আরম্ভ হলো। একদিনের মধ্যেই রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গ তাঁরা দখল করে নিলেন।

কেরেনস্কী

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা রাশিয়ার বিখ্যাত পিটার ও পল দুর্গের সৈন্যেরা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিল। লেনিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য যে সৈন্যদল পাঠান হয়েছিল, তারাই উল্টে বিপ্লবীদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী হলো। রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যাবেলা কেরেনস্কী-মন্ত্রিসভার বৈঠক চলেছে। শুধু এই প্রাসাদটিই তখন বিপ্লবীদের হাতে আসা বাকী ছিল।

রাত্রিবেলাই তারা প্রাসাদ ঘিরে ফেললো। তারপর পিছন দিকের একটা দরজা খোলা পেয়েই, হুড়মুড় করে হাজার হাজার লোক প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পড়লো। মন্ত্রীরা কে কোথায় যে পলায়ন করলেন, তার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না! সেই রাত্রির মধ্যে, রাজধানীর একটা জায়গাও আর বিপ্লবীদের হাতে আসা বাকী রইলো না। প্রায় বিনা রক্তপাতেই এত বড় বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

বিপ্লব শুধু রাজধানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না; মস্কো এবং অন্যান্য সহরেও ছড়িয়ে পড়লো। মস্কোতে জারের সৈন্যেরা বিপ্লবীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারলো না। বিপ্লবীরা একে একে রাশিয়ার সমস্ত সহর দখল করে নিল।

লেনিন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, দেশের সমস্ত জমি হচ্ছে কৃষকদের। কাজেই কৃষকেরা জমিদার-বাড়ী সব লুঠপাট করে, গ্রামের

সমস্ত জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। কৃষকদের এইভাবে তুষ্ট করা যতটা সহজ হলো, সহরের শ্রমিকদের বেলায় কিন্তু তা হলো না। যুদ্ধের জন্য সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে গিয়েছে, খাবার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। বিপ্লবীরা অনেক চেষ্টা করে খাবার জিনিষ এবং কাপড়-চোপড় প্রভৃতি শ্রমিকদের দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন।

এবার লেনিন যুদ্ধ বন্ধ করবার দিকে মন দিলেন। জার্ম্মেণীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যে তিনি পাঠিয়ে দিলেন **ট্রটস্কীকে।** রাশিয়ায় ব্রেষ্ট-লিটভ্স্ক নামে একটা সহর ছিল, সেখানে জার্ম্মেণীর কয়েকজন সেনাপতির সঙ্গে ট্রটস্কী দেখা করলেন। রাশিয়াকে কায়দায় পেয়ে, জার্ম্মেণী এমন সব কড়া কড়া সর্ত্তের কথা তুললো যে, বলশেভিকরা সে সব শুনে দস্তুরমত চটে গেল। লেনিন কিন্তু ট্রটস্কীকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন যে-কোন সর্ত্তে, সন্ধিপত্রে সই করে আসেন। লেনিন জানতেন যে, জার্ম্মেণী যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, যুদ্ধের শেষে, সন্ধির সর্ত্ত মানতে রাশিয়াকে বাধ্য করবার ক্ষমতা তার থাকবে না। অথচ যুদ্ধ বন্ধ করে, দেশে শান্তি স্থাপনের দিকে মন দেওয়া রাশিয়ার পক্ষে একান্ত দরকার।

জার্ম্মেণীর সঙ্গে রাশিয়া সন্ধি করার পর, ইংরেজ ও ফরাসীরা গেল তার উপর ভীষণ চটে। রাশিয়ানরা এতদিন ইংরেজ ও ফরাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করে এসেছে; এখন তারা হঠাৎ সরে দাঁড়ালে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে, জার্ম্মেণীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বলশেভিকদের শক্তি-প্রতিষ্ঠাও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সহ্য করতে পারছিল না। এইজন্য তারা রাশিয়ার মধ্যে একদলকে হাত করে, তাদের দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে **গৃহযুদ্ধ** বাধিয়ে দিল।

ট্রটস্কী চার লক্ষ লাল-ফৌজ নিয়ে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। এই যুদ্ধে ট্রটস্কীই জয়লাভ করলেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর রাশিয়ায় যে গোলযোগ চলছিল, তার অবসান হলো ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে। সমাজতন্ত্রবাদী বলশেভিকদল সম্পূর্ণরূপে জয়ী হলো।

একদল বলশেভিক ঠিক করেছিল যে, ভবিষ্যতে কোনদিন যাতে জার-বংশের কোন লোক এসে রাশিয়ার সিংহাসন দাবী করতে না পারে, তার ব্যবস্থা তারা করবে। এই উদ্দেশ্যে, বিপ্লবের গোলমালের মধ্যেই, তারা জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সপরিবারে ও সবংশে গুলি করে **হত্যা করেছিল।**

বর্ত্তমান রাশিয়া

বিপ্লবের অবসানের পর, রাশিয়ায় এক নতুন ধরণের গবর্ণমেণ্ট গঠিত হলো, লেনিন হলেন তার প্রধান নেতা। এই গবর্ণমেণ্টের নাম হলো **সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট**। এদের মূলনীতি হলো এই যে, দেশে বড়লোক বা গরীবলোক একজনও থাকতে পারবে না, কোন লোক পৈতৃক সম্পত্তির উপর বসে খেতে পাবে না, সবাইকে খেটে খেতে হবে। কৃষকদের এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে, সহরে সহরে এক-একটি সমিতি গঠিত হলো, তার নাম হলো **সোভিয়েট**। কৃষকদের সোভিয়েট আর শ্রমিকদের সোভিয়েট আলাদা। এই সব সোভিয়েটের প্রতিনিধি-দ্বারা রাশিয়ার গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় বলে তার নাম সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট।
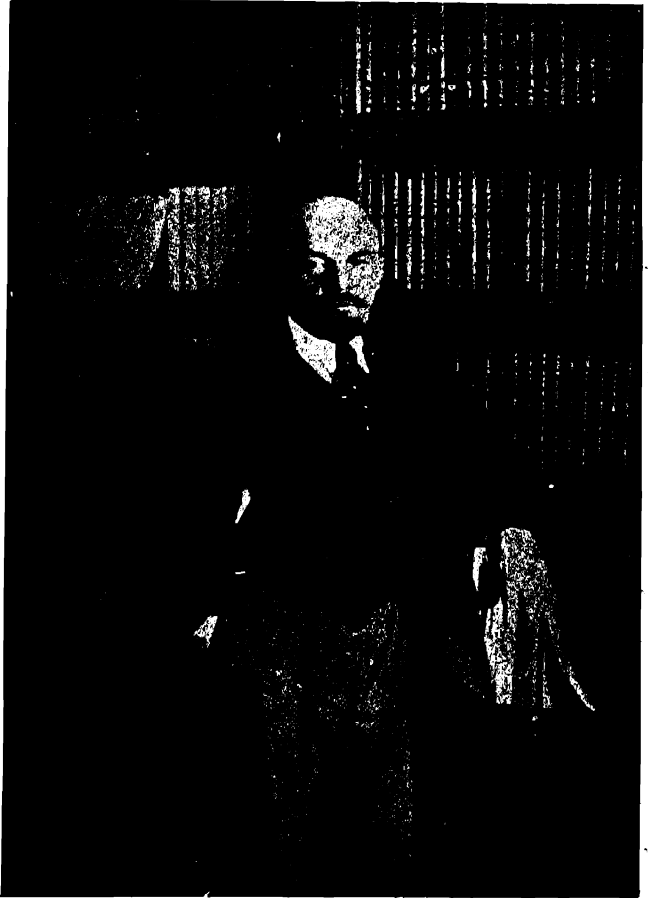
লেনিন

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে **লেনিনের মৃত্যু** হলো। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত বিপ্লবী নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের নামের সঙ্গে লেনিনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৮৭০ সালের ৯ই এপ্রিল, রাশিয়ার এক ভদ্র পরিবারে লেনিনের জন্ম হয়। লেনিন তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম হচ্ছে **ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ**।

লেনিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে

হত্যা করবার এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। লেনিনের দাদা এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। এই ঘটনায় লেনিনের মন জারের গবর্ণমেন্টের উপর বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তিনি এসে বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

একুশ বছর বয়সে আইন পাশ করে তিনি ওকালতি আরম্ভ করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর উপর জারের পুলিসের কড়া নজর পড়লো। সাতাশ বছর বয়সে তিনি, তিন বৎসরের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হলেন। সাইবিরিয়া থেকে মুক্তিলাভ করেই তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন এবং ১৯১৭ সালের বিপ্লব পর্য্যন্ত, অধিকাংশ সময় সেখানেই রইলেন। মাঝ-খানে একবার ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়, কিছু দিনের জন্য, তিনি রাশিয়ায় পদার্পণ করেছিলেন।

লেনিন **'ইস্ক্রা'** নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা বার করতেন, এই পত্রিকা রাশিয়ার বিপ্লবীদের নতুন পথের সন্ধান দিত। 'ইস্ক্রা' রাশিয়ান শব্দ, এর মানে হচ্ছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ। লেনিন অনেক বই লিখে গিয়েছেন। সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে এই সব বই আমাদের গীতার মত পবিত্র ও শিক্ষাপূর্ণ বলা চলে।

অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য লেনিনকে সবাই শ্রদ্ধা করতো, কিন্তু তবুও তাঁর শত্রু ছিল। ১৯১৮ সালে এই রকম একজন তাঁকে গুলি করে, গুলিটা তাঁর ঘাড়ে লাগে। তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠতে পারলেন না। তবুও এই অসুস্থ দেহ নিয়েই, তিনি আরও ছয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯২৩ সালে তাঁর শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত হয়ে কথা বলবার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। পর বৎসর ২১শে জানুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করে চলে যান।

লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর স্থান কে গ্রহণ করবে তাই নিয়ে গোলযোগ পাকিয়ে উঠতে লাগলো। লেনিনের পর আর চারজন নেতাকে দেশের লোক চিনতো,—তাঁদের নাম **ট্রটস্কী, ষ্টালিন, জিনোভিফ** এবং **কামেনেভ**। এঁদের মধ্যে ট্রটস্কী ছিলেন খাঁটি বিপ্লবী এবং স্পষ্টবক্তা লোক। তাঁর মত ছিল এই যে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিপ্লব না বাঁধাতে পারলে, ধনীদের অত্যাচার থেকে কৃষক এবং শ্রমিকেরা মুক্তিলাভ করতে পারবে না।

ষ্টালিন, জিনোভিফ এবং কামেনেভ, এই তিন জনের মত ছিল অন্য রকম। তাঁদের ধারণা ছিল যে, আগে নিজেদের দেশটিকে ভাল করে গুছিয়ে নিয়ে শক্তিসঞ্চয় করতে না পারলে, পৃথিবীর অন্য সব দেশে বিপ্লব বাঁধান সম্ভব নয়।

লেনিনের মৃত্যুর সময় ট্রটস্কী অসুস্থ ছিলেন। এই সুযোগে জিনোভিফ, কামেনেভ এবং ষ্টালিন গবর্ণমেণ্ট দখল করে বসলেন।

এই তিন জনের মধ্যে ষ্টালিন ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কল-কৌশল ও বিচক্ষণতার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে, জিনোভিফ এবং কামেনেভকে পিছনে ফেলে দিলেন। তারপর তিনি ট্রটস্কীকে দল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ট্রটস্কী বুঝলেন যে রাশিয়ায় আর থাকা চলে না, তা হলে হয়ত কোনদিন ষ্টালিনের লোকের হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হবে।

রাশিয়ায় এক মধ্যবিত্ত ইহুদী-পরিবারে ট্রটস্কীর জন্ম হয়। ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি বিপ্লবী দলে জড়িয়ে পড়েন এবং সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। ট্রটস্কী তাঁর ছদ্মনাম, তাঁর আসল নাম **লিওন ডেভিডোভিচ ব্রনষ্টিন**। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনে থাকবার সময় তিনি লুকিয়ে, লেনিনের সম্পাদিত কাগজ 'ইস্ক্রা' আনিয়ে পড়তেন। তিন বছর সাইবিরিয়ায় কাটাবার পর ট্রটস্কী এই ছদ্মনামে, একটা **ভুয়া ছাড়পত্র** যোগাড় করে তিনি ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় ট্রটস্কী।

লিওন ট্রটস্কী

১৯০৫ সালের বিপ্লবে তিনি এসে যোগ দেন, এবং ধরা পড়ে আবার সাইবিরিয়ায় **নির্ব্বাসিত** হন। সাইবিরিয়ায় পৌঁছানোর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবার পলায়ন করলেন। এবার তিনি গেলেন ভিয়েনায়। সেখান থেকে তিনি জার্ম্মেণী এবং রাশিয়ার বড় বড় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে টাকা রোজগার করতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে অনেকবার বিপদে পড়তে হয়েছিল। জার্ম্মেণীতে তিনি আট মাস জেল খাটলেন; ফ্রান্স থেকেও নির্ব্বাসিত হলেন। তারপর তিনি গেলেন আমেরিকায়, সেখানে তাঁকে ভয়ানক **অর্থকষ্টে** দিন কাটাতে

হয়েছিল। ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে তিনি রাশিয়ায় রওনা হলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করলো, কিন্তু পরে ছেড়ে দিল।

১৯১৭ সালের বিপ্লবে লেনিনের সহকারীরূপে ট্রটস্কী অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ট্রটস্কীর বক্তৃতা আরম্ভ হলেই হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শুনতো। সংগঠন-ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল, তাঁর হাতে-গড়া লাল-ফৌজ রাশিয়ায় যে বীরত্ব দেখিয়েছে, সচরাচর তা অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না।

লেনিনের মৃত্যুর পর, তাঁর ভাগ্য-বিপর্য্যয় আরম্ভ হলো। ষ্টালিন তাঁকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবার পর, সপরিবারে তিনি দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোন দেশই তাঁকে বেশীদিনের জন্য স্থান দিতে সাহস পেত না। প্রাণের ভয়ে তাঁকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হতো। অবশেষে মেক্সিকো দেশে তিনি আশ্রয় পেলেন; কিন্তু গুপ্তঘাতকের দল তাঁকে সেখানেও অনুসরণ করে গেল। ১৯৪০ সালে, একদিন এক যুবক তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার ছলে, তাঁর ঘরে ঢুকে অতর্কিতে **হাতুড়ির আঘাতে** ট্রটস্কীকে **হত্যা** করে।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত রাশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা ষ্টালিন হচ্ছেন জর্জ্জিয়া প্রদেশের এক মুচির ছেলে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। অল্প বয়সেই তিনি লেনিনের অনুরক্ত হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ষ্টালিন কথা বলতেন খুব কম। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি লেনিনের প্রতিটি আদেশ পালন করতেন। লেনিন এবং ট্রটস্কী যেমন ছদ্মনাম, ষ্টালিনও তেমনি তাঁর আসল নাম নয়। ষ্টালিন অর্থ হচ্ছে 'ইস্পাতের তৈরী মানুষ'। লেনিনই নিজে এই নামটি তাঁকে দিয়েছিলেন। ষ্টালিনের আসল নাম, **যোসিফ ভিসারিওনোভিচ্ জুগসিভিলি**। ষ্টালিনের কাজ করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। রাশিয়ার গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর হাতের ভিতর ছিল। ষ্টালিন রাশিয়ার কলকারখানা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নতির জন্য এবং দেশের লোকের অবস্থা ভাল করবার জন্য কয়েকটি **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** করেন।

১৯২৮ সালে, এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। এই অনুসারে যে-সব কাজ করবার কথা ছিল, চার বৎসরের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। এর পরে ষ্টালিনের নির্দ্দেশে, আবার একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরী করা হয় এবং এতে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাও সফল হয়।

এই সব পরিকল্পনা অনুসারে এবং আরও নানাভাবে ষ্টালিন রাশিয়ার

লোকদের এত কাজ দিয়েছেন যে, সেখানে আজ একজন লোকও **বেকার বসে নেই।** রাশিয়ার প্রত্যেকটি লোক কাজ পায়, খেতে পায় এবং লেখা-

ষ্টালিন
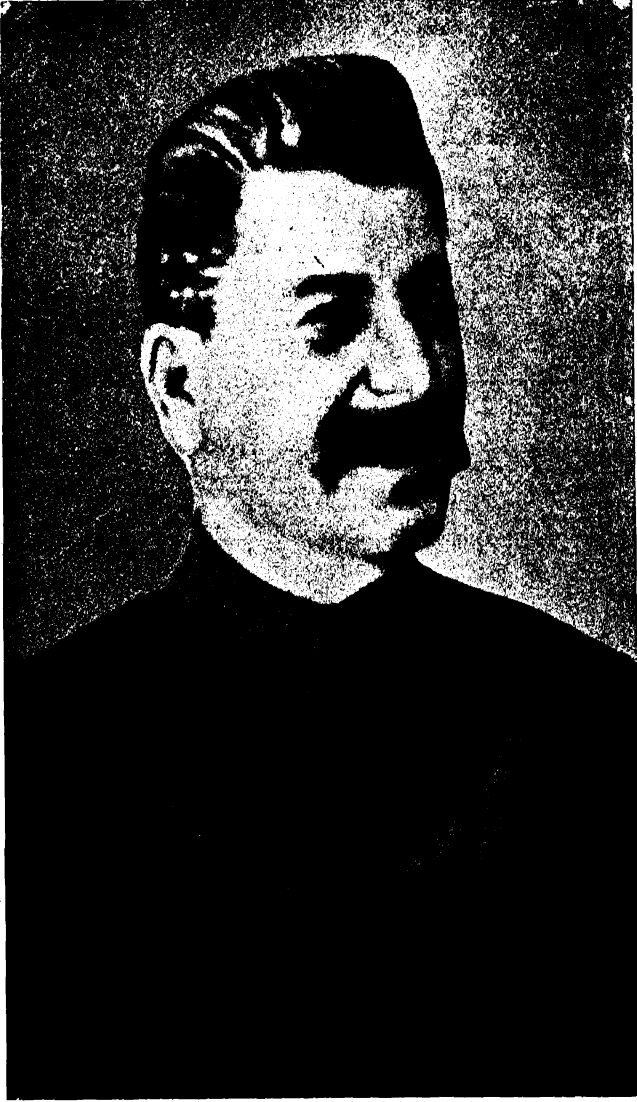
পড়া শেখবার সুযোগ পায়। মার্শাল ষ্টালিন দীর্ঘকাল রাশিয়ার কর্ণধার থেকে ১৯৫৩, ৫ই মার্চ্চ তারিখে দেহত্যাগ করেছেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সংগঠনে তিনি যে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বিপ্লবীরূপে ষ্টালিনের তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তাঁর নীতি ও প্রেরণার বলেই রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে গৌরবের সঙ্গে বিজয়ী হতে পেরেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট, ষ্টালিন ও হিটলার এক **অনাক্রমণ-সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ** হন। এই সন্ধিপত্রে জার্ম্মেণীর পক্ষ থেকে রিবেনট্রপ সই করেন, রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটভ। হিটলার ভেবেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর এই মৈত্রীচুক্তির ফলে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভয়ানক ভয় পেয়ে যাবে এবং তাঁর দিগ্বিজয়ে বাধা দিতে সাহস করবে না। বস্তুতঃ কিন্তু সে-রকম কিছুই ঘটলো না। ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করলো।

হিটলার **পোলাণ্ড আক্রমণ** করার সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টালিন বলতে সুরু

স্কি-পরিহিত রুশ পদাতিক সৈন্য

করলেন যে, পোলাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সুতরাং পোলাণ্ডের সীমানার মধ্যে অবস্থিত রাশিয়ানদের রক্ষার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য। শীঘ্রই লাটভিয়া-সীমান্ত পার হয়ে, রাশিয়ান সেনা প্রবেশ করলো পোলাণ্ডে।

তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পোলাণ্ড বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকলো—একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে জার্ম্মেণীর সঙ্গে। কিন্তু এ ভাবে দুটি পরাক্রান্ত দেশের সঙ্গে, দীর্ঘদিন লড়াই করা পোলাণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে পোলাণ্ডের রাজধানী **ওয়ার্স'র পতন** হলো।
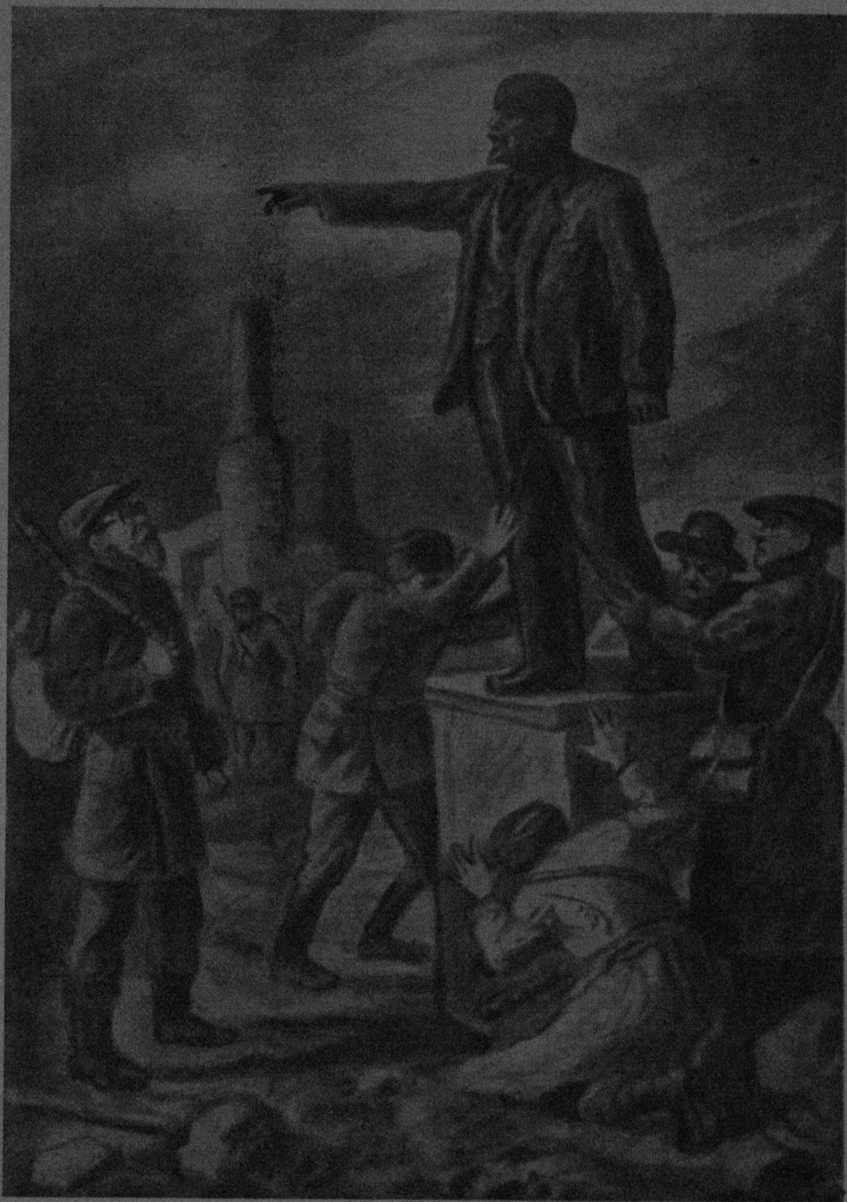
নব্য রাশিয়ার স্রষ্টা লেনিনের প্রস্তরমূর্ত্তি—বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণ সৈন্যগণ বহু চেষ্টা ক'রেও রুশ গেরিলা-বাহিনীর বাধার ফলে এ মূর্ত্তি ভাঙতে পারেনি।

বেইলীষ্টক নগরে সমবেত হয়ে জার্ম্মাণ ও রাশিয়ান সমর-নায়কেরা, নিজেদের ভিতর ভাগ করে নিলেন দুর্ভাগ্য পোলাণ্ডকে।

অতঃপর ষ্টালিনের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো **ফিনল্যাণ্ডের দিকে।** এই ক্ষুদ্র দেশটি পূর্ব্বে রাশিয়ারই অধীন ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ-কালে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এ স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে এক শক্তিশালী সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাশিয়া ১৯৩৯ সালের অক্টোবরের প্রথমেই, এর কাছে কতকগুলি দাবী করে পাঠালো।

কিন্তু ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার এত দাবী মানতে রাজী হলো না। অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই, ৩০শে নবেম্বর তারিখে, রাশিয়ান সেনা ফিনল্যাণ্ডের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করলো। কিন্তু ক্ষুদ্র দেশ হলেও ফিনল্যাণ্ডকে জয় করা রাশিয়ার পক্ষে খুব সহজসাধ্য হলো না।

ফিনল্যাণ্ড মেরুমণ্ডলের ঠিক নীচেই অবস্থিত। শীত এখানে প্রচণ্ড, তাতে রুশ-ফিন যুদ্ধ বেঁধেছিল আবার শীতকালেই। বরফের ভিতর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হতো সৈনিকদের, যুদ্ধ করতে করতে হাত-পা জমে বরফ হয়ে যেত। চলাচলের প্রধান যান ছিল শ্লেজ। স্কি (একরকম রণ-পা) অবলম্বনে বরফের উপর দ্রুতবেগে যাতায়াত করতো ফিন-সৈন্যরা। রুশ সৈনিকেরাও যথেষ্ট স্কি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার ব্যবহারে ওরা সুদক্ষ ছিল না।

এই ভীষণ যুদ্ধে, ফিনল্যাণ্ড কোন দেশের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই পায় নি। দুই-চারিজন ভলান্টিয়ার হয়ত সুইডেন থেকে এসেছে, বা শ্লেজ টানবার কুকুর দুই-দশটা। তা-ছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়।

অতঃপর **ক্যারেলিয়ান যোজকে** যুদ্ধ আরম্ভ হলো প্রচণ্ডভাবে। এই-খানেই অবস্থিত ফিনদের দুর্ভেদ্যতম রক্ষাব্যূহ—**ম্যানারহাইম লাইন।** দীর্ঘদিন ধরে, রুশদের সমস্ত আক্রমণ এই ব্যূহে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ হতে থাকলো। অবশেষে একদিন কিন্তু এই ব্যূহের অভ্যন্তরভাগে রুশ সৈন্য প্রবিষ্ট হলো। তখন ফিনল্যাণ্ডের সাহসী সৈনিকেরা বুঝতে পারলো, আর যুদ্ধ করাতে অনর্থক প্রাণিক্ষয় ছাড়া লাভ কিছু হবে না। ১৩ই মার্চ্চ তারিখে, রাশিয়ার সমস্ত দাবী মেনে নিয়ে তারা **সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর** করলো। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হলো রুশদের হাতে।

ফিনল্যাণ্ড-যুদ্ধে জয়লাভের পর, দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস রাশিয়া ইউরোপীয় যুদ্ধের সঙ্গে কার্য্যতঃ কোন সংস্রবই রাখে নাই। নিজের শক্তিবৃদ্ধির দিকেই সে দিয়েছিল অখণ্ড মনোযোগ। অকস্মাৎ ২৭শে জুন, চব্বিশ ঘণ্টার এক চরম

পত্র দিয়ে, সে দাবী করলো যে, **রুমানিয়ার** দুটি প্রদেশ তৎক্ষণাৎ রাশিয়াকে দিয়ে দিতে হবে। এ প্রদেশ দুটি হলো **বেসারাবিয়া** ও **উত্তর-বুকোভিনা**। বলা বাহুল্য, প্রবল-পরাক্রান্ত রাশিয়ার দাবী উপেক্ষা করা ক্ষুদ্র রুমানিয়ার পক্ষে সম্ভব হলো না। সে ২৮শে জুন তারিখেই উক্ত প্রদেশ দুটি রাশিয়ার হাতে সমর্পণ করলো।

বেসারাবিয়া ও উত্তর-বুকোভিনা অধিকার করে নেওয়ার পরে আবার কিছুদিন একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলো রাশিয়া। অকস্মাৎ জার্ম্মেণীর সাথে তার মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো। হিটলার তখন বিজয়-গর্ব্বে উন্মত্ত, সহসাই তিনি **রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা** করে বসলেন।

১৯৪১, ২২শে জুন, জার্ম্মাণ সেনা আক্রমণ করলো রুশ-সীমান্ত। বিভিন্ন পথ দিয়ে লেনিনগ্রাডের অভিমুখে তারা ধাবমান হলো। ক্রমশঃ জার্ম্মাণ-বাহিনী দুর্ব্বার গতিতে লেনিনগ্রাডের নিকটবর্ত্তী হলো।

জার্ম্মাণ-সৈন্য রাশিয়া আক্রমণ করার ফলে, ইংরেজ ও রাশিয়ার ভিতর মৈত্রীবন্ধনের সূত্রপাত হলো। এই দুই শক্তির সহযোগিতা রুশ-রণক্ষেত্রে যতটা না হোক, মধ্যপ্রাচ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো প্রথমেই। পারস্যের উত্তর দিক দিয়ে রুশ-সৈন্য, এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে ইংরেজ-বাহিনী, যুগপৎ প্রবেশ করলো ঐ দেশের ভিতর। পারস্য-মন্ত্রিসভার পতন হলো। রুশ ও ইংরেজ-সেনা মিলিত হলো কাজভিনে।

কীভ ও **ওডেসা** জার্ম্মাণ কবলে পতিত হলো। ক্রিমিয়ায় জার্ম্মাণ প্যারাসুট-বাহিনী অবতরণ করলো। যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে, রুশ-বাহিনীর পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হলো। **মার্শাল টিমোশেঙ্কোর** হাতে রইলো দক্ষিণ-অঞ্চলের সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার। উত্তর-অঞ্চলের অধিনায়কত্ব ন্যস্ত হলো মার্শাল জুকভের উপর।

৩রা জুলাই, ১৯৪২ **সিবাষ্টোপোল ত্যাগ** করতে হলো রুশ সৈন্যকে। জার্ম্মাণ আক্রমণে **ষ্টালিনগ্রাড বিপন্ন** হলো। ডন নদীর কূলে পশ্চাৎপদ হলো রুশ সৈন্য। ভোরোশিলভগ্রাড হস্তচ্যুত হলো তাদের। রোষ্টভ-অঞ্চল থেকে অপসৃত হলো তারা। জার্ম্মাণেরা বোমা বর্ষণ করলো ষ্টালিনগ্রাডে। টিমোশেঙ্কো ষ্টালিনগ্রাড রক্ষার জন্য ছুটে এলেন।

৮ই আগষ্ট মাইকপের তৈলকূপে আগুন জ্বালিয়ে দিল রুশেরা যাতে ঐ সব কূপ জার্ম্মাণ হস্তে পতিত না হয়। ১১ই আগষ্ট চার্চ্চিল এসে সাক্ষাৎ করলেন ষ্টালিনের সঙ্গে। ২৪শে তিনি ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে।

মস্কো, ষ্টালিনগ্রাড ও লেনিনগ্রাড—তিন দিকেই প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকলো।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, ডন ও ভলগার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রুশ সৈন্য অগ্রসর হতে সক্ষম হলো। ষ্টালিনগ্রাডে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রবলতর হয়ে উঠলো। রুশেরাও প্রাণপণ করে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগলো। ককেশাস-অঞ্চলে নল্‌চিক পরিত্যাগ করে গেল রুশ সেনা। দীর্ঘদিন ক্রমাগত তীব্র আক্রমণ করেও জার্ম্মাণেরা কোন স্থায়ী সুবিধা লাভ করতে পারলো না ষ্টালিনগ্রাডে। ক্রমে তারা একটু একটু করে বিতাড়িত হতে লাগলো ঐ স্থান থেকে। অবশেষে ষ্টালিনগ্রাডের **পথে পথে হাতাহাতি যুদ্ধ** চললো রুশ ও জার্ম্মাণ সৈন্যে। ককেশাসের এক যুদ্ধে জার্ম্মাণ সেনা ভয়ানকভাবে পরাজিত হলো।

এর পর থেকে ষ্টালিনগ্রাড-অঞ্চলে **রুশ সৈন্যই অগ্রগামী** হতে লাগলো। ডন পার হলো তারা আবার। তিন ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য বন্দী হলো রুশদের হাতে। অবরুদ্ধ ষ্টালিনগ্রাডের চারিদিকের জার্ম্মাণ-বেস্টনী ক্রমশঃ ভগ্ন হতে লাগলো। ককেশাসের অনেকটা অঞ্চল পুনরধিকার করলো রুশেরা।

১৯৪২, ২৫শে নবেম্বর ষ্টালিনগ্রাডের অবরোধ তুলে, জার্ম্মাণ সেনা পশ্চাদ-গমন করতে বাধ্য হলো। এই থেকে রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল, এবং জার্ম্মেণীর পতনেরও সূত্রপাত হলো।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখেই কালমাক-সাধারণতন্ত্রের রাজধানী **এলিষ্টা** রুশ অধিকারে এল, ষ্টালিনগ্রাডের শিল্পাঞ্চলও হলো **শত্রুমুক্ত**। ১৮ই জানুয়ারী লেলিনগ্রাডের অবরোধও উঠিয়ে নিতে বাধ্য হলো জার্ম্মাণ সেনা। চূড়ান্তভাবে ষ্টালিনগ্রাড অবরোধের অবসান হলো ২৭শে জানুয়ারী। ষ্টালিন-গ্রাডে জার্ম্মাণ ষষ্ঠবাহিনী একেবারে ধ্বংস হলো, এর সৈন্য-সংখ্যা গোড়ার দিকে ছিল ৩৩০০০০। একটার পর একটা স্থান পুনরায় অধিকার করে, **রোষ্টভে** ভীষণ আক্রমণ চালালো রুশেরা। রোষ্টভ ও ভোরোশিলভগ্রাড দখল করে, ইউক্রেণের রাজধানী খার্কভও হস্তগত করলো তারা।

মস্কোতে রুশ, ইংরেজ ও মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিবের এক যুক্ত-বৈঠক বসলো। শীঘ্রই **কীভ দখল** করলো লাল-ফৌজ। ইউক্রেণী রুশ-বাহিনী দুর্ব্বারগতিতে অগ্রসর হয়ে চললো, অবশেষে গোমেল পুনরধিকার করলো তারা ২৬শে নবেম্বর। তিহারাণে ষ্টালিন সম্মিলিত হলেন রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের সঙ্গে।

লেনিনগ্রাড-অঞ্চলে প্রতি-আক্রমণ চালালো এবার লাল-ফৌজ। নভোগোরড পুনরধিকৃত হলো। নীপার নদীর বাঁকে, দশ ডিভিশন জার্ম্মাণ সেনাকে পরিবেষ্টন করে বসলো রুশ-বাহিনী। জার্ম্মাণেরা অচিরে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

১৯৪৪, ১৫ই মার্চ্চ বাগ নদী পার হয়ে, ১৯শে তারিখে নীষ্টার-তীরে উপনীত হলো রুশ-সৈন্য। জার্ম্মাণেরা তাড়া খেয়ে প্রবেশ করলো হাঙ্গেরীর ভিতর। ক্রিমিয়ার অন্তঃপাতী ইয়াল্টা ও বালাক্লাভা রুশ-সেনার হাতে পতিত হলো। তুমুল সংগ্রামে **সিবাষ্টোপোল অধিকার** করলো লাল-ফৌজেরা। বুদাপেষ্ট থেকে যে-সব জার্ম্মাণ ও হাঙ্গেরীর সৈন্য জার্ম্মেণীর দিকে পালাবার চেষ্টা করছিল, তাদের পথ রুদ্ধ করে দণ্ডায়মান হলো রুশ-সৈন্য। বার্লিণের অভিমুখে রুশ-অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার কোন উপায়ই আর রইলো না হিটলারের।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ডানজিগ-উপসাগরে পৌঁছালো রুশ-বাহিনী। সাইলেসিয়ার অন্তর্গত হিণ্ডেনবুর্গ অধিকার করে ওডার নদীর তীরে উপনীত হলো তারা। এখানে হিটলার তাঁর শেষ রক্ষাব্যূহ রচনা করে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু রুশ-সেনার ওডার পার হওয়া রোধ করতে পারলেন না তিনি। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে **ইয়াল্টাতে** ষ্টালিন, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের সাক্ষাৎকার হলো। ১৬ই তারিখে, মার্শাল কোনিয়েভ এসে মিলিত হলেন মার্শাল জুকভের সঙ্গে, সাইলেসিয়াতে।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে লাল-ফৌজ বার্লিণের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলো। ২৯শে এপ্রিল **হিটলার আত্মহত্যা** করলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অ্যাডমিরাল **ডোয়েনিৎস** সন্ধি প্রার্থনা করলেন জুকভের কাছে। জার্ম্মেণীর আত্মসমর্পণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ৮ই মে, বার্লিণের কার্লহষ্ট নামক পল্লীতে। রুশ-সরকারের পক্ষ থেকে **মার্শাল জুকভ** এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

যুদ্ধ-বিরতির পর, জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র ও বার্লিণ নগরীর শাসনভার সম্মিলিত ভাবে রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংরেজ ও ফরাসী এই চতুঃশক্তির করায়ত্ত হলো। মার্শাল জুকভ প্রথম রুশ সামরিক শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করলেন।

জার্ম্মেণীর শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে অচিরেই মতদ্বৈধ উপস্থিত হলো রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্রশক্তির ভিতরে। সে মতদ্বৈধের মীমাংসা এখনও হয় নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা-পরিচালিত জার্ম্মেণীর তিন অংশ নিয়ে, এখন পশ্চিম-জার্ম্মেণী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র হয়েছে বন্ নগরী। রাশিয়ার নির্দ্দেশে, পূর্ব্ব-জার্ম্মেণীতে আলাদা কম্যুনিষ্ট-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জার্ম্মেণীর পতনের পরে বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপীয় পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। তখন বাকী রইলো জাপানের যুদ্ধ। ৮ই আগষ্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, **মাঞ্চুরিয়া অধিকার** করে নিল এবং ক্রমশঃ মূল জাপানী ভূখণ্ডে অবতরণ করলো। অ্যাটম বোমায় **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** বিধ্বস্ত করলো মার্কিণ-

যুক্তরাষ্ট্র। সঙ্গে সঙ্গেই জাপান বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করলো মিত্রশক্তির কাছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে জাপানের সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হলেন।

তারপর চীনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো। তাতে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট মতবাদে প্রভাবিত জনসঙ্ঘ, **চিয়াং কাইসেক** পরিচালিত **কুয়োমিনটাং গবর্ণমেণ্টকে** পরাজিত করলো। কম্যুনিষ্ট-নেতা **মাও সে তুং** তারপর চীনে নতুন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করলেন। তাঁর প্রধান মিত্রই হলো রাশিয়া।

রাশিয়ার নাম এখন **সোভিয়েট রাশিয়া**। ষোলটি স্বাধীন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রী-রাষ্ট্র এখন রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার সর্ব্বোচ্চ আইনসভার নাম, **সুপ্রীম সোভিয়েট**, এই সভা দুই কক্ষে বিভক্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তৃত্ব রয়েছে এক মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর **মালেনকভ** এখন এই মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি। **মলোটভ** এবং **ভিসিনস্কি** মন্ত্রিসভার দুইজন বিশিষ্ট সভ্য। শাসনযন্ত্র কম্যুনিষ্ট দলের প্রভাবাধীন, তারা প্রতিনিয়ত দেশকে প্রকৃত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে দাবী করছে।

বৈদেশিক নীতিতে সোভিয়েট রাশিয়া বর্ত্তমানে শান্তি-অভিযানের নামে, পৃথিবীর নানাস্থানে কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য জোর চেষ্টা করছে। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এখন রাজনৈতিক আদর্শের বিভিন্নতায় দুই প্রবল প্রতিপক্ষ।

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ষ্টালিনের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট দলের সুবিদিত ঊনবিংশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে ষ্টালিনের পরলোকগমনের পর, তাঁর ব্যক্তিত্ব-প্রতিভার আলোচনা নিয়ে প্রায় সব দেশেই খুব আলোড়ন উঠেছিল।

ইংলণ্ড
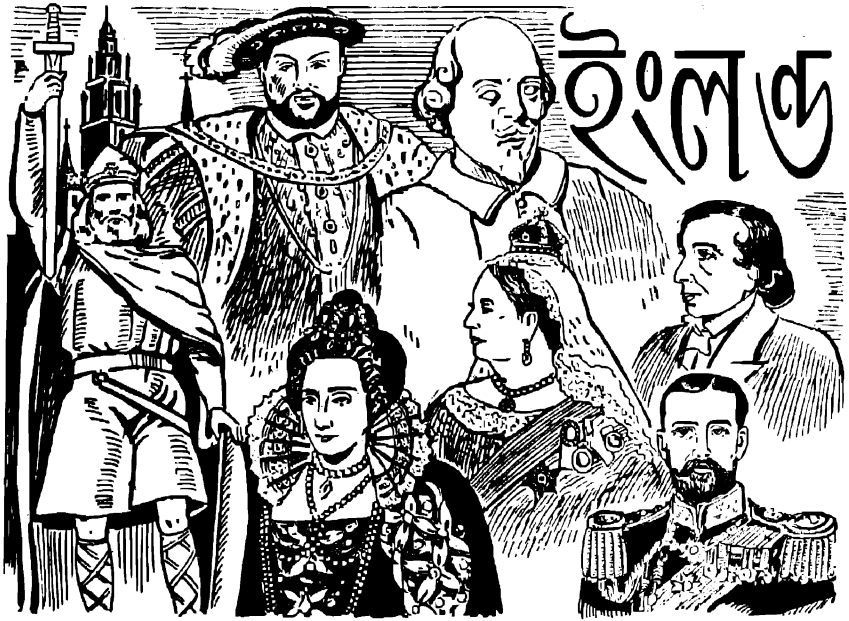
প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইংলণ্ডের নাম ছিল **ব্রিটেন**, এবং সেখানে যে-সব লোক বাস করতো তারা এখনকার মত সভ্য ছিল না। ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ে ঘর তৈরি করে তারই ভিতর তারা থাকত এবং কাপড় বুনতে জানতো না বলে, বন্য জন্তু শিকার করে তাদের ছাল পরতো। তবুও তারা স্বাধীন ছিল; তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য দূর-বিদেশ থেকেও অনেক লোক আসতো। ব্রিটেনে তখন খুব বেশী পরিমাণে টিন পাওয়া যেত। টিন ছিল খুব দরকারী জিনিষ। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরি হতো এবং সেই ধাতু দিয়ে তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র বানিয়ে, তাই দিয়ে লোকে বন্য জন্তু শিকার করতো এবং দরকার হলে যুদ্ধও করতো।

ব্রিটেনের লোকদের বলতো **ব্রিটন**। দেশের বেশীর ভাগ জায়গাতেই তখন জঙ্গল। ব্রিটনরা জঙ্গল কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে, সেই-খানে মাটির ঘর তৈরি করে, তার উপর দিত পাতার ছাউনি, আর সারাটা গ্রামের চারিপাশে গাছের গুঁড়ি পুঁতে এমনভাবে বেড়া দিয়ে দিত যাতে বন্যজন্তু বা শত্রু এসে হঠাৎ আক্রমণ না করতে পারে। জীবজন্তু শিকার, মাছ ধরা এবং চাষবাস ছিল এদের পেশা।

এদের মধ্যে অনেক পুরোহিত ছিল, তাদের বলতো **ড্রুইড**। ব্রিটনরা সূর্য্য, চন্দ্র এবং তারাগুলিকে দেবতা বলে বিশ্বাস করতো। ড্রুইডেরা ছিল বনবাসী, লোকালয়ের বাইরে তারা বাস করতো। এরা শুধু যে পূজা করতো তা নয়, লোকের ঝগড়া-বিবাদে বিচার করে মিটিয়ে দেওয়া এবং রোগে চিকিৎসা করাও ছিল এদের কাজ।

ব্রিটনদের যুগে ইংলণ্ড

রোমানদের আগমন

যতই দিন যেতে লাগলো, বিদেশ থেকে ততই বেশী বেশী করে লোক ব্রিটেনে ব্যবসা করতে আসতে লাগলো। ব্রিটনরাও সমুদ্র পার হয়ে অন্য দেশে যেতে আরম্ভ করলো। একদল গেল **গলে** বা বর্ত্তমান **ফ্রান্সে**। সেখানে গিয়ে তারা দেখলো যে, বিখ্যাত রোমক সেনাপতি **জুলিয়স সীজারের** সৈন্যরা এসে গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের হারিয়ে দিয়ে সে দেশটাকে দখল করে নেবার চেষ্টা করছে। ব্রিটনরা ছিল গলদের আত্মীয় ; তাই তাদের স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্য, তারা রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলো। কিন্তু তখনকার দিনে রোমানরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল। এদের সঙ্গে যুদ্ধে গলজাতি পেরে উঠলো না, রোমানরা গল দখল করে নিল।

সীজারই তখন গল জয় করেছিলেন। ব্রিটনরা গলে এসে রোমানদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে দেখে তিনি অত্যন্ত চটে গেলেন, এবং ব্রিটনদের শাস্তি দেবার জন্য, তাদের দেশ ব্রিটেন আক্রমণ করার সঙ্কল্প করলেন। খৃঃ পূঃ ৫৫ সালে তিনি রোমানদের নিয়ে, জাহাজে চড়ে ব্রিটেনে এসে নামলেন।

সমুদ্রের তীরে ব্রিটনরা দলে দলে এসে সীজারের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলো। কিন্তু রোমানদের অস্ত্র-শস্ত্র ব্রিটনদের চেয়ে ভাল ছিল বলে তারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে, বনে-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়লো। সীজার বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটেন জয় করা তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন তত সহজ হবে না। ব্রিটনরা হেরে গেল কিন্তু কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করলো না। এই দেখে সীজার

ব্রিটেনে বিখ্যাত রোমের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ

সেবারের মত গলে ফিরে গিয়ে আবার পর-বৎসর, আরও বেশী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ব্রিটেন আক্রমণ করলেন।

এবারও ব্রিটনরা প্রাণপণে যুদ্ধ করলো বটে, কিন্তু রোমানদের সঙ্গে পেরে উঠলো না। সীজার ব্রিটনদের কাছ থেকে অনেক কর ও উপঢৌকন আদায় করলেন। ব্রিটেন জয় করা তাঁর মতলব ছিল না, তাদের শাস্তি দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি ব্রিটেন ত্যাগ করে গলদেশে ফিরে এলেন।

সীজারের অভিযানের পর, প্রায় একশ' বছর রোমানরা আর ব্রিটেনের দিকে নজর দিল না। কালক্রমে রোমে সাধারণতন্ত্র-যুগের পর সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগ আরম্ভ হলো। তারপর ৪৩ খৃষ্টাব্দে **সম্রাট ক্লডিয়াস,** ব্রিটেন জয় করবার জন্য

অনেক সুশিক্ষিত সেনাপতি ও রোমান সৈন্যবাহিনী সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রিটনরা এবারও সকল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করলো কিন্তু এবারও তারা হেরে গেল। তাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়ে, এবার তাদের দেশ রোমান অধিকারে
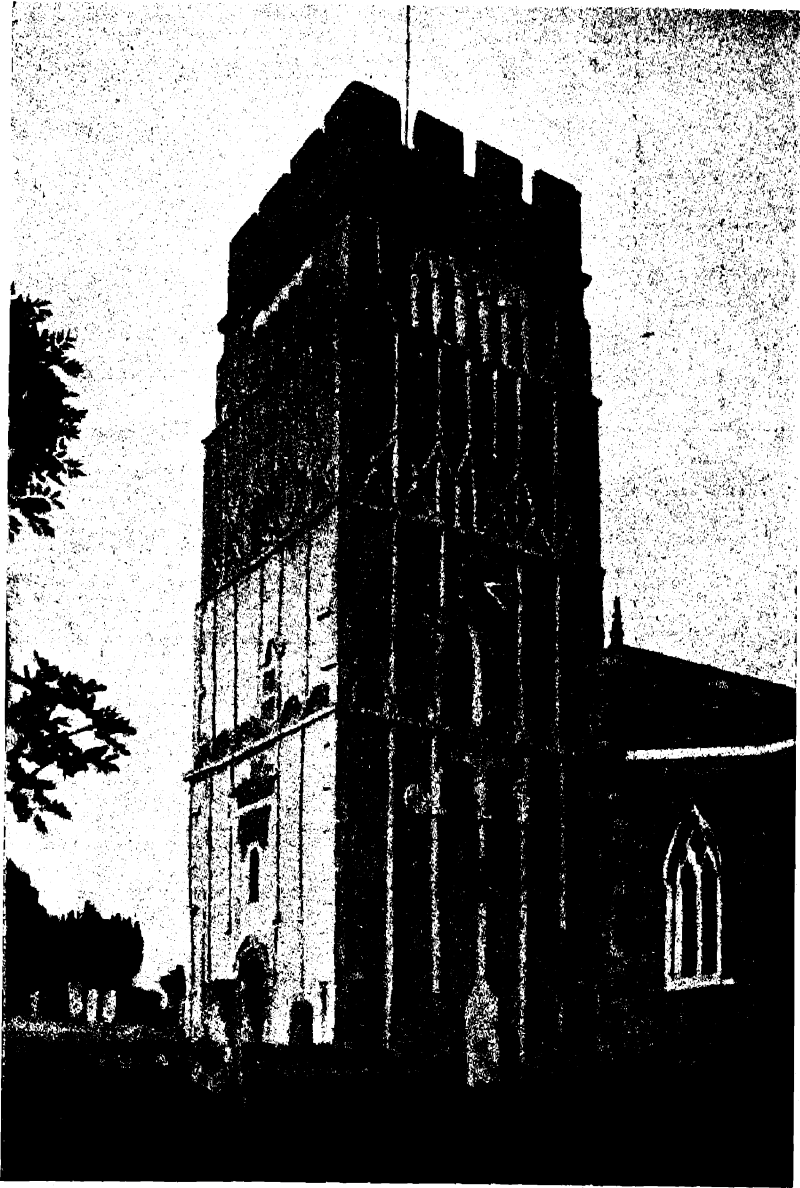
আলস বারটন চার্চ—স্যাক্সন-যুগের একটি শিল্প-নিদর্শন

চলে গেল। এ-সময়ে ব্রিটেনের একজন রাণী **বোডিসিয়া** খুব বীরত্ব ও শৌর্য্যের সঙ্গে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

এরপর রোমানরা প্রায় চারশ' বছর ধরে ব্রিটেনে রাজত্ব করেছিল। এদের রাজত্বের সময় ব্রিটেনে, লোকজনের সুবিধার জন্য অনেক ভাল ভাল রাজপথ, বড় বড় দেওয়াল এবং নদীর উপর পুল তৈরি হয়েছিল। তখনকার অনেক রাস্তা এবং প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

রাজা আলফ্রেড

রোমক সাম্রাজ্য, বিভিন্ন বর্ব্বর জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে, রোমানরা ব্রিটেন ছেড়ে চলে যায়। তখন ব্রিটনরা বেশ মুস্কিলে পড়ে গেল। এতদিন রোমক শক্তির অভিভাবকত্বের মধ্যে থেকে তারা তাদের পূর্ব্বের যুদ্ধবিদ্যা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। বাইরে থেকে কোন শত্রু এলে তাকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের আর ছিল না।

ব্রিটনদের এই অসুবিধার কথা বুঝতে পেরে, দলে দলে দুর্দ্দান্ত জাতিরা এসে ব্রিটেন আক্রমণ করতে লাগলো। স্কটল্যাণ্ড থেকে **পিক্ট, স্কট** এবং জার্ম্মেণী থেকে **অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, জুট** প্রভৃতি অসভ্য জাতির লোকেরা এসে দেশের উপর ভীষণ অত্যাচার সুরু করলো। এরা ব্রিটনদের দেখতে পেলেই হত্যা করতো, তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুটপাট করে নিত, ঘরবাড়ী সব জ্বালিয়ে দিত। এদের নিষ্ঠুর স্বভাব দেখে এবং এরা সমুদ্র-পার থেকে এসেছিল বলে ব্রিটনরা এদের নাম দিয়েছিল, 'জলের নেকড়ে'।

মহানুভব আলফ্রেড

এই সব আক্রমণকারী জাতিদের মধ্যে ক্রমে, অ্যাঙ্গল এবং স্যাক্সনরাই ব্রিটেনের অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করলো। এদের নাম থেকে দেশের লোকের নাম হলো ইংরেজ এবং দেশের নাম হলো ইংলণ্ড। ব্রিটনরা ইংরেজদের দাস হলো এবং অনেকে ওয়েলসে পালিয়ে গেল।

ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে অনেক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলো। এর মধ্যে কেণ্ট, নর্দ্দামব্রিয়া, মার্সিয়া এবং ওয়েসেক্স রাজ্য প্রধান। এই সব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। অবশেষে **এগবার্ট** নামে একজন রাজা ওয়েসেক্সের সিংহাসনে বসে,

ইংলণ্ডের আর সব রাজাকে হারিয়ে দিলেন। তখন থেকে **ওয়েসেক্স-রাজ্যের প্রাধান্য** আরম্ভ হলো।

এগবার্টের নাতির নাম ছিল **আলফ্রেড।** ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে এই আলফ্রেডই ছিলেন সব চেয়ে বড়। তাঁর রাজত্বের সময়, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক থেকে, দুর্দ্ধর্ষ ও সমুদ্রবিলাসী **ডেন** জাতির লোকেরা এসে ইংলণ্ডে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করে। আলফ্রেড প্রথমটা এদের বাধা দিতে পারলেন না, ডেনরা আলফ্রেডের লোকজনদের যুদ্ধে হারিয়ে দিল।

আলফ্রেড নিজেও পালিয়ে এক জঙ্গলে গিয়ে সেখানে এক রাখালের কুটীরে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে বসেও তিনি রাতদিন শুধু ভাবতেন, কেমন করে ডেনদের তাড়িয়ে দিয়ে, দেশকে তাদের উপদ্রব হতে মুক্ত করবেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর লোকজনদের একত্র করতে লাগলেন; তারপর ঠিক করলেন যে, ডেনদের দলে কত লোক আছে তা জানবার জন্য তিনি নিজেই তাদের ঘাঁটিতে যাবেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। আলফ্রেড বাজনাদার সেজে একটা বাজনা নিয়ে, ছদ্মবেশে, ডেনদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হলেন। ডেনরা বুঝতেই পারলো না যে, তাদের পরম শত্রু এসে তাদের বাজনা শুনিয়ে যাচ্ছেন। আলফ্রেড এইভাবে ডেনদের আড্ডার খবর নিয়ে এসে, সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে, অনেক বেশী লোক নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করলেন। এবার ডেনরা হেরে গেল এবং তাদের দলপতি বাধ্য হয়ে, আলফ্রেডের সঙ্গে **ওয়েডমুরের সন্ধি** করলো (৮৭৮ খৃঃ)। আলফ্রেড তাদের বসবাসের জন্য খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলেন।

আলফ্রেডের রাজত্বে ইংলণ্ডের লোকেরা খুব সুখে ছিল। তিনি দেশের লোকদের জন্য অনেক বিদ্যালয় খুলে দিয়েছিলেন, অনেক ভাল ভাল বই লিখিয়েছিলেন এবং সুন্দর সুন্দর আইন তৈরি করে, সকলের সুখে ও শান্তিতে থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি অনেক জাহাজও তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা আলফ্রেডের বহুমুখী প্রতিভা ছিল বলে তাঁকে নাম দেওয়া হয়, **মহামতি আলফ্রেড।**

রাজা ক্যানিউট

রাজা আলফ্রেডের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য বংশধরদের অধীনে অনেক বছর ইংলণ্ডের লোকদের ভাল ভাবেই কেটে গেল। তারপর বাইরের ডেনরা আবার এসে ইংলণ্ড আক্রমণ করলো এবং এবার স্যাক্সনদের দোষ-ত্রুটি ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে, তাদের হারিয়ে দিয়ে, দেশ জয় করে নিল। **ক্যানিউট** নামে একজন ডেন রাজকুমার ইংলণ্ডের রাজা হলেন। ক্যানিউট বিদেশী হলেও ভাল রাজা ছিলেন। তিনি ডেন ও ইংরেজদের সমচক্ষে দেখতেন। তিনি খোসামোদ পছন্দ করতেন না।

একদিন তিনি তাঁর তোষামোদপ্রিয় পারিষদদের বেশ জব্দ করেছিলেন। ক্যানিউট সেদিন সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছেন এমন সময় তাঁর একজন পারিষদ বলে বসলেন, "মহারাজ, আপনি শুধু যে এই দেশের রাজা তাই নয়, আপনি সমুদ্রেরও প্রভু।" ক্যানিউট এই কথা শুনে একটা চেয়ার এনে, জলের ধারে পাতবার জন্য সঙ্গের লোকদের হুকুম দিলেন। তখন জোয়ার আসছে, আর একটু পরেই সেই জায়গাটা জলে ভেসে যাবে। তবুও ক্যানিউট সেখানে সেই চেয়ারে বসলেন, এবং তাঁর পারিষদেরা গিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন।

ক্যানিউট তখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি সমুদ্রের প্রভু। অতএব হে সমুদ্র, তুমি আমার কাছে এসো না। দেখো যেন তোমার জলে আমার পা না-ভিজে যায়।" বুঝতেই পারছ যে, সমুদ্র সে কথা মোটেই শুনলো না, জোয়ারের জল এসে ক্যানিউটের পায়ের উপর আছড়িয়ে পড়লো, তাঁর পা ভিজে গেল। রাজা ক্যানিউট তখন সেই পারিষদের দিকে ফিরে বললেন, "এখন দেখতে পাচ্ছ তো যে, আমি সমুদ্রের প্রভু নই! মনে রেখো, পৃথিবীতে একজন মাত্র প্রভু আছেন, তিনি ঈশ্বর। একা তিনিই শুধু স্বর্গে, মর্ত্যে এবং সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব করেন।" পারিষদেরা লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইদিন থেকে ক্যানিউট রাজমুকুট নিজের মাথা থেকে খুলে, এক গির্জ্জায় খুব উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখলেন; এরপর যতদিন তিনি রাজত্ব করেছেন ততদিন তিনি আর রাজমুকুট পরেন নাই।

নরম্যান অভিযান

ফ্রান্সের উত্তরে, **নরম্যাণ্ডি** বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ডেনদের সমজাতিভুক্ত **নরম্যান** নামক এক জাতির লোকেরা বাস করতো। এদের পূর্ব্বপুরুষরাও ইংরেজ এবং ডেনদের মতই হিংস্র ও নিষ্ঠুর স্বভাবের লোক ছিল। জল-দস্যুতা ছিল তাদের পেশা। উত্তর দেশগুলি থেকে এসে নরম্যাণ্ডিতে বসবাস আরম্ভ করবার পর, ফরাসী প্রভাবে এরা অনেকটা সভ্য হয়ে এসেছিল।

বিজয়ী উইলিয়ম

এদের একজন ডিউক বা প্রধান ব্যক্তির নাম ছিল **উইলিয়ম**। ইংলণ্ডে তখন **এডওয়ার্ড কনফেসর** নামে এক ইংরেজ রাজা রাজত্ব করছিলেন, তাঁর কোন ছেলে ছিল না। উইলিয়মের সামন্ত-রাজ্য নরম্যাণ্ডি, ইংলণ্ডের খুব কাছে ছিল; রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্কও ছিল, কাজেই তাঁর মনে মনে আশা ছিল, এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তিনিই ইংলণ্ডের রাজা হবেন। এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর, ইংরেজরা **হ্যারল্ড** নামক একজন ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজা করে দিল। উইলিয়ম ভয়ানক চটে গেলেন।

স্যাক্সন পদাতিক ও নরম্যান অশ্বারোহী

উইলিয়ম ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে, অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন। ইংলণ্ডের দক্ষিণে **হেষ্টিংস** নামক একটা জায়গায় উইলিয়মের সঙ্গে হ্যারল্ডের ভীষণ যুদ্ধ হলো। তখনও যুদ্ধে কামান-বন্দুকের প্রচলন হয় নাই,

সৈন্যরা তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার এইসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতো। এই যুদ্ধে নরম্যানদের একটা তীর রাজা হ্যারল্ডের চোখে গিয়ে বিঁধে, এবং তাতে হ্যারল্ড মারা যান। রাজার মৃত্যুতে ইংরেজরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

উইলিয়ম নিজেকে ইংলণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এঁকে **বিজয়ী উইলিয়ম** বা **প্রথম উইলিয়ম** বলে। তিনি রাজা হলেন বটে, কিন্তু ইংরেজদের বশীভূত করতে তাঁর অনেক বছর কেটে গিয়েছিল।

বিখ্যাত কেনিলওয়ার্থ ক্যাসল্ (নরম্যান যুগ)

তিনি ইংলণ্ড এবং নরম্যাণ্ডি দুটো দেশেরই রাজা হলেন। উইলিয়ম বিচক্ষণতার দ্বারা সামন্তপ্রথায় নানারূপ পরিবর্ত্তন এনে, জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব্ব করেছিলেন এবং ইংলণ্ডে খুব শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হ্যারল্ড এ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন যুগের শেষ রাজা। প্রথম উইলিয়ম ইংলণ্ডে নরম্যান রাজবংশের প্রবর্ত্তন করেন।

রাজা প্রথম রিচার্ড

উইলিয়মের পরে যাঁরা রাজা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে **দ্বিতীয় হেনরী** খুব বিচক্ষণ ও সুদক্ষ। তিনি দুর্দ্দান্ত জমিদারদের বশে এনেছিলেন কিন্তু ধর্ম্মব্যাপারে, ক্যাণ্টারবেরির আর্চ্চবিশপ টমাস বেকেটের সঙ্গে বিরোধে, ঘটনাচক্রে শেষ পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে **প্রথম রিচার্ডের** বীরত্ব-কাহিনী দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রিচার্ড খুব সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন

এবং যুদ্ধ করতে ভালবাসতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল, **সিংহ-হৃদয় রিচার্ড**।

রিচার্ড যখন রাজত্ব করছিলেন সেই সময় ইংলণ্ডের লোকেরা খবর পায় যে, প্যালেষ্টাইন নামক তাদের তীর্থক্ষেত্রটিকে তুর্কীরা দখল করে নিয়েছে। প্যালেষ্টাইন যীশুখৃষ্টের জন্মভূমি এবং এইজন্য খৃষ্টানেরা ঐ জায়গাটিকে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে মনে করতো। রিচার্ড তুর্কীদের কবল থেকে প্যালেষ্টাইন উদ্ধার করবার জন্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওনা হলেন। অন্যান্য জায়গা থেকেও খৃষ্টান রাজা ও বীরেরা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। প্যালেষ্টাইনের এই যুদ্ধ তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এ-যুদ্ধে রাজা রিচার্ড যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন ; তাঁর দলের অনেক লোকও মারা গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ-যাত্রা দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় নাই।

প্রথম রিচার্ড

রিচার্ড এক জাহাজে চড়ে, ভূমধ্য-সাগর দিয়ে ইংলণ্ডে রওনা হলেন। পথে এক জায়গায় তাঁর জাহাজ ডুবে গেল, রিচার্ড অনেক কষ্টে সাঁতার দিয়ে এক দেশে গিয়ে উঠলেন। সেই দেশের রাজার সঙ্গে রিচার্ডের শত্রুতা ছিল। সেই রাজা রিচার্ডকে, পাহাড়ের উপরে একটা দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। সেখান থেকে রিচার্ড, তাঁর গানের সঙ্গী ব্লণ্ডেল নামক এক ব্যক্তির চাতুরীর সাহায্যে মুক্তি পেয়েছিলেন।

রিচার্ডের কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কাজই ভাল লাগতো না। দেশে ফিরে এসে, কিছুদিন চুপচাপ বসে থেকে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তিনি শীঘ্রই ফ্রান্সে চলে গেলেন। সেখানে তিনি অনেক বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু একটা যুদ্ধে তীর বিঁধে মারা গেলেন।

ম্যাগনা কার্টা

রিচার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই জন ইংলণ্ডের রাজা হলেন। জন মানুষটি মোটেই **ভাল ছিলেন না**। একবার তিনি তাঁর পিতা দ্বিতীয় হেনরীকে হত্যা করে, রাজা হবার ফন্দী এঁটেছিলেন; আর একবার বড় ভাই রিচার্ড যখন প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি নিজে রাজা হবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য রাজ-মুকুট তিনি পরতে পেরেছিলেন।

জন ম্যাগনা কার্টায় সহি করছেন

জন যেমন অত্যাচারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন খামখেয়ালী। প্রজারা তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। যার কাছ থেকে খুসী তিনি টাকা আদায় করতেন, টাকা দিতে কেউ অস্বীকার করলে, হয় তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন, নইলে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করে দিতেন। **রোমের পোপ** ছিলেন খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরু। তিনিও জনের ব্যবহারে এমন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, ইংলণ্ডের প্রজাদের জানিয়ে দিলেন যে, জন আর ধর্ম্মতঃ দেশের রাজা নন; তারা যদি জনকে জোর করে সিংহাসনচ্যুত করে, তাহলে তাদের কোন অন্যায় হবে না।

রাজা জনের অনাচার-অত্যাচারে ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁর উপরে ভীষণ ক্ষেপে গেল। তারা, প্রধান ধর্ম্মযাজক **ষ্টিফেন ল্যাংটনের** নেতৃত্বে, রাজার কাছে অনেক অধিকার দাবী করলো। জন প্রজাদের মনের ভাব দেখে বুঝলেন যে, এই দাবী উপেক্ষা করা চলবে না। তাই তিনি রাজি হলেন। ১২১৫ সালের ১৫ই জুন, টেমস নদীর উপরে, **রাণীমিড** নামক একটি ছোট দ্বীপে, রাজা জন, অনেক লোকের সামনে এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এই ঘোষণাপত্রই পৃথিবীর ইতিহাসে **'ম্যাগনা কার্টা'** বা

'মহাসনন্দ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ম্যাগনা কার্টা ল্যাটিন ভাষার শব্দ, এর মানে হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা।

ম্যাগনা কার্টায় যে সব সর্ত্ত ছিল তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরূপ। রাজা যখন খুসী কর বসিয়ে, যত ইচ্ছা টাকা সকলের কাছ থেকে আদায় করতেন বলে একটি সর্ত্ত দেওয়া হলো এই যে, দেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যে পরিষদ গঠন করবেন, তার অনুমতি না নিয়ে রাজা কখনও কোন রকম কর বসাতে পারবেন না। দেশে সুবিচার বলে কোন জিনিষ ছিল না; এইজন্য একটি সর্ত্ত হলো এই যে, দেশের প্রত্যেক লোক সুবিচার পাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচারকার্য্য শেষ হবে। অনর্থক লোকের উপর মোকদ্দমা ঝুলিয়ে রেখে তাকে হয়রান করা হবে না।

অশ্বপৃষ্ঠে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট

এতদিন রাজারা যাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন বিচার না করে, তাকে নিজের কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, যতদিন ইচ্ছা কারাগারে বন্দী করে রাখতে পারতেন। এইজন্য ম্যাগনা কার্টার একটি সর্ত্ত এই হলো যে, রাজা কোন লোককে বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারবেন না।

রাজা জন এই ঘোষণাপত্রে সই করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন এতে সায় দিল না। তিনি রেগে আগুন হয়ে রইলেন। হঠাৎ একদিন তিনি ম্যাগনা কার্টার **সর্ত্তগুলি অস্বীকার** করে বসলেন। তিনি বললেন যে, ঘোষণাপত্রে সই করবার আগে ভগবানের নামে তিনি যে শপথ করেছেন তা তিনি মানতে বাধ্য নন। দেশের লোকেরা এতে ভীষণ

হলো। তারা জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। জন তাঁর জিদ ছাড়লেন না বলে অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এক বছর যুদ্ধ চলবার পর, জন হঠাৎ একদিন **মারা গেলেন**। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল, দেশের লোকেরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

রাজা জনের মৃত্যুর পর, তাঁর ছেলে **তৃতীয় হেনরী** ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। তিনি নিজে রাজকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই। তাঁর রাজত্বকাল, **সাইমন ডি মণ্টফোর্টের** জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছে। সাইমন রাজার অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজে আধিপত্য লাভ করেন এবং তিনি ইংলণ্ডে, **হাউস অব কমনস** বা গণপ্রতিনিধি-সভার সূচনা করেন।

তৃতীয় হেনরীর পরে রাজা হন তাঁর পুত্র **প্রথম এডওয়ার্ড**। তিনি খুব শক্তিশালী ও প্রতিভাবান নৃপতি ছিলেন। তিনি ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে, **আদর্শ পার্লামেণ্ট** গঠন করে সাইমনের পার্লামেণ্টের উন্নতি বিধান করেন। তিনি আইন-প্রণয়ন ও রাজ্য-সংগঠনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রথম এডওয়ার্ড খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি ওয়েলস রাজ্য আক্রমণ করে ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডও অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডবাসীরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে। স্কটল্যাণ্ডের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ওয়ালেস, ব্রুস প্রভৃতি বীরগণের শৌর্য্যকাহিনীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে। এডওয়ার্ড অশেষ চেষ্টা করেও স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন নাই। প্রথম এডওয়ার্ডের পর অপদার্থ রাজা **দ্বিতীয় এডওয়ার্ড** রাজত্ব করেন। তারপরে সিংহাসনে উপবেশন করেন আর একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। তাঁর নাম **তৃতীয় এডওয়ার্ড**। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের 'শতবার্ষিক যুদ্ধ' তাঁর রাজত্বেই সুরু হয়।

রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের ক্যালে অধিকার

তৃতীয় এডওয়ার্ডের ফ্রান্স জয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকেই শতবার্ষিক যুদ্ধের উৎপত্তি। তিনি অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে, **ফ্রান্স আক্রমণ** করেছিলেন। ফ্রান্সে, **ক্যালে** নামক একটি সুন্দর ও প্রকাণ্ড সহর আছে; তখনকার দিনে সেই সহরটির চারদিকে মস্ত উঁচু দেয়াল আর তার পাশে গভীর খাদ ছিল।

এডওয়ার্ড বুঝলেন যে, এই সহরটিকে সোজাসুজি আক্রমণ করে দখল করা অসম্ভব, সুতরাং তিনি ঠিক করলেন, সহরটিকে এমনভাবে ঘেরাও করে বসে থাকবেন যেন সহরের লোকেরা, বাইরে থেকে খাবার জিনিষ কিছুই আনতে না পারে। সহরের মজুত খাবার ফুরিয়ে গেলে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

এই ভেবে এডওয়ার্ড ক্যালে সহরটিকে ঘেরাও করে, চুপটি করে পূরো এক বৎসর বসে রইলেন। সত্যি সত্যিই তিনি যা ভেবেছিলেন তাই হলো। মজুত রুটি ও মাংস সব যখন ফুরিয়ে গেল, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল এমন কি ইঁদুরের মাংস পর্য্যন্ত যখন আর পাওয়ার উপায় রইলো না, সবাই যখন বুঝতে পারলো যে, এডওয়ার্ডের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে, এবার সহরশুদ্ধ ছেলে-বুড়ো সকলকেই অনাহারে মরতে হবে, তখন তারা রাজা এডওয়ার্ডের কাছে খবর পাঠালো যে, যদি তাদের প্রাণে না মারেন, তাহলে তারা সহরের সিংহ-দ্বারের চাবি তাঁর হাতে দিয়ে দেবে।
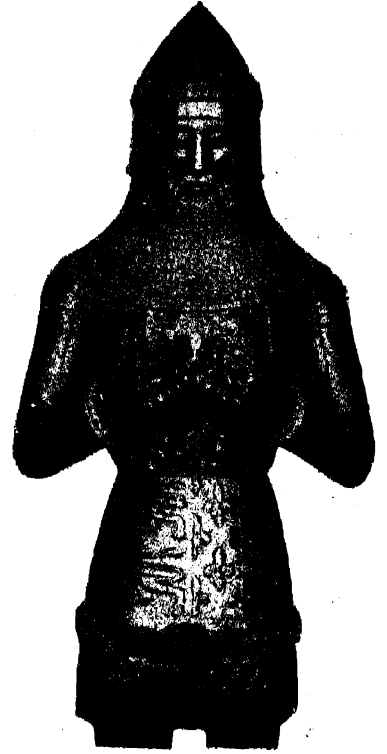
ব্ল্যাক প্রিন্স

রাজা এডওয়ার্ড এক বছর ধরে সহর অবরোধ করে বসেছিলেন, এর জন্য তাঁর অনেক সময় নষ্ট তো হয়েছেই, সৈন্যদের বসিয়ে রাখতে হয়েছে বলে অনেক ক্ষতিও হয়েছে। এইসব কারণে ক্যালের লোকদের উপর তিনি ভীষণ চটে গিয়েছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন যে, এদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

সহরের লোকেরা যখন **আত্মসমর্পণ** করবে বলে খবর পাঠালো, তিনি তখন তাদের বলে দিলেন, "তোমাদের সহরের যারা নেতা, তাদের ছয় জনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তারা যেন সহরের সিংহ-দ্বারের চাবি সঙ্গে নিয়ে আসে, আর তাদের গলায় যেন দড়ি পরানো থাকে। আমি সেই দড়িতে ঝুলিয়ে তাদের ফাঁসি দেব। যদি এই রকম ছয় জন লোক তোমরা পাঠাতে পার, তাহলে আমি সহরের আর কাউকেই প্রাণে মারব না।"

রাজা এডওয়ার্ডের এই নিষ্ঠুর সর্ত্তের কথা সবাই যখন জানতে পারলো

তখনই ক্যালের এক সাহসী বৃদ্ধ, সকলের আগে এসে বললেন, "ছয় জনের এক জন আমি হব। হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আর পাঁচ জন কে কে জীবন দিতে চাও, এগিয়ে এস।" তখুনি আরও পাঁচ জন লোক এসে সেই বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ালেন।

এঁরা ছয় জন গলায় দড়ি পরে সহরের চাবি হাতে নিয়ে, রাজা এডওয়ার্ডের শিবিরে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। ক্যালের লোকেরা জলভরা চোখে তাঁদের বিদায় দিল। তারা বেশ বুঝতে পারলো যে, নিষ্ঠুর রাজা এডওয়ার্ডের হাতে এঁদের নিষ্কৃতি নেই, ফাঁসিকাষ্ঠে এঁদের প্রাণ দিতে হবে।

ক্যালের এই ছয় জন লোককে সত্যিই কিন্তু প্রাণ দিতে হলো না; তাঁরা রাজার দরবারে এসে পৌঁছেছেন এই খবর পেয়েই এডওয়ার্ডের রাণী ছুটে এলেন সেখানে। রাণী ছিলেন পরম দয়াবতী, তিনি রাজার কঠোর সঙ্কল্পের কথা শুনে তখনই ঠিক করেছিলেন যে, এই ছয় জনকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। তাই তিনি রাজার সামনে এসে এঁদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন।

রাজা এডওয়ার্ড তাঁর রাণীর এই অনুরোধ ঠেলে ফেলতে পারলেন না। তিনি সহরের চাবি নিয়েই ক্যালের সেই সাহসী ছয়টি লোককে মুক্তি দিলেন। এর পর অনেক বছর পর্য্যন্ত ক্যালে সহর ইংলণ্ডের অধীন ছিল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র **ব্ল্যাক প্রিন্স** শতবার্ষিক যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করতেন বলে তাঁকে সকলে "ব্ল্যাক প্রিন্স" বলতো।

যোয়ান অব আর্ক

তৃতীয় এডওয়ার্ডের পর রাজা **পঞ্চম হেনরী** আবার ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং ফরাসীদের অনেকগুলো যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে, তিনি ফ্রান্স জয় করে, তাকে ইংলণ্ডের অধীন করে নেন। তাঁর ছেলে **ষষ্ঠ হেনরী** ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

একটার পর একটা যুদ্ধে হারতে হারতে ফরাসীরা হতাশ হয়ে গিয়েছিল; তারা ভাবতে সুরু করেছিল যে আর যুদ্ধ করে লাভ নেই। এমনি সময় ফ্রান্সের এক গ্রামের একটি কৃষক-বালিকা, দেশের লোকের মনে সাহস জাগাতে আরম্ভ করলো। সবাইকে ডেকে সে বলতে লাগলো, "আবার

আমাদের স্বাধীনতা ফিরে আসবে। ওঠ, জাগো তোমরা, হতাশ হয়ো না।” এই বালিকাটির নাম **যোয়ান।**

যোয়ান লেখা-পড়া জানতো না। গ্রামের মেয়ে সে, আর দশটি গ্রামবাসীর মতই মানুষ হয়েছে। ইংরেজ এসে তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে এই কথাটা যখনই তার মনে আসতো, ব্যথায় তার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠতো। ভেড়া চরানো ছিল তার কাজ।

একদিন ভেড়ার পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে, একটি গাছে ঠেস দিয়ে সে যখন দেশের কথা ভাবছে, সেই সময় হঠাৎ তার মনে হলো যেন একজন দেবদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে, একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাকে ডেকে বলছেন, “তুমিই ইংরেজের কবল থেকে ফ্রান্সের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে পারবে। এই তলোয়ার নাও, সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে যাও।”

পর-মুহূর্ত্তেই অবশ্য যোয়ান আর সেই দেবদূতকে দেখতে পেল না, কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলো দেবদূত সত্যিই এসেছিলেন এবং ভগবানের ইচ্ছার কথা তাকে জানিয়ে গিয়েছেন।

সেই দিনই যোয়ান তার গ্রামের লোকদের বললো, “আমায় আমাদের ফরাসী রাজার কাছে নিয়ে চল।” তারপর যোয়ান তাদের সবাইকে সেই দেবদূতের কথা জানালো। তারা সে সব বিশ্বাসই করলো না, হেসেই যোয়ানের কথা উড়িয়ে দিল। ফ্রান্সের রাজ্যচ্যুত রাজা তখনও বেঁচে ছিলেন, তারা তাঁর কাছে যোয়ানকে নিয়ে যেতে সাহস করলো না।

যোয়ান কিন্তু দমবার পাত্রী নয়। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, দেশের স্বাধীনতা তার দ্বারাই আসবে। যোয়ানের ব্যাকুলতা এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা দেখে দেশের লোকদের মন একটু একটু করে ভিজতে লাগলো। শেষে তারা তাকে রাজার কাছে নিয়ে পৌঁছে দিল।

সব কথা শুনে যোয়ানের উপর রাজার ধারণাও খুব ভাল হলো না। তিনি ভাবলেন, তাঁকে ঠকিয়ে কিছু আদায় করাই হয়ত তার মতলব! কিন্তু তবুও তিনি ঠিক করলেন যে, মেয়েটিকে পরীক্ষা করাই যাক। যেদিন যোয়ানকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবার কথা, সেদিন তিনি অন্য একজন যোদ্ধাকে তাঁর আসনে বসিয়ে, নিজে সাধারণ পোষাক পরে অন্য লোকদের সঙ্গে ঘরের ভিতর রইলেন।

যোয়ান ঘরে ঢুকে রাজার সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে সেদিকে মোটেই

গেল না। চারপাশে একবার দেখে নিয়ে, সোজা রাজার কাছেই গিয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসলো। রাজা ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যোয়ান তাঁকে কেমন করে চিনলো! এর আগে কোনদিনও সে তাঁকে দেখে নাই। যোয়ানের কথায় তাঁর তখন আস্তে আস্তে বিশ্বাস হতে লাগলো। যোয়ান তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, "ভগবান এ দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবার জন্য আমায় আদেশ দিয়েছেন। আমাকে সৈন্য দাও, আমি তোমার শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।"

রাজা যোয়ানকে একটা ধবধবে সাদা ঘোড়া আর একটি ঝক্‌ঝকে সাদা নিশান দিয়ে তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিলেন, "তোমরা যোয়ানের সঙ্গে যাও। তার সমস্ত আদেশ পালন কর।" **যোয়ানের নেতৃত্বে** এই সৈন্যদল একটা সহর আক্রমণ করলো এবং সেটাকে দখলও করে নিল।

একজন মেয়েকে যুদ্ধ করতে দেখে ইংরেজেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবলো এ মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোন ডাইনী। যোয়ানকে আসতে দেখলেই অনেক ইংরেজ দৌড়ে পালিয়ে যেত। এই ভাবে একটির পর একটি **যুদ্ধে জয়লাভ করে,** যোয়ান ফ্রান্সের অনেক জায়গা ইংরেজদের হাত থেকে কেড়ে নিল। ফরাসী রাজা আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

রাজার যেদিন অভিষেক, তাঁর মাথায় যেদিন রাজমুকুট পরানো হয়, যোয়ান সেদিন তার সেই ঝক্‌ঝকে সাদা নিশানটি এক হাতে, আর এক হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। নিজের জন্য সে কোনদিন কিছু চায় নাই; তার স্বপ্ন, তার সাধনা ছিল দেশের লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। ফ্রান্সের রাজা যেদিন ফ্রান্সের রাজমুকুট মাথায় তুলে নিলেন, যোয়ান সেদিন মনে ভাবলো তার স্বপ্ন সফল হয়েছে, তার সাধনা সার্থক হয়েছে।

যোয়ানের মৃত্যুর কাহিনী বড়ই করুণ। একদিন হঠাৎ যোয়ান ফরাসী রাজার এক **শত্রুর হাতে ধরা** পড়ে গেল। সে তাকে সঁপে দিল ইংরেজদের হাতে। যোয়ানের জন্যই ফ্রান্সের রাজত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে ইংরেজরা এটা মোটেই ভুলতে পারে নাই, তার উপর তাদের ধারণা ছিল যোয়ান মানুষ নয়—**ডাইনী**। একজন পাদ্রী এবং কয়েকজন লোক দিয়ে যোয়ানের একটা বিচারও হয়ে গেল। বিচারকেরাও রায় দিলেন যে যোয়ান ডাইনী।

তখনকার দিনের লোকেরা কাউকে ডাইনী বলে সন্দেহ করলেই তাকে পুড়িয়ে মারতো। কাজেই এখানেও ঠিক হয়ে গেল যোয়ানকে **পুড়িয়ে মারা** হবে। যোয়ান এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে একটু ভয় পেল না, একবার কাঁপলো না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললো না।

কাঠের একটা স্তূপের উপর ইংরেজরা তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তার চারপাশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। যোয়ান তবুও অটল, অচল, স্থির! আকাশের পানে চোখ তুলে, জোড় হাত করে সে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলো। আগুনের শিখা লক্ লক্ করে তাকে ঘিরে ধরলো। যোয়ানের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

একজন ইংরেজ এই দৃশ্য দেখে আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠেছিলেন, "আমাদের আর উপায় নাই, আমরা এক স্বর্গের দেবীকে পুড়িয়ে মেরেছি!" এই লোকটির কথাই সত্যি হয়েছিল। ইংরেজরা তখনও ফ্রান্সের যে সব জায়গা দখলে রেখেছিল, যোয়ানকে পুড়িয়ে মারবার কিছু-দিন পরেই, ফরাসীরা তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফরাসী রাজত্ব চিরদিনের মত ইংরেজদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

স্পেনের রাজার ইংলণ্ড অভিযান

রাজা ষষ্ঠ হেনরীর পর **চতুর্থ এডওয়ার্ড** ইংলণ্ডের রাজা হন। চতুর্থ এডওয়ার্ডের দুই ছেলে ছিল। তিনি যখন মারা যান তখন তারা নাবালক। তাদের কাকা, রিচার্ড ছিলেন খুব নিষ্ঠুর এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তিনি কুঁজো হয়ে চলতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল, **কুঁজো রিচার্ড**।

চতুর্থ এডওয়ার্ড মারা যাবার পর তাঁর নাবালক বড় ছেলে রাজা হলেন বটে, কিন্তু কুঁজো রিচার্ডই তাঁর অভিভাবক হয়ে দেশ-শাসন করতে লাগলেন। শেষে একদিন রিচার্ড ছেলে দুটিকে জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করে, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছেলে দুটিকে **কারাগারে হত্যা** করিয়ে, নিজে পূরোদস্তুর রাজা হয়ে বসলেন।

রিচার্ড রাজা হয়ে উপাধি নিলেন, **তৃতীয় রিচার্ড** কিন্তু তাঁকে বেশী-দিন রাজত্ব করতে হলো না। দু' বছরের মধ্যেই, তাঁর সঙ্গে **হেনরী টিউডর** নামক একজন রাজার যুদ্ধ বেঁধে গেল। যুদ্ধে কুঁজো রিচার্ড নিহত

হলেন। নতুন রাজা, **সপ্তম হেনরী** এই নাম নিয়ে, ইংলণ্ডের রাজমুকুট মাথায় তুলে নিলেন।

"গোলাপের যুদ্ধের" দীর্ঘ গৃহ-যুদ্ধ ও স্বার্থদুষ্ট অভিজাতশ্রেণীর অনাচার-বিশৃঙ্খলার যুগের পর, সপ্তম হেনরী রাজা হয়ে, প্রসিদ্ধ **টিউডর-বংশের** প্রবর্ত্তন করেন। তারপর রাজা হলেন জবরদস্ত **অষ্টম হেনরী।** অষ্টম হেনরীর রাজত্বকাল একটি ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। সেই ঘটনাটিই ইংলণ্ডের ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেয়, এতে ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বহুদিন থেকেই রোমের পোপ খৃষ্টান জগতের ধর্ম্মগুরুরূপে সম্মান পেয়ে আসছিলেন। একচ্ছত্র প্রভুত্বের ফলে নৈতিক অবনতি সর্ব্বত্রই ঘটে। পোপ-দেরও নৈতিক অধঃপতন ঘটলো। তাঁদের অধীন ধর্ম্মযাজকদেরও চরিত্র অকলঙ্কিত রইলো না। তাঁরা অতিমাত্র বিলাসী ও অর্থগৃধ্নু হয়ে উঠলেন। তাঁদের অনাচারে ও অত্যাচারে সকল দেশের রাজা-প্রজা সমানভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

তৃতীয় রিচার্ড

অবশেষে জার্ম্মেণীর এক পল্লীতে, **মার্টিন লুথার** নামে এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হলো। তিনি পোপের ও যাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এবং বাইবেলের সরল অনুবাদ করে দেখিয়ে দিলেন যে, সে-পুণ্যগ্রন্থের কোথাও এমন কথা লেখা নাই যে, পোপের মতামত ধর্ম্ম-বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। লুথারের বহুপূর্ব্বে ইংলণ্ডে **জন ওয়াইক্লিফ** নামক এক ধর্ম্মসংস্কারক, ধর্ম্মযাজকশ্রেণীর অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। মার্টিন লুথারের মতাবলম্বীরা **প্রোটেষ্টাণ্ট** বা প্রতিবাদকারী নামে অভিহিত হলো।

তদবধি খৃষ্টজগৎ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা পোপের অনুরক্ত রইলো, তারা **রোমান ক্যাথলিক** নাম পেল। আর লুথারের ভক্তদের নাম হলো প্রোটেস্টাণ্ট। জার্ম্মেণী ও স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদের বহুল প্রচার ঘটলেও, ইংলণ্ড এ-যাবৎ রোমান ক্যাথলিকই ছিল।

কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে, অষ্টম হেনরীর সঙ্গে **পোপের মনোমালিন্য** ঘটলো। পূর্ব্বেকার দিন হলে, রাজাকে বাধ্য হয়ে পোপের আদেশই অবনত শিরে মেনে নিতে হতো; কিন্তু এখন সুযোগ পেয়ে অষ্টম হেনরী প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন এবং পোপকে অগ্রাহ্য করলেন।

সেই থেকে ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম দিনে দিনে প্রবল হতে লাগলো। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে **কার্ডিনাল উলসে** কিছুদিন তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। উলসে বৈদেশিক নীতিতে খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর পর, প্রথমে তাঁর পুত্র **ষষ্ঠ এডওয়ার্ড,** তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা **মেরী,** তারপর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা **এলিজাবেথ** সিংহাসনে আরোহণ করেন। এলিজাবেথের রাজত্বকালে, স্পেনের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** খুব শক্তিমান সম্রাট ছিলেন। রাণী এলিজাবেথ তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন এবং তিনি স্কটল্যাণ্ডের সুন্দরী রাণী মেরী ষ্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ড দেন। এই সব কারণে ফিলিপ ভীষণ চটে গিয়ে, নৌবহর দ্বারা ইংলণ্ড আক্রমণ করে, এলিজাবেথকে সমুচিত শাস্তি দিবেন এই মনস্থ করলেন। ইংলণ্ড জয় করতে হলে অনেক জাহাজ দরকার এটা তিনি বুঝলেন এবং সেইজন্য শত শত জাহাজ তৈরি করালেন।
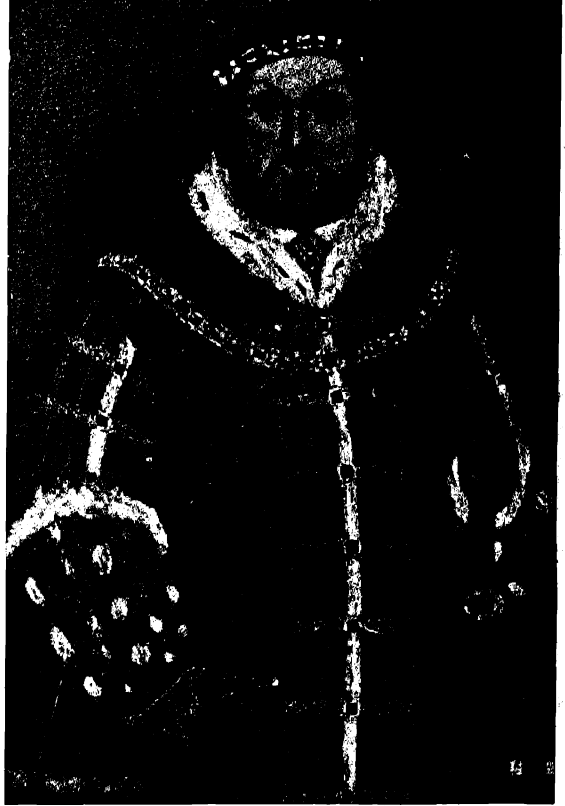
অষ্টম হেনরী

তারপর ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে একদিন তাঁর আদেশে, সেই সব জাহাজ হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে বেরিয়ে পড়লো। ইংরেজদেরও অনেক জাহাজ ছিল তবে সেগুলো ছিল স্পেনের জাহাজের চেয়ে ছোট এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগামী। **ফ্রান্সিস ড্রেক** নামক একজন বিখ্যাত নাবিক ছিলেন ইংরেজ নৌ-সৈন্যদের একজন সেনাপতি।

স্পেনের জাহাজ ইংলণ্ড আক্রমণ করতে আসছে এই সংবাদ চারদিকে রটে যাবার পর, ড্রেক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রাণী এলিজাবেথ নিজে

এসে সৈন্যদের উৎসাহ দিলেন। স্পেনের জাহাজ, ইংলণ্ডের উপকূলের কাছাকাছি এসে পৌঁছাবার পরই যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ইংরেজদের জাহাজগুলো ছিল ছোট, কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে পারতো। এরা দল বেঁধে স্পেনের জাহাজগুলোর কাছে গিয়ে, এক এক ঝাঁক গুলি মেরেই অমনি পালিয়ে আসতো, স্পেনের বড় বড় জাহাজ তাদের তাড়া করেও ধরতে পারতো না। এইভাবে এক সপ্তাহ যুদ্ধ চললো।

স্পেনের জাহাজগুলো আস্তে আস্তে ক্যালে সহরে পৌঁছে গেল। ইংরেজরা তখন তাদের জব্দ করবার জন্য নতুন ফন্দী আবিষ্কার করলো। তারা ছয়টি পুরাণ জাহাজ এমন সব জিনিষ দিয়ে বোঝাই করলো, যেগুলো খুব সহজে আগুন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একদিন রাত্রিবেলা তারা দূর থেকে, সেই **জাহাজগুলোতে আগুন ধরিয়ে** পাল তুলে, সেগুলোকে স্পেনের জাহাজগুলোর দিকে চালিয়ে ছেড়ে দিল।
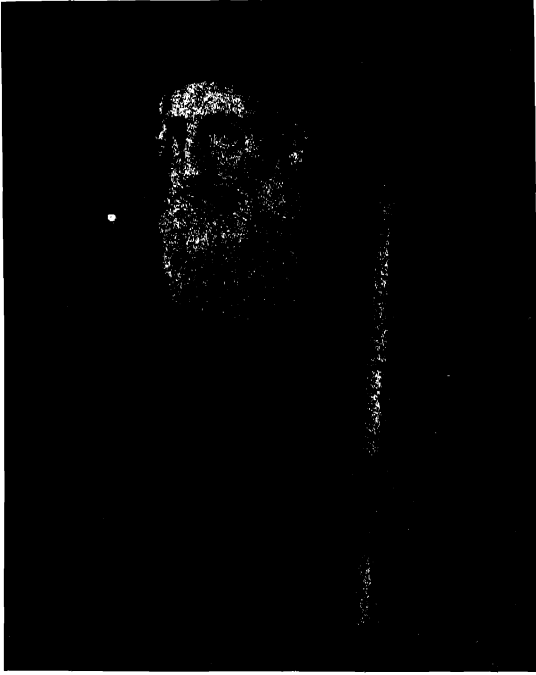
জন ওয়াইক্লিফ

স্পেনের নৌ-সেনাপতি বিপদটা বুঝতে পারলেন। তিনি দেখলেন যে, ইংরেজদের ঐ আগুন-ধরা জাহাজ যদি তাঁর জাহাজের ঝাঁকের ভিতর এসে ঢুকে পড়ে, তাহলে তাঁর জাহাজগুলোতেও আগুন ধরে যাবে। তিনি তখুনি হুকুম দিলেন, সব জাহাজ তাড়াতাড়ি নোঙ্গর তুলে সমুদ্রে ভেসে পড়বার জন্যে।

আগুন লাগার ভয়ে, স্পেনের জাহাজগুলো কে কোথায় ছুটে চলেছে তা কেউই ঠিক করতে পারছিল না। রাতের অন্ধকারে তারা এমনভাবে **ছত্রভঙ্গ** হয়ে পড়লো যে, পরদিন সকালে ইংরেজদের জাহাজগুলো তাদের খুঁজে বের করে, এক এক করে ডুবিয়ে দিতে লাগলো। তারপর এক **ভীষণ ঝড়** উঠলো। এই ঝড়েও স্পেনের অনেক জাহাজ এসে চড়ায়

ঠেকে সেখানে আটকে গেল। মোটে তিপ্পান্নটি জাহাজ স্পেনে ফিরে যেতে পেরেছিল।

স্পেনের সম্রাটের এই গর্ব্বিত-অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতার পর, ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে উৎসব স্বুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক গির্জ্জায় অসংখ্য লোক সমবেত হয়ে, এই বিপদ থেকে মুক্ত করে দেবার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। সমস্ত পৃথিবীতে যখন এই খবর ছড়িয়ে পড়লো, সকলে তখন স্বীকার করলো ইংরেজের জাহাজের সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ নয়।
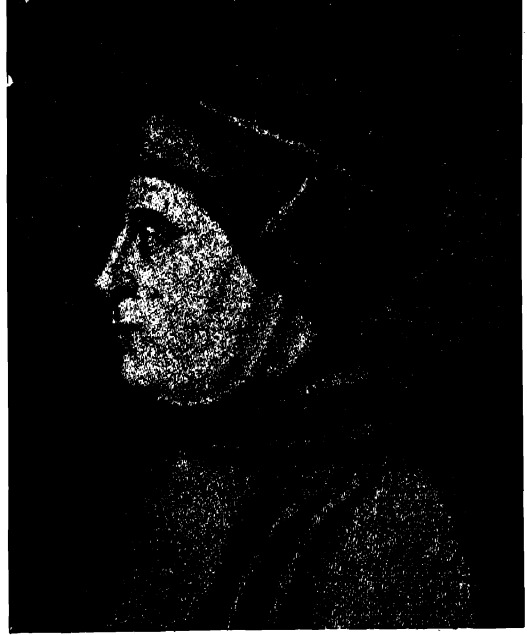
কার্ডিনাল উলসে

স্পেনকে হটিয়ে দেবার পর, এলিজাবেথের রাজত্বের শেষের দিকে ইংলণ্ড সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা সমস্ত দিকেই খুব উন্নত ও সমৃদ্ধ হলো। অমর সাহিত্যিক **সেক্সপিয়র** এই যুগেরই লোক।

ওলিভার ক্রমওয়েল

রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর, স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী ষ্টুয়ার্টের ছেলে, রাজা **প্রথম জেমস** ইংলণ্ডে **ষ্টুয়ার্ট-বংশের** প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর সময়, রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধের সূত্রপাত হয়, এই বিরোধ চরমে ওঠে তাঁর ছেলে প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে। জেমসের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র **প্রথম চার্লস**। চার্লস এমনি ভাল লোক ছিলেন কিন্তু তাঁর একটা মস্ত দোষ এই ছিল যে, রাজ্যশাসন-ব্যাপারে তিনি কোন লোকের পরামর্শ শুনতেন না, সম্পূর্ণ-ভাবে নিজের ইচ্ছামত তিনি চলতে চাইতেন।

ইংলণ্ডে ততদিনে একটা পার্লামেন্ট ভালরূপে গড়ে উঠেছে। জমিদারদের স্থলে এ সময়ে পার্লামেন্টে উগ্রপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রধান হয়ে ওঠে।

রাজা এই পার্লামেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করবেন, দেশের লোকেরা তাই চাইতো। রাজা চার্লস যতই **খামখেয়ালী ভাবে** চলতে আরম্ভ করলেন তাঁর বিরুদ্ধেও তেমনি একটা মস্ত দল গড়ে উঠতে লাগলো।

রাজার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ালো লোকে তাদের নাম দিল, **রাউণ্ডহেড**।

রাণী এলিজাবেথ

রাউণ্ডহেড মানে হচ্ছে গোল মাথা। এদের রাউণ্ডহেড বলতো এইজন্য যে, এরা খুব ছোট ছোট করে চুল ছাঁটতো, কাজেই মাথাটা একেবারে গোল দেখা যেত। দেশের জমিদার, ধনিকশ্রেণী এবং আরও অনেকে ছিল রাজার দলে ; এরা আবার লম্বা লম্বা চুল রাখতো। রাউণ্ডহেডরা সাধারণ পোষাক পরতো এবং তারা ছিল খুব গম্ভীর প্রকৃতির। রাজার সমর্থকেরা পরতো রংচং-এ পোষাক এবং তারা খুব হেসে খেলে বেড়াতে ভালবাসতো।

ক্রমে ক্রমে এই দুই দলের মতবিরোধ চরমে উঠলো এবং শেষ পর্য্যন্ত রাউণ্ডহেডদের সঙ্গে, রাজা চার্লসের দলের **গৃহযুদ্ধ** বেঁধে গেল। ছয় বছর এই যুদ্ধ চললো, দু'পক্ষেই অনেক লোক মারা গেল। রাউণ্ডহেডদের নেতা ছিলেন **ওলিভার ক্রমওয়েল** নামক একজন দৃঢ়-চরিত্র, শক্তিশালী লোক। এই যুদ্ধে ক্রমওয়েল জয়লাভ করলেন, রাজা চার্লস প্রাণের ভয়ে পলায়ন করলেন স্কটল্যাণ্ডে। সেখানকার লোকেরা কিন্তু তাঁকে আশ্রয় দিল না, বরং তাঁকে ধরে নিয়ে রাউণ্ডহেডদের হাতে সমর্পণ করলো।

দ্বিতীয় ফিলিপ

দেশের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, রাজার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে, রাউণ্ডহেডরা চার্লসের বিচার করলো। বিচারে তাঁর **প্রাণদণ্ডের আদেশ** হলো। তারপর একদিন রাজা প্রথম চার্লসের মাথা **কেটে ফেলা হলো**। ওলিভার ক্রমওয়েল নিজে রাজা হলেন না, কিন্তু রাজার জায়গায় তিনিই দেশ-শাসন করতে আরম্ভ করলেন।

ফ্রান্সিস ড্রেক

রাজা চার্লসের এক ছেলে ছিল। সাধারণ নিয়মে অবশ্য তাঁরই রাজা হওয়ার কথা; কিন্তু দেশের লোকে তাঁকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে রাজি হলো না, তারা ক্রমওয়েলের শাসনই মেনে নিল। চার্লসের ছেলে বেঁচে থাকলে, হয়ত হঠাৎ কোনদিন, সে রাজা হবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করে দেবে এই ভেবে, ক্রমওয়েলের দলের লোকেরা, তাঁকে ধরবার জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগলো। রাজপুত্র এই খবর পেয়ে **ফ্রান্সে পালিয়ে** গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। যতদিন ক্রমওয়েল বেঁচে ছিলেন, তিনি আর দেশে ফেরেন নাই। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর, তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং তখন দেশের লোকের

ইচ্ছায়ই তিনি রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁর নাম হয়, **দ্বিতীয় চার্লস।** ক্রমওয়েলের শাসনকাল, ইংলণ্ডে সামরিক কর্তৃত্বেরই নামান্তর তবে এ সময় বৈদেশিক ব্যাপারে খুব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন হয়েছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের পরে **দ্বিতীয় জেমস** রাজ-সিংহাসনে বসলেন। তিনিও একজন স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালী শাসক ছিলেন। ধর্ম্মব্যাপারে তিনি প্রোটেস্টাণ্টদের অপ্রিয়ভাজন হন। অনেক দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী থেকে প্রোটেস্টাণ্টদের বিতাড়িত করে, তিনি রোমান ক্যাথলিকদের সেখানে বহাল করেন।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ছিল প্রোটেস্টাণ্ট; তারা রাজা জেমসের উপর বিরক্ত হয়ে, জেমসের প্রোটেস্টাণ্ট জামাতা, হল্যাণ্ডের **রাজা উইলিয়মকে** ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণ করতে **আহ্বান করেন।** রাজা উইলিয়ম ইংলণ্ডে এসে, **তৃতীয় উইলিয়ম** উপাধি নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করলেন। দ্বিতীয় জেমস যুদ্ধ না করে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনা ইংলণ্ডের ইতিহাসে, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের, **"রক্তপাতহীন গৌরবময় বিপ্লব"** নামে খ্যাত।
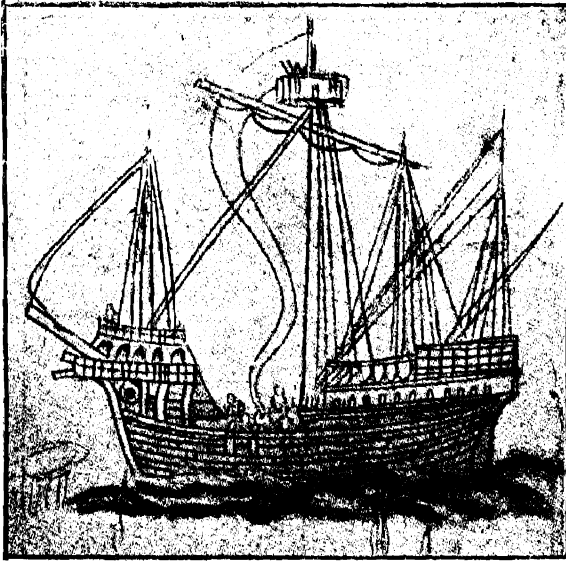
চারি মাস্তুলবিশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পর **রাণী অ্যান** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে "স্পেন-সিংহাসন উত্তরাধিকার যুদ্ধে" ইংলণ্ডের অজেয় সেনাপতি, **মার্লবরো** বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

রাণী অ্যানের মৃত্যুর পর, জার্ম্মেণীর অন্তর্গত, হ্যানোভার রাজ্যের **প্রথম জর্জ্জ** এসে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এইরূপে ইংলণ্ডে **হ্যানোভার-বংশের** রাজত্বকাল স্থরু হয়। ইংলণ্ডে প্রথম জর্জ্জ ও দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্ব-কালের বিখ্যাত লোকদের মধ্যে **ওয়ালপোল** এবং **বড় পিটের নাম** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ালপোল দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনেন এবং তাঁকে ইংলণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। বড় পিট নামজাদা সমর-সচিব ছিলেন।

তিনি **'সপ্ত-বার্ষিক যুদ্ধে'** (১৭৫৬-১৭৬৩ খৃঃ) বিশেষ কৌশল দেখিয়ে, পৃথিবীর নানাস্থানে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যপ্রসার করেন।

দ্বিতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর **তৃতীয় জর্জ্জ** ইংলণ্ডের অধীশ্বর হন। তাঁর স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রান্তনীতির ফলে, উত্তর-আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করে এবং জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন হয়। এইভাবে **আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি** হয় (১৭৮৩ খৃঃ)।

নেলসন

ইংলণ্ড যে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী হয়েছিল তার প্রধান কারণ, ইংলণ্ডে অনেক বড় বড় যোদ্ধা এবং নাবিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইংলণ্ডের নাবিকদের মধ্যে জলযুদ্ধে যাঁরা সবচেয়ে বড় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নেলসনের সম্মান সবার চেয়ে বেশী।
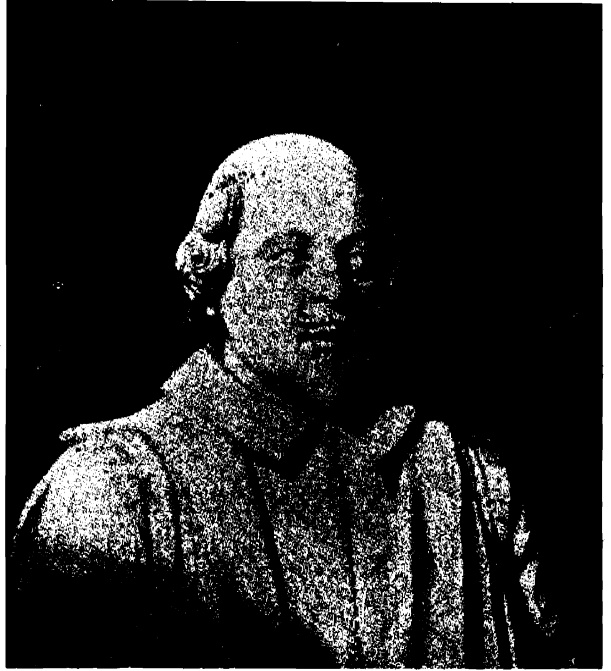
সেক্সপিয়র

নেলসনের পূরা নাম ছিল, **হোরেসিও নেলসন।** ছোটবেলায় তিনি রোগা ও দুর্ব্বল ছিলেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ও সাহস খুব প্রবল ছিল। তিনি তাঁর ঠাকুরমার কাছে থাকতেন।

একদিন বালক নেলসন একা বাইরে গিয়েছেন ; সারাদিন তাঁকে ফিরতে না দেখে ঠাকুরমা খুব চিন্তিত হয়ে, বাড়ীর চাকরকে তাঁর খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। চাকর অনেক খোঁজাখুঁজি করে, তাঁর সন্ধান পেয়ে, তাঁকে বাড়ীতে

ডেকে নিয়ে এল। ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন, "সারাদিন ছিলে কোথায়? ভয়-ডর বলেও কি কিছু তোমার নেই।" নেলসন অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, "ভয়! সে আবার কে? তাকে তো কখনও দেখি নাই!" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, নেলসন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভয় কাকে বলে জানতেন না।

বার বছর বয়সে, নেলসন ঠাকুরমার কাছে বিদায় নিয়ে, জাহাজে নাবিকের কাজ শিখতে চলে গেলেন। তিনি এত ভাল করে কাজ শিখেছিলেন যে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই, তাঁকে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেনের দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হলো।

নেলসনের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরাট এক যুদ্ধ বেঁধে গেল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে প্রথমে হলো **'ফরাসী-বিপ্লব'** ও তার অল্প পরেই, বিখ্যাত যোদ্ধা **নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান** হলো। নেপোলিয়নের ভয়ে তখন সারা ইউরোপ কম্পমান। তাঁর বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধের সমস্ত ভার এসে পড়লো নেলসনের উপর। তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে অনেকগুলো জলযুদ্ধে, ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে হারিয়ে দিলেন। একটা যুদ্ধে নেলসনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল, আর এক যুদ্ধে তাঁর একটা হাত উড়ে গেল; কিন্তু তবু তিনি দমবার পাত্র নন।

প্রথম চার্লস

একবার ফরাসীপক্ষীয় ডেনদের যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ-জাহাজের প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। ডেনরা এত ভাল যুদ্ধ করেছিল যে, ইংরেজ নৌ-সেনাপতি ভাবলেন যে, তিনি জয়লাভ করতে পারবেন না। এই ভেবে তিনি যুদ্ধ থামাবার সঙ্কেত করে নিশান উড়িয়ে দিলেন।

নেলসন এই যুদ্ধে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি যখন খবর পেলেন যে, সেনাপতি যুদ্ধ থামাবার জন্য সঙ্কেত করছেন তখন তিনি

মনে মনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন। নাবিকদের কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন না, একটা দূরবীণ নিয়ে নিজের অন্ধ চোখটিতে লাগিয়ে তিনি শুধু বললেন, "কই, যুদ্ধ থামাবার কোন সঙ্কেত তো আমি দেখতে পাচ্ছি না! তোমরা আরও বেশী করে গোলা চালাও।"

যুদ্ধ পেলে নেলসন আর কিছু চাইতেন না। তাঁর উৎসাহে নাবিকেরা এমন ভীষণ যুদ্ধ সুরু করলো যে, ডেনদের যুদ্ধ-জাহাজগুলো পালাতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত নেলসনই জয়লাভ করলেন বালটিকের যুদ্ধে।

এই যুদ্ধে নেলসনের বুদ্ধি এবং বীরত্ব দেখে রাজা এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি নেলসনকে **লর্ড** করে দিলেন এবং তাঁকে নৌ-বিভাগে এডমিরালের পদে উন্নীত করলেন। এডমিরাল হলো নৌ-বিভাগের সবচেয়ে বড় সম্মান-জনক পদ।

ওলিভার ক্রমওয়েল

নেলসনের শেষ যুদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্স এবং স্পেনের মিলিত নৌ-বহরের সঙ্গে। নেপোলিয়নের ফরাসী নৌবহর, স্পেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করবার উপক্রম করলো, নেলসন তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য রওনা হলেন। স্পেনের উপকূলে, **ট্রাফালগার** অন্তরীপের কাছে নেলসনের জাহাজগুলির সঙ্গে ফ্রান্স ও স্পেনের জাহাজের **ভীষণ যুদ্ধ** হলো (১৮০৫ খৃঃ)। যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ একটা গুলি এসে নেলসনের গায়ে বিঁধলো। তিনি পড়ে গেলেন। নাবিকেরা ছুটে এসে ধরাধরি করে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করেছে এই সংবাদটি শোনবার জন্যই যেন তিনি বেঁচে রইলেন!

যুদ্ধ শেষ হলে, তাঁর লোকজন এসে যখন তাঁকে জয়ের কথা জানালো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি শুধু বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি।" এর অল্পপরেই তিনি মারা যান। নেলসনের কৃতিত্বের ফলে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড আক্রমণ ও জয়ের পরিকল্পনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

নেলসন যে জাহাজে যুদ্ধ করেছিলেন তার নাম ছিল 'ভিক্টরী'। এই জাহাজটি পুরাণ হয়ে গেলেও ইংরেজরা তাকে নষ্ট করেনি; নেলসনের স্মৃতিরক্ষার জন্য অত্যন্ত যত্ন করে, পোর্টসমাউথ নামক বন্দরে সেটিকে রেখে
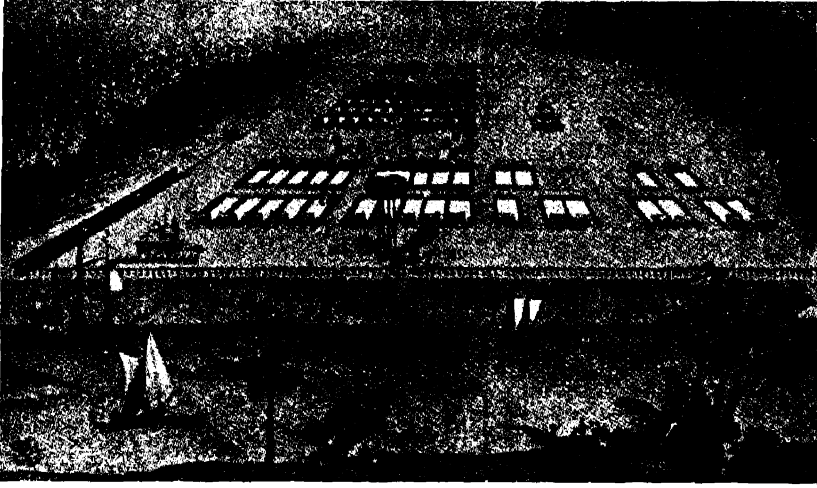
আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশ

দিয়েছে। ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসন যেদিন জয়লাভ করেছিলেন, প্রতি বৎসর সেই তারিখে, ভিক্টরী জাহাজের মাস্তুলের উপর নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সেনাপতি ওয়েলিংটন

নেলসন ছিলেন জলযুদ্ধে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা, আর স্থলযুদ্ধে সবার চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়ে, অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন **ডিউক অব ওয়েলিংটন।** ওয়েলিংটনেরও যুদ্ধ করতে হয়েছিল ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেপোলিয়নের সঙ্গে।

নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের সম্রাট, দেশের পর দেশ জয় করে বেড়ানোই ছিল তাঁর নেশা। ইউরোপের প্রায় সব দেশকেই তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডকে অনেক চেষ্টা করেও তিনি কাবু করতে পারেন

অষ্টম এডওয়ার্ড, ষষ্ঠ জর্জ্জ ও রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুর পরে, তাঁর বড় ছেলে **অষ্টম এডওয়ার্ড** ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অষ্টম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রেও গিয়েছেন।

অষ্টম এডওয়ার্ড খুব স্বাধীনচেতা ছিলেন। নিজের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করার চেয়ে সিংহাসন ত্যাগ করাও তিনি শ্রেয়ঃ মনে করতেন। **মিসেস সিম্পসন** নামে এক আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিয়ে করতে চান। ইংলণ্ডের মন্ত্রীরা এতে ঘোর আপত্তি করেন। প্রধানমন্ত্রী ষ্টানলি বলডুইন, অষ্টম এডওয়ার্ডকে এই বিয়ে না করবার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। নিজের বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্য থাকবে না, অষ্টম এডওয়ার্ড একথা মানতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

অষ্টম এডওয়ার্ড

অষ্টম এডওয়ার্ড তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করলেন না; ইংলণ্ডের **সিংহাসন ত্যাগ করে**, তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। এখন তিনি **ডিউক অব উইণ্ডসর** নামে পরিচিত। মিসেস সিম্পসনকে তিনি বিয়ে করেছেন।

অষ্টম এডওয়ার্ডের মেজ ভাই ছিলেন **ডিউক অব ইয়র্ক**। দাদার সিংহাসন ত্যাগের পর ইনিই রাজা হলেন এবং **ষষ্ঠ জর্জ্জ**, এই নাম গ্রহণ করলেন। ষষ্ঠ জর্জ্জ অনেক বছর রাজত্ব করবার পর, কিছুদিন পূর্ব্বে, ১৯৫২ সাল, ফেব্রুয়ারী মাসে মারা গিয়েছেন। তাঁর প্রথমা কন্যা এলিজাবেথ, **দ্বিতীয় এলিজাবেথ** নামে এখন ইংলণ্ডের রাণী হয়েছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরে, এই আর একজন রাণী ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছে।

জেমস ওয়াট ও জর্জ্জ ষ্টিফেনসন

শুধু রাজা-রাণীদের কথা জানলেই ইংলণ্ডের ইতিহাসের সবখানি জানা যাবে না, তার শিল্প-বাণিজ্য এবং কলকারখানার কথাও জানতে হবে।

ষষ্ঠ জর্জ্জ

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হবার আগে ইংলণ্ড ছিল কৃষিজীবী দেশ। জমি চাষ করে এবং গরু-ভেড়া পালন করেই লোকে জীবন ধারণ করতো। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হবার পর থেকেই ইংলণ্ডে মস্ত মস্ত কলকারখানা গড়ে উঠতে আরম্ভ হয়। এই সব কারখানায় তৈরি জিনিষ জাহাজে করে, দূর বিদেশে যেদিন থেকে চালান দেওয়া স্নুরু হলো, সেদিন থেকেই ইংলণ্ডের ধনদৌলত খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে আরম্ভ করলো।

এই **বাষ্পচালিত ইঞ্জিন** যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম **জেমস ওয়াট**। ওয়াট যখন বালক, তখন একদিন তিনি এক টেবিলে তাঁর কাকা আর কাকীমার সঙ্গে চা খেতে বসেছিলেন। টেবিলের উপর ষ্টোভে একটা কেটলিতে চায়ের জল গরম হচ্ছিল। সামনে কেকগুলো রয়েছে কিন্তু ওয়াট সেদিকে না তাকিয়ে, শুধু দেখছিলেন কেমন করে কেটলির মুখ দিয়ে

ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর কেটলির ঢাকনিটা লাফিয়ে উঠছে! তিনি ঢাকনিটা দু-একবার চেপে ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তবুও সেটা লাফিয়ে উঠতে লাগলো।

সাধারণ জল ফুটে যে বাষ্প হয়, সেই বাষ্পের এত জোর দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এরপর থেকে তিনি দিনরাত ভাবতে লাগলেন, এই বাষ্পকে কেমন করে মানুষের কাজে লাগান যায়! তাঁর সাধনা ব্যর্থ হলো না, বড় হয়ে তিনি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরি করতে পারলেন।

কাপড়ের কল ও পশমের কলে এই ইঞ্জিন বসিয়ে, কল চালান আরম্ভ হলো, তখন হতে মানুষের খাটুনি অনেক কমে গেল, আর সূতার কাপড়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যুৎ-চালিত কাপড়ের কল

ও পশমের কাপড় খুব তাড়াতাড়ি বেশী বেশী করে তৈরি হতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে এই ইঞ্জিনের সাহায্যে **খনি থেকে কয়লা** তোলা হতে লাগলো। এই ইঞ্জিনের জোরে **জাহাজ ও ট্রেণ** আগেকার চেয়ে অনেক জোরে চলতে আরম্ভ করলো।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ইংলণ্ডকে যে সম্পদের অধিকারী করেছে, পৃথিবীতে তার তুলনা নাই। ইংলণ্ডের যে ধনসম্পদ দেখে পৃথিবীশুদ্ধ লোক অবাক হয়েছে, তার সবই এসেছে এই বাষ্পের ইঞ্জিনের দৌলতে।

রেলওয়ে ইঞ্জিন অবশ্য ওয়াটের আগেই আর একজন ইংরেজ তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাম **জর্জ্জ ষ্টিফেনসন**। ওয়াটের মৃত্যুর পাঁচ বছর

আগে, ষ্টিফেনসনের তৈরি ইঞ্জিন রেল টানতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা নেলসন, ওয়েলিংটন প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধাদের যেমন ভুলতে পারবে না, জেমস ওয়াট, জর্জ্জ ষ্টিফেনসনকেও তেমনি চিরদিন মনে রাখবে। নেলসন এবং ওয়েলিংটন বাইরের শত্রুকে পরাজিত করে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ

আধুনিক কাপড়ের কল

রেখেছিলেন, আর ওয়াট এবং ষ্টিফেনসন, দৈত্যের মত বিরাট শক্তিশালী বাষ্পকে কাবু করে, তাকে মানুষের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছেন।

ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের রাজা দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা, তাঁর হুকুমে দেশের রাজকার্য্য পরিচালিত হয় এবং **আইন তৈরি** হয়। দেশের যে কোন মামলা-মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচারও একমাত্র তিনিই করতে পারেন। কিন্তু রাজা একান্ত নিজের ইচ্ছায় এর একটি কাজও করতে পারেন না।

দেশ-শাসনের জন্য যখন তিনি কোন আদেশ দেন, তখন **মন্ত্রীদের পরামর্শ** তাঁকে শুনতে হয় এবং মন্ত্রীরা তাঁর কোন আদেশ সম্বন্ধে আপত্তি করলে, তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কোন আইন জারী করতে হলেও তেমনি তাঁকে **পার্লামেণ্টের পরামর্শ** শুনতে হয়। পার্লামেণ্ট যেভাবে আইন জারী করা হবে বলে ঠিক করে দেন, রাজাকে সেই ভাবেই তা করতে হয়।

উইলিয়ম পিট, আর্ল অব চ্যাথাম
(বড় পিট)

বিচারের বেলাতেও তাই। **প্রিভি কাউন্সিল** বলে রাজার একটি মন্ত্রণা-পরিষদ আছে, দেশের সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই পরিষদের সভ্য। সব আদালতের মামলায় হেরে গিয়ে কোন লোক রাজার কাছে চূড়ান্ত বিচার প্রার্থনা করলে, এঁরা আগে সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখেন এবং দু'পক্ষের ব্যারিষ্টারদের বক্তব্য শোনেন। তারপর তাঁরা সেই মামলা সম্বন্ধে যে রায় দেওয়া ভাল মনে করেন, রাজাকে ঠিক সেইভাবে রায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রাজাকে তাঁদের পরামর্শ শুনে, তাঁদেরই কথামত রায় দিতে হয়।

ইংলণ্ডের রাজা সমস্ত দেশের অধীশ্বর, দেশের সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি সবই তাঁর অধীন, তবুও তাঁকে রাজ্য শাসন করতে গিয়ে মন্ত্রীদের কথা শুনে চলতে হয় কেন? চলতে হয় এইজন্য যে, রাজা যদি মন্ত্রীদের পরামর্শ না শোনেন, তাহলে তাঁরা এসে পার্লামেণ্টের কাছে নালিশ করবেন।

পার্লামেণ্টে যাঁরা দলে ভারী, মন্ত্রীরা তাঁদের প্রতিনিধি। মন্ত্রীরা তাঁদের সমস্ত কাজের জন্যে এঁদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। পার্লামেণ্টের

সভ্যদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া আর দেশের সব লোককে সে কথা জানানো একই জিনিষ। কারণ, পার্লামেণ্টের সভ্যরা দেশের লোকের প্রতিনিধি।

আগে ইংলণ্ডের অনেক রাজাই তাঁদের কোন কাজের জন্য দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে চাইতেন না। প্রজারা কিন্তু চাইতো যে, রাজা কোন কর বসাতে হলে অথবা কোন আইন পাশ করতে হলে, তাদের মতামত জেনে তবে সে কাজ করবেন। এই নিয়ে এক এক রাজার সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ বাঁধতো। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজা-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত ঘটতো।

শেষ পর্য্যন্ত রাজারা বাধ্য হয়ে এই নিয়ম মেনে নিয়েছেন যে, প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে পার্লামেণ্ট গঠিত হবে। পার্লামেণ্টে দুটি ভাগ থাকবে; প্রজাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে **কমন্স-সভা** আর রাজা যাঁদের লর্ড উপাধি দেবেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত হবে **লর্ড-সভা**। এই দুই সভা যে আইন পাশ করা উচিত বলে ঠিক করে দেবেন, রাজা তা'তে সই করবেন। পার্লামেণ্টের অনুমোদন না নিয়ে, তিনি নিজে হতে কোন আইন জারী করতে পারবেন না। দেশে যে কোন রকম কর বসাতে হলে, পার্লামেণ্টের সম্মতি নিতে হবে।
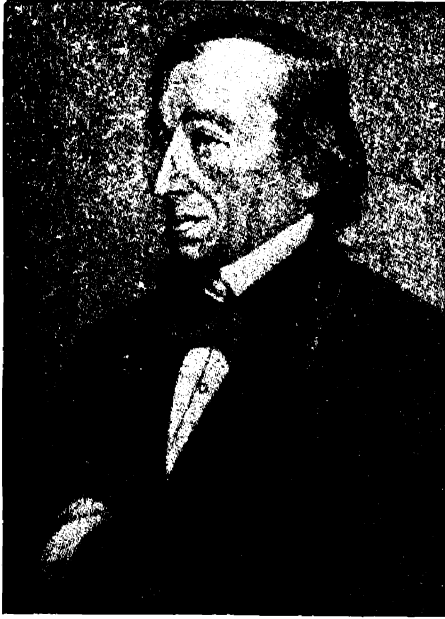
ডিজরেলি

কমন্স-সভার সভ্যেরা এক একটি দলের অন্তর্ভুক্ত থাকেন; যেমন **রক্ষণশীল দল, উদারনৈতিক দল, শ্রমিক দল,** স্বতন্ত্র দল প্রভৃতি। এর মধ্যে যে-দল একা অথবা দু-তিন দল মিলে ভারী হবে, তারাই ঠিক করবে কারা দেশের মন্ত্রী হবেন।

মন্ত্রীদের এক এক জনের উপর এক একটা বিভাগের ভার থাকে; যেমন, দেশের পুলিশ-বিভাগের ভার থাকে স্বরাষ্ট্র-সচিবের হাতে, বিদেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার এবং সন্ধি করার ভার থাকে বৈদেশিক সচিবের হাতে,

প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা এবং সেটা খরচ করবার ভার থাকে অর্থ-সচিবের হাতে ইত্যাদি।

সমস্ত বিভাগের কাজ চলে রাজার নামে, কিন্তু তার জন্য পার্লামেণ্টের কাছে **দায়ী** থাকতে হয় মন্ত্রীদের। তার মানে, বিদেশের সঙ্গে যদি কোন সন্ধি হয়, তাহলে সেটা প্রচার করা হবে এই বলে যে, রাজা সেই সন্ধি করেছেন; কিন্তু পার্লামেণ্টের সভ্যেরা যদি মনে করেন যে, সন্ধি করাটা ভাল কাজ হয় নাই, তাহলে তাঁরা রাজার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইবেন না, তাঁরা বৈদেশিক মন্ত্রীকে চেপে ধরবেন কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে। রাজা যে দলিলে সই করবেন, সেই দলিলে একজন না একজন মন্ত্রীকে সই করতেই হবে, এবং যদি সেই দলিলের কোন কথা নিয়ে কখনও আপত্তি ওঠে, তাহলে সেই মন্ত্রীকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, এই হলো ইংলণ্ডের নিয়ম।

গ্ল্যাডষ্টোন
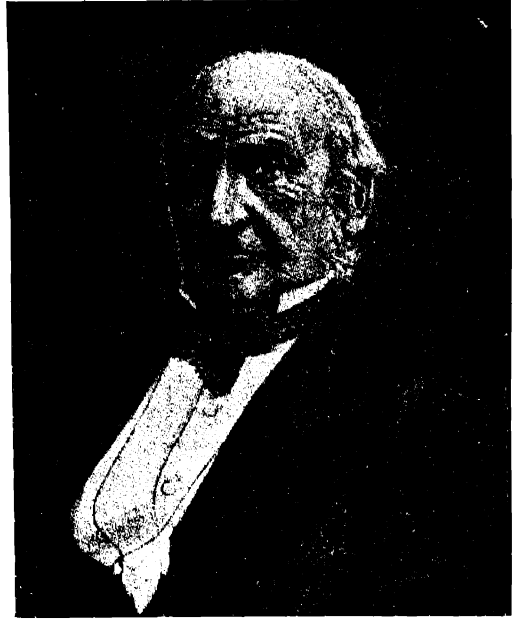
পার্লামেণ্টের **সদস্য নির্ব্বাচন** হয় পাঁচ বছর পর পর। নির্ব্বাচন হয় শুধু কমন্স-সভার জন্য। লর্ড-সভার সদস্যেরা দেশের লোকের ভোটে নির্ব্বাচিত হন না; রাজা যাঁদের লর্ড উপাধি দেন, তাঁরাই সেখানকার সদস্য হন। কমন্স-সভায় **প্রায় সাড়ে ছয়শো জন** সদস্য থাকেন। নির্ব্বাচন হয়ে গেলে পর, যে দলের সদস্য কমন্স-সভায় সংখ্যায় বেশী হন, সেই দলের নেতাকে রাজা ডেকে পাঠান এবং তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করবার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি তখন যাঁদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান, তাঁদের নাম রাজার কাছে দাখিল করেন এবং রাজা সেটা মঞ্জুর করেন। দলের নেতা নিজে হন **প্রধানমন্ত্রী**। একে বলে **ক্যাবিনেট**। মন্ত্রীরা এক-একজন এক-একটি বিভাগের ভার নেন এবং তাঁদের হুকুমে, সেই সব বিভাগ পরিচালিত হয়।

কোন **আইন** পাশ করার দরকার হলে, মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে তার জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাকে বলে **বিল** ; এই বিল কমন্স-সভা এবং লর্ড-সভা দুটোতেই যখন পাশ হয়ে যায় তখন রাজা তাতে সম্মতি দেন। রাজার সম্মতি পাওয়ার পর সেই বিল আইনে পরিণত হয়। দেশে কোন রকম কর বসাবার দরকার হলে, মন্ত্রীরা একটি বিলের মত করে যদি সেই প্রস্তাব পাশ করাতে না পারেন, তাহলে তাঁরা, কারও কাছ থেকে কর আদায় করতে পারেন না।

এরই নাম **পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্ট।** এই নিয়মে গবর্ণমেণ্ট চললে রাজার সম্মানও অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রজাদের অধিকারও বজায় থাকে। এইজন্য ইংলণ্ডের এই পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্টকে পৃথিবীর অনেক দেশ নকল করেছে।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে এই কয়জনের নাম **বিশেষ উল্লেখযোগ্য** ; **ওয়ালপোল, বড় পিট** বা আর্ল অব চ্যাথাম ও তাঁর ছেলে **ছোট পিট, রবার্ট পীল, পামারষ্টোন, গ্ল্যাডষ্টোন, ডিজরেলি, লয়েড জর্জ্জ, চার্চ্চিল** এবং **এটলি।** এঁরা সকলেই রাজনীতিতে ও নানা বিষয়ে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ইংলণ্ডের রাজবংশ

নরম্যানরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে, জয়লাভ করবার পর প্রথম উইলিয়ম সেখানকার রাজা হলেন। তাঁর আমল থেকে আরম্ভ হলো, **নরম্যান-রাজ-বংশ।** এঁর আগে সমস্ত ইংলণ্ডের উপর বংশানুক্রমে কোন রাজা রাজত্ব করতে পারেন নাই। নরম্যান-বংশের চার জন রাজা রাজত্ব করেছেন ; **প্রথম উইলিয়মের** পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় উইলিয়ম** রাজা হন, তাঁর পরে দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাই **প্রথম হেনরী** সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম হেনরীর পুত্রসন্তান ছিল না, কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর ভাগিনেয় **ষ্টিফেন।**

নরম্যান-বংশের পর ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন **প্লাণ্টাজেনেট-বংশ।** প্রথম হেনরীর দৌহিত্র **দ্বিতীয় হেনরী** থেকে এই বংশ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় হেনরীর পিতা ছিলেন ফ্রান্সের আঞ্জু নামক স্থানের অধিপতি। তিনি নিজের মুকুটে তৃণগুচ্ছ ধারণ করতেন। ল্যাটিন ভাষায় তৃণগুচ্ছকে বলে 'প্লাণ্ট-জেনিষ্ট'—এইজন্য তাঁর বংশের নামই হয়ে গেছে **প্লাণ্টাজেনেট-বংশ।**

প্লান্টাজেনেট-বংশের সপ্তম রাজা ছিলেন **তৃতীয় এডওয়ার্ড।** তৃতীয় এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র **দ্বিতীয় রিচার্ড** রাজা হন। তৃতীয় এডওয়ার্ডের জীবিতকালেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রিচার্ডের পিতা **ব্ল্যাক প্রিন্সের মৃত্যু** হয়েছিল। **জন অব গণ্ট** ছিলেন তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় সন্তান। এঁর পুত্র হেনরীর সঙ্গে, দ্বিতীয় রিচার্ডের সিংহাসন নিয়ে ভীষণ শত্রুতা আরম্ভ হয়। এই নিয়ে যুদ্ধও হয়। এই যুদ্ধই **ল্যাঙ্কাষ্ট্রিয়ান বিপ্লব** নামে পরিচিত (১৩৯৯ খৃঃ)। **হেনরী** ইংলণ্ডের অন্তর্গত ল্যাঙ্কাষ্টার নামক স্থানের ডিউক ছিলেন, এইজন্য তাঁর দলকে বলতো 'ল্যাঙ্কাষ্ট্রিয়ান দল'। তৃতীয় এডওয়ার্ডের বংশধরগণের মধ্যে, সিংহাসন নিয়ে, এই শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বছর ধরে চলে। এই ঝগড়া থেকে **গোলাপের যুদ্ধের** উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধ ল্যাঙ্কাষ্ট্রিয়ান ও ইয়র্কিষ্ট দলের মধ্যে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে চলেছিল (১৪৫৫-১৪৮৫ খৃঃ)।

দ্বিতীয় উইলিয়ম

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয় **টিউডর-বংশের** রাজত্ব। **সপ্তম হেনরী** এই বংশের প্রথম রাজা। এই বংশে মাত্র পাঁচজন রাজত্ব করেছেন। **রাণী এলিজাবেথ** টিউডর-বংশের শেষ রাণী।

এলিজাবেথের পর, স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর পুত্র **জেমস** ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেরী, এলিজাবেথের আত্মীয়া ছিলেন। এই রাজা জেমস হতেই, ইংলণ্ডের **ষ্টুয়ার্ট-বংশের আরম্ভ** হয়।

ষ্টুয়ার্ট-বংশের শেষ রাণী **অ্যান** হঠাৎ মারা যাওয়ায় ইংলণ্ডের লোকেরা, জার্ম্মেণীর অন্তর্গত হ্যানোভার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা জর্জ্জকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ইনি **প্রথম জর্জ্জ** নাম নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং এঁর বংশ **হ্যানোভার-রাজবংশ** বলে পরিচিত হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে, জার্ম্মেণীর অন্তর্গত স্যাক্সে-কোবার্গ নামক স্থানের শাসনকর্ত্তার বংশধর, প্রিন্স অ্যালবার্টের বিবাহ হয়েছিল বলে, তাঁর পুত্র **সপ্তম এডওয়ার্ডের** আমল থেকে ইংলণ্ডের রাজবংশ, **স্যাক্সে-কোবার্গ**-বংশ নামে পরিচিত হয়। সপ্তম এডওয়ার্ডের

পুত্র পঞ্চম জর্জ্জের আমলে, ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মেণীর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, তিনি ব্রিটিশ রাজবংশের নাম বদলে দিয়ে, স্যাক্সে-কোবার্গের বদলে, **উইণ্ডসর-বংশ** নাম দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, বিজয়ী শক্তিসমূহ ফ্রান্সের **ভার্সাই** নগরীতে সমবেত হয়ে এক **সন্ধিপত্র** স্বাক্ষর করেন। এতে জার্ম্মেণীর শক্তি ও সমৃদ্ধি সকল দিক দিয়েই খর্ব্ব করার ব্যবস্থা হয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার অতঃপর সামান্যই রইলো জার্ম্মেণীর, আলসেস-লোরেন ও রাইন-উপত্যকা থেকে বঞ্চিত করা হলো তাকে। তার সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে আনা হলো আগের তুলনায় এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে, উপরন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা অসম্ভব রকম মোটা টাকা জার্ম্মেণী, বৎসর বৎসর দিতে বাধ্য রইলো মিত্রশক্তিকে।

প্রথম হেনরী

বিজিত, পদানত জার্ম্মেণীর পক্ষে এইসব সুকঠোর সর্ত্তে রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার তখন হল্যাণ্ডে পলাতক। জার্ম্মাণরা দেশ থেকে রাজতন্ত্র তুলে দিয়ে, সেখানে প্রতিষ্ঠা করলো এক **সাধারণতন্ত্র**। মহাযুদ্ধকালীন সমরনায়ক **ভন্ হিণ্ডেনবুর্গকে** নির্ব্বাচিত করা হলো **প্রেসিডেণ্ট** পদে। অসহ্য দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে, হিণ্ডেনবুর্গ কোনমতে চালিয়ে যেতে লাগলেন দেউলিয়া দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য্য।

এই সময়ে এক ভাগ্যান্বেষী পুরুষের ক্রমবর্দ্ধমান ছায়া এসে মাঝে মাঝে পড়তে লাগলো জার্ম্মেণীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনের উপরে। এর নাম **অ্যাডলফ হিটলার**। অষ্ট্রিয়ায় এঁর জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইনি ছিলেন সামান্য সৈনিক। ভার্সাই-সন্ধির পরে ইনি নিজস্ব একটি দল সৃষ্টি করেন, এই দলই পরে **নাৎসীদল** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯২৪ সালের পর থেকে এই নাৎসীদল ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে। অবশেষে ১৯৩৩ সালে, এই দলের অধিনায়ক হিসাবে হিটলার জার্ম্মাণ রাইখের **চ্যান্সেলার** পদে অধিষ্ঠিত হলেন।
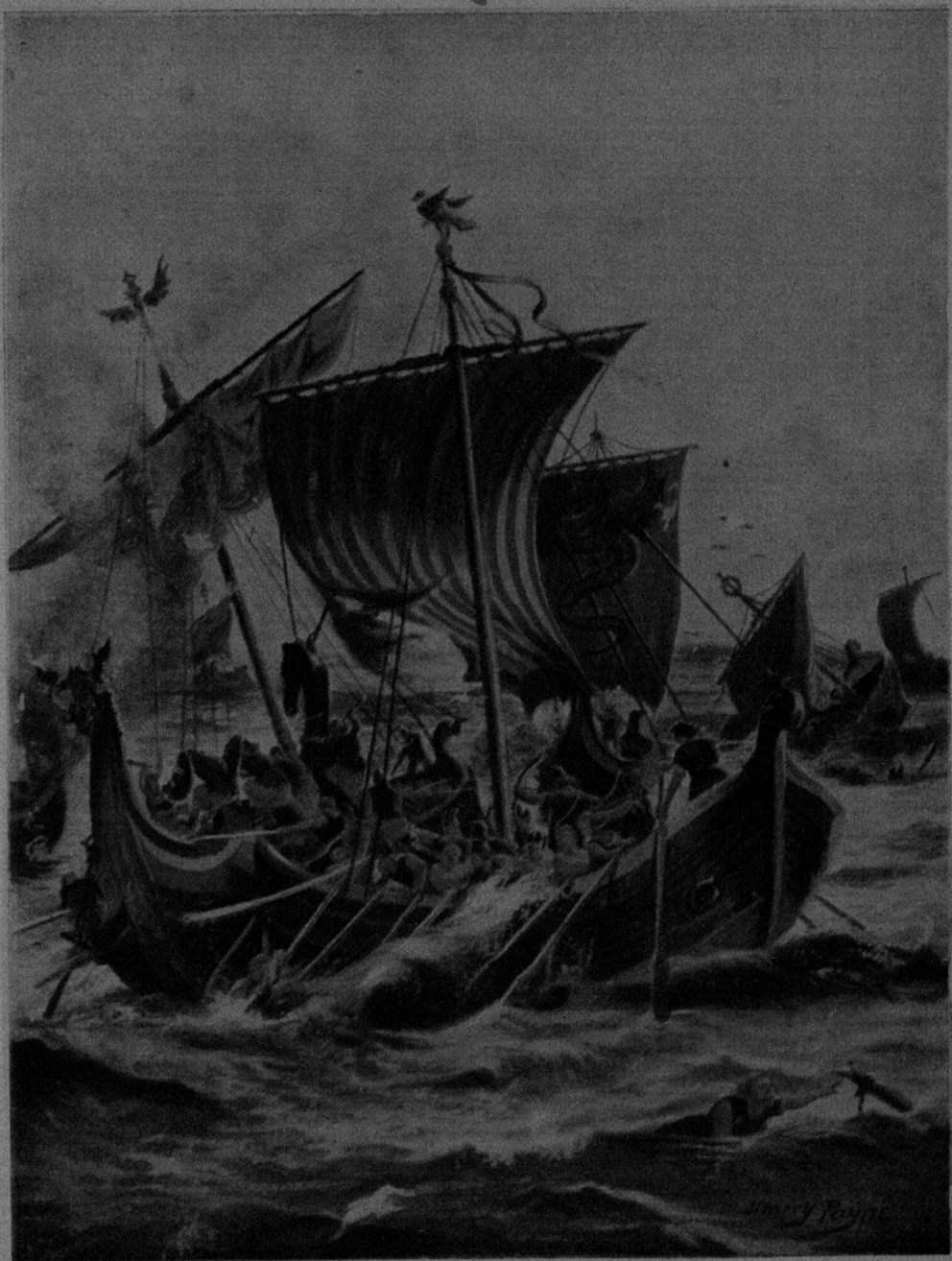
ডেনদের সঙ্গে আলফ্রেডের যুদ্ধ।

অতঃপর ভার্সাই-সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত একে একে পদদলিত করতে আরম্ভ করলেন হিটলার। ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত সুদেতানল্যাণ্ড মূলতঃ জার্ম্মাণজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এই দাবীতে, ঐ প্রদেশটিকে জার্ম্মেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন হিটলার।

এত অত্যাচার সত্ত্বেও, শান্তিকামী ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা সহ্য করে যাচ্ছিল হিটলারকে, কিন্তু তিনি যখন **পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ** করে বসলেন **১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর** তারিখে, তখন আর নীরব থাকা সম্ভব হলো না তাদের।

ইতিপূর্ব্বে রাশিয়ার সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেছিলেন হিটলার, এতেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ ঘটেছিল। এখন এই পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তারা সমস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকলো। ভার্সাই-সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী, পোল্যাণ্ড-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পূর্ব্বাবধিই প্রতিশ্রুত, এজন্য তারা স্পষ্টাক্ষরে হিটলারকে জানিয়ে দিল যে, তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে ওঠা অনিবার্য্য।

ষ্টিফেন
(অপুত্রক প্রথম হেনরীর ভাগিনেয়)

হিটলার এ ধমকে ভয় পাবার পাত্র নন। তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন এবং পোলদের যথাসাধ্য প্রতিরোধ সত্ত্বেও, চারি সপ্তাহের ভিতর **পোল্যাণ্ডের পশ্চিমার্দ্ধ গ্রাস** করে ফেললেন। ইতিমধ্যে রুশসেনা এসে পোল্যাণ্ডের পূর্ব্বাংশ দখল করে বসেছিল; রাজধানী ওয়ার্স **আত্মসমর্পণ** করার পর, পোল্যাণ্ডের আর যুদ্ধ করবার সামর্থ্য রইলো না। জার্ম্মেণী ও রাশিয়া মিলে ভাগাভাগি করে নিল গোটা পোল্যাণ্ড দেশটাকে।

হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। কিন্তু পোল্যাণ্ডকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য তারা কিছুই করতে পারে নি। তার কারণ, তারা কেউই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অভিযাত্রী-বাহিনী গড়ে উঠবার পূর্ব্বেই পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল।

তখন হিটলার নানাভাবে সন্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি আর কোন দেশ আক্রমণ বা অধিকার করবেন না। কিন্তু তিনি এর পূর্ব্বেও বহুবার এমনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও তা ভঙ্গ করেছেন। কাজেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আর তাঁকে বিশ্বাস করতে রাজী হলো না। তারা মনস্থ করলো—হিটলারকে ধ্বংস করতেই হবে, তা নইলে ইউরোপে শান্তিরক্ষা সম্ভব হবে না। সেই জন্যই, পোল্যাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও তাদের রণোদ্যম পূর্ণতেজে চলতে লাগলো।

দলে দলে ইংরেজসৈন্য ফ্রান্সে এসে অবতরণ করতে লাগলো, ফ্রান্সের পথে জার্ম্মেণীর দিকে অগ্রসর হবার জন্য। সমুদ্রপথে জার্ম্মেণীকে অবরুদ্ধ করে বসে রইলো ইংরেজ রণতরীর বহর। জলে স্থলে ও ব্যোমপথে সমান তালে প্রচণ্ড যুদ্ধ স্থরু হলো। ফ্রান্সের জেনারেল **গামেলঁা** অভিষিক্ত হলেন মিলিত ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক-পদে। ইংরেজ সেনার প্রধান সেনাপতি হলেন **লর্ড গর্ট,** তাঁর সহকারী পদে কাজ করতে লাগলেন **জেনারেল আয়রণসাইড।**

দ্বিতীয় হেনরী

চেম্বারলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী, **দালাদিয়ের** ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। চেম্বারলেন ডেকে পাঠালেন উইনষ্টন চার্চ্চিলকে নৌবাহিনীর প্রধান নিয়ামক পদ গ্রহণ করবার জন্য—(First Lord of the Admiralty)। জার্ম্মাণ আক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্য, ফ্রান্সের পূর্ব্বসীমান্ত-বরাবর এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্ম্মিত হয়েছিল—প্রথম মহাযুদ্ধের পর। এর নাম **ম্যাজিনো-লাইন**। এখানেই ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এই ম্যাজিনো-লাইন থেকে কিছুদূরে অবস্থিত ছিল জার্ম্মেণীর **সিগফ্রিড-লাইন।** এও এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী। এই দুই দুর্গশ্রেণীর ভিতর আছে **মালিকবিহীন দেশ** (No Man's Land); এখানে ক্রমাগত চলতে থাকলো প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের হানাহানি স্থল ও ব্যোমপথে।

এদিকে **রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ** বাঁধলো ফিনল্যাণ্ডের। বালটিক সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপ ও উপদ্বীপ, রাশিয়া দাবী করেছিল ফিনল্যাণ্ডের কাছে,

স্বভাবতঃই ফিনল্যাণ্ড এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে পারে নি। যুদ্ধ বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গেই, রুশবাহিনী হানা দিল কারেলিয়ান যোজকের উপর। ফিনদের **সেনাপতি ম্যানারহাইম** ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা। তাঁর পরিচালনায়, দুর্দ্ধর্ষ রুশসৈন্যকেও দীর্ঘদিন ধরে ঠেকিয়ে রাখলো ফিনল্যাণ্ডবাসীরা।

১৩ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-আটলান্টিক সমুদ্রে এক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল, জার্ম্মাণ রণতরী "**গ্রাফ-স্পী**" ও ব্রিটিশ ক্রুজার একিলিস, আজাক্স ও এক্সেটারের মধ্যে। গ্রাফ-স্পী ঐ অঞ্চলের সমুদ্রে ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজগুলির ধ্বংস-সাধনে ব্যাপৃত ছিল। একিলিস, আজাক্স ও এক্সেটার ওকে দেখতে পেয়ে আক্রমণ করে। তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গ্রাফ-স্পী নিকটবর্ত্তী নিরপেক্ষ বন্দর মন্টিভিডিওতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু নিরপেক্ষ বন্দরে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বসে থাকার অনুমতি পাওয়া যায় না। এই সঙ্কটে পতিত হয়ে হিটলার আদেশ পাঠালেন, গ্রাফ-স্পীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্য। তদনুযায়ী ১৭ই ডিসেম্বর, মন্টিভিডিও বন্দরের বাইরে এনে, গ্রাফ-স্পী জাহাজখানিকে বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয় এডওয়ার্ড

অবশেষে ১৩ই মার্চ্চ (১৯৪০) তারিখে, ফিনল্যাণ্ড পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। রাশিয়ার দাবীমত ভূখণ্ডগুলি থেকে অপসৃত হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলো সে। এদিকে হিটলার ও মুসোলিনীর ভিতর ব্রেনার-গিরিবর্ত্মে সাক্ষাৎ হলো, ইউরোপীয় পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করবার জন্য। ইতালির সর্ব্বময় কর্ত্তা এই মুসোলিনী, তখন পর্য্যন্ত নিরপেক্ষই রয়েছেন এই ইউরোপীয় যুদ্ধে। এমন কি, যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও বারবার করেছেন তিনি। কিন্তু হিটলার তাঁর সাহায্যলাভের আশা চিরদিনই করেছিলেন। ব্রেনার-গিরিবর্ত্মের সাক্ষাৎকারে, ভাবী সন্ধি সম্বন্ধে কোন গোপন আলোচনাই হয়ে থাকবে বোধ হয়।

মসিয়েঁ দালাদিয়ের ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন। প্রেসিডেণ্ট লেব্রানের অনুরোধে **মসিয়েঁ রেণো** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

তুরস্ক ইতিপূর্ব্বে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গেও এক সন্ধি স্থাপন করলো সে। মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশ থেকেও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসতে লাগলো ইংলণ্ডে।

নরওয়ের যুদ্ধ অমীমাংসিত রয়ে গেল দীর্ঘদিন ধরে। নার্ভিক অঞ্চলে ইংরেজদের আধিপত্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো, কিন্তু ট্রনডিমস্থিত ইংরেজসেনাকে জাহাজে চড়ে পলায়ন করতে হলো এবং নামসোস সহর একেবারেই ত্যাগ করে চলে এল মিত্র-শক্তি।

দ্বিতীয় রিচার্ড

কিন্তু ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের নাটকে দেখা দিল এক চমকপ্রদ দৃশ্যান্তর। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে জার্ম্মেণী যুদ্ধ ঘোষণা করলো ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে। অমনি নরওয়ের যুদ্ধের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে গেল অনেকখানি, ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ ফ্রান্স থেকে ধেয়ে এল বেলজিয়ম-সীমান্তে।

এসময়ে **ইংরেজ মন্ত্রিসভার পতন** হলো। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার উপর জনসাধারণ ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছিল। নরওয়ের যুদ্ধে কার্য্যতঃ পরাজয় স্বীকার করে অপসৃত হয়ে আসার দরুণ এঁদের প্রতিপত্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কমন্স-সভায় মিষ্টার আমেরী, ক্রমওয়েলের সেই ঐতিহাসিক উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন তারস্বরে—"তোমরা (মন্ত্রিসভা) দীর্ঘদিন গদী আঁকড়ে বসে আছ, কিন্তু কারও কোন উপকার করতে পারনি। ভগবানের দোহাই, তোমরা এইবার যাও!"

সত্যই চেম্বারলেনকে যেতে হলো, তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হলেন **উইনষ্টন চার্চ্চিল**। অবশ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সম্মানিত সদস্য হিসাবে চেম্বারলেন কাজ করতে থাকলেন এখনও।

উত্তর-সমুদ্রতীর থেকে মোসেল সহর পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ সীমান্ত-রেখার সর্ব্বত্রই ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী এখন তৎপর হয়ে উঠলো। রাজকীয় বিমানবহর শত্রু-সেনার উপর ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে চললো। জার্ম্মাণ বিমানও ইংলণ্ডের উপকূলে হানা দিতে ত্রুটি করলো না। ইংরেজসেনা

অবিলম্বে **আইসল্যাণ্ডে** অবতরণ করে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করলো—যাতে-না, জার্ম্মাণেরা ঐ দ্বীপটি দখল করে নিতে পারে।

১৪ই মে **ওলন্দাজ সরকার,** যুদ্ধবিরতির আদেশ প্রচার করতে বাধ্য

ক্রমওয়েল কর্ত্তৃক পার্লামেণ্ট বন্ধ

হলেন। ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী নানাস্থানে বোমাবর্ষণ ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করতে সক্ষম হলো না।

অবশেষে ২৮শে মে, **বেলজিয়ান সৈন্য** অস্ত্র ত্যাগ করলো। মিত্রশক্তির সম্মিলিত বাহিনীর উপর এই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া হলো অতি ভয়ানক। তারা প্রায় তিনদিকে বেষ্টিত হয়ে পড়লো জার্ম্মাণ সেনার দ্বারা। প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে তারা অপসৃত হতে লাগলো সমুদ্রতীরের দিকে। অবশেষে **ডানকার্কে** এসে উপনীত হলো তারা।

তখন আরম্ভ হলো, তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সশস্ত্র সৈনিককে, জাহাজে করে সাগর-পারে পাঠিয়ে দেবার পালা। বড়-ছোট, সশস্ত্র-নিরস্ত্র যতরকম জাহাজ ইংরেজ ও ফরাসীদের ছিল, সবই দিবারাত্রি ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করতে লাগলো ছয় দিন ধরে। সেই বিরাট বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌঁছে গেল এইভাবে। ওদের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য যারা ডানকার্কে ছিল, সেই সৈন্যদল কয়টিই কেবল জার্ম্মাণ-হস্তে বন্দী হলো। আর পতিত হলো জার্ম্মাণ কবলে—কোটি কোটি পাউণ্ড মূল্যের অগণিত সমর-সম্ভার। তার কিছু ইংরেজেরা যাবার সময় নষ্ট করে দিয়ে যেতে পেরেছিল,

বাকী সবই জার্ম্মাণ বাহিনীর কাজে লেগে গেল। তাই চার্চ্চিল বলেছিলেন, "ডানকার্কের পশ্চাদপসরণ একদিকে যেমন পরমাশ্চর্য্য, অন্যদিকে তেমনি সর্ব্বনাশা। বাহিনীটা উদ্ধার পেয়েছে আশ্চর্য্যভাবে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতি যা হয়েছে, তাকে সর্ব্বনাশই বলা যেতে পারে।"

মার্শাল পেতঁ্যা

এখানে লক্ষ্য করবার জিনিষ এই যে, **ডানকার্কের ব্যাপারে** ইংরেজের বিমান ও নৌ-শক্তির প্রাধান্য আবার সপ্রমাণ হলো সারা জগতের সম্মুখে। দীর্ঘ ছয় দিন ধরে অভিযাত্রী-বাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পার হলো, কিন্তু জার্ম্মাণ রণতরী বা বিমানবহর তাদের সে পারাপারের কোন ব্যাঘাতই করতে পারলো না। জলপথে ইংরেজের রণতরী ও আকাশ-পথে ইংরেজের বিমানবহর, জার্ম্মেণীর সমস্ত আক্রমণকেই অনায়াসে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী ডানকার্ক বন্দর থেকে পালিয়ে এল ইংলণ্ডে, ওদিকে জার্ম্মাণবাহিনীকে বাধা দেবার বেলজিয়ম বা ফ্রান্সের আর কোন উপায়ই রইলো না। দুর্ব্বার গতিতে হিটলারের সৈন্য সীন নদী পার হয়ে, ফ্রান্সের ভিতর ঢুকে পড়লো। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জেনারেল **গামেলঁাকে অপসারিত** করে সর্ব্বাধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন **জেনারেল ওয়েগাঁকে।**

তারপর ফরাসী মন্ত্রিসভারও পতন হলো। মসিয়েঁ রেণোকে পদত্যাগ করতে হলো। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন **মার্শাল পেতঁ্যা।** ওয়েগাঁও জার্ম্মাণ সেনাকে প্রতিরোধ করতে পারলেন না। এদিকে ইতালি আবার জার্ম্মেণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো

(১০ই জুন, ১৯৪০)। তখন পেত্যাঁ **যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব** করে দূত পাঠালেন হিটলারের কাছে।

যে সর্ত্তে হিটলার যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী হলেন, তা ফ্রান্সের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। তা সত্ত্বেও পেত্যাঁ সেই সর্ত্তই গ্রহণ করে **সন্ধি** করলেন। প্যারিসসহ ফ্রান্সের অধিকাংশই, বিজয়ী জার্ম্মাণদের সামরিক শাসনের পদানত রইলো; ভিচীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে, মার্শাল পেত্যাঁ ফ্রান্সের বাকী অংশে, হিটলারের আজ্ঞাবহরূপে গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করতে লাগলেন।

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণে ইংলণ্ড স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী **চার্চ্চিল** দুটি প্রস্তাব করে পাঠান পেত্যাঁর কাছে। একটি হলো এই যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্স ত্যাগ করে, উত্তর-আফ্রিকাস্থিত ফরাসী উপনিবেশ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। অন্যটি হলো রীতিমত চমকপ্রদ প্রস্তাব। এতে চার্চ্চিল ফরাসী জাতিকে, ইংরেজ জাতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়ে, একটি ইউনিয়ন-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে বললেন—ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ ইউনিয়ন নামে। বলা বাহুল্য —দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলেন পেত্যাঁ-গবর্ণমেণ্ট।

তখন চার্চ্চিল ইংরেজ নৌবহর প্রেরণ করলেন—যেখানে যত ফরাসী জাহাজ আছে সব ধৃত করবার জন্য, যাতে সেগুলি জার্ম্মাণদের কবলে পড়তে না পারে। ডাকার, আলেকজাণ্ড্রিয়া, ওরান প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দর থেকে বহু ফরাসী রণতরী ও বাণিজ্যতরী, এইভাবে ইংরেজ বন্দরে আনীত হলো। কতক ফরাসী জাহাজ আবার ইংরেজ নৌবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বিধ্বস্তও হয়ে গেল।

এখন থেকে যুদ্ধ চলতে লাগলো প্রধানতঃ দুই জাতির। এক—**জার্ম্মেণী ও ইংলণ্ডের ভিতর বিমান-যুদ্ধ (ব্যাটল্ অব ব্রিটেন**—৮ই আগষ্ট, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৪০)। দুই—ইংলণ্ড ও ইতালির ভিতর নৌযুদ্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজারে হাজারে জার্ম্মাণ বোমারু-বিমান, লণ্ডন ও ইংলণ্ডের অন্যান্য অংশে দিবারাত্রি বোমা নিক্ষেপ করতে লাগলো। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমানের সাথে তাদের যুদ্ধ হতে থাকলো প্রতিনিয়ত। ব্রিটিশ বোমারুরাও আক্রমণে ক্ষান্ত ছিল না। তারা কীল, মিউনিক, লিপজিপ, বার্লিণ এবং ফ্রান্সের সীমানার ভিতর জার্ম্মাণ-অধিকৃত বিভিন্ন সহরে, সুযোগ পেলেই হানা দিতে থাকলো।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জার্ম্মাণ বিমানের আক্রমণে ভয়াবহ দুর্দ্দশা হয়েছিল ইংলণ্ডের। নারী ও শিশুদিগকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূর দেশে পাঠানো হয়েছিল নিরাপত্তার খাতিরে। ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র রজনীতে নিষ্প্রদীপ, রাজপথে ট্রেঞ্চ ও আণ্ডারসন-আশ্রয়স্থানের ছড়াছড়ি। দৈনন্দিন

জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও, একদিনের জন্যও ইংরেজজাতির মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় নি, জার্ম্মেণীকে পরাজিত করবার জন্য সর্ব্বরকম ত্যাগ স্বীকারে তারা দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই রইলো।

ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল দ্য'গল

ইংরেজ নৌবাহিনীর ভূমধ্যসাগরীয় বহর, মাল্টাদ্বীপের পূর্ব্বদিকে, এক ইতালিয় নৌবহরকে আক্রমণ করে পর্য্যুদস্ত করলো। তোব্রুক বন্দরস্থিত ইতালিয় জাহাজগুলি ব্রিটিশ বিমান-বহরের আক্রমণে হলো বিধ্বস্ত।

এদিকে নতুন রণক্ষেত্র সৃষ্টি হলো আফ্রিকার প্রদেশে প্রদেশে। **ইতালিয়েরা** ব্রিটিশ-সোমালিল্যাণ্ড **আক্রমণ** করলো। লিবিয়াতেও চললো ভীষণ যুদ্ধ।

ইতালিয়-বাহিনী মিশর-সীমান্ত অতিক্রম করে সোলম অধিকার করে বসলো।

ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ **জেনারেল দ্য'গল,** পেতঁ্যা-গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধবিরতির আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তিনি ইংলণ্ড-প্রবাসী ফরাসীদের নিয়ে, ফরাসী জাতীয়-গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে ইংরেজের সহযোগিতায়, জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন তিনি। ডাকার বন্দরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তিনি, পেতঁ্যা-সরকার ও জার্ম্মাণ-বাহিনীর নৌশক্তির সঙ্গে।

গ্রীসের যুদ্ধ চলতে চলতেই, জার্ম্মাণ-বাহিনী ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ যুদ্ধের পর ক্রীট ছেড়ে অপসৃত হতে হলো ইংরেজ সৈন্যকে।

গ্রীসের যুদ্ধের মোড় ফিরে গেল ৬ই এপ্রিল তারিখে, যখন জার্ম্মেণীর বিজয়ী-বাহিনী প্রবেশ করলো গ্রীসে। ৪৩০০০ সৈন্য নিয়ে, ইংরেজ সেনাপতিরা গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ওদিকে **আফ্রিকাতেও** যুদ্ধ চলেছে নানাস্থানে। বেনগাজী থেকে অপসৃত হতে হলো ইংরেজদের, যদিও আবিসিনিয়ার রাজধানী আদিস-আবাবাতে প্রবেশ করলো তাদের সেনা।

২রা মে তারিখে, ইংরেজ সেনা বাস্‌রা সহর অধিকার করলো। ইংরেজাধিকৃত আদিস-আবাবায়, আবিসিনিয়ার সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত সম্রাট, **হাইলে সেলাসী** আবার প্রবেশ করলেন, ইংরেজ সেনার সহায়তায়। আবিসিনিয়াতে ইতালিয় সেনাপতি, **ডিউক আওষ্টা** ইংরেজদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন। গ্রীনল্যাণ্ডযাত্রী জার্ম্মাণ-নৌবহর পথিমধ্যেই ইংরেজদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হলো। বাগদাদ ও মুসল ইংরেজ সেনার করায়ত্ত হলো। জাতীয় ফরাসী-বাহিনীর সহযোগিতায়, ইংরেজেরা সিরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

আফ্রিকার যুদ্ধ মৃদুমন্দ গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। **রোমেল** মিশরে প্রবেশ করে, ইংরেজদের পিছন থেকে আক্রমণ করলেন।

২৮শে নবেম্বর ইংলণ্ডের তরফ থেকে **ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গারী** ও **রুমাণিয়াকে** চরমপত্র দেওয়া হলো ; কারণ তাদের নিরপেক্ষতা, পরোক্ষভাবে অক্ষশক্তিরই সহায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তারা প্রকাশ্যে ইংরেজপক্ষে যোগদান করুক, এই ছিল চরমপত্রের উদ্দেশ্য। এই পত্রকে কোন গুরুত্বই দিল না ঐ তিনটি দেশ। ফলে, ৬ই ডিসেম্বর ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ব্রিটেন।

৭ই ডিসেম্বর (১৯৪১), **জাপান** যুদ্ধ ঘোষণা করলো ইংলণ্ড ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ৮ই তারিখে জাপানের বিরুদ্ধে পাল্‌টা যুদ্ধ ঘোষণা হলো ইংলণ্ড থেকে।

এদিকে জাপানীরা স্থল ও জলপথে ইংরেজ-অধিকৃত চীনা বন্দর **হংকং আক্রমণ** করলো। জাপানের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, কানাডা, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র সবাই করলো যুদ্ধ ঘোষণা। জাপানী বোমা-বর্ষণে. ইংরেজদের **"প্রিন্স অব ওয়েলস"** এবং **"রিপাল্‌স্‌"** এ দুটি জাহাজ জলমগ্ন হলো।

হংকং থেকে ইংরেজরা অপসৃত হতে লাগলো। **বর্ম্মায়** তারা ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট ত্যাগ করে গেল। **মালয়ের** উত্তর-পশ্চিম অংশেও তারা পশ্চাৎপদ হলো। জাপানীরা উত্তর-বোর্ণিওতে অবতরণ করলো। ১৮ই ডিসেম্বর হংকং এবং ১৯শে পেনাংয়ে প্রবেশ করলো জাপানীরা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একখানি নিমজ্জমান রণতরী

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে মন্ত্রণা করবার জন্য, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে উপস্থিত হলেন।

ওয়াশিংটন মন্ত্রণাসভায় সম্মিলিত হয়ে, ছাব্বিশটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ঘোষণা করলেন—তাঁরা একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এবং কেউই স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করবেন না ওদের সঙ্গে।

চার্চ্চিল কানাডার রাজধানী অটোয়া পরিদর্শন করে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। বর্ম্মার প্রধানমন্ত্রী, জাপানীদের সঙ্গে গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন সন্দেহ করে তাঁকে বন্দী করা হলো। ২৫শে জানুয়ারী (১৯৪২) **শ্যামদেশ** ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

২রা ফেব্রুয়ারী ব্রিটেন থেকে চীনকে পাঁচ কোটী পাউণ্ড ঋণ দেওয়া হলো। জাপানীরা সিঙ্গাপুরের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ স্থরু করলো।

চীনের প্রেসিডেণ্ট **চিয়াং-কাইশেক** ভারত পরিভ্রমণে আগমন করলেন। লণ্ডনে "প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংসদের" প্রতিষ্ঠা হলো।

১৫ই ফেব্রুয়ারী **সিঙ্গাপুরের পতন** হলো। তারপর **বালি দ্বীপ** আক্রমণ করলো জাপানীরা। বর্ম্মায় ব্রিটিশ সেনা সীতাং নদীর পরপারে অপসৃত হলো। জাপানীরা **জাভা দ্বীপে** অবতরণ করলো।

৫ই মার্চ্চ, বর্ম্মার গভর্ণর ভারতবর্ষে পলায়ন করলেন। **রেঙ্গুণ** পরিত্যক্ত হলো।

১২ই মার্চ্চ ইংরেজ সেনা **আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ** থেকে অপসৃত হলো।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্লে, ইংলণ্ড থেকে **সার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসকে** পাঠানো হলো ভারতে। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন; কিন্তু পরিণামে তাঁর কোন প্রস্তাবই কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলো না।

বর্ম্মাদেশের বিভিন্ন অংশে, জাপানী ও **আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর** অগ্রগতি অব্যাহত রইলো। ইংরেজ সেনা ইরাবতী নদীর তীরে এসে নতুন ঘাঁটি নির্ম্মাণ করলো।

নাইট্‌সব্রিজে (লিবিয়াতে) জার্ম্মাণ আক্রমণে, ব্রিটিশ সেনা নির্ম্মূল হয়ে গেল। তোব্রুক আক্রমণে উদ্যত হলো জার্ম্মাণেরা। ইংরেজ মালবাহী জাহাজের একটা বহর, সারা পথ যুদ্ধ করতে করতে, জিব্রাল্টার থেকে মাল্টায় এসে পৌঁছালো। আর একটা বহর, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে যাত্রা করে বার দিন যুদ্ধের পর, আবার আলেকজান্দ্রিয়াতেই ফিরে যেতে বাধ্য হলো। লিবিয়ার অধিকাংশ ইংরেজ সেনা মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। দুই দল জার্ম্মাণ সেনা তোব্রুক আক্রমণ ও অধিকার করলো। সোলম, সিদি-ওমর সব কিছু ত্যাগ করে, ইংরেজ সেনা মের্সা-মাত্রুতে আশ্রয় নিল। **জেনারেল রিচিকে** অপসারিত করে সেখানে **জেনারেল অচিনলেককে** নিযুক্ত করা হলো ইংরেজ সেনার অধিনায়ক-পদে।

জুলাই মাসের প্রথমেই ইংলণ্ড ঋণদান করলো রাশিয়াকে আড়াই কোটি পাউণ্ড—যুদ্ধ পরিচালনার জন্য।

এদিকে মোজাম্বিক-প্রণালীতে ম্যায়োট দ্বীপ অধিকার করলো ইংরেজেরা। এল-আলামিনে পাল্‌টা আক্রমণ আরম্ভ করলো ইংরেজ সেনা। অষ্টমবাহিনী অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেল এল-আলামিন লাইনে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল মস্কো যাত্রা করলেন—রুশ প্রধানমন্ত্রী ষ্টালিনের সঙ্গে, সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য।

সেপ্টেম্বরের প্রথমেই ইংরেজবাহিনী **ইথিওপিয়া ত্যাগ** করে গেল। **মাডাগাস্কার** দ্বীপে যুদ্ধ চলতে লাগলো। ঐ দ্বীপের গভর্ণর-জেনারেল সন্ধি প্রার্থনা করলেন। মিত্রশক্তি আণ্টানানারিভোতে প্রবেশ করলো। তখন এই সর্ত্তে মীমাংসা হলো যে, দ্বীপের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব ফরাসী-গবর্ণমেণ্টেরই থাকবে, কিন্তু সাময়িকভাবে দ্বীপটি মিত্রশক্তির সামরিক কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকবে।

নবেম্বরের প্রথমে, অষ্টমবাহিনী মিশরে টেল-এল-আকিবের নিকটে ভীষণ ট্যাঙ্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। ঐ সহর অধিকার করে ইংরেজ সৈন্য দ্রুতগতি অগ্রসর হয়ে গেল, জার্ম্মাণ সেনা পশ্চাৎপদ হলো। মার্সা-মেত্রু পুনরধিকৃত হলো, সিদি-বারানিও ইংরেজের হাতে এল। বারদিয়া, সোলম, তোব্রুক ও গাজালাও শত্রুকবল থেকে উদ্ধার হলো আবার। এদিকে ব্রিটিশ প্রথমবাহিনী টিউনিসিয়াতে প্রবেশ করলো। বর্ম্মার মংদ-বুথিডং অঞ্চলে, ইঙ্গ-ভারতীয় সেনা ঘাঁটি স্থাপন করলো।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী, চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের সাক্ষাৎ হলো ক্যাসাব্লাঙ্কাতে। জার্ম্মাণেরা বিনা-সর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করলে যুদ্ধ বন্ধ করা হবে না, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এই সম্মেলনে। তারপর আদানায় গিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট ইনোনুর সঙ্গেও মিলিত হলেন চার্চ্চিল।

মে মাসে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো **টিউনিসিয়ায়**। সম্মিলিত মিত্রশক্তির সৈন্যদল টিউনিস, ফেরিভিল, বাইজার্ত্তা, তেবুর্ব্বা, জেদিদা প্রভৃতি দখল করে নিল।

ক্রীটদ্বীপে অবতরণ করতে সক্ষম হলো ইংরেজ সেনা ৪ঠা জুলাই। ৯ই তারিখে সিসিলিতে অবতরণ করলো তারা। ১০ই আগষ্ট চার্চ্চিল কুইবেকে আগমন করলেন, মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সম্মিলিত হবার জন্য। ২রা সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের আবার সাক্ষাৎ হলো।

ইতালির রেগিওতে, ইংরেজ অষ্টমবাহিনী অবতরণ করলো ৩রা সেপ্টেম্বর। ইতালি আত্মসমর্পণ করলো ৮ই তারিখে। স্যালার্ণো, টরণ্টো, ব্রিন্দিসি, ক্রটোন অধিকৃত হলো। মাল্টাতে ইতালির নৌবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। ইংরেজ, মার্কিণ ও রুশ পররাষ্ট্র-সচিবদের এক বৈঠক হলো মস্কোতে।

২২শে নবেম্বর চার্চ্চিল, রুজভেল্ট ও চিয়াং-কাইশেক এক সম্মেলনে একত্র হলেন কাইরো নগরে। আবার ২৮শে তারিখে তেহারাণে, চার্চ্চিল-রুজভেল্ট মিলিত হলেন ষ্টালিনের সঙ্গে। কাইরোতে আবার ইনোনুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হলো চার্চ্চিল-রুজভেল্টের।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ইতালির ক্যাসিনো সহরে পঞ্চম ইংরেজবাহিনী আক্রমণ চালালো। রোম নগরী থেকেও জার্ম্মাণগণকে বিতাড়িত করলো ইংরেজ ও মার্কিণ সেনা।

১৯৪৫এর মার্চ্চ মাসের সূচনাতেই, সম্মিলিত ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীসমূহ, ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করতে আরম্ভ করলো। তাদের সঙ্গে যোগ দিল জেনারেল দ্য'গল-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ফরাসী সেনাদল। জার্ম্মাণেরা তখন পূর্ব্ব-সীমান্তে রুশ-আক্রমণ নিয়েই ভীষণ ব্যতিব্যস্ত, তারা আর কোনক্রমেই পশ্চিমদিকের এই রণাঙ্গনে বিশেষ শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হলো না। সমগ্র ফ্রান্স ক্রমশঃ ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী সেনার বশীভূত হলো। ভিচী-গবর্ণমেণ্ট বাতিল করে দিয়ে, জেনারেল দ্য'গল স্বাধীন ফ্রান্সের নতুন গবর্ণমেণ্ট গঠন করলেন। এই গবর্ণমেণ্ট অচিরেই ইংলণ্ড, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বীকৃতি লাভ করলো।

প্রথম জেমস

ফ্রান্সের সীমা পার হয়ে, মিত্রশক্তির বিভিন্ন বাহিনী একে একে রাইন নদী পার হয়ে, প্রবেশ করলো খাস জার্ম্মাণ ভূখণ্ডে। তখনও হিটলার রুশ-আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যতিব্যস্ত। জেনারেল **মণ্টগোমারী** দ্রুতবেগে জার্ম্মেণীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়ে গেলেন। ৩রা মে, জার্ম্মাণ সেনাপতি **ভন ফ্রিডবার্গ** এসে সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে, হামবুর্গের নিকটবর্ত্তী লুনে-বার্গ-হীদে। এখানে তিনি বার্লিণের পশ্চিমদিকস্থিত, দশ লক্ষ **জার্ম্মাণ সেনার** বিনাসর্ত্তে **আত্মসমর্পণ** চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন (৪ঠা মে, ১৯৪৫)। তারপর **৮ই মে** বার্লিণে স্বাক্ষরিত হলো সমগ্র জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রের আত্মসমর্পণের চুক্তি।

১৭ই জুলাই **পট্‌সড্যামে** ইংলণ্ড, রাশিয়া ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর এক সম্মেলন হলো—জার্ম্মেণীর ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য। ২৫শে জুলাই পর্য্যন্ত এই সম্মেলনে ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন

চার্চিল। তারপর সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলো। শ্রমিক-নেতা ক্লিমেণ্ট এ্যাটলী হলেন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। ২৫শে জুলাইয়ের পর পট্‌স্‌ড্যাম-সম্মেলনে তিনিই ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন।

অতঃপর ২রা সেপ্টেম্বর, **জাপান** বিনাসর্ত্তে **আত্মসমর্পণ** করায় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান হলো।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট, ইংলণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করবার পরে, ভারতবর্ষ, বর্ম্মা ও সিংহলকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতৃগণের বিরোধ-মীমাংসা করবার জন্য, তাঁরা এক ঘোরতর ভুল পথ গ্রহণ করে, ভারতকে করেছেন **দ্বিখণ্ডিত**। উত্তর-পশ্চিমে কিছু এবং পূর্ব্ব-সীমান্তে কিছু ভূখণ্ড, মূল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে নাম দেওয়া হয়েছে **পাকিস্তান**। এইটি এখন মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের অবশিষ্ট অংশ **ভারত** বা **ইণ্ডিয়া** নামেই পরিচিত রয়েছে।

ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল এখনও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে ভারতবর্ষে এক সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ম্মাদেশ স্বাধীনতা পেয়েই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে চলে গিয়েছে। চার্চিল এখন আবার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

ইংলণ্ডের উত্তরে **স্কটল্যাণ্ড** দেশ অবস্থিত। এই দুটি দেশ গ্রেট ব্রিটেন নামক **একই দ্বীপের দুটি অংশ**। আজকাল এই দুটি দেশ একেবারে এক হয়ে মিলে গেছে বটে, কিন্তু এদের মধ্যে অতীতে শত্রুতা চলেছিল অনেকদিন ধরে।

রোমানরা যখন ইংলণ্ডে আগমন করে তখন সেখানে ব্রিটন নামে যে জাতির লোক বাস করতো, স্কটল্যাণ্ডেও সেই জাতিরই জ্ঞাতি **কেণ্ট, পিক্ট** ও **স্কটরা** বাস করতো। একই দ্বীপের দুই অংশে, দুইটি দেশে প্রায় একই জাতির লোক বসবাস করলে কি হবে, এদের মধ্যে ছিল ভীষণ শত্রুতা।

স্কটল্যাণ্ড পাহাড়ে দেশ বলে, সেখানকার লোকদের আক্রমণ করে কাবু করাও কঠিন ছিল। রোমানরা এসে ইংলণ্ড জয় করেছিল বটে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডকে তারা কখনও আক্রমণ করে নাই। পিক্ট ও স্কটরা যাতে উত্তরদিক থেকে ব্রিটেন আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য, রোমানরা ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত-বরাবর অনেক বড় বড় প্রাচীর নির্ম্মাণ করেছিল।

রোমানদের পর স্যাক্সনরা এসে ইংলণ্ড দখল করেছিল, কিন্তু এরাও স্কটল্যাণ্ডের দিকে কোন অভিযান করে নাই। স্যাক্সন জাতির কতক লোক

স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণদিকের সমতল ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সে-দেশ আক্রমণ করে জয় করবার চেষ্টা করে নাই। ধীরে ধীরে এরা সবাই স্কটদের সঙ্গে এক হয়ে গেল। **এডিনবরা** নামক সহরে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী স্থাপিত হলো। রাজায় রাজায় ঝগড়া না করে, এরা সকলে মিলে একজন রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে, সুখে, শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

এমনি ভাবে অনেক বছর কেটে গেল। স্কটল্যাণ্ড জয় করে, তাকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসবার ইচ্ছা ইংলণ্ডের অনেক রাজারই মনে মনে ছিল, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড পাহাড়ে দেশ বলে তাকে আক্রমণ করবার সুবিধা তাঁদের হয় নাই। স্যাক্সন-যুগে, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত-স্থান নিয়ে পরস্পর দুই জাতির লোকের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, আবার কখনও কখনও ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের রাজার সন্ধি দ্বারা মৈত্রীও স্থাপিত হয়েছে।

উইলিয়াম ওয়ালেস

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১২৮৪ সালে, রাজা প্রথম **এডওয়ার্ড,** দুর্জ্জয় লোভ নিয়ে স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসলেন। এডওয়ার্ডের উচ্চাভিলাষ ছিল, সমস্ত ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসকে তাঁর রাজদণ্ডের অধীনে আনা। ইতিমধ্যে তিনি অন্যায়ভাবে ওয়েলস দেশটি হস্তগত করে-ছিলেন। এরপর তিনি, স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখে, সেই দেশে হস্তক্ষেপ করলেন। শীঘ্রই ইংরেজ সৈন্যেরা স্কটল্যাণ্ড দেশটির উপরে ছড়িয়ে পড়লো।

এ পর্য্যন্ত স্কটদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ একতা ছিল না, বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই ছিল। কিন্তু যখন সারা স্কটল্যাণ্ড, **ইংলণ্ড দ্বারা আক্রান্ত** হলো তখন দেশের সমস্ত লোক পরস্পরের শত্রুতা

ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এক নতুন **প্রেরণা ও উদ্দীপনা** দেখা দিল। **উইলিয়াম ওয়ালেস** নামক এক স্বদেশপ্রেমিক বীর স্কটদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতা হলেন। তিনি ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে **'ষ্টার্লিং ব্রিজের' যুদ্ধে** অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে, ইংরেজদের হারিয়ে দিলেন। রাজপুতবীর রাণা প্রতাপের মত, পাহাড়ে, গুহায় লুকিয়ে থেকে, ওয়ালেস অনেকদিন পর্য্যন্ত
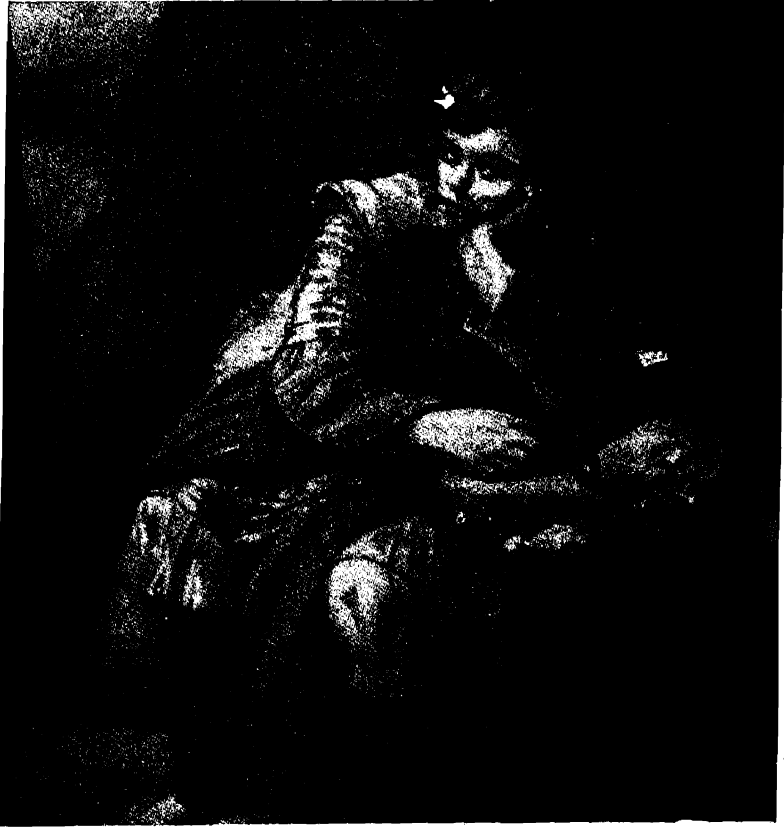
রবার্ট ব্রুস

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিলেন; কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তের ফলে, ওয়ালেস শীঘ্রই ইংরেজের হাতে ধরা পড়লেন ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন।

ওয়ালেসের পরও স্কটজাতি দমলো না, তারা নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ-চালিয়ে যেতে লাগলো। এর পরের স্কটবীরদের মধ্যে **রবার্ট ব্রুসের** নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ইনি প্রায় সমস্ত জীবন ধরে

আক্রমণকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে এই দীর্ঘযুদ্ধে ইংরেজেরা হেরে যায়; তারা স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করতে পারলো না। ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে **ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে,** ইংরেজদের স্কটদের কাছে খুব বড় পরাজয় হয়েছিল।

এই স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলে, স্কটল্যাণ্ড **আরও বেশী একতাবদ্ধ** ও শক্তিশালী হয়। রবার্ট ব্রুস হলেন নতুন সম্মিলিত **স্কটল্যাণ্ডের প্রথম স্বাধীন রাজা**। স্কটরা এর পর প্রায় তিনশ' বছর পর্য্যন্ত, ইংরেজদের এই ব্যবহার ভুলতে না পেরে, যখনই সুবিধা পেয়েছে তখনই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফরাসী বা অন্যান্য দেশকে সাহায্য করেছে।

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলন

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পরস্পর ঝগড়ার মধ্যেও, এদের দুই রাজবংশের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে কোন বাধা হয় নাই। শত্রুতা সত্ত্বেও, দুই দেশের রাজবংশের মধ্যে অনেক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই সব আত্মীয়তার মধ্য দিয়েই ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এক হয়ে মিলে গেল।

রাণী মেরী ষ্টুয়ার্ট

টিউডর-বংশের শেষ রাণী, **রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে,** ইংলণ্ডের লোকেরা

ঠিক করলো যে, তারা এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ও তাঁর সম্পর্কে বোন, স্কটল্যাণ্ডের সুন্দরী **রাণী মেরী ষ্টুয়ার্টের** ছেলে, **ষষ্ঠ জেমসকেই** সিংহাসনে বসাবে। ষষ্ঠ জেমস তখন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। ষষ্ঠ জেমস ইংলণ্ডে এসে "**প্রথম জেমস**" নাম নিলেন। এঁর থেকেই ইংলণ্ডের **ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা** হলো।

এই বন্দোবস্তে দুটো দেশ এক রাজার অধীনে মিলিত হলো বটে, কিন্তু তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, পার্লামেণ্ট প্রভৃতি সবই আলাদা রয়ে গেল। স্কটল্যাণ্ডের তৈরি জিনিষপত্র সেখানকার বণিকেরা অবাধে ইংলণ্ডে এসে বিক্রী করতে পারতো না। ইংলণ্ডের কল-কারখানা দিন দিন বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ধন-সম্পদ বাড়ছিল, অথচ স্কটরা তার থেকে কোন ভাগ পাচ্ছিল না। ইংলণ্ডের অধীনে যে-সব উপনিবেশ ছিল, সেখানে নিজ দেশে তৈরি শিল্পদ্রব্য বিক্রী করবার যে সুযোগ ইংলণ্ড পেত, স্কটল্যাণ্ড তা পেত না। এই নিয়ে দুই দেশে আবার **মন-কষাকষি** আরম্ভ হয়ে গেল।

অবশেষে ইংলণ্ডের **রাণী অ্যানের সময়** ১৭০৭ খৃঃ, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা **এক সঙ্গে বসে** ঠিক করে দিলেন যে, ঐ দুই দেশ তখন যে-ভাবে এক রাজার অধীনে দুটো আলাদা দেশ ছিল, সে রকম আর থাকবে না। দুটি দেশই মিলিত হয়ে, একটি মাত্র দেশরূপে পরিচিত হবে এবং তার নতুন নাম হবে, **গ্রেট ব্রিটেন।** ইংলণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের দুটো আলাদা পার্লামেণ্ট আর থাকবে না। স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট উঠে যাবে, স্কটরা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে এবং সেই পার্লামেণ্টেরই প্রভুত্ব স্বীকার করবে। স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট তুলে দেবার জন্য প্রতিদানে, স্কটরা ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের অধীন উপনিবেশগুলিতে **অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য** করতে পারবে।

এই বন্দোবস্তে দুই দেশেরই লাভ হলো। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়লো আর স্কটল্যাণ্ড পেল আর্থিক সুবিধা। আজ পর্য্যন্ত এই সন্ধির কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এর পর থেকে ইংরেজ ও স্কটরা অনেকটা একজাতির মতই হয়ে গেল।
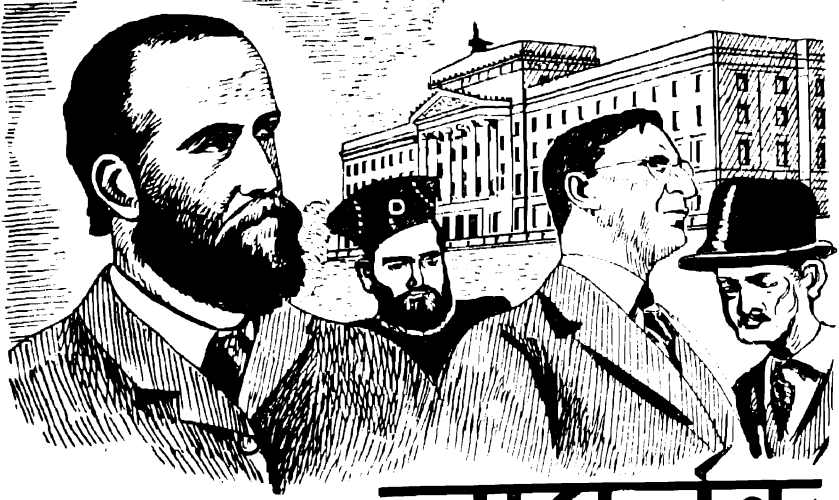
আয়র্লণ্ড

ব্রিটনরা যখন ব্রিটেন দেশটি অধিকার করে তখন কেল্টদের অধিকাংশ, ব্রিটেন থেকে আয়র্লণ্ডে পালিয়ে যায়। সেই সময় থেকে কেল্টরা আয়র্লণ্ডে বসবাস করতে থাকে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, আয়র্লণ্ড সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পশ্চিম-ইউরোপের একটি কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। খৃষ্টানধর্ম্ম অতি প্রাচীনকালে আয়র্লণ্ডে প্রবেশ করে। সেখানে খৃষ্টানদের অনেক মঠ তৈরি হয়। এই মঠগুলি বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম আয়র্লণ্ডের কেল্ট-প্রচারকদের দ্বারাই, স্কটল্যাণ্ড হতে উত্তর-ইংলণ্ডে বিস্তৃত হয়। বর্ত্তমান আইরিশগণ, ষষ্ঠ শতাব্দীর পর দুই-তিন শত বৎসরকালকে আয়র্লণ্ডের স্বর্ণযুগ বলে মনে করে। এ-যুগকে বলে **গ্যেলিক সংস্কৃতির যুগ।**

বহুদিন পর্য্যন্ত আয়র্লণ্ডবাসিগণ বিভিন্ন দল ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। মধ্যযুগে দিনেমার ও নর্ম্মাণ জাতির লোকেরা এসে, আইরিশদের উপর অত্যাচার করে ও অনেক স্থান দখল করে।

আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ দিকে খানিকটা জায়গা, ইংলণ্ডের রাজা **দ্বিতীয় হেনরী** জয় করেন এবং তার নাম দেন 'দি পেল'। অনেক ইংরেজ সেখানে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলো। ক্রমে এই ইংরেজ ও আরও অনেক

আগমনকারী স্কটদের সঙ্গে, আইরিশদের তীব্র বিরোধ হতে সুরু করলো। আইরিশগণ যখনই সুবিধা পেত, বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো। তারা অনেক সময় ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে মিলিত হতো।

ষোড়শ শতাব্দীতে, রাণী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ড, বিদ্রোহী আইরিশ-বাসীদের জব্দ করবার জন্য, অনেক ইংরেজ ভূস্বামীকে আয়র্লণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করলো। এঁরা গিয়ে আইরিশদের জমি বাজেয়াপ্ত করলেন। আয়র্লণ্ড তখন প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষিজীবী জাতির দেশে পরিণত হলো। ভূস্বামীরা হলেন সব বিদেশী।

আইরিশ বিপ্লবীদের আক্রমণ

রাজা **প্রথম জেমসের** আমলে, আয়র্লণ্ডের উত্তর দিকে **আলষ্টার** নামক জায়গাটিতে, ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড থেকে লোক পাঠিয়ে সেখানে একটি বসতি স্থাপন করবার চেষ্টা হয়। এই ব্যাপারটিতে আয়র্লণ্ড, ইংলণ্ডের উপর আরও বেশী অসন্তুষ্ট হলো। উত্তর-আয়র্লণ্ডে এই নিয়ে একটা বিদ্রোহ ঘটে গেল, কিন্তু আইরিশ বিদ্রোহীরা প্রবল-পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে পরাজিত হলো। যে-সব প্রজারা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তাদের জমি-

জমা সমস্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট, বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের যে-সব লোক আলষ্টারে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

আলষ্টারে যারা এসে বসতি স্থাপন করলো, তারা খৃষ্টান হলেও তাদের ধর্ম্ম ছিল প্রোটেস্টান্ট। আয়র্লণ্ডের লোকেরাও খৃষ্টান ছিল, কিন্তু তারা ছিল রোমান ক্যাথলিক। আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকরা, তাদের দেশেই ইংরেজ এবং স্কটদের আগমনে এমনিতেই সন্তুষ্ট হয় নাই, তার উপর আবার প্রোটেস্টান্টরা তাদের দেশে আসায়, আইরিশরা আরও বেশী অসন্তুষ্ট হলো।

কর দিতে অসম্মত গৃহস্বামীর ভিটা-মাটি উচ্ছেদ করা হচ্ছে

আলষ্টারের বিদ্রোহ দমনের পরও আয়র্লণ্ডের লোকেরা কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আশা ছাড়ে নাই। তারা আবার বিদ্রোহ করবার সুযোগ খুঁজছিল। ইংলণ্ডের রাজা **প্রথম চার্লসের** সঙ্গে ক্রমওয়েলের দলের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হলো, আইরিশরা দেখলো বিদ্রোহ করবার এই সুযোগ। ক্রমে বিদ্রোহীরা আয়র্লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রভুত্ব স্থাপন করে নিল, শুধু ডাবলিন সহর থেকে ইংরেজদের হটাতে

পারলো না। **ডাবলিন** এখন আয়র্লণ্ডের রাজধানী। ইংরেজরা সেখানকার যে-জায়গাটা দখল করেছিল তখনও সেটা তার রাজধানী ছিল।

তারপর রাজা প্রথম চার্লসের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে, **ক্রমওয়েল** যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করবার জন্য রওনা হলেন। ক্রমওয়েল সেখানে এমন **অত্যাচার** করেছিলেন যে, আইরিশরা সে-কথা আজও ভুলতে পারে

পুলিশ আইরিশ গৃহে অস্ত্রের জন্য থানাতল্লাসী করছে

নাই এবং সেই অত্যাচারের পর, প্রায় সত্তর বছর আর মাথা তুলে স্বাধীনতার দাবী জানাতে সাহস পায় নাই। ক্রমওয়েল সেখানকার বহু জমি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে, ব্রিটিশ সেনাপতিদের সেগুলো বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্রমওয়েল জয়লাভ করলেন বটে, আয়র্লণ্ডের সমস্ত লোক তাঁর ভয়ে কাবু হয়ে গেল এটাও সত্যি, কিন্তু মনে মনে তারা ইংলণ্ডের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট

হয়ে রইলো ; আবার তারা দেশ স্বাধীন করবার জন্য সুযোগের সন্ধান করতে লাগলো।

সুযোগ মিলল প্রায় সত্তর বছর পরে। **দ্বিতীয় জেমস** তখন ইংলণ্ডের রাজা। ইংরেজরা যখন তাঁকে ইংলণ্ডের সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিল তখন তিনি এলেন আয়র্লণ্ডে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে তিনি আইরিশদের সাহায্য চাইলেন। আলষ্টার ছাড়া সমগ্র আয়র্লণ্ড তাঁর ডাকে সাড়া দিল। জেমস ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। এবারও ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহের জন্য, তার উপর এমন অত্যাচার করলো যে, এর পর অনেকদিন আয়র্লণ্ড আর মাথা খাড়া করতে পারে নাই।

আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ডের মিলনের আইন

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সম্পর্কে, যখন ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা পেকে উঠতে আরম্ভ করলো, এই দুটি দেশের মধ্যে যখন কথায় কথায় যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল, আয়র্লণ্ড তখন সেই সুযোগে, আবার একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে স্বাধীন হয়ে গেল। আয়র্লণ্ডও আমেরিকানদের মত স্বাধীন হয়ে যেতে পারে এই ভেবে, ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ আয়র্লণ্ডকে একটি **স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট** গঠন করার অধিকার দিলেন। এর দ্বারা, আয়র্লণ্ড আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলো কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আইরিশ পার্লামেণ্ট হলো, তার পূর্ব্বেকার আইনসভাগুলির ন্যায়ই, একটি বৈদেশিক জমিদারদের অধিকৃত, শুধু প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের পার্লামেণ্ট। আইরিশদের অধিকাংশ ছিল ক্যাথলিক। তারা আগেকার মতই উৎপীড়িত হতে লাগলো।

ইংলণ্ডের অবিচার ও ফরাসী বিপ্লবীদের সাম্যবাদ-বাণীর ছোঁয়াচ লেগে, কিছুদিনের জন্য, আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে একটু মিলনের ভাব এল। এরা **"যুক্ত আয়র্লণ্ডবাসী"** নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো ; কিন্তু সরকার এ-প্রতিষ্ঠানকে মানলো না। ফলে, আয়র্লণ্ডে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে, একটা জোর **বিদ্রোহ** দেখা দিল। ইংলণ্ড বিদ্রোহীদের উপর কঠোর অত্যাচার করে শীঘ্রই তাদের আন্দোলনকে ভেঙ্গে দিল। তখনকার ইংলণ্ডের

প্রধানমন্ত্রী **ছোট পিট** মনে করলেন যে, আয়র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট তুলে দিয়ে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আইরিশ প্রতিনিধিদের আসতে দেওয়া উচিত।

এতদিন পরে ইংরেজরা বুঝতে আরম্ভ করলো যে, জোর করে আয়র্লণ্ডকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। পিট একটি আইনের খসড়া তৈরি করলেন এবং আইরিশ পার্লামেণ্টকে দিয়ে সেটা পাশ করিয়ে নিলেন। এই আইনটিকে বলে ১৮০০ সালের **"অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন"**। এই আইনে ঠিক হলো যে আয়র্লণ্ডের আলাদা কোন পার্লামেণ্ট থাকবে না, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টই হবে তাদেরও পার্লামেণ্ট। লর্ড-সভায় তাদের আটাশ জন প্রতিনিধি থাকবেন, আর কমন্স-সভায় থাকবেন একশ' জন। ইংলণ্ডের রাজার প্রতিনিধিরূপে একজন বড়লাট আয়র্লণ্ড শাসন করবেন।
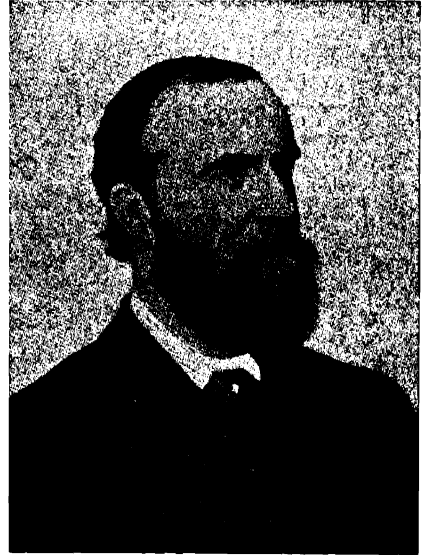
চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্নেল

এই আইনে আয়র্লণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ কোন সুবিধা হলো না, তা ছাড়া দুটো দেশের ধর্ম্ম যে আলাদা একথা আগেই বলা হয়েছে। এই সব কারণে বাইরের মিলন সত্ত্বেও, আইরিশদের মনে মনে ইংরেজদের উপর একটা অসন্তোষের ভাব রয়েই গেল। **ডানিয়েল ও'কনেল** নামক একজন আইরিশ নেতা, পিটের তৈরি আইনটিকে বাতিল করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সাড়া তিনি পান নাই।

ধীরে ধীরে দেশে আবার **স্বাধীনতা-আন্দোলন** আরম্ভ হলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আইরিশগণ নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে, প্রাণপণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। কখনও তারা হতোদ্যম হয় নাই। এবার আন্দোলন অন্য পথে চললো। ১৮৭৩ সালে **"আইরিশ স্বায়ত্ত-শাসন লীগ"** নামক একটি দল গঠিত হলো। স্বায়ত্ত-শাসন মানে হচ্ছে নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করবার অধিকার। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই দলের লোকেরা যাতে বেশী করে যেতে পারে, সেজন্য স্বায়ত্ত-শাসন লীগ জোর চেষ্টা সুরু করলো। ক্রমে ক্রমে এদের চেষ্টায় পার্লামেণ্টের মধ্যেই

"আইরিশ জাতীয় দল" নামে একটি দল গঠন করা সম্ভব হলো। **চার্লস ষ্টুয়ার্ট পার্ণেল** হলেন এই দলের নেতা।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী **গ্ল্যাডষ্টোন** আয়র্লণ্ডের সমস্যা সমাধানে, নিজেকে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রথম মন্ত্রিত্বকালে, তিনি আইরিশ কৃষকদের আর্থিক দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য কয়েকটি আইন পাশ করেছিলেন, কিন্তু এ-সবে আইরিশগণ মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলো না; পার্ণেলের নেতৃত্বে, একদল আয়র্লণ্ডবাসী তখন **"হোমরুল"** বা স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করতে লাগলো। গ্ল্যাডষ্টোন দেখলেন যে, আইরিশদের খানিকটা স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার মঞ্জুর করা একান্ত পক্ষে দরকার। তা না-হলে আবার যে-কোন সময় বিদ্রোহ ঘটতে পারে। গ্ল্যাডষ্টোন দুইবার এই হোমরুলের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুইবারই বিপুল বাধার দরুণ তাঁর চেষ্টা সফল হলো না। অবশেষে **হেনরী অ্যাসকুইথের** প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় তৃতীয় বারের চেষ্টায়, ১৯১৪ সালে **আইরিশ স্বায়ত্ত-শাসন আইন** পাশ হলো।

এই আইন অনুসারে আয়র্লণ্ডের ডাবলিন সহরে আবার আইরিশ পার্লামেণ্ট স্থাপিত হলো। ঠিক হলো যে, এই পার্লামেণ্টই আয়র্লণ্ডের জন্য আইন পাশ করবে। আয়র্লণ্ড শাসন করবার জন্য এই পার্লামেণ্টেরই সদস্যদের মধ্যে থেকে নেতাদের নিয়ে, একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, এবং আয়র্লণ্ডে রাজার প্রতিনিধি যিনি থাকবেন তিনি এই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন। এই সময় ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেঁধে যাবার জন্য উক্ত আইনটি কার্য্যকরী হলো না।

ঈষ্টার বিদ্রোহ

এই আইনটি পাশ হবার অল্পদিন পরেই, ১৯১৪ সালে **প্রথম মহাযুদ্ধ** আরম্ভ হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রথম বছরটা আইরিশরা চুপচাপ রইলো; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আইরিশ তরুণেরা পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে তৈরি হতে আরম্ভ করলো। স্বায়ত্ত-শাসন আইনে যতটুকু অধিকার আয়র্লণ্ড পেয়েছিল, তাতে তারা সন্তুষ্ট হয় নাই; তাদের ইচ্ছা, আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। আয়র্লণ্ডে কোন রাজা থাকবে না, প্রজারা ভোট দিয়ে যাঁকে সভাপতি নির্ব্বাচন করবে তিনিই দেশ শাসন

করবেন। প্রজাদের নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, এই মন্ত্রিসভার পরামর্শে সভাপতি চলবেন।

এই কল্পনাকে কাজে খাটাতে হলে দল চাই, কাজেই **'সিন্‌ফিন্‌'** নাম দিয়ে একটা দল গঠিত হলো। 'সিন্‌ফিন্‌' আইরিশ কথা, এর মানে, "আমরা আলাদা থাকবো।" সিন্‌ফিন্‌ দল ঠিক করলো যে, ইংরেজের শত্রু জার্ম্মেণীর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা দেশ স্বাধীন করবে। **সার রজার কেসমণ্ট** নামক তাদের একজন নেতার মারফৎ তলে তলে তারা, জার্ম্মাণদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলো যে, জার্ম্মেণী তাদের দলকে অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করবে। সার রজার কেসমণ্টের এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

সিন্‌ফিন্‌রা এতে দমে যাওয়া ত দূরের কথা, তাদের দলে অসংখ্য যুবক এসে যোগ দিতে লাগলো। বিদ্রোহের জন্য এরা এমন অধৈর্য্য হয়ে উঠলো যে, জার্ম্মেণী থেকে অস্ত্র আসবার অপেক্ষাও তারা করতে পারলো না। ১৯১৬ সালের গুড ফ্রাইডের পরের সোমবার, ডাবলিন সহরে বিদ্রোহীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলো।

যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে কি হবে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘরের পাশে এই বিদ্রোহ সহ্য করলেন না। কঠোর ভাবে তাঁরা এই বিদ্রোহ দমন করলেন। গুড ফ্রাইডের পরের সোমবারকে বলে, ঈষ্টার সোমবার; এই দিনে বিদ্রোহ হয়েছিল বলে একে "ঈষ্টার বিদ্রোহ" বলে। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা ধরা পড়লো তাদের অনেকেরই ফাঁসি হয়ে গেল।

বিদ্রোহ এবারও দমন হলো বটে, কিন্তু আইরিশরা ইংরেজদের উপর চটেই রইলো। যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন আবার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন হলো, আইরিশরা তখন তাদের একশ' জন সদস্যের মধ্যে, ৭৩ জন সিন্‌ফিন্‌ দলের লোককে নির্ব্বাচিত করে পাঠিয়ে দিল এবং তাদের জানিয়ে দিল যে, তারা যেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যোগ না দিয়ে দূরে থাকে।

বর্ত্তমান আয়র্লণ্ড

উদারনৈতিক দলের বিখ্যাত নেতা **লয়েড জর্জ্জ** ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে, আয়র্লণ্ডকে শান্ত করবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। তিনি আলষ্টারের জন্য একটা, আর আয়র্লণ্ডের জন্য একটা, এই দুইটি পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা করলেন। আলষ্টারের অধিবাসীরা এতে খুব খুসী হলো, কিন্তু আইরিশরা তাদের পার্লামেণ্টের জন্য কোন সদস্য নির্ব্বাচন করলো না।

ডি. ভ্যালেরা

আইরিশরা মিলিত হয়ে স্থির করলো যে, ইংরেজের তৈরি পার্লামেণ্টে তারা যাবে না, ইংরেজের তৈরি আদালতে তারা মামলা-মোকদ্দমা করবে না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন হুকুমই তারা মানবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের পার্লামেণ্ট ও নিজেদের আদালত গড়ে নিল, নিজেদের পুলিশ পর্য্যন্ত নিযুক্ত করে, তারা দস্তুরমত একটা পাল্টা-গবর্ণমেণ্ট চালাতে আরম্ভ করলো।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমটা সৈন্য পাঠিয়ে গায়ের জোরে, এই পাল্টা-গবর্ণমেণ্ট ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করলেন। আইরিশরা ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে এই সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। আড়াল থেকে লুকিয়ে যুদ্ধ করাকে বলে, **গরিলা যুদ্ধ**। আইরিশরা তাই করেছিল বলে আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহকে

গরিলা যুদ্ধ বলা হয়। **ডি. ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্স, ডান ব্রিন** প্রভৃতি এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।

সাতশ' বছরের বিবাদ-বিসংবাদের পর এই যুদ্ধেই ইংরেজরা ভাল করে বুঝতে পারলো যে, আইরিশদের কিছুতেই গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখা চলবে না। আইরিশরাও বুঝলো যে, ইংরেজকে একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

এবার উঠলো সন্ধির কথা। লয়েড জর্জ্জ তখনও প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিদ্রোহী নেতাদের লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। একটা সন্ধিপত্র তৈরি হলো। ইংলণ্ডের পক্ষে লয়েড জর্জ্জ এবং আর কয়েকজন মন্ত্রী তাতে সই করলেন। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে সই করলেন ডি. ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্স প্রভৃতি কয়েকজন।

সন্ধি হলো এই যে, আয়র্লণ্ড কি ভাবে শাসিত হবে সেটা আইরিশরাই ঠিক করবে। আইরিশ পার্লামেণ্ট, মন্ত্রিসভা, আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা, বিচার-আদালত

পার্লামেণ্ট-ভবন

প্রভৃতির গঠনপ্রণালী আইরিশরা স্থির করে দেবার পর, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই বন্দোবস্ত মেনে নেবে। রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ একজন বড়লাট থাকবেন, তবে তিনি আইরিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করবেন না। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়র্লণ্ডে তাদের নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়।

এখন আয়র্লণ্ডে ডি. ভ্যালেরার দলই খুব শক্তিশালী। আয়র্লণ্ড বড়লাটের পদ তুলে দিয়েছে। বড়লাটের বদলে তা'রা আজকাল সাত বৎসরের জন্য একজন

করে সভাপতি নির্ব্বাচন করে। উত্তর-আয়র্লণ্ডের আলষ্টারের সঙ্গে তাদের মন-কষাকষি কিন্তু আজও শেষ হয় নাই।

দক্ষিণ-আয়র্লণ্ডকে এখন **"আয়ার"** বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ ছিল। তথাপি বিভিন্ন যুদ্ধ-রত দেশের নৌ-শক্তির আক্রমণে তার কুড়িখানি জাহাজ বিনষ্ট হয়েছিল, বিভিন্ন সময়ে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও হিটলার, উভয়ের মৃত্যুতেই ডি. ভ্যালেরা শোক প্রকাশ করেছিলেন।

কষ্টেলো এখন আয়ারের প্রধানমন্ত্রী। ভারতবর্ষের মত আয়র্লণ্ডও এখন একটি সাধারণতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। আয়ারের বর্ত্তমান সভাপতির নাম, **সীন ও'কেলী**। **ডাবলিন** আয়ারের রাজধানী।

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, স্পেনের তিন দিক ঘিরে আছে সমুদ্র, আর উত্তর দিকে আছে পাইরেনিজ নামক এক পর্ব্বতমালা। প্রকৃতিদেবী স্পেনকে এমন করে সুরক্ষিত করে দেওয়া সত্ত্বেও, স্পেন কিন্তু বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নাই।

সবার আগে, পুরাকালের এসিয়ার বিখ্যাত বণিকজাতি ফিনিশীয়গণ স্পেনের উপকূলভাগে আগমন করে। এর পরে গ্রীকরা এসে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। গ্রীকরা অবশ্য স্পেনের ভিতরে বেশীদূর পর্য্যন্ত যায় নাই। তারপরে স্পেন জয় করে, এখানে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন, কার্থেজের সেনাপতি **হামিলকার বার্কা** ও তাঁর পুত্র, পৃথিবী-বিখ্যাত যোদ্ধা **হানিবল**। রোমানগণ যখন শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন তারা কার্থেজ-শক্তিকে পরাভূত করে স্পেনের অধীশ্বর হয়। ছয়শ' বছর, স্পেনকে রোম-সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে থাকতে হয়। স্পেনের প্রায় সমস্ত অংশই রোম জয় করে নিয়েছিল, গ্রীকদের মত শুধু তার একটা উপকূল নিয়েই, রোমানরা সন্তুষ্ট থাকে নাই।

স্পেনবাসিগণ নানা পাহাড়ী জাতিতে বিভক্ত ছিল। তারা সহজে রোমানদের পদানত হয় নাই। ক্রমে স্পানিশগণ রোমক-সভ্যতা গ্রহণ করে। রোমানরা স্পেন জয় করেছিল বটে, কিন্তু স্পেনের লোকদের কাছ থেকে তারাও শিল্প-কলা প্রভৃতি অনেক জিনিষ শিখেছিল।

স্পেনের ক্যাথলিক ধর্ম্মগ্রহণ

আরব রাজত্ব

রোমানদের পতনের পর পঞ্চম শতাব্দীতে, বর্ব্বর টিউটন আক্রমণকারিগণ স্পেন অধিকার করে। এই বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে **ভ্যাণ্ডাল** ও **ভিসি-গথদের** নাম উল্লেখযোগ্য। এদের যুগ প্রায় তিনশ' বছর চলে। ৭১১ খৃষ্টাব্দে, আরব সেনাপতি **তারিক**, সদলবলে স্পেন আক্রমণ করেন। তিনি জিব্রালটারে অবতরণ করেন। তাঁর নাম থেকেই জিব্রালটার নামের উৎপত্তি। দুই বছরের মধ্যে

আরব-মুসলমানগণ, ভিসি-গথদের হাত থেকে সম্পূর্ণ স্পেন জয় করে এবং কিছুকাল পরে তারা পর্তুগালও অধিকার করে।

স্পেনে আরবগণের রাজত্বকালের সভ্যতার ইতিহাস একটি গৌরবময় কাহিনী। স্পেনের আরবদের **মুর** বা **সারসেন্** বলে। মূররা স্পেনে প্রায় সাতশ' বছর ধরে রাজত্ব করে। উত্তর-স্পেনে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল **করডোভা** রাজ্য। করডোভা নগরী ছিল এই দেশের রাজধানী। প্রায় পাঁচশ' বছর পর্য্যন্ত এই নগরীর খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নগরীতে ছিল দশ লক্ষেরও উপর লোকের বসতি। এই উদ্যানমণ্ডিত নগরী দৈর্ঘ্যে ছিল দশ

মূরদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের অভিযান

মাইল; আর কথিত আছে, এতে ষাট হাজার প্রাসাদ, দুই লক্ষ অপরাপর গৃহ, আশী হাজার বিপণি, প্রায় চার হাজার মসজিদ্ এবং সাতশ' স্নানাগার ছিল। তাছাড়া ছিল অনেক গ্রন্থাগার, যার মধ্যে আমীরের নিজের গ্রন্থাগারে চার লক্ষের উপর বই ছিল। করডোভা-বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সমস্ত ইউরোপ ও এমন কি, পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবযুগে স্পেন দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্যচর্চ্চা, ইতিহাস ও বিজ্ঞান নানাদিকে শ্রেষ্ঠ উন্নতির পরিচয় দেয়।

দশম শতাব্দীতে করডোভার আমীরের প্রভুত্ব প্রায় সমস্ত স্পেনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দক্ষিণ-ফ্রান্সের কতকটা অঞ্চলও এই রাজ্যের অন্তর্গত

হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার জন্য করডোভা রাজ্যে ভাঙ্গন স্বরু হলো। স্পেনের উত্তরভাগে কয়েকটি খৃষ্টান রাজ্য ছিল। তারা ক্রমাগত মূরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল। অবশেষে আরবদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, ক্যাষ্টিল রাজ্যের নৃপতি করডোভা জয় করলেন।

আরবগণ যদিও দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত হলো, তবু তারা খৃষ্টান রাজ্যগুলিকে বাধা দিতে লাগলো। স্পেনের দক্ষিণ দিকে তারা **গ্রাণাডা** নামে একটি

গ্রাণাডার আত্মসমর্পণ

রাজ্যের পত্তন করলো। এখানে আরও দুইশত বছর তাদের প্রতিপত্তি থাকলো। এই গ্রাণাডায়ও মূর-সভ্যতা খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। প্রসিদ্ধ **অল্‌হামব্রা প্রাসাদ** আজিও সেই যুগের উন্নত আরব-সভ্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার রাজত্বকালে, গ্রাণাডা রাজ্যের অবসান হয় ও সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের পরিবর্ত্তে খৃষ্টান প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলা

এতদিন পর্য্যন্ত স্পেন ঠিক একটি রাজ্য ছিল না। দেশটা ছিল ছোট ছোট অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত। এদের মধ্যে বড় রাজ্যগুলি আরবশক্তির পতনের পর ছোট রাজ্যগুলিকে জয় করে নিতে আরম্ভ করলো। তাছাড়া এদের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গেই অপর রাজ্যের বিবাহসম্পর্কে আদান-প্রদান চলতো। তাতেও অনেক সময় এক রাজ্যের ছেলের সঙ্গে অন্য রাজ্যের মেয়ের বিয়ে হয়ে দুটো রাজ্য এক হয়ে যেত। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্পেনে শুধু চারটি রাজ্য অবশিষ্ট রইলো। তাদের নাম, **ক্যাষ্টিল, আরাগণ, নোভার** এবং **গ্রাণাডা**।

ফার্দ্দিনান্দ

স্পেনের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে-সব বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য **ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার** বিয়ে। ফার্দ্দিনান্দ ছিলেন আরাগণের উত্তরাধিকারী, ইসাবেলা ছিলেন ক্যাষ্টিলের রাজার মেয়ে। ইসাবেলার এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম **হেনরী**। পিতার মৃত্যুর পর হেনরী ক্যাষ্টিলের রাজা হলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুর্ব্ব্যবহারে প্রজারা এমন ভীষণ অসন্তুষ্ট হলো যে তারা তাঁকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিল। ক্যাষ্টিলের লোকেরা হেনরীর বদলে সিংহাসনে বসালো ইসাবেলাকে। কাজেই ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার বিবাহের ফলে, আরাগণ এবং ক্যাষ্টিল, তাঁদের দুজনের শাসনাধীনে এসে এক হয়ে গেল।

গ্রাণাডা তখনও ছিল মূরদের হাতে। এই ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলাই মূরদের তাড়িয়ে গ্রাণাডা দখল করেন। এর কিছুদিন পরে তাঁরা নোভার নামক বাকি রাজ্যটিও জয় করে নেন। এইভাবে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার রাজত্বকালে স্পেন প্রায় **এক দেশ** ও **এক রাজ্যে** পরিণত হলো।

এই সময়ে স্পেনে সামন্ত-জমিদার ও ধনীদের অসীম ক্ষমতা ছিল। ছোট ছোট রাজ্যগুলোতে যাঁরা রাজা হতেন, আসলে তাঁরা থাকতেন জমিদার ও ধনীদের হাতের **পুতুল**। ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা জমিদার ও ধনীদের এই ক্ষমতা খর্ব্ব করে তাঁদের রাজার হুকুম মানতে বাধ্য করেন। ক্যাষ্টিলের জমিদারেরা একবার তাঁদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা ফার্দিনান্দের তৎপরতায় তাঁদের ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।
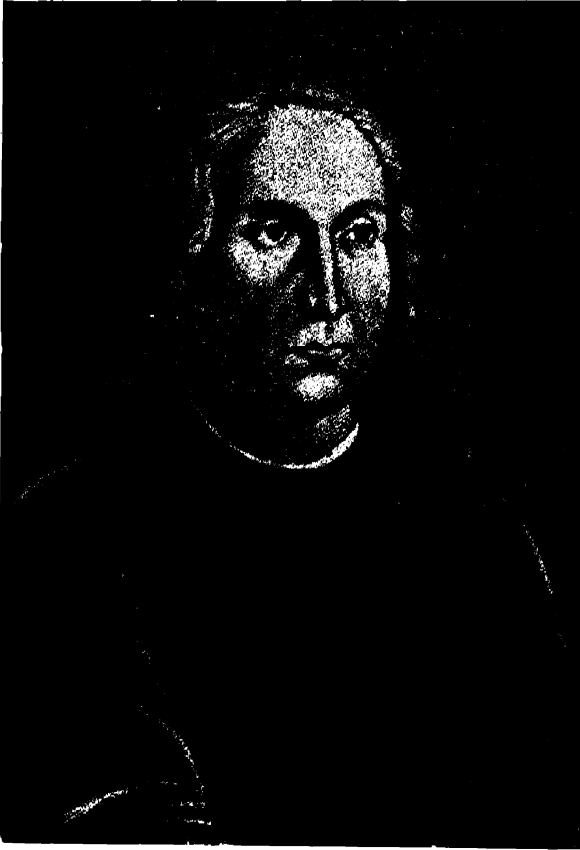
কলম্বাস

ইসাবেলার উৎসাহেই বিখ্যাত নাবিক **কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার** করেছিলেন। কলম্বাসের এই আবিষ্কার একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে, দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনের বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হলো। এসময় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিক **ভাস্কো-দা-গামা,** আবিষ্কারের নেশায়, দক্ষিণ-আফ্রিকা পরিভ্রমণ করে, ভারতের **পশ্চিম**-উপকূলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

স্পেনের সাম্রাজ্য

ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার পর সম্রাট **পঞ্চম চার্লসের** রাজত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্লস ছিলেন ফার্দ্দিনান্দ ও ইসাবেলার মেয়ের ছেলে। কলম্বাসের আবিষ্কারের ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ স্পেনের অধিকারে আসে। **কোর্টিস** নামক একজন যোদ্ধা ৫০০ সৈন্য নিয়ে **মেক্সিকো** দেশ জয় করে সেখানে স্পেনের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন। **পিজারো** নামক আর এক সাহসী বীর মাত্র ২০০ সৈন্য নিয়ে, দক্ষিণ-আমেরিকায় **চিলি** এবং **পেরু** নামক দুটি দেশে, স্পেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের সাম্রাজ্য, আতলান্তিক মহাসমুদ্রের ওপারে আমেরিকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন থেকে আরও সৈন্য এইসব দেশে গিয়ে সেখানে স্পেনের আধিপত্য পাকা করে এবং ধীরে ধীরে **প্রায় সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকাই** স্পেনের অধীনে এসে যায়।

কলম্বাসের জাহাজ 'সান্টামেরিয়া'

চিলি, পেরু, মেক্সিকো, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশ থেকে স্পেনে সোনা আর রূপা প্রচুর পরিমাণে আসতে থাকে। স্পেনের লোকদের ধারণা ছিল, বিদেশ থেকে সোনা আর রূপা ছাড়া আর কিছু এনে লাভ নাই; তারা সে সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে নজর দিত না, খুঁজে বেড়াতো শুধু সোনা আর রূপা।

ষোড়শ শতাব্দীতে, পঞ্চম চার্লসের পুত্র **দ্বিতীয় ফিলিপের** রাজত্বকালে

স্পেন ইউরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় বিশাল আমেরিকা-সাম্রাজ্য থেকে প্রভূত ধনরত্ন এসে স্পেনকে খুব সমৃদ্ধিশালী করে। ফিলিপ পর্ত্তুগালও জয় করেন; কিন্তু গর্ব্বিত সম্রাট ফিলিপের ভ্রান্তনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উগ্র-সঙ্কীর্ণতার জন্য, চারিদিকে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় সাম্রাজ্য স্থায়ী হতে পারে নাই। এলিজাবেথের রাজত্বকালে, ইংলণ্ড জয় করার অভিপ্রায়ে ফিলিপ যে বিরাট **"ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্ আর্ম্মাডা"** পাঠিয়েছিলেন,

পঞ্চম চার্লস

তার মস্ত বিপর্য্যয় ঘটলো। ফিলিপের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্পেন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল্যাণ্ড দেশ বিদ্রোহ করে ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক **উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের** নেতৃত্বে জোর সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বের পর আর কোন উপযুক্ত রাজা স্পেনের সিংহাসনে এলেন না। বাইরের আয়তনে স্পেন-সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত রইলো বটে কিন্তু তার ভিতরটা ঘুণে ধরে গেল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন প্রতাপান্বিত সম্রাট **চতুর্দ্দশ লুই** ফ্রান্সদেশে রাজত্ব করছিলেন, তখন দুর্ব্বল ও অন্তর্জীর্ণ

স্পেন লুইর প্রলুব্ধ দৃষ্টির আকর্ষণে পড়লো। লুইর সারা জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম সত্বেও স্পেন ফরাসীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো না, তবে "স্পেনিশ উত্তরাধিকার" যুদ্ধের ফলে, বুর্বন-রাজবংশের চতুর্দ্দশ লুইর পৌত্র **পঞ্চম ফিলিপ** স্পেনের অধীশ্বর হলেন। এরপর থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত স্পেন একরূপ ফ্রান্সের আওতায় থাকলো। আস্তে আস্তে স্পেনের পারিপার্শ্বিক ইউরোপীয় রাজ্য ও অধিকার-সমূহ তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

এলিজাবেথের রাজত্বের সময় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে স্পেনিশদের ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। ইংরেজ নাবিকগণ লোভের তাড়নায়, দক্ষিণ-আমেরিকা

কোর্টিসের মেক্সিকো বিজয়

হতে আগত ধন-সম্পত্তি বোঝাই স্পেনিশ জাহাজগুলি আক্রমণ করে লুট করতো। স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা অপটু ও বিশৃঙ্খল ছিল বলে, আমেরিকায় তার সাম্রাজ্য থাকা সত্বেও, সে বিদেশী আক্রমণকারীদের দমন বা নিজের ঘর-সামলানো কোনটাতেই সমর্থ হলো না।

বিনা পরিশ্রমে সাম্রাজ্যের দেশগুলো থেকে বহু ধনরত্ন পেয়ে স্পেনের লোকেরা বিলাসী হয়ে পড়েছিল; তাছাড়া দেশের ভাল ভাল ছেলেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দক্ষিণ-আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো; এই সব কারণে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা কমে গেল এবং সভ্যতার দিক দিয়ে স্পেন ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেল। স্পেনের রাজারা

ধর্ম্মনীতিতে ছিলেন উগ্র ক্যাথলিকপন্থী। জেসুইট নামে একদল গোঁড়া, ধর্ম্মোন্মত্ত যাজক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁরা বিরুদ্ধধর্ম্মবাদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন। দেশের লোক এই সব নিয়ে মত্ত থাকতো, তাদের

দ্বিতীয় ফিলিপ

স্বাধীন মনোবৃত্তি স্ফুরণের সুযোগ মিলতো না। তাই স্পেনবাসীদের সহজ, স্বাভাবিক মনোবিকাশ হতে পারলো না।

ফরাসী বিপ্লবের পর, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেপোলিয়ন যখন দেশের পর দেশ জয় করছিলেন, তখন তিনি জোর করে স্পেনের

স্বাধীনতা হরণ করে, তাঁর ভাই **জোসেফকে** স্পেনের সিংহাসনে বসান। এতে স্পেনিশদের মধ্যে একটা প্রবল জাতীয়-জাগরণ দেখা দেয়। **'পেনিনসুলার যুদ্ধে'** স্পেনিশরা, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের সাহায্যে, আক্রমণকারী ফ্রান্সের হাত থেকে স্পেনের স্বাধীনতা উদ্ধার করে। ১৮১২ খৃঃ স্পেনে একটি উদার শাসনবিধিও অবলম্বন করা হয়, তবে স্বেচ্ছাচারী রাজা **সপ্তম ফার্দ্দিনান্দ** যখন নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, স্পেনে ফিরে আসেন তখন তিনি অবশ্য এই শাসনতন্ত্র রহিত করে দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু হয়। স্পেন সে-সব আন্দোলন দমন করতে পারলো না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **মনরোর**

"ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্‌ আর্ম্মাডা"

নীতি ও ইংলণ্ডের সহানুভূতির ফলে, দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি শীঘ্রই বিদ্রোহ আরম্ভ করলো ও একে একে তারা সকলেই স্বাধীন হয়ে গেল। এই-ভাবে স্পেনের আমেরিকা-সাম্রাজ্য তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের সব দেশই যখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, স্পেনেও তখন কয়েকবার শাসন-সংস্কারের দাবী উঠলো বটে, কিন্তু তার ফল বিশেষ কিছু হলো না। শুধু একবার রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয়েছিল। এই সময় **ইসাবেলা** নামে এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাণীর শাসনে স্পেনের

লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীরা এই রাণী ইসাবেলাকে দেশ থেকে তাড়াতে পেরেছিল এবং তাঁর বদলে, **আমাদেও** নামক নতুন একজন রাজাকে সিংহাসনে বসিয়েছিল।

আমাদেও স্বীকার করলেন যে, দেশের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্লামেণ্টের কথা শুনে তিনি চলবেন। তিনি দুর্ব্বল লোক ছিলেন, তাঁর শাসনে লোকে সন্তুষ্ট হলো না। স্পেনের লোকেরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলো। এইবার তারা ঘোষণা করলো যে, দেশে আর কাউকেই
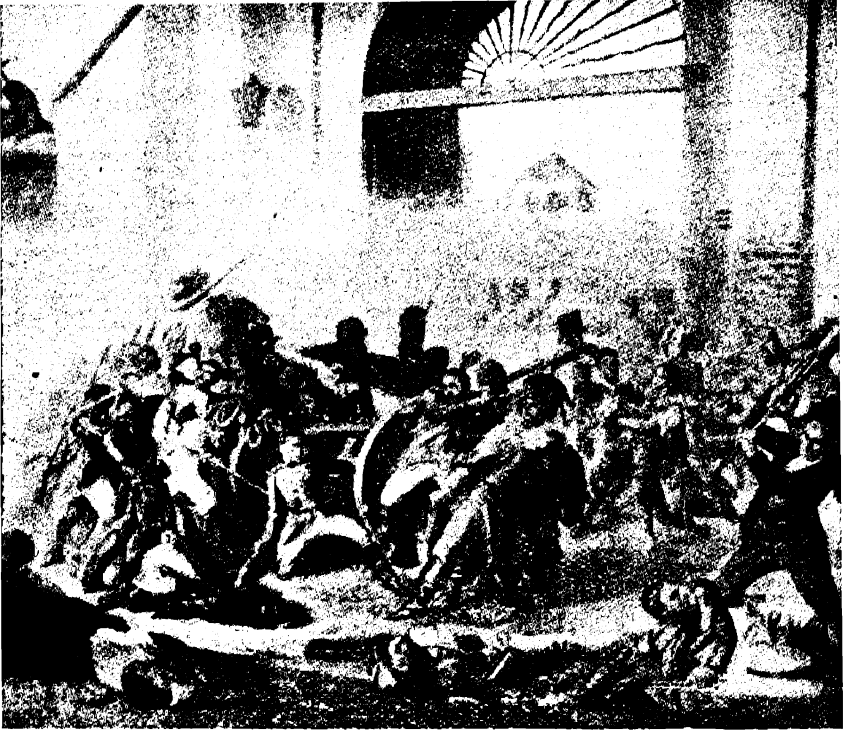
পেনিনসুলার যুদ্ধ

রাজা করা হবে না। প্রজারা তাদের পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন করবে, এই সদস্যদের মধ্য থেকে দেশের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং এঁরাই দেশ-শাসন করবেন। রাজার বদলে দেশে প্রজাদের নির্ব্বাচিত একজন সভাপতি থাকবেন। এই রকম শাসন-ব্যবস্থাকে বলে **প্রজাতন্ত্র**।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও কিন্তু মোটেই সুবিধা হলো না। নতুন গবর্ণমেণ্টের ভার যাঁরা নিলেন তাঁরা কেউই শক্ত লোক ছিলেন না। প্রজারা অনেকেই তাঁদের গ্রাহ্য করতো না। ট্যাক্সের টাকা উঠতো না, সরকারী কর্ম্মচারীরাও

মাইনে পেত না। প্রায় দুই বছর এইভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলবার পর, প্রজারা বুঝলো যে এভাবে বেশী দিন চালানো সম্ভবপর নয়। আবার দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সকলের ধারণা হলো।

পুরাণো রাজবংশের **দ্বাদশ আলফন্সোকে** ডেকে এনে তারা তাঁকে সিংহাসনে বসালো। রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে সব কাজ করবেন এবং মন্ত্রীরা প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন, এটা এবারও ঠিক রইলো বটে, কিন্তু কার্য্যকালে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের সময় ঘুস, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজী, জালিয়াতি প্রভৃতি সব রকম উপায় অবলম্বন করে

ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের সাহায্যে ফ্রান্সের হাত হতে স্পেনের স্বাধীনতা-উদ্ধার

রাজা, তাঁর দলের লোকদের নির্ব্বাচনে জিতিয়ে দিয়ে, পার্লামেণ্টের বেশীর ভাগ সদস্যকে নিজের হাতে রাখতেন। ফলে তিনি নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারতেন এবং তাঁদের নিজের খুসীমত চালাতে পারতেন।

দ্বাদশ আলফন্সো মারা যাবার কয়েক মাস পর তাঁর ছেলে **ত্রয়োদশ আলফন্সো** ভূমিষ্ঠ হন এবং ষোল বছর বয়সে তিনি রাজা হন। রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, শাসনতন্ত্র মেনে তিনি চলবেন। নতুন রাজা মানুষ হয়েছিলেন পাদ্রী, সৈন্যদল ও বড়লোকদের সংসর্গে, কাজেই এদের প্রভাব তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না। স্পেনের রাজনীতিক্ষেত্রেও আবার এই তিন দল ছিল একেবারে একজোট। পাদ্রীদের

এক একটি গির্জ্জার অধীনে বিরাট এক একটি জমিদারী ছিল, তাছাড়া দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনগুলি ছিল এঁদের হাতে। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাদ্রীদের যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। এঁদের আমলে স্পেনের অর্দ্ধেক লোকই লিখতে পড়তে শেখে নাই।

সৈন্যদলের প্রভাবও কম ছিল না। ১৮৯৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে, স্পেনের যে-সব অবশিষ্ট সাম্রাজ্য ছিল সেগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবার পর, সেই যুদ্ধে যে-সব সেনাপতি হেরে এসেছিলেন, তাঁদের মোটা মোটা পেন্সন বরাদ্দ করে দেওয়া হয়। সেনাপতিদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না, তখনকার স্পেনে প্রত্যেক সাতজন সৈন্যের জন্য একজন করে সেনাপতি থাকতো। এইভাবে এঁদের তুষ্ট করতে গিয়ে সামরিক বিভাগের জন্য খরচ ভয়ানক ভাবে বেড়ে গেল।

সপ্তম ফার্দ্দিনান্দ

অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলেন আরও ভয়ানক। এঁরাই ছিলেন দেশের অধিকাংশ জমির মালিক; গরীবেরা এঁদের জমি চাষ করে দিত। তাদের পারিশ্রমিক ছিল সামান্য কয়েক পয়সা। এঁরা সেই জমিতে ঠিক যেটুকু ফসল নিজেদের খোরাকের জন্য দরকার সেইটুকুই শুধু উৎপাদন করাতেন, বাকি জমি অমনি পড়ে থাকতো। কাজেই গরীবদের খাবারের অভাব কিছুতেই ঘুচতো না।

এই সব কারণে **পাদ্রী, সেনাপতি** ও **অভিজাত** এই তিন শ্রেণীর

বিরুদ্ধে ক্রমেই দেশের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এই} তিন দলের অন্যায় প্রভুত্ব নষ্ট করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সবার আগে অগ্রসর হলেন; ফলে তাঁদের .এত বেশী সম্মান বেড়ে গেল যে, লোকে তাঁদের দেবতা বলে পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।

স্পেনে **সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের** নাম খুব বিখ্যাত। অধ্যক্ষ **মিগুয়েল উনামুনো** এবং স্পেনের রাজধানী, মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক **জোসে ওর্টেগা ই গ্যাসেট**, দেশের যুবকদের মধ্যে নব-জাগরণ এনে দেশশুদ্ধ সকলকে নতুন ভাবধারায় মাতিয়ে তুললেন। জাতীয় ঐক্য না থাকলে যে স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় ও দেশের উন্নতি হয় না, এঁদের কথায় সকলে তা অনুভব করতে পারলো।

আমাদেও (১৮৭০)

শুধু যুবকদের মধ্যে নয়, শ্রমিকদের মধ্যেও জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। শ্রমিকরা এর আগে রাজনীতি-চর্চ্চা করতো না; এই সময় থেকেই তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলো; কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে কোন একতা ছিল না বলে তারা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারলো না। রাজার বিরোধী দলগুলি যথেষ্ট প্রবল **হলেও রাজতন্ত্র** উচ্ছেদ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারলো না। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত এইভাবে চললো।

প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেনের নিরপেক্ষতা

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর রাজা আলফন্সো সবচেয়ে বড় বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, যুদ্ধে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থেকে। তাঁর মা ছিলেন অষ্ট্রিয়ান আর রাণী ছিলেন ইংরেজ। দেশের মধ্যে সমান দুটো দল হয়ে গিয়েছিল, একদল চেয়েছিল ইংরেজের পক্ষে আর একদল চেয়েছিল জার্ম্মেণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে।

দ্বাদশ আলফন্সো (১৮৭৪)

আলফন্সো কিন্তু দেখলেন যে, ইউরোপের সবগুলো দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তাদের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাদের সব লোকজন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে এবং কারখানাগুলোতে কেবল যুদ্ধের জন্য দরকারী জিনিষই তৈরী হচ্ছে। ব্যবসা করবার জন্য কোন শিল্পদ্রব্য তৈরি করবার ক্ষমতা কিছুদিন পরে অনেকেরই থাকবে না। কাজেই এই সময় তিনি যদি নিজের দেশকে যুদ্ধের বাইরে রেখে, কারখানাগুলোকে ভাল করে চালাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, তাহলে তাঁর গরীব দেশ এই যুদ্ধের সুযোগে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে।

হলোও ঠিক তাই। প্রত্যেক দেশ থেকে স্পেনে বড় বড় সব অর্ডার আসতে লাগলো; কারখানার মালিকেরা লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে লাগলেন, শ্রমিকদেরও মজুরী বাড়লো। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, স্পেনের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে।

দেশে কারখানার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়লো এবং এবার এরা গবর্ণমেণ্ট দখল করবার জন্য জোর চেষ্টা সুরু করে দিল। ১৯১৭ সালে দেশের অনেক জায়গায় **শ্রমিক ধর্ম্মঘট** হলো। বিব্রত হয়ে গবর্ণমেণ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন; কিন্তু এই আদেশ টিঁকলো না। নেতাদের কারাদণ্ডে শ্রমিকরা এমন ভয়ানক ভাবে ক্ষেপে গেল যে, রাজা তাঁদের ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। পরের নির্ব্বাচনে এই সব নেতাই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হলেন।

ত্রয়োদশ আলফন্সো

১৯২১ সালে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-ক্ষেত্রেও একটু মন্দা দেখা দিল। কারখানাগুলোতে কাজ কমে গেল, অনেক শ্রমিকের কাজ চলে গেল, যারা কাজে রইলো তাদেরও মাইনে কাটা গেল। এই সব নিয়ে আবার শ্রমিক-মহলে ভয়ানক চাঞ্চল্য দেখা দিল।

রাজা আলফন্সো দেখলেন—মহাবিপদ! তিনি এবার এক মস্ত চাল চাললেন। তিনি দেখলেন যে, যদি বাইরের কোন ছোটখাট দেশের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বহিঃশত্রুর

বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দেশের লোকে নিজেদের মধ্যে বেশী গোলমাল করবে না।

স্পেন-অধিকৃত মরক্কোতে **আবদুল করিমের নেতৃত্বে** এর কিছু দিন আগে থেকে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। আলফন্সো এই আবদুল করিমকে দমন করবার জন্য **সিলভেস্তর** নামক এক জেনারেলকে পাঠালেন ; কিন্তু ফল হয়ে গেল উল্টো। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে, **আনুয়ালের যুদ্ধে** স্পেনীয় বাহিনী আবদুল করিমের হাতে ভীষণ ভাবে পরাজিত হলো, দশ হাজার স্পেনীয় সৈন্য নিহত হলো, পনেরো হাজার বন্দী হলো এবং সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আবদুল করিমের হাতে পড়লো। রাগে, দুঃখে জেনারেল সিলভেস্তর **আত্মহত্যা** করলেন।

এই ব্যাপারে দেশে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দিল। **প্রাইমো ডি রিভেরা** নামক একজন জেনারেল তখন জনসাধারণের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, তিনি গবর্ণমেণ্ট দখল করলেন এবং নিজেকে **ডিক্টেটর** বলে ঘোষণা করলেন।

প্রাইমো ডি রিভেরা

প্রাইমো ডি রিভেরা শক্তিশালী দৃঢ়চরিত্রের লোক। তিনি বুঝলেন মরক্কোর বিদ্রোহী নেতা আবদুল করিমের কাছে পরাজিত হয়ে স্পেনের যে বদনাম হয়েছে, তা অবিলম্বে দূর করা দরকার। ১৯২৫ সালে তিনি ফ্রান্সকে দলে টেনে, ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে আবদুল কারমের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। স্পেন ও ফ্রান্সের মিলিত আক্রমণ **আবদুল করিম** ঠেকাতে পারলেন না, বাধ্য হয়ে তিনি **আত্মসমর্পণ** করলেন।

দেশে ফিরে এসে রিভেরা জাতি-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশী জিনিসের উপর আমদানী-শুল্ক বসিয়ে তিনি দেশী কারখানার মালিকদের সুবিধা করে দিলেন। বড় বড় রাস্তা ও রেলওয়ে তৈরি আরম্ভ করে তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কাজ দিলেন। প্রাইমো ডি রিভেরা চাইতেন যে, তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশ অনুসারেই দেশের সমস্ত কাজ হবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে তিনি **ইউনিয়ন প্যাট্রিওটিকা** বলে একটা দল তৈরি করে নিয়েছিলেন। ১৯২৬ সাল থেকে এই দলের সাহায্যে তিনি স্পেনে ডিক্টেটরী শাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করলেন।
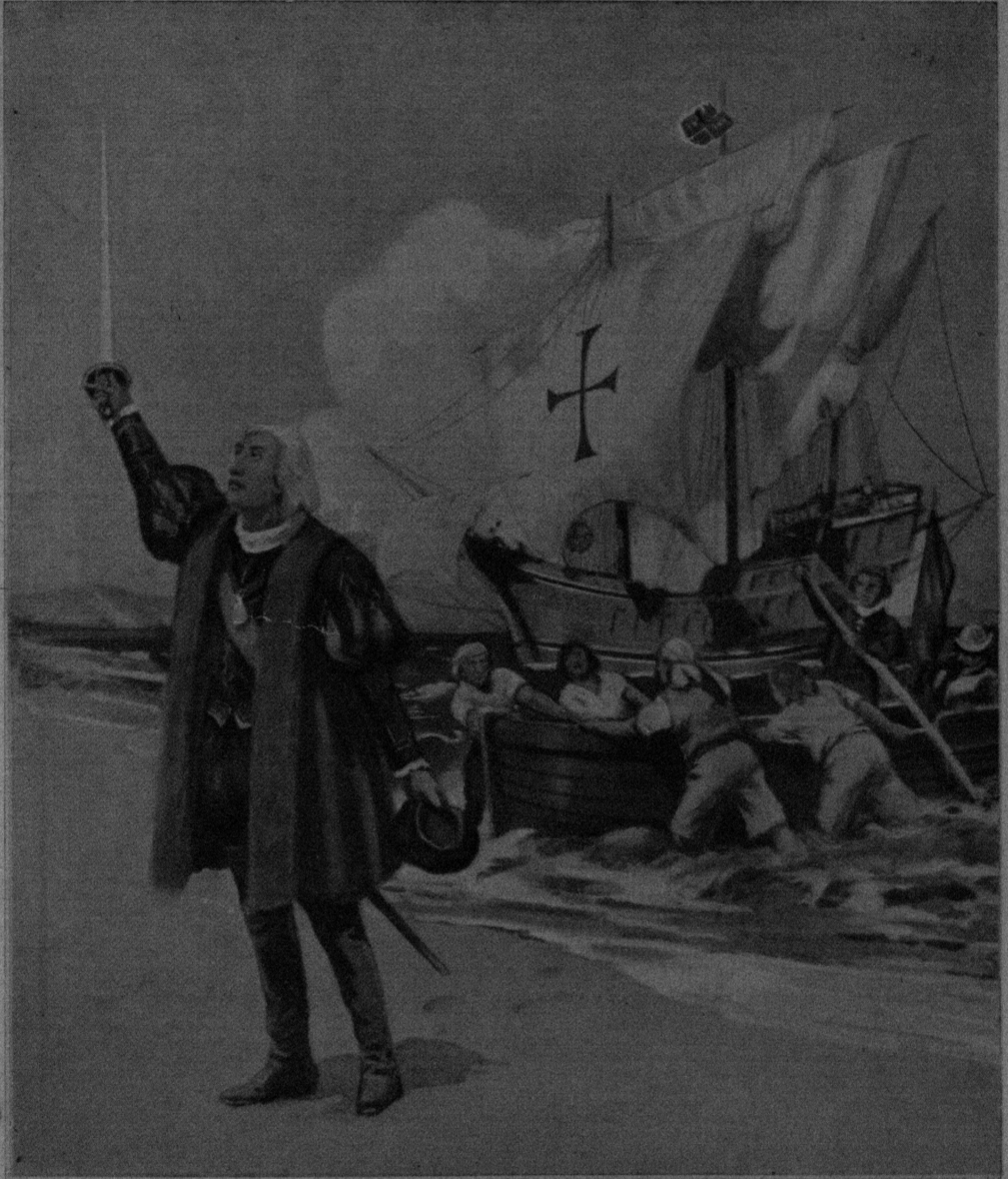
কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার।

ডিক্টেটরী শাসনের অর্থ এই যে, দেশে একজন মাত্র নেতার আদেশে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হয়। তাঁর শাসনে কলকারখানার মালিক এবং জমিদারদের আয় বেড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ কোন লাভ হয় নাই।

প্রাইমো ডি রিভেরা যে দেশের স্থায়ী উপকার করতে পারবেন না, দেশের শিক্ষিত লোকেরা তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং এইজন্য দেশে তাঁর ডিক্টেটরী প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনবিধি পরিবর্ত্তনের যে-চেষ্টা তিনি করছিলেন, তাতে তাঁরা বাধা দিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক। রিভেরা এঁদের পদচ্যুত করলেন, তাঁদের ক্লাবগুলো বন্ধ করে দিলেন, তাঁরা যেসব সংবাদপত্র চালাতেন সেগুলো ছাপা বন্ধ করলেন। **উনামুনো, ওর্টেগা** প্রভৃতি নেতাদের তিনি দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করলেন। পুলিশের গুপ্তচরে দেশ ছেয়ে গেল। প্রত্যেকেই বুঝতে পারতো যে, তার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে, চিঠিপত্র লুকিয়ে খোলা হচ্ছে, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে কারা বসে তার সব কথাবার্ত্তা শুনছে!

রিভেরার পদত্যাগ

১৯২৯ সালে রিভেরার বিরুদ্ধে লোকের **তিক্ত মনোভাব** চরমে উঠলো, চারিদিক থেকে তাঁর প্রত্যেক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসতে লাগলো। **রাজা আলফন্সো** এতদিন রিভেরার হাতে দেশ-শাসনের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে চুপটি করে বসে ছিলেন; এবার তিনি এগিয়ে এসে রিভেরার পদত্যাগ-পত্র দাবী করলেন। রিভেরা নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, রাজা চাইবামাত্র তিনিও পদত্যাগ-পত্র লিখে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলন

রাজা আলফন্সো রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে নিলেন বটে, কিন্তু তিনিও দেশকে ঠিক পথে চালাতে পারলেন না। বিপ্লবীরা দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনে আয়োজন আরম্ভ করলেন। নির্দ্ধারিত সময়ের আগেই হঠাৎ একদিন একটা সৈন্যদল **বিদ্রোহ** ঘোষণা করে বসলো। রাজার হুকুমে তাদের গ্রেপ্তার করে গুলি করে হত্যা করা হলো। বিদ্রোহ কিন্তু এতে থামলো না;

প্রদেশে প্রদেশে ধর্ম্মঘট এবং দাঙ্গা আরম্ভ হলো। নানাস্থানে পুলিশের গুলি চললো। ১৬ জন বিপ্লবী নেতা নিহত হলেন এবং ৯৯২ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। প্রজাতন্ত্রের সমর্থক এই সব নেতাকে একসঙ্গে **মাদ্রিদ জেলে** রাখা হলো। সেখানে তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কি হবে তার একটা খসড়া রচনা করলেন ; এই খসড়াই স্পেনের বিখ্যাত **"জেলের প্রোগ্রাম"** বলে পরিচিত।

এই বিপ্লবী নেতাদের কারাদণ্ডে দেশের লোক এমন ভাবে ক্ষেপে উঠলো যে, রাজা বুঝলেন এঁদের বেশী দিন আটকে রাখা চলবে না, প্রজাতন্ত্রের দাবীকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি কারারুদ্ধ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। স্থির হলো যে, আগামী নির্ব্বাচনে রাজা কোন রকমে হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রজারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দেশের পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে। এই বন্দোবস্তের পর বন্দীরা সকলে মুক্তি পেলেন।

নতুন নির্ব্বাচনে বিপ্লবীরা নেমে পড়লেন। সহরের মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁরা দখল করলেন, রাজার দল সব জায়গায় ভয়ানক ভাবে হেরে গেল। বেগতিক দেখে রাজা বিপ্লবীদের ঠেকাবার জন্য একবার শেষ চেষ্টার আয়োজন করলেন। তিনি বুঝলেন যে, বিপ্লবীদের হাতে গবর্ণমেণ্ট চলে গেলে তাঁর কোন ক্ষমতাই আর থাকবে না। বিপ্লবী নেতা **আলকালা জামোরা** রাজার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাঁকে দেশত্যাগ করবার উপদেশ দিলেন। রাজাকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, বিপ্লবীদের সঙ্গে আবার যদি তিনি বিরোধ করতে যান, তাহলে তাঁর জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

জামোরার উপদেশ যে অর্থহীন নয়, সেটা বুঝতে পেরে রাজা আলফন্সো **দেশ ছেড়ে পলায়ন** করলেন। রাজার উপর সৈন্যদলের বিশ্বাস আগেই টলে গিয়েছিল, তারাও এসে প্রজাতন্ত্রের নেতাদের সঙ্গে যোগ দিল। বিপ্লবীরা রাজপরিবারের কারও উপর কোন অত্যাচার করলো না, কিন্তু যে সব **পাদ্রী** রাজার নামে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে গিয়েছে, তাদের তারা ছাড়লো না। পাদ্রীদের তারা প্রাণে মারলো না বটে কিন্তু প্রায় ২০০ গির্জ্জা তারা পুড়িয়ে ছাই করে দিল। পাদ্রীদের হাতে দেশে শিক্ষাবিস্তারের ভার ছিল, সেটা কেড়ে নেওয়া হলো, সরকার থেকে তারা যে সব বৃত্তি পেত, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল, তাদের টাকা

রোজগার করে বড়লোক হবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হলো। ১৯৩১ সালে বিনা রক্তপাতে এই **প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত** হলো।

প্রজাতন্ত্রের অধীনে রেলওয়ে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হলো, দেশে সস্তায় বিদ্যুৎ-সরবরাহের বন্দোবস্ত হলো, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যও অনেক রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো।

বিপ্লবীদের মধ্যে দুইটি দল হয়ে গিয়েছিল। একদল চাইলো যে, দেশের বড় বড় কলকারখানা প্রভৃতি কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারবে না। গবর্ণমেণ্ট এগুলোর মালিক হবে এবং গবর্ণমেণ্টই কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে এগুলো চালাবে। এই দলের নাম হলো **সমাজতন্ত্রবাদী দল**।

আর একদল বললো যে, এত কড়াকড়ির কোন প্রয়োজন নাই, প্রজাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্ট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা-হলেই বড়লোকেরা গরীবদের উপর যাতে অন্যায়-অবিচার না করতে পারে তার ব্যবস্থা হবে। কল-কারখানা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তিই থাকুক। এই দলের নাম **প্রজাতন্ত্রী দল**। বিপ্লবীদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রী দলের লোক ছিল সংখ্যায় বেশী, কাজেই গবর্ণমেণ্ট এলো এদের হাতে। সমাজতন্ত্রবাদীরাও পার্লামেণ্টে ঢুকেছিল; তারা প্রজাতন্ত্রী দলকে হারিয়ে গবর্ণমেণ্ট হাত করবার জন্য গোপনে চেষ্টা আরম্ভ করলো।

১৯৩৪ সালে সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের একটা ছোটখাট রকমের যুদ্ধ হয়, এবং এই সংঘর্ষে গবর্ণমেণ্টই জয়লাভ করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা এতে হাল ছাড়লো না। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে তারা গবর্ণমেণ্ট দখল করতে সক্ষম হলো। প্রজাতন্ত্রীরা এবার তাদের কাছে হেরে গেল।

সমাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে দেশে আবার একটা দল গড়ে উঠতে লাগলো। এই দলের নেতা হলেন **জেনারেল ফ্রাঙ্কো**। ফ্রাঙ্কো ডিক্টেটরী শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন; দেশের প্রজাদের মতামত নিয়ে কাজ করার চেয়ে, একজন বড় নেতার ইচ্ছানুসারে দেশ-শাসন করাই তিনি ভাল মনে করতেন। ফ্রাঙ্কো তাঁর দলবল নিয়ে, সমাজতন্ত্রবাদীদের তাড়িয়ে গবর্ণমেণ্ট দখল করবার জন্য ১৯৩৬ সালে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই যুদ্ধই স্পেনের ১৯৩৬-১৯৩৯ সালের **ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধ**।

এই যুদ্ধে রাশিয়া সমাজতন্ত্রবাদীদের সাহায্য করেছিল, আর ফ্রাঙ্কো পেয়েছিলেন হিটলার ও মুসোলিনীর সাহায্য। প্রায় তিন বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই ব্যাপারে প্রথমে নিরপেক্ষ ছিল,

কিন্তু পরে তারা ফ্রাঙ্কো-গবর্ণমেণ্টকেই মেনে নিয়েছিল। প্রজাতন্ত্রবাদীরা শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধে পরাজিত হলো। ফ্রাঙ্কো স্পেনে **ডিক্টেটরী শাসন** প্রতিষ্ঠা করলেন। স্পেনে তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসলেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের লোকেরা অপূর্ব্ব সাহস ও বাধাদানের ক্ষমতা দেখিয়েছিল। হিটলার-মুসোলিনী-পুষ্ট ফ্রাঙ্কো তাঁর প্লেনগুলি থেকে, মাদ্রিদ সহরের উপর অবিরাম বোমা ও গোলা-বারুদ বর্ষণ করেছেন কিন্তু নির্ভীক নগরবাসীরা একটুও দমে নাই। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সহিত বড় বড় ইউরোপীয় শক্তি জড়িত হয়ে পড়েছিল এবং এই যুদ্ধে পরবর্ত্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বাভাষ সূচিত হয়।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেন বরাবরই **নিরপেক্ষ** ছিল, কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়েছে। তারই ফলে, যুদ্ধ-বিরতির পরে যখন সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো, তখন তার সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত হলো স্পেন।

বর্ত্তমানে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিচক্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার তীব্র বিরোধের জন্য, ইংলণ্ড, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের জাতিসমূহ, ফ্রাঙ্কো-পরিচালিত স্পেনকে নিজেদের দলে টানতে চেষ্টা করছে। স্পেনকে এখনও একটি ফ্যাসিষ্ট-রাষ্ট্রই বলা চলে। একমাত্র ফালানজিষ্ট দল দেশে শাসন চালাচ্ছে, সেনাপতি ফ্রাঙ্কো হলেন কডেলো বা রাষ্ট্রনেতা আর **আর্টাজো** এখন স্পেনের প্রধান মন্ত্রী।

বালটিক সাগরের উত্তরদিকস্থিত দেশগুলিকে প্রাচীনকাল থেকে এক-কথায় **স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশ** বলে। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এরা আলাদা আলাদা দেশ হলেও, অনেক বিষয়ে এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। একই প্রোটেস্টান্ট ধর্ম্ম, এক জাতীয় ভাষা এবং এদের ইতিহাসে আরও অনেক ব্যাপারে সামঞ্জস্য আছে। এক কথায় এদের **নর্থমেন** বা উত্তরদেশস্থ লোক বলে অভিহিত করা হয়। যারা ইতিহাসে **ভাইকিং** বা সমুদ্রে বিচরণকারী ও লুণ্ঠনকারী জাতি বলে প্রসিদ্ধ, তাদের মধ্যে শুধু দিনেমারগণই নয়, নরওয়ে ও সুইডেনের প্রাচীন জাতিদেরও ধরা যায়।

সুইডেনের পৌরাণিক ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। সুইডিশগণ প্রধানতঃ দেশের উত্তর অঞ্চলেই বাস করতো। সুইডেনের দক্ষিণদিকের উর্ব্বর উপদ্বীপ-অঞ্চলে দিনেমারগণের বসতি ছিল। ডেনমার্কের উত্তর অংশে **গথরা** বসবাস করতো। সুইডিশগণ আস্তে আস্তে দেশের মধ্য-অঞ্চলে ছড়াতে থাকে। ক্রমে তারা বালটিক সাগরের পূর্ব্বদিকে, বিশেষ করে ফিনল্যাণ্ডের উপকূলভাগে বিস্তৃত হতে থাকে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সুইডেনের একজন অভিযাত্রী দলপতি, **রুরিক** তাঁর সশস্ত্র দলবলসহ বালটিকের পূর্ব্ব-অঞ্চলে যান এবং সেখানে তিনি প্রথম ফিনল্যাণ্ডের ফিনদের এবং পরে বালটিকের পূর্ব্বতীরের শ্লাভদের যুদ্ধে পরাভূত করেন। রুরিক কিয়েভ ও নোভগোরড অধিকার করে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে আজকালকার এক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র রাশিয়ার উৎপত্তি হয়।

সুইডিশগণ অনেক পরে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তারা পূর্ব্বেকার ধর্ম্ম-সহজে ছাড়তে চায় না এবং দশম শতাব্দীতে, যখন খৃষ্টধর্ম্ম সুইডেনে ঢুকে পড়েছে তখনও দেশের অনেক লোক আগেকার দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতো।

রুরিকের সমুদ্র-যাত্রা

প্রথম দিকের রাজাদের, দেশের সমস্ত স্থানের উপরে কর্ত্তৃত্ব ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন রাজবংশ লোপ পায়। নতুন **স্টেঙ্কিল** রাজবংশের সময়ে, দেশের রাজা-মনোনয়নে নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। রাজা **ওলফ** সুইডেনের প্রথম খৃষ্টান নৃপতি। তাঁর রাজত্বের কিছুদিন পর দ্বাদশ শতাব্দীতে, **ভারকার** সারাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপিত করেন। বিদেশী আক্রমণ-কারীদের হাত থেকে দেশরক্ষা-কল্পে, দ্বাদশ শতাব্দীতে, সুইডেনের বর্ত্তমান রাজধানী **ষ্টকহল্‌ম্‌** নগরীকে একটি দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সুইডেনের পরবর্ত্তী নৃপতিগণকে **ফোকুঙ্গার** রাজবংশের লোক বলে। **ম্যাগনাস** এই বংশের একজন নামজাদা রাজা ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে দেশের জমিদার ও প্রধান প্রধান লোকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি আসে। তাঁর রাজ্যের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল। সুইডেনের দুর্দ্দান্ত জমিদারদের ক্ষমতাও তিনি অনেকটা খর্ব্ব করেছিলেন।

ক্রমে সুইডিশ জাতি উত্তরদিকে বিস্তৃত হয় এবং ল্যাপল্যাণ্ড দেশ তাদের অধীন হয়। ইতিমধ্যে শক্তিশালী রাজার অভাবে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

সুইডেনে অভিজাতবর্গ সর্ব্বদাই ক্ষমতা আদায় করার জন্য ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্ব্বলতা দেখে অত্যন্ত প্রতাপশালী ও অত্যাচারী হয়ে উঠেন। জমিদারদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল না। তাঁরা এই সময়ে নিজেদের স্বার্থসাধন-কল্পে বৈদেশিক জাতি, বিশেষ করে দিনেমার ও জার্ম্মাণ-দের সুইডেনে আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা **আলবার্ট** নামে একজন জার্ম্মাণকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বৈদেশিক জার্ম্মাণ শাসকের সাহায্যে জমিদারগণ নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুললেন।

কিন্তু দেশের লোকদের মধ্যে এই সময়ে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একটা প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শীঘ্রই ফোকুঙ্গার বংশের শেষ শাসনকর্ত্রী **রাণী মার্গারেট** সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ের অধীশ্বরী হয়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করেন। মার্গারেট কিছুদিনের জন্য **"কালমার ঐক্য"** নামে এক একতার প্রবর্ত্তন করে, স্কাণ্ডিনেভিয় দেশগুলিকে এক শাসনের অধীনে আনয়ন করেন।

তিনি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা ও অভিজাত-পরিষদের ক্ষমতা-হ্রাসে প্রয়াসী হন; কিন্তু তিনি বা তাঁর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণ বিদেশী ছিলেন। এই কারণে মার্গারেটের রাজত্বের পর, যখন বৈদেশিক কর্ম্মচারীদের হাতে দেশে কুশাসন আরম্ভ হয় তখন সুইডিশগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তারা ডেনমার্কের জার্ম্মাণ রাজবংশের বিরুদ্ধে দেশের প্রিয় নেতা **কার্ল নুটস্থানকে** শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করলো। কার্লের পরে তাঁর বিশ্বস্ত আত্মীয় **স্টেনষ্টুর** দেশবাসীর অধিপতিরূপে মনোনীত হন।

যদিও স্টেনষ্টুর কোনদিন রাজা উপাধি পান নাই, তথাপি সুইডেনের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শাসন-বিষয়ে

সর্ব্বদা কৃষক ও নগরবাসীর সাহায্য নিতেন। ডেনমার্কের **ওল্ডেনবুর্গ** রাজাদের বিরুদ্ধে তিনি ক্রমাগত সংগ্রাম করেন। তাঁরই শাসনকালে সুইডেনে, ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে **উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়। দেশের জমিদারগণ অনেক সময়ে তাঁর কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। তবে **পাদ্রী হেমিংগাড** প্রভৃতির সাহায্যে স্টেনষ্টুর দেশ থেকে দিনেমারদের বিতাড়িত করেন।

এর পর দেশ-নেতাদের মধ্যে **ভাণ্টষ্টুরের পুত্র, ছোট স্টেনষ্টুর** বিশেষ নামজাদা শাসনকর্ত্তা। তাঁর শাসনকাল মোটেই নিরাপদ বা বাধাহীন ছিল না। এই সময়ে ডেনমার্কে জবরদস্ত **দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ান** রাজা ছিলেন। তিনি খুব ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। সুইডেনেও এই সময়ে অন্তর্ব্বিরোধ দেখা দেয়। রাজা ক্রিশ্চিয়ান স্টেনষ্টুরের উপর রুষ্ট হয়ে নিজে সমুদ্রপথে ষ্টক্‌হল্‌ম নগরী আক্রমণ করেন; কিন্তু বীর স্টেনষ্টুর, তাঁর অনুগামী সহচর তরুণ **গাষ্টেভাস ভাসার** সাহচর্য্যে ষ্টক্‌হল্‌ম নগরীটি উদ্ধার করেন।

স্টেনষ্টুরের মৃত্যু

স্টেনষ্টুর ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিটমাটের আলোচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু ডেনগণ **বিশ্বাসঘাতকতা করে** হেমিংগাড্, গাষ্টেভাস ভাসা প্রমুখ নেতাগণকে ধরে নিয়ে ডেনমার্কে চলে যায়। তারপর রাজা ক্রিশ্চিয়ান সুইডেনকে অধিকার করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলতে থাকে। একটি যুদ্ধে স্টেনষ্টুর আহত হয়ে শীঘ্রই মারা যান, ফলে বীর

নগরবাসী এবং কৃষকগণ আর বেশীদিন সংগ্রাম চালাতে পারলো না। অবিলম্বে ক্রিশ্চিয়ান সুইডেনের **সিংহাসন কেড়ে** নিলেন।

ক্ষমতালাভের পর রাজা ক্রিশ্চিয়ান, শক্তি-মাদকতায় মত্ত হয়ে একটা জঘন্য কাজ করলেন। বিচারের প্রহসন করে তিনি বহু সুইডিশ নেতাকে **হত্যা** করলেন। এই সময়ে হেমিংগাড্‌কেও হত্যা করা হয়। কিন্তু এই অতিমাত্র **অত্যাচারের ফলে** সুইডিশদের মনে ভীষণ আক্রোশ জমে ওঠে। তারা এর প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। সুইডেনের ইতিহাসে তখন যে ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি একজন অসাধারণ লোক। তিনি সুইডেনে নতুন রকমের স্বাধীনতা ও জাগরণ আনেন। এঁর নাম **গাষ্টেভাস ভাসা।**

গাষ্টেভাস ভাসা

গাষ্টেভাস ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, ক্ষিপ্রগতি, স্থিরবুদ্ধি ও উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর দেশের দুর্গতি ও অত্যাচারের কথা শুনে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। নানা কৌশল অবলম্বন করে, তিনি ছদ্মবেশে ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে এলেন। শীঘ্রই তিনি সুইডেনে এসে উপস্থিত হলেন। দেশের লোকদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি নানাস্থানে বেড়ালেন ও নানা-ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ডেনদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উত্তেজিত করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। সুইডিশরাও সকলে ক্রিশ্চিয়ানের অত্যাচারে এত জর্জ্জরিত হয়েছিল যে, তারা গাষ্টেভাসকেই সুইডেনের **রাজা বলে মনোনীত** করলো। গাষ্টেভাস এই স্বাধীনতার ও মুক্তিকামী-যুদ্ধে অসামান্য সাফল্য লাভ করলেন ও সুইডেন থেকে ডেনমার্কের ক্ষমতা অপসারিত করলেন। তিনি অবিলম্বে ষ্টক্‌হল্‌ম নগরী, অপরাপর দুর্গ এবং ফিনল্যাণ্ড দেশ পুনরুদ্ধার করে, সুইডেনকে একটি **পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে** পরিণত করলেন।

গাষ্টেভাস এখন দেশের যাবতীয় উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। নিজের শাসনের সুবিধার জন্য তিনি **প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকে** সুইডেনের রাজধর্ম্ম করলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী করে তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন। তিনি ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা হন এবং তারপর প্রায় পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত, অনবরত একটি বড় রাষ্ট্রের শক্তিমান রাজা হতে চেষ্টা করেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও কৌতুকপূর্ণ ছিলেন কিন্তু নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তনে

কোনরূপ বাধা মানতেন না। সুইডেনের আইন-পরিষদ, বংশপরম্পরায় **ভাসা-বংশকে** দেশের **রাজবংশ** বলে স্থির করে নিল।

গাষ্টেভাস শুধু নিজের সম্পত্তি বাড়ালেন না, রাজ্যের সমৃদ্ধিও অনেক বাড়িয়ে তুললেন; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করলেন। তিনি সৈন্যদলকে নতুন ভাবে গঠন করলেন, বড় বড় জাহাজ তৈরি করে নৌ-বহর সৃষ্টি করলেন এবং ফিনল্যাণ্ডের উপর রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ

গাষ্টেভাস ভাসা

করলেন। সৃজনী-শক্তি ও কর্ম্মদক্ষতায় তাঁকে ফ্রান্সের একাদশ লুই, প্রাশিয়ার গ্রেট ইলেকটর এবং এমন কি, রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

গাষ্টেভাস সুইডেনে যে ভাসা-রাজবংশের প্রবর্ত্তন করেন, সেই বংশে বহু সুদক্ষ রাজার আবির্ভাব হয়। এঁদের রাজত্বকালে সুইডেনের রাজ্যসীমা ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে বালটিক সাগর অঞ্চলে সুইডেনের

প্রভুত্ব গড়ে উঠে। গাস্টেভাসের পর তাঁর ছেলে **চতুর্দ্দশ এরিক** সিংহাসনে বসেন। এরিক এস্থোনিয়া দেশ জয় করেন কিন্তু শীঘ্রই তিনি ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এরিকের নানা গুণ ছিল কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইরা, **জন** এবং **চার্লস** তাঁকে **সিংহাসন থেকে বিতাড়িত** করেন।

এরপর **জন** সুইডেনে রাজত্ব করতে থাকেন। রাজা হয়ে জনের নাম হয়, **তৃতীয় জন**। তিনি রাজ্যশাসনে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই। ডেনমার্কের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে সুইডেনের খুব ক্ষতি হয়েছিল। ধর্ম্ম-ব্যাপারে জনের আত্মম্ভরিতা ও রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বে সুইডিশগণ খুব চটে যায়। জনের ভাই চার্লসও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে জন তাঁর পুত্র, **সিগিসমুণ্ডকে** পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসান। এর ফলে ভবিষ্যতে, পোল্যাণ্ডের ভাসা-বংশের রাজাদের সঙ্গে, সুইডেনের ভাসা-বংশের রাজগণের অনেকদিন পর্য্যন্ত সংঘর্ষ চলে। কিছু-দিন পর্য্যন্ত সিগিসমুণ্ড সুইডেনেরও অধিপতি ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর ক্যাথলিক-ধর্ম্মের জন্য, দেশবাসিগণ চার্লসের পক্ষই সমর্থন করলো।

এর পরে চার্লস, **নবম চার্লস** উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তিনি পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

গাস্টেভাস এডলফাস

নবম চার্লসের পরে তাঁর পুত্র, **গাস্টেভাস এডলফাস** সুইডেনের অধীশ্বর হন। তিনি সুইডেনের প্রসিদ্ধ ভাসা-বংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তিনি নানা রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি শুধু শক্তিশালী রাজা ও বড় যোদ্ধা নন, নানা বিদ্যায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ইতিহাস, সঙ্গীত, রাজনীতি ও উন্নত রণনীতিসমূহ আয়ত্ত-করেছিলেন। তিনি অনেক ভাষা জানতেন। তাঁর আন্তরিকতা ও আদর্শ দ্বারা তিনি সমস্ত জাতির মধ্যে নতুন প্রেরণা এনেছিলেন। রাজ্যের নানা ব্যাপারে তিনি দেশের লোকদের পরামর্শের জন্য আহ্বান করতেন। সামরিক কৌশলে তিনি এত অসাধারণ উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন যে, সুইডিশ জাতি ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতিতে পরিণত হলো।

গাস্টেভাস এডলফাসকে প্রায় সারা রাজত্বকালেই যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়। বালটিক-অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্য বাড়াবার জন্য তিনি আশেপাশের রাজ্যগুলির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করেন। ডেনমার্ক, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড—প্রত্যেকটি দেশের সঙ্গেই একের পরে একে তাঁকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।

গাস্টেভাস এডলফাস

১৬১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে জার্ম্মেণীতে প্রসিদ্ধ "ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ" চলছিল। এই যুদ্ধে ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র জড়িত হয়ে পড়েছিল। এতে প্রধানতঃ প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক শক্তিগণ বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করে। ক্যাথলিকদের পক্ষে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট নেতা ছিলেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ **রিসল্যু** নিজে ক্যাথলিক হলেও, রাজনৈতিক কারণে, জার্ম্মেণীর যুদ্ধে প্রোটেষ্টাণ্টদের

পক্ষে ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে ক্যাথলিক শক্তিগণ জয়লাভ করে যাচ্ছে, তখন তিনি সুইডেনের বীর নৃপতি গাষ্টেভাস এডলফাসকে, প্রোটেষ্টান্টদের পক্ষে, জার্ম্মেণীতে যুদ্ধ করতে অনুরোধ করলেন। গাষ্টেভাসও এই সুযোগ ছাড়লেন না।

গাষ্টেভাস ইতিমধ্যে বহু যুদ্ধে বিশেষ নাম করেছিলেন। তিনি সুইডেনে অনেক উপযুক্ত সেনানায়কও সৃষ্টি করেছিলেন। জার্ম্মেণীতে ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্যে সকলেই চমৎকৃত হলো। একটার পর একটা যুদ্ধে তিনি একটানা জয়লাভ করতে লাগলেন। ক্যাথলিকগণ ক্রমেই হটে যেতে লাগলো, প্রোটেষ্টান্টদের অবস্থা দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করলো। গাষ্টেভাসের জয়-জয়কার পড়ে গেল; কিন্তু তিনি আর অধিক দিন বাঁচলেন না। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ **লুটজ্যেনের যুদ্ধে** তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধজয়ের কালেই হঠাৎ তিনি আততায়ীর গুলিতে **নিহত হন**।

গাষ্টেভাস এডলফাস্ তাঁর বিজয়-অভিযানসমূহ ও বীরোচিত মৃত্যুর দ্বারা সুইডিশগণের মনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলে, সুইডেন ভবিষ্যতে উন্নতির পর উন্নতি করে যেতে লাগলো। তিনি সুইডেনকে শেখালেন নতুন রণবিদ্যা, তাকে দিলেন সারা ইউরোপে সম্মান, সুইডিশদের মনে বালটিক-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন জাগরূক করলেন এবং রাজাকে করলেন দেশের কেন্দ্রশক্তি।

গাষ্টেভাস এডলফাসের মৃত্যুর পর তাঁর শিশুকন্যা **ক্রিষ্টিনা** দেশের রাণী হলেন। গাষ্টেভাসের বিশ্বস্ত অনুচর, **অক্সেনষ্টিয়ার্ণা**, ক্রিষ্টিনার হয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে ক্রিষ্টিনা নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করলেন, কিন্তু রাজকার্য্যে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই। রাণী ক্রিষ্টিনার রাজ্যশাসনে বিশেষ আগ্রহও ছিল না। তিনি একটু স্বাধীনচেতা ছিলেন। দেশশাসনের চেয়ে লেখাপড়া ও সাহিত্যের আলোচনায় সময় কাটাতে তিনি বেশী ভালবাসতেন। তাঁর দরবারে বিভিন্ন **বিদ্বান্ লোকের সমাবেশ** হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিককে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজকার্য্যে শৈথিল্য ও অপটুতা হেতু এবং অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য রাজ্যে ক্রমেই অবনতি দেখা দিতে লাগলো। রাণী ক্রিষ্টিনাও আর বেশী দিন সিংহাসনে থাকতে চাইলেন না। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে রোমে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি

শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ও সাহিত্য প্রভৃতির সাধনায় দিন কাটাতে লাগলেন ক্রিষ্টিনা **চিরকুমারী ছিলেন।**

রাণী ক্রিষ্টিনা (১৬৪৪)

ক্রিষ্টিনার পরে তাঁর সম্পর্কিত ভাই **দশম চার্লস** সুইডেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ইনি ছিলেন নামজাদা যোদ্ধা এবং এঁকে **সুইডেনের নেপোলিয়ন** বলা হয়। তিনি যেমন উৎসাহী তেমন সমরপ্রিয় ছিলেন।

প্রতিবেশী-রাজ্যগুলির সহিত যুদ্ধে তিনি অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ যোগ্যতা দেখান। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, প্রাশিয়া সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্রধারণ করে, কিন্তু চার্লস তাঁর শৌর্য্য দ্বারা সমস্ত বিপদ অতিক্রম করেন। ডেনমার্ককে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করেন ও নরওয়ের ক্ষমতা বিশেষভাবে ভেঙ্গে দেন। বিরাট বাধার বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যান কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, সুইডেনকে প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে হলো।

দশম চার্লসের পর তাঁর শিশুপুত্র **একাদশ চার্লস** সিংহাসনে বসলেন। এই সময়ে সুযোগ পেয়ে, সুইডেনের জমিদারগণ আবার দুর্বিনীত ও পরাক্রান্ত হয়ে উঠেন। তাঁদের অনাচারের জন্য বাইরে সুইডেনের সুনাম যথেষ্ট হ্রাস পায়।

একাদশ চার্লসও বিশেষ সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিলেন, বিদেশী শত্রুদের তিনি পরাজিত করলেন এবং দেশের বিদ্রোহী সামন্তদের জোর করে নিজের অধীনে নিয়ে এলেন। চার্লস তাঁর শক্তির সাহায্যে, দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনলেন ও একটি প্রবল সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন।

দ্বাদশ চার্লস

একাদশ চার্লসের রাজত্বের পর তাঁর ছেলে, **দ্বাদশ চার্লস** যখন সিংহাসন অধিকার করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর। এই দ্বাদশ চার্লস ছিলেন এক অদ্ভুত ব্যক্তি। অল্প বয়সেই তিনি যে সামরিক প্রতিভা দেখান তা বিস্ময়কর। সে-যুগে তাঁর সমকক্ষ যোদ্ধা সারা ইউরোপে আর কেউ ছিলেন না। রণবীর হিসাবে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যায়; কিন্তু এত বড় প্রতিভাবান হলেও চার্লস মোটেই বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত **একগুঁয়ে, দাম্ভিক** এবং তাঁর সব কাজই ছিল কাল্পনিক ও হঠকারিতাপূর্ণ। এই কারণে যদিও তাঁরই রাজত্বকালে সুইডেন বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, তথাপি তাঁর সময়েই সুইডেন-সাম্রাজ্যের দ্রুতগতি পতন আরম্ভ হয়।

চার্লসের সিংহাসনে বসবার অল্প পরেই সুইডেনের প্রতিবেশী শত্রুরাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়া চার্লসের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে

অস্ত্রধারণ করলো। এই ভাবে প্রসিদ্ধ **"উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধ"** সুরু হলো। এই সময় রাশিয়ায় খ্যাতনামা জার **পিটার** ছিলেন সিংহাসনে। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, চতুর, তেমনি বড় রাজনীতিজ্ঞ। পিটারের উদ্দেশ্য ছিল বাল্টিক-অঞ্চল হতে সুইডেনের ক্ষমতা অপসারিত করে সেখানে রাশিয়ার প্রতিপত্তি কায়েমী করা। তিনি অন্যান্য শক্তিদের সহযোগে, চার্লসের বিরুদ্ধে একটি

দ্বাদশ চার্লস

বিরাট মিত্রশক্তিমণ্ডলী গঠন করলেন এবং নানাদিক থেকে আক্রমণ করে চার্লসকে বিব্রত করে তুললেন।

পিটার অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেলেন যে, দ্বাদশ চার্লস বয়সে তরুণ হলেও সামরিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। যুদ্ধের মত আর কোন জিনিষকেই চার্লস ভালবাসতেন না, যুদ্ধের বিপদে ও কষ্টে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

অসামান্য ত্বরিত গতিতে, তিনি প্রতিপক্ষ মিত্রশক্তিবর্গের একটার পর একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন এবং প্রত্যেককেই হটিয়ে দিলেন।

চার্লস ছিলেন যুদ্ধে অক্লান্ত। তিনি শীঘ্রই **পোল্যাণ্ডকে হারিয়ে** দিয়ে সেখানে তাঁর মনোমত একজন লোককে রাজা করলেন। তারপর তিনি ছুটে গেলেন **জার্ম্মেণীর অভ্যন্তরে** এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ডের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন। এই সময়ে চার্লসের যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখন ইউরোপে **স্পেন-উত্তরাধিকার যুদ্ধ** চলছিল। পাছে চার্লস ফ্রান্সের শক্তিমান সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইয়ের পক্ষে চলে যান, এই ভয়ে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সেনানী **মার্লবরো,** চার্লসের বন্ধুত্ব লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। কিন্তু চার্লস তাঁর নিজের শক্তি-মাদকতায় সমস্ত সুযোগ হেলায় হারালেন। তিনি লুইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। বস্তুতঃ চার্লসের জার্ম্মেণীতে প্রবেশ করা **মস্ত ভুলের কাজ** হয়েছিল।

চার্লস যখন জার্ম্মেণীতে ব্যাপৃত ছিলেন তখন পিটার সময় পেয়ে, দৃঢ়ভাবে তাঁর যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন। পিটার আবার বালটিকের দিকে সসৈন্যে অভিযান আরম্ভ করলেন। উদ্ধত-প্রকৃতির চার্লস এতে ভীষণ চটে গেলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, একেবারে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরী জয় করার অভিপ্রায়ে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মূল **রাশিয়া আক্রমণ** করলেন।

চার্লস যতই দ্রুতগতিতে রাশিয়ার ভিতরে বিজয়-গর্ব্বে এগিয়ে চললেন ততই বিচক্ষণ পিটার তাঁর অগণিত সৈন্যসংখ্যা নিয়ে, চারপাশ থেকে চার্লসকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। হঠকারী চার্লস বিপদের জালে আটকে পড়লেন। তখন ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে **পোল্টাভার যুদ্ধ** হলো, চার্লস সম্পূর্ণভাবে হেরে গেলেন, তাঁর সৈন্যদল বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। চার্লস তুরস্কে পালিয়ে গেলেন। পোল্টাভার যুদ্ধের ফলে সুইডেনের **সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল।**

বিপক্ষ শক্তিরা একের পর এক বালটিক-সাম্রাজ্যের অংশগুলি সুইডেনের হাত থেকে কেড়ে নিতে লাগলো। সুইডেনের চিরকালের স্বার্থান্বেষী, দুর্দ্দান্ত জমিদারগণ দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলো। যদিও চার্লস কিছুদিন পরে সুইডেনে ফিরলেন কিন্তু তিনি আর দেশের পূর্ব্বগৌরব ফেরাতে পারলেন না। অবশেষে তিনি ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। এরপর থেকে ক্ষিপ্রগতিতে সুইডেনের গরিমা ম্লান হতে লাগলো; সুইডেনের জায়গায় রাশিয়া পূর্ব্ব-বাল্টিকে তার প্রভুত্ব স্থাপন করলো।

এরপর পর্য্যাক্রমে দ্বাদশ চার্লসের ভগ্নী, **উলরিকা ইলিওনোরা,** তাঁর স্বামী, **প্রথম ফ্রেডারিক** এবং **এডলফাস ফ্রেডারিক** রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্বকালে ক্ষুদ্র জমিদারের দলরাই সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁদের হাতেই ক্ষমতা একরূপ ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে সুইডেন একবার রাশিয়ার বড় নগরী পেট্রোগ্রাডকে আক্রমণ করতে গিয়ে হেরে গেল।

১৭৫৬ সাল থেকে ১৭৬৩ সাল পর্য্যন্ত, ইউরোপীয় **"সপ্তবার্ষিক যুদ্ধে"** সুইডেন প্রাশিয়ার শক্তিমান ফ্রেডারিক দি গ্রেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিশেষভাবে **অপদস্থ হলো**। এই সময়ে সুইডেনের অত্যন্ত দুরবস্থা। এক সময়ে প্রাশিয়া ও রাশিয়া সুইডেন-রাজ্যকে ভাগ করে নেবারও চেষ্টা করেছিল। তখন **তৃতীয় গাষ্টেভাস** নামক একজন সুযোগ্য যুবক রাজা, সুইডেনের স্বাধীনতা এবং রাজার ক্ষমতা রক্ষা করলেন।

চতুর্দ্দশ চার্লস (জীন বার্ণাদোত্)

তারপর **চতুর্থ গাষ্টেভাস** ও **ত্রয়োদশ চার্লস** ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পর পর রাজত্ব করেন। এই সময়ে ফরাসী বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে সুইডেন খুব নাজেহাল হয়েছিল। অতঃপর সুইডেনের সিংহাসনে এলেন নেপোলিয়নের একজন ফরাসী সেনানায়ক, **বার্ণাদোত্**।

জীন বার্ণাদোত্, চতুর্দ্দশ চার্লস উপাধি নিয়ে ১৮৪৪ সাল পর্য্যন্ত সুইডেনে রাজত্ব করেন। তিনি সিংহাসনে বসবার পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেড়ে দিলেন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে সুইডেনের উন্নতি আরম্ভ করলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, যখন ভিয়েনায় ১৮১৫ সালে শান্তি-সম্মিলন হলো, তখন বিজেতা দেশের নেতারা, সুইডেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বলে তাকে, ডেনমার্কের হাত থেকে কেড়ে এনে নরওয়ে দিয়ে দিলেন।

বার্ণাদোত ও তাঁর বংশধরগণ যথা, **প্রথম অস্কার, পঞ্চদশ চার্লস,**

দ্বিতীয় অস্কার এবং **পঞ্চম গাষ্টেভাস** প্রভৃতির রাজত্বকালে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে, সুইডেনে আবার নানাদিকে উন্নতি দেখা দিল। এঁদের চেষ্টায় ক্রমে সুইডেন একটি খুব সভ্য ও উন্নত দেশে পরিণত হলো। শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞানে দেশ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করলো। সুইডেনে বরাবরই লোক-সংখ্যা খুব কম ছিল এবং দেশটা দরিদ্র ছিল। বর্ত্তমান যুগে দেশের রাজা ও শাসকবৃন্দ, ক্রমাগত দেশটিকে যুদ্ধের হাত থেকে দূরে রেখে ও শান্তির নীতি অবলম্বন করে, সুইডেনে বিভিন্ন দিকে এত উন্নতির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে সুইডেন, অপরাপর স্কাণ্ডিনেভিয় দেশগুলি—যথা, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব-নীতি অনুসরণ করে আসছে। সুইডেন ও নরওয়ে যদিও বর্ত্তমানে আর আগেকার মত প্রতিপত্তি-শালী রাষ্ট্র নয়, তবুও আজকাল এই দুটো দেশই শান্তি-ব্যবস্থা, সমৃদ্ধি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাদিকে খুব বেশী এগিয়ে গেছে।

বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত সুইডেনের নীতি চলে এসেছে,—শান্তিপূর্ণভাবে দেশের উন্নতি করা, যুদ্ধের পথে নয়। এই জন্য দেখা যায়, সুইডেন বিংশ শতাব্দীর দুটি মহাসমরের একটিতেও জড়িয়ে পড়ে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধে সে একরূপ নিরপেক্ষই ছিল।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে, সুইডেনের রাজা **গাষ্টেভাস** যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেন। এই সময়ে সুইডেনের রাজধানী, ষ্টকহল্‌মে বালটিক-রাষ্ট্রগুলির একটা সম্মিলন হলো। এই সম্মিলনে বিভিন্ন শক্তির কর্ণধারগণ, তাঁদের পরস্পর দেশের মধ্যে নিবিড়তর সহযোগের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁরা নিজেদের দেশগুলিকে যথাসম্ভব যুদ্ধ হতে দূরে রাখবার সঙ্কল্প করলেন।

যদিও সুইডেন যুদ্ধে ব্যাপৃত হলো না—কিন্তু আজকাল যুদ্ধের পরিসর এত ব্যাপক যে, নিরপেক্ষ দেশগুলিরও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, জার্ম্মেণী সমগ্র বালটিক-অঞ্চল তার আয়ত্তাধীনে নিয়ে এল। শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্বী-শক্তি, জার্ম্মেণী ও ইংলণ্ডের মাইন-আক্রমণে, সুইডেনের কয়েকটি জাহাজ ঘায়েল হলো। এরপর রাশিয়া যখন অতর্কিত ভাবে ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণ করলো তখনও সুইডেনের নিরাপত্তা বিপন্ন হলো। এই সব কারণে সুইডেনকে বাধ্য হয়ে, নানারূপ আত্মরক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করতে হয়েছিল। তার সমস্ত উপকূল-অঞ্চল বরাবর, সুইডেন

বিভিন্ন সৈন্য-ঘাঁটি স্থাপন করলো আর দেশের চারপাশে একটা সতর্ক-পাহারার ব্যবস্থা রাখলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুইডেন নিজেকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল; তবে যুদ্ধের ঝামেলা তাকে অনেক সময়ই সইতে হয়েছে। ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানে, সুইডেনই শান্তির দূতরূপে কাজ করেছিল। জার্ম্মেণী, সুইডেনের মাধ্যমেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের নিকট, সুইডেনের নেতাদের হাত দিয়ে, যুদ্ধ-স্থগিতের ও শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। বর্ত্তমানে সুইডেন দেশ শান্তিপূর্ণ ও উন্নতভাবে চলেছে।

সুইডেনের শাসনব্যবস্থা এখন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, দেশের **রিকস্‌ডাগ** বা পার্লামেন্ট দুই-বিভাগবিশিষ্ট। ১৯৫০ সালে, রাজা **প্রথম গাষ্টাভের** মৃত্যুর পর থেকে **প্রথম গাষ্টাভ আডলফ** সুইডেনের রাজা হয়েছেন। নরওয়ে ও ডেনমার্কের মত সুইডেনেরও সমস্যা খুব কম। দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণবিধানে সুইডেন এখন একটি বিশেষ অগ্রসর-রাষ্ট্র।

হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ম, দুইটি দেশকে একত্রে বলে **নেদারল্যাণ্ড**। 'নেদারল্যাণ্ড' শব্দটির মানে নিম্নতর জমি। হল্যাণ্ডের অনেক অংশ বস্তুতঃ সমুদ্র-তটের সীমানার তলে অবস্থিত। উত্তর-সাগর থেকে দেশটিকে রক্ষা করার জন্য অনেক বাঁধ ও কৃত্রিম প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করে ডাচ্ বা ওলন্দাজগণ ইতিহাসের গোড়া থেকে খুব দুর্দ্ধর্ষ, সাগর-বিহারী জাতিতে পরিণত হয়েছে। নৌ-বাণিজ্যেও তারা সহজেই পারদর্শিতা লাভ করেছে।

অনেকদিন থেকেই ওলন্দাজগণ উল ও অন্যান্য জিনিষ উৎপন্ন করতো এবং পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মশলাপাতির ব্যবসা করতো। হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের কাছে থেকেই, ইউরোপের অপরাপর দেশের সদাগরগণ এই সব বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করতো। দুঃসাহসিক ওলন্দাজ নাবিকেরা তাদের অসংখ্য জাহাজে করে, পৃথিবীর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা স্থান থেকে তারা যে-সকল দ্রব্যাদি আহরণ করে আনতো, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিত। এরূপে ব্রুজেস, ঘেণ্ট এবং বিশেষ করে এণ্টোয়ার্প নগরীর মত সমৃদ্ধিশালী ও কর্ম্মচঞ্চল নগরীর

উৎপত্তি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিক দিয়ে, **এণ্টোয়ার্প** নগরী ইউরোপের বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানকার ওলন্দাজ বণিকদের **সমকক্ষ** আর কোন দেশের বণিকেরা ছিল না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে **হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের** সম্রাট **পঞ্চম চার্ল্‌স,** তাঁর বাপ-ঠাকুরদার বৈবাহিক-সূত্রে, অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর রাজত্বের পরে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম তাঁর ছেলে, স্পেনের শক্তিমান **সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের** অংশে পড়ে। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে

হল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য

সঙ্গে, উত্তর-ইউরোপের অধিকাংশ জাতির মত, হল্যাণ্ডের লোকেরা বেশীর ভাগই ঐ নতুন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া ক্যাথলিক। তিনি সারাজীবন প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম্মের ধ্বংসের জন্য সংগ্রাম করেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁরই প্রজা হল্যাণ্ডবাসীরা মার্টিন লুথারের নতুন ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি তাদের সমুচিত শিক্ষা দিবেন।

উইলিয়ম দি সাইলেন্ট

দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ভয়ানক একগুঁয়ে, উদ্ধত প্রকৃতির নৃপতি। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন প্রজাদের, কোনরূপ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি হল্যাণ্ডের নগর-গুলির সুবিধা-সুযোগ বিনষ্ট করতে ও তাদের নতুন ধর্ম্মের উচ্ছেদ-কল্পে, **ডিউক আল্‌ভা** নামক এক নির্ম্মম অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানে প্রধান শাসনকর্ত্তা করে পাঠালেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ

আল্‌ভা ওলন্দাজদের উপরে অমানুষিক, নিষ্ঠুর উৎপীড়ন সুরু করলেন। তিনি একটা দেশের সমগ্র নরনারীর স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে যে নৃশংস অভিযানের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তা ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে দুরপনেয় কলঙ্কে মসী-লিপ্ত করেছে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদির শার নিষ্ঠুরতাও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। স্পেন-সরকারের অত্যাচার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও বাড়তে লাগলো। এই সময়ে হল্যাণ্ডে একজন স্বার্থত্যাগী, মহৎ বীরের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম অরেঞ্জ-বংশের **প্রিন্স উইলিয়ম** বা **উইলিয়ম দি সাইলেন্ট।**

উইলিয়মের স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রেরণা দেশবাসীর প্রতি ইন্দ্রজাল বিস্তার করলো। প্রথম দিকে উইলিয়ম, স্পেনের রাজাকেই হল্যাণ্ডের রাজা বলে মেনে আসছিলেন কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে, তিনি দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন। তখন স্পেন বিরাট প্রতাপান্বিত

শক্তি, অপরপক্ষে নেদারল্যাণ্ড কয়েকটি সাধারণ প্রদেশের সমষ্টি মাত্র। হত্যা, লুণ্ঠন ও বিবিধ নির্য্যাতনের দ্বারা আল্‌ভা তাদের নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। কাউন্ট এগমণ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেশনেতাদের তিনি প্রাণদণ্ড দিলেন। নগরের পর নগর তিনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। অনেক সময়ে, এক একটা সহরের নিরস্ত্র স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে, মাটি ও জলের উপর দাঁড়িয়ে, আলভার শিক্ষিত স্পেনিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে গিয়েছে, ক্রমাগত উপবাসেও তারা দমে নাই। যখন আর কোন কিছুতে পারে নাই তখন হল্যাণ্ডবাসিগণ বাঁধগুলি ভেঙ্গে দিয়ে, উত্তর-সাগরের জলে দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে, স্পেনের

ওলন্দাজদের উপরে প্রধান ডিউক আল্‌ভার অত্যাচার

সৈন্যগণ তখন আর অবরোধ করা বা যুদ্ধ চালাবার সুযোগ পায় নাই, অনেকে জলে ডুবেও গিয়েছে।

হল্যাণ্ডের এই স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে হার্লেম, আল্কমার, লেডেন প্রভৃতি নগরের উপর স্পেনিশ সেনাদের অত্যাচার এবং ঐ সকল নগরবাসীর নিঃশেষে আত্মাহুতি অমর-কাহিনী হয়ে আছে। লেডেনের নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ এই সময়ে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল,

তারই **স্মৃতিস্বরূপ,** ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত **লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের** প্রতিষ্ঠা হয়।

এই যুদ্ধ হল্যাণ্ডই একা চালায়। দক্ষিণ-নেদারল্যাণ্ড অর্থাৎ বেলজিয়ম ক্যাথলিক-ধর্ম্মী ছিল বলে, স্পেন সে দেশের লোকদের কৌশলে নিজের হাতে রাখে। কখনও কখনও দেশের জমিদাররাও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের মোহে

উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট

বিদেশী শত্রুর পক্ষে চলে যান। নিজেদের দেশের মধ্যে এই **অনৈক্য** দেখে উইলিয়ম অনেক সময় দুঃখ করেছেন ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। অতটুকু হল্যাণ্ড দেশে যদি আবার একতা না থাকে, তবে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্পেনের বিরুদ্ধে, তারা কতদিন প্রতিরোধ চালাতে পারবে?

তবু হল্যাণ্ড যুদ্ধ :চালাতে লাগলো। তখন **এলিজাবেথ** ইংলণ্ডের রাণী

ছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্পেনের ঘোরতর শত্রুতা চলছিল। তিনি প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে ওলন্দাজদের সংগ্রামে সাহায্য করেন। জার্ম্মেণীর কতক প্রোটেষ্টান্ট রাষ্ট্র থেকেও উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। স্পেন যখন কিছুতেই ক্ষুব্ধ হল্যাণ্ডকে দমাতে পারলো না, তখন বাধ্য হয়েই তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করলো। ওলন্দাজগণ দেশে একজন রাজা চাচ্ছিল। তাদের শ্রেষ্ঠ নেতা উইলিয়মকে তারা সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করলো; কিন্তু নিঃস্বার্থ, অনাড়ম্বর, দেশপ্রেমিক উইলিয়ম কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না। হল্যাণ্ড বাধ্য হয়ে **সাধারণতন্ত্র-শাসন** প্রতিষ্ঠা করলো।

হল্যাণ্ডের "স্বাধীনতার যুদ্ধ" অনেক দিন পর্য্যন্ত চলেছিল। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হল্যাণ্ড প্রকৃতভাবে স্বাধীন হয় নাই। তবে আসল সংগ্রাম চলে ১৫৬৭ থেকে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। দ্বিতীয় ফিলিপ যখন উইলিয়ম দি সাইলেণ্টকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারলেন না, তখন তিনি ঘৃণিতভাবে, এক আততায়ীকে লেলিয়ে দিয়ে, তাঁকে **হত্যা করান**।

উইলিয়ম জীবন দিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে গিয়েছিলেন। কষ্ট, লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে, একটি একতাবদ্ধ, নবজাগ্রত, স্বাধীন ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্রের সৃষ্টি হলো। শীঘ্রই হল্যাণ্ড জেগে উঠলো এক আত্মবিশ্বাসী দেশরূপে, সে গড়লো এক বিরাট নৌশক্তি ও প্রতিষ্ঠা করলো পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পৃথিবীর অপরাপর প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক-সাম্রাজ্য। হল্যাণ্ডে সুরু হলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক **সুবর্ণ-যুগ**।

হল্যাণ্ডের সুবর্ণ-যুগ

অতটুকু ছোট দেশ হল্যাণ্ড, লোকসংখ্যা তার মোটেই বেশী নয়। স্বাধীনতা পেয়ে যেন তার দিকে দিকে আশ্চর্য্য উন্নতি আরম্ভ হলো। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, হল্যাণ্ডের **সর্ব্বতোমুখী উন্নতি** ইতিহাসে একটি বিস্ময়ের বস্তু। যদিও এই সুবর্ণ-যুগ নানাকারণে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, তবু এই যুগের হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে।

ওলন্দাজদের সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব আরম্ভ হলো। এর আগে স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজগণ পৃথিবীর নানাস্থানে দেশ আবিষ্কার করে। ক্ষুদ্র পর্ত্তুগাল দেশের লোকেরা পূর্ব্ব-পশ্চিমে, বহু-বিস্তৃত দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, ব্যবসা-

বাণিজ্যে খুব একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল; কিন্তু তাদের ঔপনিবেশিক শাসনে অপটুতা ও **জলদস্যুবৃত্তির** জন্য সর্ব্বত্রই তাদের বিরুদ্ধে **অসন্তোষ** দেখা দিল। পর্ত্তুগালও শীঘ্রই পরাধীন হয়ে স্পেন-রাষ্ট্রভুক্ত হলো। স্পেন তার মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকার সাম্রাজ্য ও ফিলিপাইন সাম্রাজ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। সে সঙ্কীর্ণ **ধর্ম্মসংক্রান্ত গোঁড়ামি** নিয়ে মত্ত ছিল, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনে মন দিতে পারে নাই, তার সামর্থ্যও ছিল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ে ব্যাপৃত ছিল। এই সুযোগে হল্যাণ্ড উত্তর-সাগর, বালটিক-অঞ্চল, পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-আমেরিকা প্রভৃতি দূর-দূরান্তে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়লো। স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজদের হাত থেকে ওলন্দাজগণই প্রথম সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নেয়। ওলন্দাজদের হাজার হাজার অর্ণবপোত তৈরি হতে থাকে ও তারা নানাকেন্দ্রে, সমুদ্র-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

এর আগেও ওলন্দাজগণ সারা ইউরোপে সবচেয়ে বেশী **কর্ম্মদক্ষ জাতি** রূপে পরিচিত ছিল। যে দেশে তারা বাস করতো, তার অধিকাংশ ভাগই সমুদ্রের জলের তল থেকে উদ্ধার করে, তারা বাঁধ ও প্রাচীরের সাহায্যে রক্ষা করতো। দেশের জমির অবস্থার জন্য তারা **কৃষিকার্য্যে** ততটা সুবিধা করতে পারে নাই। এই কারণে তারা **মাছের ব্যবসা** ও অন্যান্য বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হয়। এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, তারা ইউরোপের অনেক দেশের মাছ জোগাতো। পর্ত্তুগীজগণ পূর্ব্বদেশ থেকে যে সব মশলা আহরণ করে আনতো, তা ওলন্দাজগণই ইউরোপে বিতরণ করার ভার নিয়েছিল এবং জার্ম্মেণীর **হ্যান্স বণিক-সঙ্ঘের** হাত থেকে প্রভুত্ব কেড়ে নিয়ে, তারা বালটিক-সাগরের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

নতুন যুগে সকল ব্যাপারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পেয়ে, ওলন্দাজেরা নৌ-বিদ্যায় ও বাণিজ্যিক দক্ষতায় অন্য দেশকে অতিক্রম করে গেল। তাদের জাহাজগুলিও সংখ্যায় ও আয়তনে সবচেয়ে বৃদ্ধি লাভ করলো। ওলন্দাজেরা ভারতের দিকে ততটা আকৃষ্ট না হয়ে পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ বর্ত্তমান **ইন্দোনেশিয়ায় ঘাঁটি** স্থাপন করলো। এই দেশগুলি, বিশেষ করে জাভা—মশলা দ্রব্যাদি ও কফি প্রভৃতিতে খুব সমৃদ্ধ। এই দেশসমূহের সাহায্যে ওলন্দাজদের খুব লাভজনক ব্যবসা আরম্ভ হলো। ইংরেজরা সেখানে গিয়ে ওলন্দাজদের ক্ষমতাচ্যুত করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিল কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ভারতে চলে আসে। ওলন্দাজরা কালক্ষেপ না করে পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলো। তারা ভারতের দিকে তত নজর দেয় নাই বটে কিন্তু ঐশ্বর্য্য-ভরা সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপটি অধিকার করলো এবং তারাই সর্ব্বপ্রথম জাপানে বন্দরের পত্তন করলো। তারা উত্তর-আমেরিকার **নতুন আমষ্টারডাম** (পরবর্ত্তী **নিউ-ইয়র্ক**) প্রদেশ ও দক্ষিণ-আফ্রিকার **উত্তমাশা অন্তরীপে** উপনিবেশ স্থাপন করলো।

বহুদিন পর্য্যন্ত হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যের মত আর কোন সাম্রাজ্য এত ভালভাবে শাসিত হয় নাই, আর কোন বণিক কোম্পানী এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় নাই এবং আর কোন কোম্পানী এরূপভাবে সমস্ত দেশের লোকের ঐকান্তিক সমর্থন লাভ করে নাই। ওলন্দাজ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" এই সময়ে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-সঙ্ঘে পরিণত হয়।

ইউরোপের **উপকূলভাগের বাণিজ্য** এই সময় অধিকাংশই ওলন্দাজদের হাতে ছিল। তাদের বস্ত্রশিল্প খুব উন্নত হয়েছিল, মুদ্রাঙ্কনে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ধনী ওলন্দাজেরা বাগিচা-চর্চ্চা ও দুষ্প্রাপ্য চারাগাছ উৎপাদনে খুব কৃতিত্ব দেখান। তখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে হল্যাণ্ড ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। দেশের সব লোকই যে অর্থবান ছিল তা নয়, তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় সেখানে দারিদ্র্য কম ছিল এবং পরস্পরের তরফ থেকে, জনকল্যাণকর কার্য্যাবলী ঐ দেশেই বেশী ছিল।

মধ্যযুগে ভেনিস নগরী যেরূপ অর্থের জোরে আড়ম্বর ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হল্যাণ্ডেও সেরূপ **উৎকর্ষের স্ফুরণ** দেখা দেয়। হল্যাণ্ডবাসী কাজের লোক ছিল বলে ধর্ম্ম-ব্যাপারে গোঁড়ামি বা অসহিষ্ণুতা তাদের মধ্যে কমে যায়। হল্যাণ্ডে চিন্তা-জগতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। দেশের লোক বেশীর ভাগ প্রোটেষ্টাণ্ট বা অগ্রসর-প্রোটেষ্টাণ্ট ছিল বটে, কিন্তু তারা নানা ধর্ম্মাবলম্বী ও রাজনৈতিক পলাতকদের তাদের দেশে আশ্রয় দেয়। সে যুগের বহু শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাবীর হল্যাণ্ডে বসে নির্ব্বিরোধে তাঁদের দার্শনিক চর্চ্চা করেন। হল্যাণ্ডের মুদ্রাযন্ত্র থেকেই বিখ্যাত ফরাসী রাজনৈতিক ও চিন্তানায়ক **রুশোর** প্রসিদ্ধ বইখানি (কনট্রাট্ সোস্যাল) ছাপা হয়।

ওলন্দাজদের মধ্যেও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক ও শিল্পীর আবির্ভাব হয়। **হুগো গ্রোসিয়াস** একজন পৃথিবীখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁকে 'আন্তর্জ্জাতিক আইনের' জনক বলা হয়। **রেমব্রাণ্ড** এবং অন্যান্য ওলন্দাজ **শিল্পী** চিত্রাঙ্কনে বিস্ময়কর প্রতিভা লাভ করেন। আরও বিবিধ ক্ষেত্রে

ওলন্দাজগণ বিশেষ উন্নতি দেখান। এ যুগের ওলন্দাজগণ পৃথিবীর যেখানে যেত, সেখানেই খুব বুদ্ধিমান ও অগ্রসর-মতাবলম্বী বলে পরিচিত হতো। তাদের প্রখর বুদ্ধির জন্যই তাদের বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু নানা অন্তরায়ের জন্য ওলন্দাজদের এই পরিপূর্ণ উন্নতি বেশী দিন টিকলো না।

রেমব্রাণ্ড

ওলন্দাজদের বিশেষ প্রতিভা সত্ত্বেও, তারা তাদের সৌভাগ্যের দিন অধিক কাল চালাতে পারলো না। প্রথমতঃ তাদের গবর্ণমেণ্ট ছিল দুর্ব্বল, জাতীয় বিপদকে ঠেকাবার মত তার ক্ষমতা ছিল না। "যুক্তপ্রদেশ সাধারণতন্ত্র" মূলতঃ সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমাবেশ ছিল। কেন্দ্রীয় কার্য্য-সমূহ চালাবার জন্য, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত, একটি **'এসটেট্‌স জেনারেল'** বা আইন-সভা ছিল। আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে, এই সভার সকল সদস্য একমত হলেই তবে কোন সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হবে, এই ছিল প্রথা। ফলে, কোন না কোন প্রদেশের লোকেরা কার্য্যসম্পাদনে প্রায়ই বাধার সৃষ্টি করতো।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে **'স্ট্যাড্‌হুডার'** বা প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অনেক সময় অধিকাংশ প্রদেশ অরেঞ্জ-বংশের প্রধান ব্যক্তিকেই তাদের স্ট্যাড্‌হুডার নির্ব্বাচন করতো। তবে হল্যাণ্ড প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের লোকদের **অরেঞ্জ-বংশের** প্রতি ঈর্ষ্যার ভাব, এরূপ মনোনয়নে অনেক সময় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা সমস্ত দেশে কতকটা একতা এনেছিল। তাদের স্বার্থের কেন্দ্র ছিল হল্যাণ্ড প্রদেশ। এই প্রদেশটি অর্থবল ও লোকসংখ্যায় আর সব প্রদেশ থেকে এত উন্নত ছিল যে, এই হল্যাণ্ড প্রদেশের নামেই সমস্ত দেশটী পরিচিত হতো।

মধ্যবিত্ত অর্থবান বণিকেরা অনেক দিন সৌভাগ্য ভোগ করে আয়েসী ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দেশে তারাই সমস্ত সুবিধা ভোগ করতো। এই কারণে যারা অসুবিধায় ছিল, তারা এদের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়ে উঠে। এর ফলে দেশে অনৈক্য দেখা দেয়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত বড় দেশগুলি এখন থেকে শক্তিতে জেগে উঠছিল। হল্যাণ্ডের পৃথিবীজোড়া একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার তাদের অসহ্য হয়ে উঠলো। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের হিংসার সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা ক্ষুদ্র হল্যাণ্ড দেশের ছিল না। **ইংলণ্ডই প্রথম হল্যাণ্ডের প্রতি আঘাত হানলো।**

ইংলণ্ডে **ওলিভার ক্রমওয়েলের** শাসনের সময়, বৈদেশিক নীতি ও বাণিজ্যে চারদিকে প্রসারের চেষ্টা সুরু হলো। ওলন্দাজদের জাহাজের সংখ্যার আধিক্য দেখে তার গুরুত্ব কমাবার অভিপ্রায়ে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে 'নেভিগেশন আইন' নামে একটি আইন পাশ করলো। তাতে স্থির হলো যে, ইংলণ্ডের বন্দরগুলিতে ইংলণ্ডের জাহাজ বা যে দেশ হতে মাল আমদানী করা হবে, সেদেশের জাহাজ ছাড়া অন্য দেশের জাহাজে মাল আনা যাবে না। এই আইনটি প্রধানতঃ ওলন্দাজদের লক্ষ্য করেই হয়েছিল। এর ফলে, ওলন্দাজদের ব্যবসায়ে যার পর নাই ক্ষতি হলো। তাদের অনেক জাহাজ অকেজো হয়ে পড়লো। তথাপি তারা ইংলণ্ডের সঙ্গে একটা আপোষ করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ইংলণ্ড এতে চটে গিয়ে আবার দাবী করলো যে, ইংলিশ-চ্যানেল ও আশপাশের সমুদ্র-অঞ্চলে ইংলিশ জাহাজ, নিষিদ্ধ মালের খোঁজে

ওলন্দাজ জাহাজগুলিকে অন্বেষণ করতে পারবে। তাছাড়া, উত্তর-অঞ্চলে ইংলিশ জাহাজের সঙ্গে ওলন্দাজ জাহাজের সাক্ষাৎ হলে, প্রত্যেক ওলন্দাজ জাহাজের নৌ-অধ্যক্ষ তাঁর দেশের পতাকা অবনমিত করবেন ও ইংলিশ জাহাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকল্পে বন্দুকের আওয়াজ করবেন। ওলন্দাজ নাবিকদের সঙ্গে ইংরেজ নাবিকদের ক্রমেই গোলযোগ বাঁধতে সুরু করলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

বাণিজ্য-বিরোধ নিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের যে তিনটি যুদ্ধ হয়, এইটি তার প্রথম যুদ্ধ। ওলন্দাজগণ যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করলো কিন্তু

বাণিজ্য-বিরোধ নিয়ে ইংলণ্ডের সহিত হল্যাণ্ডের প্রথম নৌ-যুদ্ধ

শেষ পর্য্যন্ত তারা হেরে গেল। তাদের উত্তর-আমেরিকার নিউ-আমস্টারডাম ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হলো এবং এই সংগ্রামে তাদের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হলো।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে, হল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের আরও দুইটি যুদ্ধ হয়। তৃতীয় যুদ্ধের সময় শুধু ইংলণ্ড নয়, প্রতাপান্বিত চতুর্দ্দশ লুইর আমলের ফ্রান্সের সঙ্গেও একযোগে, হল্যাণ্ডের সমরে অবতীর্ণ হতে হয়। এই সময় অবশ্য হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ-বংশের আর একজন বীরপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নামও **উইলিয়ম অব অরেঞ্জ।** ইনিই পরে **তৃতীয় উইলিয়ম** উপাধি নিয়ে ইংলণ্ডের রাজা হন।

উইলিয়ম অব অরেঞ্জ

ফরাসী সম্রাট **চতুর্দ্দশ লুই** খুব দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি খুব আক্রমণাত্মক ছিল। ফ্রান্সের সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির জন্য তিনি সারা জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সর্ব্বদাই তাঁর ভয়ে শঙ্কিত থাকতো। হল্যাণ্ড ছোট দেশ, তারও ভয় হবারই কথা। প্রথম একটা যুদ্ধে লুই বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের সীমান্তে কতকগুলি দুর্গ কেড়ে নেন। তাতে আশঙ্কিত হয়ে, উইলিয়ম অব অরেঞ্জ নিজের দেশের রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ইউরোপের অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য দেশকে চতুর্দ্দশ লুইর অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। লুই এতে ভীষণ চটে গিয়ে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান সরাসরি হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই চালান।

এই সময় হল্যাণ্ড খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গেও তার যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু বিপদের মুখে উইলিয়ম অসাধারণ প্রতিরোধশক্তি ও পররাষ্ট্রনীতিতে দক্ষতা দেখান। তিনি ইউরোপের অষ্ট্রিয়া এবং অপরাপর রাষ্ট্রকে বুঝান যে, লুইর অভিপ্রায় শুধু হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করা নয়, তিনি ইউরোপের শক্তি-ভারসাম্য বিনষ্ট করে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারে বদ্ধপরিকর। উইলিয়মের এই আবেদনে কয়েকটি দেশ সাড়া দিল ও তাঁর সঙ্গে, লুইর বিপক্ষে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হলো। যুদ্ধে ওলন্দাজদের স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বে এবং উইলিয়মের রাজনৈতিক কৌশলে লুইর গ্রাস থেকে **হল্যাণ্ড রক্ষা পেয়ে গেল**।

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে, উইলিয়মের সারা জীবনের অক্লান্ত চেষ্টা ছিল, চতুর্দ্দশ লুইর আক্রমণ-নীতিকে সর্ব্বদা বাধা দেওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে, ইউরোপীয় শক্তি-সমন্বয় সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। এই কারণেই তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ নানা বিরোধ ও সাধারণতন্ত্রীদলের তাঁর নীতির বিপক্ষতা সত্ত্বেও, তিনি প্রচণ্ড ফরাসী-সম্রাটের কবল থেকে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অটুট রাখতে পেরেছিলেন।

ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের 'গৌরবময় বিপ্লবে'র পর, উইলিয়ম যখন ইংরেজদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে, **তৃতীয় উইলিয়ম নাম নিয়ে** ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর অবস্থার অনেক উন্নতি হলো। তিনি এখন

লুইর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মিলিত শক্তির মালিক হলেন। **অগস্‌বুর্গ-সঙ্ঘে** উইলিয়ম ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়াকে লুইর বিরুদ্ধে একত্রে মিলিত করলেন। এই সময়কার যুদ্ধে লুই বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসানে **রেসিক-সন্ধিতে,** লুইর অমিতবিক্রমে প্রথম খানিকটা বিপর্য্যয় দেখা দিল।

লুইর পররাষ্ট্রনীতিতে প্রধান অভিপ্রায় ছিল, প্রথমে **দুর্ব্বল** স্পেন-সাম্রাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নেওয়া এবং পরে স্পেনের সিংহাসনে, তাঁর পৌত্র ফিলিপকে বসিয়ে সমস্ত স্পেনই গ্রাস করা। এই অভিসন্ধি টের পেয়ে, উইলিয়ম নিরলসভাবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহকে লুইর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও ব্রাণ্ডেনবুর্গের (ভবিষ্যৎ প্রাশিয়া) মধ্যে **'গ্র্যাণ্ড এলায়েন্স'** বা মহাশক্তি-সম্মিলনের সৃষ্টি করলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, দীর্ঘদিনব্যাপী 'স্পেন-উত্তরাধিকার যুদ্ধ' আরম্ভ হলো। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি **মার্লবরো** অসামান্য নৈপুণ্য দেখান এবং শেষ পর্য্যন্ত **ফ্রান্সের পরাজয়ে** এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

সেনাপতি মার্লবরো

এর পরে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বজায় রইলো বটে কিন্তু সে তার পূর্ব্ব-গৌরব আর ফিরে পেল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, **হল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি** ক্রমেই **হ্রাস** পেতে লাগলো। অবশ্য পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য অব্যাহত রইলো কিন্তু সেখানে দেশবাসীর উপর, ওলন্দাজদের ব্যবহার ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো। অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী জাতির মত, সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রজাদের স্বার্থের ক্ষতি করে, ওলন্দাজগণ নিজেদের স্বার্থসাধন এবং ঐ দেশসমূহের ঐশ্বর্য্য শোষণেই মত্ত হলো।

হল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দলাদলি, কলহ-বিবাদ ও রাজনৈতিক অসততা তার **পতনের কারণ।** ক্রমে আমস্টারডামের বদলে লণ্ডন পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজধানীতে পরিণত হলো, ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক আমস্টারডাম-ব্যাঙ্কের স্থান অধিকার করলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ফরাসী বিপ্লবিগণ ও পরে **নেপোলিয়ন** হল্যাণ্ড অধিকার করেন। নেপোলিয়নের পতনের পর, বিজেতা দেশগুলির কর্ণধারগণ, ভিয়েনা-কংগ্রেসে, হল্যাণ্ডের উপর খুসী হয়ে তাকে বেলজিয়ম দিয়ে দেন। এতে কিছুদিনের জন্য হল্যাণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেলজিয়মবাসীরা তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তারা হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকে, পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করে।

বেলজিয়মের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার—(১৮৩০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংলণ্ডের যে দুইবার **বুয়োরদের সঙ্গে যুদ্ধ** হয়, সেই বুয়োরদের পূর্ব্বপুরুষেরাও হল্যাণ্ডের অধিবাসী। ওখানে গিয়ে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বুয়োরগণ খুব দুর্দ্ধর্ষ কৃষকশ্রেণী ছিল। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করতে ইংলণ্ডের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন জার্ম্মেণী পরাজিত হয়, তখন জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার, হল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নিকট পোল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের পর, তিনি পশ্চিম-সীমান্ত আক্রমণে অখণ্ড মনোযোগ দিলেন। তাঁর বিমানবাহিনী ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। এই সময়

থেকেই ওলন্দাজ-সীমান্তে জার্ম্মাণ সেনা সক্রিয় হয়ে উঠলো। ওলন্দাজ-সরকার এর মধ্যেই তাঁদের পূর্ব্ব-সীমান্তের অনেকটা স্থানকে অবরুদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছিলেন। হল্যাণ্ডের **রাণী উইলহেলমিনা** ও বেলজিয়মের

রাণী উইলহেলমিনা

রাজা লিওপোল্ড নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে, ইউরোপে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মিলিতভাবে চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁদের নিজেদের রাজ্য বিপন্ন হয়ে উঠলো, তখন তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যথাসাধ্য জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন।

১০ই জুন (১৯৪০) তারিখে **হিটলার** হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** করলেন। ওলন্দাজেরা আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল জার্ম্মাণ সেনার গতিরোধ করেছিল কিন্তু সে দুর্ব্বার অভিযানকে আর ঠেকাতে না পেরে, তারা পশ্চাদপসরণ করলো। এবারে তারা অনন্যোপায় হয়ে
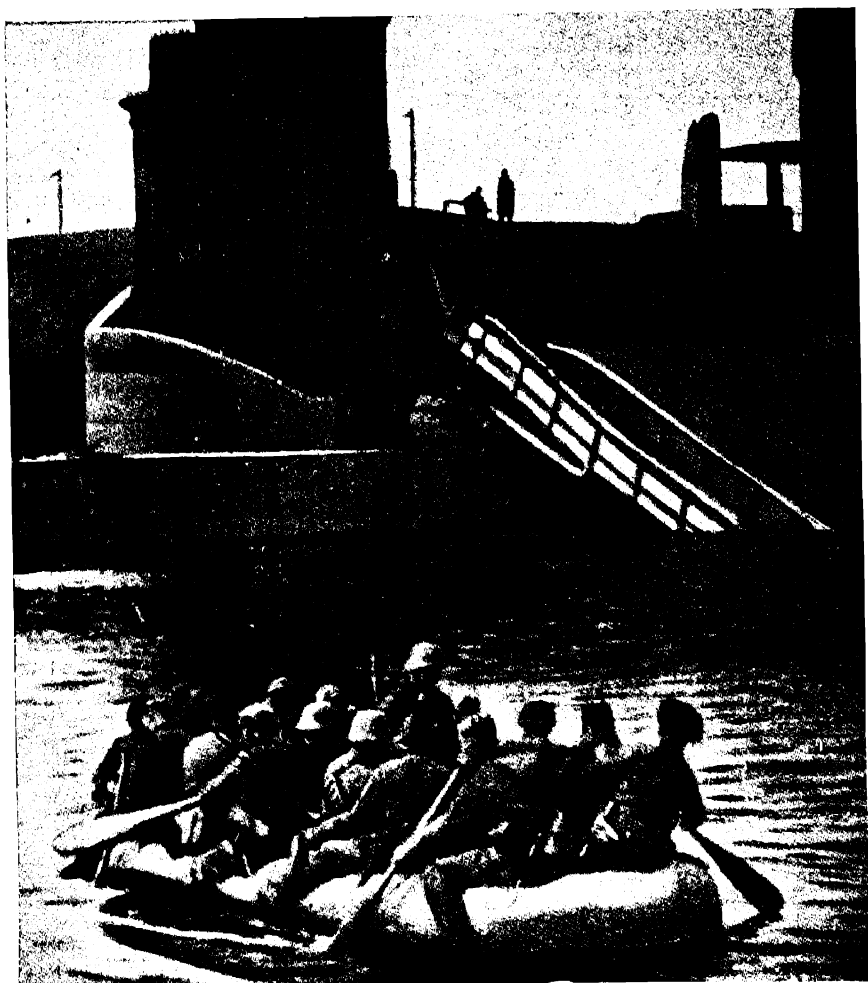
হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ সৈন্য
(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ)

তাদের বিপদের মধ্যে, চিরকালের নিয়ম অনুসারে, সমস্ত খালের মুখ খুলে দিল চারদিকে। প্রবল বেগে সমুদ্রজল এসে সমগ্র হল্যাণ্ডকে ডুবিয়ে দিল। ওলন্দাজ রাজপরিবার লণ্ডনে পলায়ন করলেন। ওলন্দাজ-সরকার শীঘ্রই যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। এই নিয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সমালোচনা

হয়েছিল কিন্তু তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বন্ধ করে দেবার ফলে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম জার্ম্মাণদের দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। ওলন্দাজ-গবর্ণমেণ্টও শীঘ্রই **লণ্ডনে স্থানান্তরিত** হলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, হল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাম্রাজ্য **জাপানের কবলিত** হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে, জাপান হেরে যাবার পর, হল্যাণ্ড আবার ঐ-সব স্থানে তার গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করলো। ওখানকার লোকেরা অনেকদিন থেকেই হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন করে আসছিল। এবার তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জোর যুদ্ধ আরম্ভ করলো। শেষ পর্য্যন্ত তারা সফলকাম হয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে, ঐ দ্বীপপুঞ্জ **ইন্দোনেশিয়া** নামে স্বাধীন **সাধারণতন্ত্রী** রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিয়েছে।

অস্ট্রিয়া

ইউরোপীয় ইতিহাসে অষ্ট্রিয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। ইহা ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত, কিন্তু যেন পূর্ব্ব-সীমানার দ্বারপ্রান্তে। বারে বারে অষ্ট্রিয়াকে ইউরোপের পূর্ব্ব-দিক হতে বিভিন্ন জাতির আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছে। এই দেশ ইউরোপের তিনটি প্রধান জাতি—স্যাক্সন, শ্লাভ এবং ল্যাটিনদের মিলনক্ষেত্র ও যুদ্ধক্ষেত্র।

এক হাজার বছরেরও আগে বিখ্যাত জার্ম্মাণ সম্রাট **শার্লামেন**, শ্লাভদের হাত থেকে তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে, রক্ষা-ঘাঁটিরূপে অষ্ট্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। ইতিহাসের নানা যুগে কখনও জমিদারী, কখনও রাজ্য বা কখনও সাম্রাজ্যরূপে, অষ্ট্রিয়া পূর্ব্ব-প্রান্তের বিপদ থেকে পশ্চিম-ইউরোপকে রক্ষা করেছে। দানিয়ুব নদীর মধ্য-উপত্যকায় অবস্থিত থেকে, অষ্ট্রিয়া সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মেণীর উপর শ্লাভদের আক্রমণ, তারপর হাঙ্গেরীয়দের আক্রমণ ও সর্ব্বশেষে তুর্কীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

"অষ্ট্রিয়া" কথাটি একটি ল্যাটিন শব্দ। এর মানে পূর্ব্বদিকের রাজ্য। নবম শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়া এই নামেই পরিচিত হতো। যদিও অষ্ট্রিয়া প্রথমে ছিল ছোট একটি 'মার্ক' বা জমিদারী, কিন্তু ধীরে ধীরে এর চারপাশে পরবর্ত্তী অষ্ট্রিয়-সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। দুইটি রাজবংশ এই দেশকে প্রথমে অতি সাধারণ

অবস্থা থেকে পরে বিরাট সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করে। এ দুটির নাম যথাক্রমে **ব্যাবেনবার্গ** এবং **হ্যাপসবুর্গ**।

অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা একটি জাতির ইতিহাস নয়, ইহা একটি রাজবংশের, বিশেষ করে হ্যাপসবুর্গ-বংশের ইতিহাস। এখানে এক জাতি, এক ভাষা ও এক ধর্ম্ম গড়ে ওঠে নাই, এখানে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, একটিমাত্র রাজবংশের

ডিউক ষষ্ঠ লিওপোল্ডের ভিয়েনায় আগমন

প্রতি আনুগত্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। ফলে, হ্যাপসবুর্গ-বংশের সমস্যাও চিরকালই খুব বেশী জটিল হয়েছে।

শার্লামেন যে জমিদারীটির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, হাঙ্গেরীয়রা ৯১০ খৃষ্টাব্দে তা জয় করে। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাবেনবার্গ-বংশের **লিওপোল্ড** এই জমিদারীটি লাভ করেন। এই বংশ ১২৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে শাসন-কর্তৃত্ব চালায়। ব্যাবেনবার্গরা এই দেশে খুব নৈপুণ্য ও দক্ষতার সঙ্গে

শাসন চালান। তাঁদের চেষ্টায় ইহা "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের" রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়। **ডিউক দ্বিতীয় হেনরী** ভিয়েনা নগরীর একজন প্রতিষ্ঠাতা।

১১৫৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ সম্রাট **বারবারোসা** একটি সনদে অষ্ট্রিয়াকে একরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নেন। অষ্ট্রিয়ার ডিউক **পঞ্চম লিওপোল্ড** বিখ্যাত তৃতীয় ক্রুজেডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের বীর রাজা প্রথম রিচার্ডের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়েছিল। ডিউক **ষষ্ঠ লিওপোল্ডের** আমলে অষ্ট্রিয়ার বিবিধ উন্নতির সূচনা হয়। তাঁর দরবার খুব আড়ম্বরপূর্ণ ও বিখ্যাত ছিল। তাঁর পুত্র **ফ্রেডারিক** ব্যাবেনবার্গ-বংশের শেষ অধিপতি।

কাউণ্ট রুডলফের প্রস্তর-মূর্তি

এর কিছু পরে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেণীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসক-বৃন্দ, হ্যাপসবুর্গ-বংশের **কাউণ্ট রুডলফকে** সম্রাটরূপে নির্ব্বাচিত করেন। সুইজারল্যাণ্ডের একটি দুর্গ থেকে 'হ্যাপসবুর্গ' নামটি এসেছে। হ্যাপসবুর্গ-বংশের কাউণ্ট বা জমিদারদের অষ্ট্রিয়া ছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি আরও সম্পত্তি ছিল।

রুডলফের উত্তরাধিকারিগণ আশেপাশের দেশগুলির উত্তরে তাঁদের শাসন বিস্তৃত করতে থাকেন। নানাবিধ কারণে, বিশেষ করে কতকগুলি সৌভাগ্যপূর্ণ বিষয়ের জোরে, অষ্ট্রিয়া রাজ্যটি বিপুলভাবে বিস্তৃত হলো। শাসনকর্ত্তা **চতুর্থ রুডলফ** ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে **ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন** করেন।

১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক **পঞ্চম আলবার্ট** "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের" সম্রাটরূপে নির্ব্বাচিত হন। তদবধি হ্যাপসবুর্গ-বংশের শাসনকর্ত্তাগণ ১৮০৬

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই গৌরবজনক উপাধি ভোগ করে থাকেন। এর পরের সম্রাটের নাম **চতুর্থ ফ্রেডারিক**। তাঁর ছেলে **ম্যাক্সিমিলিয়ান** হ্যাপসবুর্গ-বংশের **যশ** ও সুনাম খুব বৃদ্ধি করেছিলেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ানের শাসনকাল হতে অষ্ট্রিয়া ইউরোপে একটি প্রধান স্থান অধিকার করতে স্থুরু করে। বারগাণ্ডির ডিউকের কন্যা **মেরীকে বিয়ে করার ফলে** ম্যাক্সিমিলিয়ান হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি বহুদেশ লাভ করেন। এই

ম্যাক্সিমিলিয়ান ও রাণী মেরী

নৃপতি একজন সুদক্ষ, উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছড়ানো সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকটা ঐক্য-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেন। ম্যাক্সিমিলিয়ান বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিল্প, কাব্য এবং শিক্ষার একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। অষ্ট্রিয়ান জাতির স্মৃতিতে আজও তাঁর নাম জাগরূক হয়ে আছে। তাঁর সময়ে নেদারল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম হ্যাপসবুর্গ-অধিকারভুক্ত হয় বলে, তখন থেকে ফরাসী রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা স্থুরু হয়।

স্পেনের **রাজকুমারী জোয়ানার সঙ্গে** ম্যাক্সিমিলিয়ানের পুত্র **ফিলিপের বিয়ে** হয়। এর ফলে বিরাট স্পেনিশ সাম্রাজ্যের উপর হ্যাপসবুর্গদের অধিকার স্থাপিত হয়। ফিলিপ ও জোয়ানার দুই পুত্র, **চার্লস ও ফার্দ্দিনান্দ।** এই চার্লসই ইতিহাস-বিখ্যাত **পঞ্চম চার্লস।** পঞ্চম চার্লসের সময়ে হ্যাপসবুর্গ-সাম্রাজ্য ইউরোপের প্রায় অর্দ্ধেক জায়গা জুড়ে ছিল। এই সময়ে হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়াও অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পঞ্চম চার্লসের পর তাঁর ছোট ভাই ফার্দ্দিনান্দ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হন, আর স্পেনিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন পঞ্চম চার্লসের পুত্র **দ্বিতীয় ফিলিপ।** সম্রাট ফার্দ্দিনান্দের সময় থেকে, অষ্ট্রিয়ার শাসকদের মধ্যে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ভাবে কেন্দ্রীভূত করা ও সাম্রাজ্যে জার্ম্মাণ ভাবধারাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তখন থেকে হ্যাপসবুর্গ-সম্রাটগণ তাঁদের নিজেদের শক্তির সমর্থকরূপে, **ক্যাথলিক যাজকবৃন্দ** ও অভিজাত সম্প্রদায়কে সর্ব্বদা সাহায্য করেন। তাঁদের অধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রে এমন এক **অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি** করেন যাঁরা সমস্ত ব্যাপারে তাঁদের প্রধান অবলম্বন হতে পারেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মায়তনের সাহায্য পাওয়ার দরুণ, এখন থেকে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটরা ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রধান রক্ষাকর্ত্তা হয়ে উঠলেন।

ফার্দ্দিনান্দের রাজত্বকালে বিখ্যাত তুর্কী সুলতান **সুলেমান** হাঙ্গেরী জয় করতে বারবার চেষ্টা করেন। তিনি বহু সৈন্যের সমাবেশে ভিয়েনা নগরী অবরোধ করেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। এর পর থেকে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত তুর্কীদের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। ফার্দ্দিনান্দের সময়ে সারা ইউরোপের একটি প্রধান বিষয় ছিল ব্যাপক ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলন। তিনি **প্রোটেষ্টাণ্টদের প্রতি** কতকটা উদারভাবাপন্ন ছিলেন।

তারপর **দ্বিতীয় রুডলফ** সম্রাট হয়ে প্রোটেস্টান্টদের উপর অত্যাচার সুরু করেন। সম্রাট দ্বিতীয় ফার্দ্দিনান্দও খুব প্রোটেষ্টান্ট-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর সময়েই বোহেমিয়ায় একটি সাধারণ ঘটনা থেকে জার্ম্মেণীতে ঐতিহাসিক "ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের" সূচনা হয়।

ফার্দ্দিনান্দ ছিলেন ক্যাথলিক লীগের নেতা। এই যুদ্ধে **ওয়ালেনষ্টিন্ ও টিলি** তাঁর প্রধান সেনাপতিদ্বয় ছিলেন। যদিও প্রথম দিকে অষ্ট্রিয়াই এই যুদ্ধে সুবিধা করছিল, কিন্তু যখন সুইডেনের যোদ্ধা-নৃপতি **গাষ্টেভাস অ্যাডলফাস** ত্রিশ-বর্ষ-যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন যুদ্ধের গতি ফিরে গেল।

এই যুদ্ধে হ্যাপসবুর্গদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফরাসীদের যোগদানেও অষ্ট্রিয়ার ক্রমেই পরাজয় হতে লাগলো। পরিশেষে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে, 'ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে' হ্যাপসবুর্গরা ফ্রান্সের কাছে আলসেস ছেড়ে দিলেন এবং জার্ম্মেণীর একতা একেবারে ভেঙ্গে গেল। অবশ্য অষ্ট্রিয়ার রাজার 'পবিত্র রোমক সম্রাট' উপাধি বজায় রইলো।

এরপর সম্রাট **প্রথম লিওপোল্ড** অনেক দিন রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে তুর্কীদের পুনঃপুনঃ হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে **তুর্কী সেনাপতি কারা মুস্তাফা** ভিয়েনা নগরী অবরোধ করেন। এই সময় অষ্ট্রিয়া খুব বিপদের মধ্যে পড়েছিল। পোল্যাণ্ডের রাজা **সোবিয়েস্কি** প্রভৃতির আপ্রাণ চেষ্টায় **তুর্কী-অভিযান ব্যর্থ** করে দেওয়া হয়। এর পর থেকে তুর্কী শক্তির ক্রমাগত পতন হতে থাকে ও তারা আস্তে আস্তে ইউরোপ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়, তার মধ্যে **জেণ্ট যুদ্ধে** অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি **প্রিন্স ইউগেনের জয়লাভ** খুব গৌরবপূর্ণ ঘটনা।

এই সময়ে ফরাসী সিংহাসনে প্রবল শক্তিমান **চতুর্দ্দশ লুই** উপবিষ্ট ছিলেন। স্পেন-উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়ার পক্ষ হয়ে চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধের অবসানে **ইউট্রেক্ট সন্ধির ফলে,** বেলজিয়ম এবং ইতালির নেপলস, মিলান প্রভৃতি স্থানে, অষ্ট্রিয়া আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

হ্যাপসবুর্গ-বংশের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে **ষষ্ঠ চার্লস শেষ সম্রাট।** তাঁর কোন ছেলে ছিল না। তিনি তাঁর মেয়ে **মেরিয়া থেরেসাকে** তাঁর উত্তরাধিকারিণী করবার জন্য **"প্রাগমেটিক স্যাংসন'** নামে এক বিধি রচনা করেন। এই বিধিকে আইনসম্মত করার জন্য, তিনি ইউরোপের অধিকাংশ রাজাদের কাছে অনুরোধ করেন। মেরিয়া থেরেসাকে সিংহাসনে আইনগতভাবে অধিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায়, তিনি নিজের সাম্রাজ্যের অনেক সুবিধাও অপর দেশের রাজাদের কাছে ছেড়ে দেন।

ষষ্ঠ চার্লস **তুর্কীদের বিরুদ্ধে** অনেক যুদ্ধ করেন, এবং ক্রমাগত তাদের হারিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর অষ্ট্রিয়ার উপর মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসে। তাঁর পিতার বিধি অনুসারে রাণী মেরিয়া থেরেসা সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু **বহু প্রতিদ্বন্দ্বী** সিংহাসনের উপর তাঁদের দাবী নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে অষ্ট্রিয়ার সব চেয়ে বিপদ হলো তার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার বিখ্যাত নৃপতি **ফ্রেডারিকের সমরাভিযান।**

মেরিয়া থেরেসা

ফ্রেডারিক প্রাশিয়ারাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য লালায়িত ছিলেন। তিনি হ্যাপসবুর্গ-সাম্রাজ্যে একজন রাণীকে দেখে সমস্ত ন্যায়-নীতি উপেক্ষা করে, শাইলেশিয়া দেশটি গ্রাস করবার অভিপ্রায়ে **অষ্ট্রিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন।** এইভাবে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে "অষ্ট্রিয়-উত্তরাধিকার যুদ্ধ" আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ইংলণ্ড তার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। যদিও এই যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত **অষ্ট্রিয়ার পরাজয়** হয়েছিল এবং ফ্রেডারিক শাইলেশিয়া জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন, তথাপি এই সময় মেরিয়া থেরেসার সাহসিকতা ও মনোবলের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। **আইলা-শ্যাপেলের সন্ধিতে** এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

মেরিয়া থেরেসা চারদিকে বিপদজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তখন হাঙ্গেরীয়গণ তাঁর প্রতি খুব ভক্তি ও আনুগত্য দেখায়। যুদ্ধের পরে, মেরিয়া থেরেসা নানারূপ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করে, অষ্ট্রিয়াকে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনলেন ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুললেন। চিরকালের ক্যাথলিক স্বেচ্ছাচারী শাসন ত্যাগ করে তিনি **উদার একরাট্ শাসনের প্রবর্ত্তন করলেন।** তিনি তাঁর দূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক একতা আনতে প্রয়াসী হলেন। শিক্ষার বহুল প্রচারকল্পে তিনি অনেক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে **জার্ম্মাণ ভাষাকে** তিনি রাজকীয় ভাষা করতে চেষ্টা করলেন। তিনি ধর্ম্ম-সংস্থানের অনেক দোষত্রুটির সংশোধন করলেন। এইসব **সংস্কার** প্রণয়নে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন।

অষ্ট্রিয়-উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরে অষ্ট্রিয়ার **বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্ত্তন** দেখা দিল। এই ব্যাপারে মেরিয়া থেরেসা তাঁর সচিব **কৌনিজের** খুব সাহায্য পেয়েছিলেন। কৌনিজ বুঝতে পারলেন যে, চিরকালের শত্রু ফ্রান্সের চেয়েও নবজাগ্রত প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার বড় শত্রু। তাই তিনি প্রাশিয়ার সঙ্গে আবার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনে ফ্রান্সের সঙ্গে এত দিনের **শত্রুতা পরিত্যাগ করে** বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

মেরিয়া থেরেসা **শাইলেশিয়া হারিয়ে** অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত ছিলেন।

তিনি পুনরায় ঐ দেশ লাভ করার জন্য আবার যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অনেক শক্তির সহযোগিতা সংগ্রহ করতে লাগলেন। শীঘ্রই আবার একটি বড় যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এর নাম **"সপ্তবার্ষিক যুদ্ধ"**। এই যুদ্ধে **ইংলণ্ড ফ্রেডারিকের পক্ষে** গেল। **ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার পক্ষে** যোগদান করলো। এই যুদ্ধেও **অষ্ট্রিয়ার পরাজয়** হয় ও শাইলেশিয়া স্থায়িভাবে প্রাশিয়ার কুক্ষিগত হয়।

এই সময় **দ্বিতীয় ক্যাথারিণ** রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি খুব উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একযোগে, মেরিয়া থেরেসা পোল্যাণ্ডের প্রথম-রাজ্যবিভাগ করেন ও গ্যালিসিয়া অধিকার করেন। মেরিয়া থেরেসা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়াকে খুব দুরবস্থা থেকে ভাল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করেন।

দ্বিতীয় জোসেফ

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসার পুত্র, **দ্বিতীয় জোসেফ** সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। ইনি খুব শিক্ষিত ও প্রগতিপন্থী নৃপতি ছিলেন। ইনি ফরাসী সাম্যমন্ত্রের পূজারী **রুশোর মন্ত্রশিষ্য** ছিলেন। এঁর রাজ্য-শাসনের মূলে ছিল, যুক্তি এবং প্রগতি। ইনি ইতিহাসের এক অদ্ভুত ব্যক্তি; সারাজীবন আন্তরিকভাবে সাম্রাজ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের চেষ্টা করেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে শুধু **ব্যর্থতা বরণ** করতে হয়েছিল। এর কারণ, তিনি ছিলেন স্বপ্নবিলাসী ও অবাস্তবপন্থী।

রাজা হয়েই তিনি, একটা আদর্শের প্রেরণায়, রাজ্যের চারদিকের **সংস্কারে ব্রতী হলেন**। তিনি তাঁর বহুধাবিভক্ত সাম্রাজ্যের, বিভিন্নমুখী জাতিদের মধ্যে চিরকালের জাতিগত অধিকার, প্রথা ও জাতি-বৈষম্য দূরীভূত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর আদর্শ ছিল, সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে একজাতীয় শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাদের মধ্যে **একতা** আনা। এই কারণে, সমস্ত প্রদেশে তিনি একজাতীয় রাষ্ট্রীয় গঠন, আইন-কানুন এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে আরম্ভ করলেন। এতে অনেকেরই নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলো ও তাদের চিরাচরিত প্রথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো। জোসেফ যখন তাঁর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র জার্ম্মাণ ভাষাকে **রাজকীয় ভাষা** বলে চালাতে সুরু করলেন, তখনই অন্য-জাতীয় প্রজাদের মধ্যে **অসন্তোষের মাত্রা** বেড়ে গেল।

জোসেফের কিছু সামাজিক সংস্কার অবশ্য স্থায়ী হলো। তিনি অভিজাতবর্গ ও যাজক-সম্পত্তির উপর কর বসান, দাসত্বপ্রথা রহিত করেন এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম-ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করেন। অষ্ট্রিয়ায় বরাবরই যাজক-সম্প্রদায়ের অপরিমিত সুযোগ-সুবিধা ছিল। তিনি তার যথেষ্ট হ্রাস করেন, যাজকদের রাষ্ট্রের অধীন করেন। চার্চ্চের সম্পত্তির অনেকটা রাষ্ট্রগত করে, তিনি তার সাহায্যে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্ম্মাণ করেন। তিনি

দ্বিতীয় জোসেফ

দাসদের শুধু মুক্তি দান করেন নাই, তাদের জমির উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দিয়ে দেন।

এই সব থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় জোসেফ, ফরাসী **বিপ্লবীদের আধুনিক নীতিগুলি** তাদেরও আগে প্রবর্ত্তন করেন।

জোসেফের আদর্শ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা খুবই উচ্চধরণের ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি বাস্তবতার দিকে তাকান নাই বলে এবং তাঁর মাতার মত তাঁর সব দিকে খেয়াল ছিল না বলে, তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ, তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বিদ্রোহী হয়। হাঙ্গেরী,

বোহেমিয়া, বেলজিয়ম ও তিরোল জোসেফের সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে **প্রকাশ্যে বিদ্রোহ** আরম্ভ করে। জোসেফ এই সব কারণে ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে, নিজের হাতেই সারাজীবনের সংস্কার-ব্যবস্থাগুলির বিলোপ সাধন করেন।

জোসেফের পরবর্ত্তী সম্রাট **দ্বিতীয় লিওপোল্ডও** খুব সামর্থ্যবান্ ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কল্পনার ধার ধারতেন না। তিনি হ্যাপসবুর্গদের বরাবরের নিয়ম অনুসারে রাজ্যে পুনরায় যাজক-প্রাধান্য প্রচলিত করেন। তিনি **কঠোর হস্তে** সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে বিদ্রোহের ভাব মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার দমন করেন ও **রাজ্যে শৃঙ্খলা** স্থাপিত করেন।

দ্বিতীয় লিওপোল্ড

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় লিওপোল্ড পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতিপদে স্থাপিত হবার পরেই **ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে** তাঁর ভীষণ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। আলসেস, লরেন ও রাইন নদীর অঞ্চলভাগে, নবজাগ্রত ফরাসী বিপ্লবীরা নানাস্থানে আক্রমণ করতে সুরু করেছিল। লিওপোল্ড এই কারণে ভীত হন ও তাদের উপর রুষ্ট হন। ফরাসী দেশ থেকে অনেক বিপ্লব-বিরোধী পলাতক অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অধীনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বিপ্লবীরা তাদের ফিরিয়ে চাইলে লিওপোল্ড তাদের ছেড়ে

দিতে অস্বীকার করলেন। এই সব কারণে, নবপ্রেরণায় বলীয়ান ফরাসী বিপ্লবীরা **অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা** করে।

ইতিমধ্যে লিওপোল্ডের মৃত্যু হইলে তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় ফ্রান্সিস** অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হন। ফ্রান্সিস অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপদের **সম্মুখীন** হলেন। ফ্রান্সে শীঘ্রই **নেপোলিয়নের আবির্ভাব** হলো এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার ঘোরতর **সংগ্রাম** স্বরু হলো। নেপোলিয়নের বিজয়-অভিযান, দেখতে দেখতে সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে এগিয়ে চললো। তিনি একটার পর

দ্বিতীয় ফ্রান্সিস

একটা যুদ্ধে **অষ্ট্রিয়াকে পর্য্যুদস্ত** করতে লাগলেন। শীঘ্রই বেলজিয়ম অষ্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হলো। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে **লুনভিল-চুক্তির** পর, জার্ম্মেণীতে হ্যাপসবুর্গদের প্রতিপত্তির অবসান হলো। এখন থেকে ফ্রান্সিস, **প্রথম ফ্রান্সিস** উপাধি নিয়ে শুধু অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হয়ে রইলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে **অষ্টারলিজের যুদ্ধে** অষ্ট্রিয়ার বিরাট পরাজয়ের পর, তাকে সাম্রাজ্যের অনেক স্থান ছেড়ে দিতে হলো। এর পর যখন **নেপোলিয়ন**
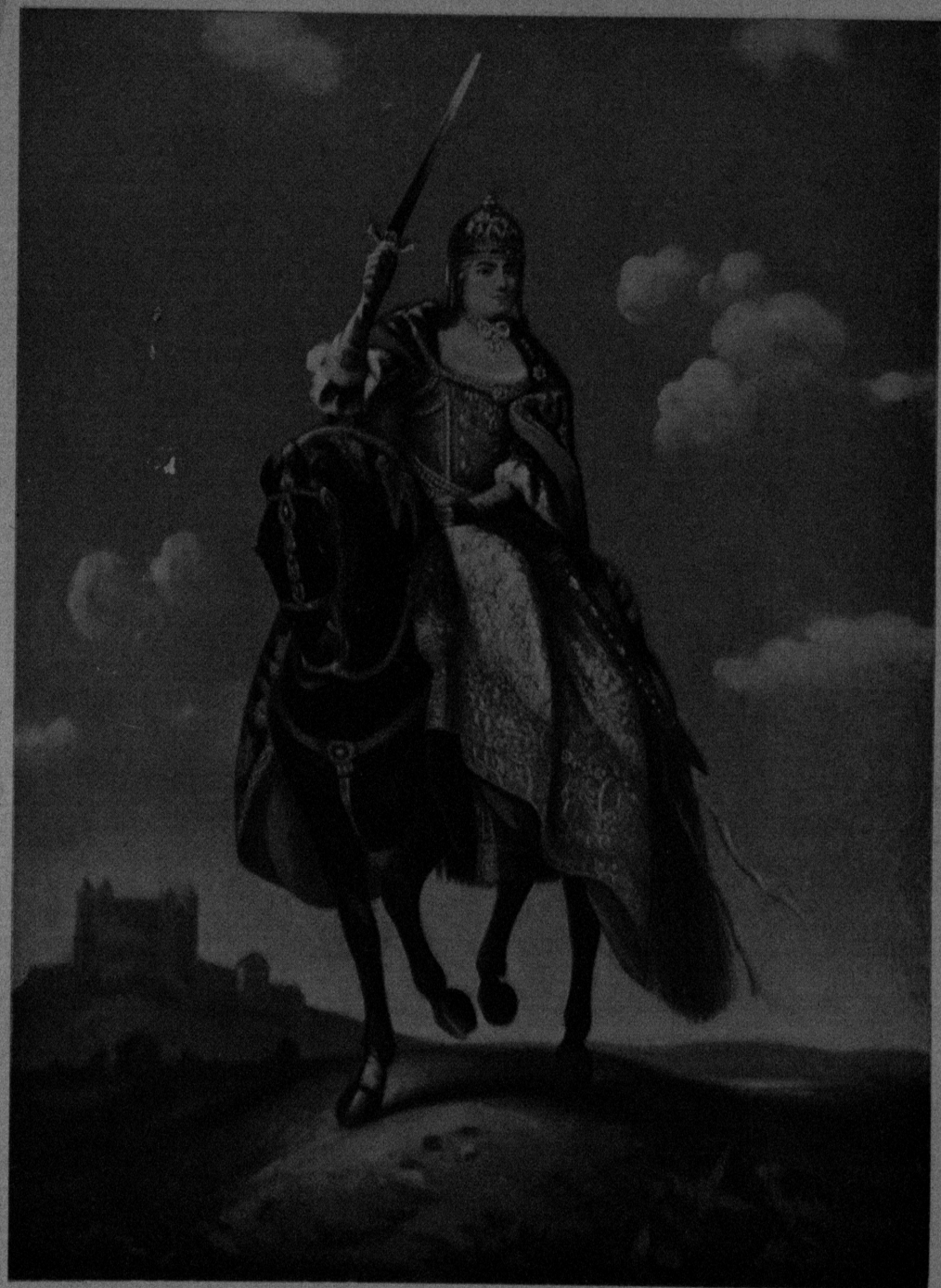
মেরিয়া থেরেসা।

জার্ম্মেণীর রাষ্ট্রগুলি একত্রিত করে, "রাইন-কনফেডারেশান" বা রাইন-রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৃষ্টি করলেন, তখন ফ্রান্সিস ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে, আইনগতভাবে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট উপাধি পরিত্যাগ করলেন। এইরূপে শার্লামেনের সময় হতে আগত যে উচ্চ সম্মান এতদিন হ্যাপসবুর্গরা ভোগ করে আসছিলেন, তার অবসান হলো।

বিজয়ী নেপোলিয়ন বারবার অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রবেশ করতে লাগলেন। **ওয়াগ্রামের যুদ্ধে** অষ্ট্রিয়ার আরও অনেক রাজ্য হাতছাড়া হলো।

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী আক্রমণ

তখন অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যাকাশে এক ক্ষণজন্মা, প্রতিভাবান রাজনীতিকের আবির্ভাব হলো। এঁর নাম **মেটারনিক**। ইনি অপরিসীম ধৈর্য্য ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার গৃহ-সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

মেটারনিক

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের পরে বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়াকে নেপোলিয়নের ক্ষমতার অধীনে থাকতে হলো। পরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়নের "মস্কো অভিযানে" বিরাট ক্ষতি হলো, তখন আবার অষ্ট্রিয়া সুযোগ পেয়ে, নেপোলিয়নের প্রতিপক্ষ-মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিল। অষ্ট্রিয়া এবার প্রচণ্ডবিক্রমে মিত্রশক্তির সহযোগে, **নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে** অভিযান আরম্ভ

করলো। লাইপজিগ্ যুদ্ধ, ফ্রান্সে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের অভিযান এবং মিত্রশক্তির সগৌরবে প্যারিস নগরীতে প্রবেশ, প্রত্যেকটি ব্যাপারেই অষ্ট্রিয়া প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে **ওয়াটালুর যুদ্ধে** নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, সমস্ত বিজয়ী শক্তি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী **ভিয়েনাতে এক কংগ্রেসে** সম্মিলিত হলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের **পুনরায় সংগঠন** করা। এই ভিয়েনা-সম্মিলনে মেটারনিক সবচেয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সুকৌশলী বুদ্ধি ও কূট রাজনীতির সাহায্যে অষ্ট্রিয়া তার হৃত রাজ্যগুলির **অনেক স্থানই ফিরে** পেল। জার্ম্মেণী ও ইতালিতে **অষ্ট্রিয়ার প্রভুত্ব** আবার

ভিয়েনার কংগ্রেস

স্থাপিত হলো। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার একটি শক্তিশালী, রাজভক্ত সৈন্যদল গড়ে উঠেছিল। এই সেনাদলই এখন থেকে অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের প্রধান অবলম্বন হলো।

মেটারনিক খুব প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তিনি সারা ইউরোপ থেকে, ফরাসী বিপ্লবীদের প্রজাতন্ত্রী নীতিগুলিকে নির্ব্বাসিত করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, বিপ্লবী ভাবধারা বিনষ্ট করে, পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রথায় ফিরে যাওয়া। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তিনি রাশিয়ার জার, প্রাশিয়ার রাজা ও অপরাপর

দেশের শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে মিলে, **"হোলি অ্যালায়েন্স"** বা পবিত্র সঙ্ঘের সৃষ্টি ও অনেক প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ করলেন।

অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষার সমাবেশ ছিল। তাদের বিভিন্নমুখী জাতিগত অধিকারবোধ ছিল। ফরাসী বিপ্লবীদের মানব-অধিকার ও স্বাধীনতাবোধ তাদের মধ্যে প্রবেশ করলে, অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে যাবে মেটারনিক এটা বুঝতে পেরে, সাম্রাজ্যের
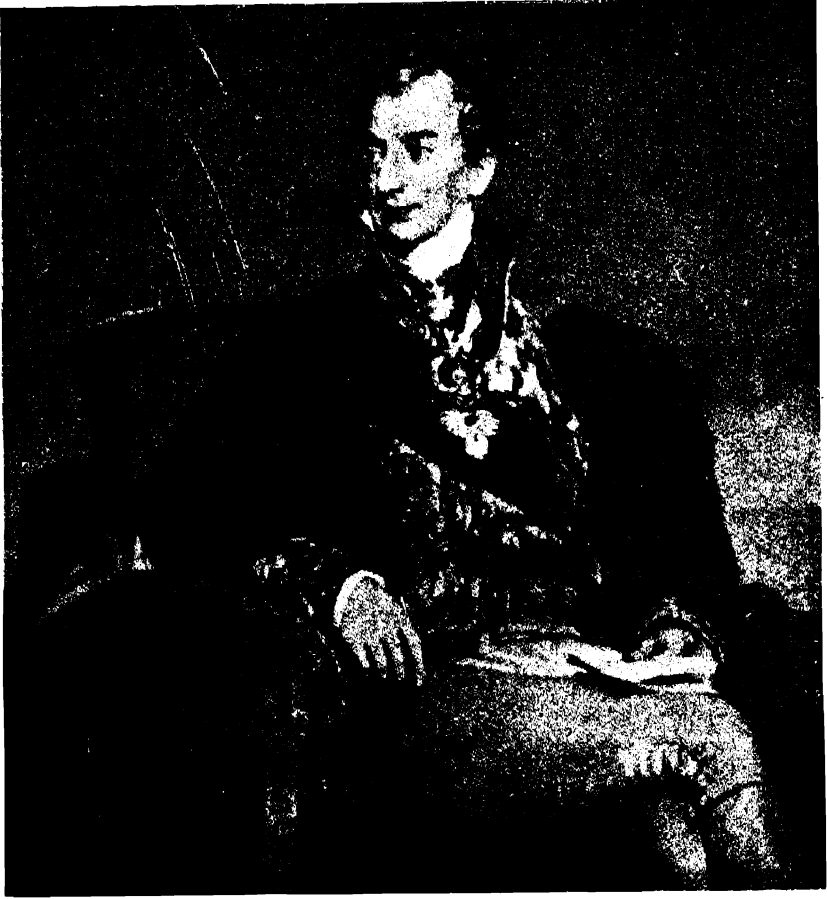
মেটারনিক

সংহতি বজায় রাখবার জন্য, দীর্ঘকাল ধরে, তিনি ইউরোপের যেখানে গণ-আন্দোলন হয়েছে, সেখানেই সেই সব দেশের রাজা-মহারাজাদের সাহায্যে, কঠোর হাতে ঐ সব **আন্দোলন দমন** করেছেন। এই যুগে মেটারনিক হলেন ইউরোপে গণ-আন্দোলনের বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপন্থার প্রতীক।

প্রথম ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **প্রথম ফার্দ্দিনান্দ** সম্রাট হলেন। এঁর রাজত্বকালে মেটারনিকের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল; কিন্তু মেটারনিক এত চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মনে স্বাধীনতার ভাব বিনষ্ট করতে পারলেন না। ফরাসী বিপ্লবীদের স্বাধীনতার মন্ত্র প্রত্যেক দেশের লোকের মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। উগ্র শাসনের দ্বারা তার নাশ করা যায় না। পর পর ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে **ফ্রান্সে আবার বিপ্লব** হলো। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রতিধ্বনি সারা ইউরোপকে প্রকম্পিত করলো। এই সময়ে অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও এক বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান হলো। এই বিপ্লবের ঝড়ে সম্রাট ও মেটারনিক প্রত্যেককেই রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যেতে হলো। তবে বিপ্লব অবশেষে **ব্যর্থ** হয়ে গেল। এই সময় অষ্ট্রিয়ার ছাত্রসমাজে বিশেষ জাগরণ দেখা দিয়েছিল।

বিপ্লব ভেঙ্গে দেবার পর আবার অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁর কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। সম্রাট ফার্দ্দিনান্দের পর **ফ্রান্সিস জোসেফ** অল্প বয়সে সিংহাসনে বসলেন। ফ্রান্সিস জোসেফ আইনানুগভাবে রাজ্য চালনা করবেন বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু কার্য্যকালে তার বিশেষ কিছু হলো না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার জবরদস্ত রাজনীতিজ্ঞ **শবারজেনবার্গ** দেশের রাষ্ট্রবিধি রহিত করলেন। অষ্ট্রিয়ায় আবার নিরঙ্কুশ **স্বৈরাচারী শাসনের প্রবর্ত্তন** হলো। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত হলো। সমস্ত জাতির মধ্যে একমাত্র জার্ম্মাণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হলো এবং ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপিত হলো। কিন্তু ইউরোপে এই সময় এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটলো যার ফলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভালরূপেই ভাঙ্গন ধরলো।

ইতালিতে বহুদিন থেকেই **ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের** নেতৃত্বে, সাম্রাজ্যবাদী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। পূর্ব্বে অনেকবার বিফল-মনোরথ হয়ে এইবার কাভুরের পররাষ্ট্রনীতির বিচক্ষণতায়, ইতালি তার স্বাধীনতা-আন্দোলনে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থন পেল। **ইতালি শীঘ্রই স্বাধীন** হয়ে গেল।

জার্ম্মেণীর অন্তর্গত প্রাশিয়ায় এই সময় একজন অভূতপূর্ব্ব শক্তিমান রাজনীতিবিদের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম **বিসমার্ক।** তিনি প্রথম

থেকে অষ্ট্রিয়ার সমস্ত প্রভুত্ব অপসারিত করে, জার্ম্মেনীতে প্রাশিয়াকে প্রধান রাষ্ট্ররূপে স্থাপিত করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রথমে **শ্লেজ্-উইগ্-হল্‌ষ্টিন্** সমস্যার সৃষ্টি করে, বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে অসুবিধার জালে জড়িত করলেন, পরে সরাসরি অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যেই **যুদ্ধ** বেধে গেল।

ফ্রান্সিস জোসেফ

এই যুদ্ধে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে অষ্ট্রিয়া সর্ব্বত্র হেরে গেল। এই সময় **সাডওয়ার যুদ্ধ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১৮৬৬ খৃঃ)। জার্ম্মেনীর উপর অষ্ট্রিয়ার আর কোনরূপ আধিপত্য থাকলো না।

পর পর এই পরাজয়ের ফলে, অষ্ট্রিয়া তার সাম্রাজ্যনীতিতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করলো। রাজনীতিজ্ঞ ব্যারণ বিউষ্টের পরামর্শ অনুসারে ১৮৬৭

খৃষ্টাব্দে একটা চুক্তি হলো। এর ফলে সাম্রাজ্যে দ্বৈত-রাজতন্ত্রের প্রচলন হলো। হাঙ্গেরীকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো। সাম্রাজ্যের নতুন নাম হলো **"অষ্ট্রীয়-হাঙ্গেরী"** সাম্রাজ্য।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ জার্ম্মেণীকে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করবার পর, বিসমার্ক তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরম্ভ করলেন। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ক্রমে দুইটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হলো। এক-দিকে জার্ম্মেণী, অষ্ট্রিয়া ও ইতালি এবং আর একদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ড। পশ্চিম দিকের সাম্রাজ্যগুলি হাতছাড়া হয়ে যাবার পর অষ্ট্রিয়া পূর্ব্ব-দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বাধীনতাকামী জাতিগুলিকেও জোরহস্তে দমন করতে সুরু করলো।

অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ছিল; তাদের মধ্যে শ্লাভ, চেক, রুথেন, ক্রোশিয়ান, শ্লোভেন ও সার্ব্ব প্রধান। এদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল। সেই অনুপাতে, এদের উপর অষ্ট্রিয়ার দমননীতিও ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। শ্লাভ জাতিদের বিদ্রোহী আন্দোলনে বরাবরই সার্ব্বিয়া নেতৃত্ব করছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন, অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ **ফ্রান্সিস ফার্দ্দিনান্দ**, বোসনিয়ার রাজধানী সারাজিভোতে তাঁদের ভ্রমণকালে **সস্ত্রীক নিহত** হন। এই থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের উৎপত্তি হয়। শীঘ্রই এই যুদ্ধে জার্ম্মেণী অষ্ট্রিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো এবং অপর পক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। এই যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য বহুধাবিভক্ত হলো। অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি নতুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলো। অষ্ট্রিয়া একেবারে একটি ছোট শক্তিতে পরিণত হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়ার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো। তার অর্থনীতিক ব্যবস্থায় নানারূপ বিপর্য্যয় দেখা দিল। জার্ম্মেণীর রাষ্ট্র-গগনে হিটলারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, অষ্ট্রিয়া একরূপ জার্ম্মেণীর অঙ্গী-ভূত হয়ে যায়। অর্থনীতিক ব্যাপারে জার্ম্মেণী অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি ঐক্য-সংযোগ করলো, যার নাম **"আনসলুস"** বা অর্থনীতিক ঐক্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে, জার্ম্মেণী অষ্ট্রিয়াকে তার দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কাজে কাজেই অষ্ট্রিয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, জার্ম্মেণীর পক্ষে

আগাগোড়া যুদ্ধে তাকে যোগ দিতে হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য কোনদিকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নাই। বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়া তার আগেকার গরিমাময় ইতিহাসের তুলনায় একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্ম্মেণীর মত, অষ্ট্রিয়াও প্রধান মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। মিত্রশক্তিগণের নিজেদের মধ্যে বিভেদের জন্য, 'অষ্ট্রিয়া-শান্তি-চুক্তি' এখন পর্য্যন্তও সম্পাদিত হতে পারে নাই। বর্ত্তমানে অষ্ট্রিয়ার লোকেরা নিজেদের দেশশাসন নিজেরাই করছে বটে, কিন্তু মিত্র-শক্তিদের কর্ত্তৃত্ব এখনও সেখানে পূরোমাত্রায়ই রয়েছে।

ইউরোপীয় ইতিহাসের ঝটিকা-কেন্দ্র বলকান দেশসমূহ যেমন পাহাড়-উপত্যকায় ঘেরা তেমনি এদের কাহিনী নানা বৈচিত্র্য ও বিপর্য্যয়ে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম প্রান্তে বলকান পর্ব্বতমালার নাম হতেই এ-অঞ্চলের নামের উৎপত্তি হয়েছে। দক্ষিণ-ইউরোপের তিনটি উপদ্বীপের মধ্যে সকলের পূর্ব্বে হয়েছে বলকান উপদ্বীপ। এক রুমানিয়া বাদে অপরাপর বলকান দেশগুলি দানিয়ুব নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। বলকান অঞ্চলের পূর্ব্বদিকে দার্দ্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালী এশিয়ার এত সন্নিকট যে এদেশকে এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশের সেতুস্বরূপ বলা চলে। বলকান উপদ্বীপে এত বিভিন্ন জাতি, ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম ও বিভিন্নমুখী জাতীয় আদর্শের সমাবেশ হয়েছে যে পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন অংশে এরূপ দেখা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভের সময় বলকান অঞ্চল আটটি দেশে বিভক্ত ছিল, যথা,—সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, আলবেনিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ এবং অষ্ট্রিয়া। বলকান অঞ্চলের অন্তর্গত বোস্‌নিয়া, হার্জিগোভিনা ও ডালমেসিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বলকান অঞ্চলে অনেক ভাঙ্গা-গড়া হয় এবং ওখানকার দেশগুলির নাম হয়—যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস এবং আলবেনিয়া। মণ্টেনিগ্রো ও সার্ব্বিয়া নতুন দেশ

যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়; অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ বলকান অংশগুলি তার হাতছাড়া হয়।

বহু শতাব্দী ধরে বলকান অঞ্চলের সমস্যা যে এত জটিল তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে, বলকান জাতিনিচয় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, বিভিন্ন দেশগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে কখনো কখনো বলকান অঞ্চল এক শাসনের অধীনে এসেছে বটে কিন্তু সাধারণতঃ এ-অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলতাই বেশী দৃষ্ট হয়। এ বিশৃঙ্খলতার ফলে নানাযুগে পার্শ্ববর্ত্তী শক্তিশালী জাতিসমূহ, এ দেশগুলির অভ্যন্তরে জোর করে হস্তক্ষেপ করেছে। কত জাতির অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণের কাহিনী যে এ দেশগুলির সঙ্গে জড়িত, তার ইয়ত্তা নাই।

পুরাতন ইতিহাস

প্রাচীনকালে বলকান অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একশাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, পশ্চিম-রোমক সাম্রাজ্যের উপর বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বলকান দেশগুলিই প্রথম আক্রান্ত হয়। পর পর ভিসিগথ, অষ্ট্রোগথ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিগুলি এ দেশের উপর হানা দিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, কিন্তু শীঘ্রই উত্তর-ইউরোপ হতে শ্লাভজাতীয় অভিযাত্রীর দল এসে পূর্ব্ব-বর্ব্বর জাতিদের উপর আপতিত হয় ও তাদের পশ্চিমদিকে বিতাড়িত করে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্লাভজাতীয় আক্রমণকারিগণ বলকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ-যুগের প্রথমদিকে, বাইজান্টিয়ামের পূর্ব্ব-রোমক সাম্রাজ্যের প্রভাব দানিয়ুবের দক্ষিণে বলকান দেশে বিস্তৃত ছিল। রোমক ও ল্যাটিন সভ্যতা বলকান ভূভাগের নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিল। শ্লাভ-জাতিরা ক্রমে ইলীরিয় প্রভৃতি পূর্ব্বেকার জাতিদের কোণঠাসা করে চারদিকে বিস্তারলাভ করলো। এখনও বলকান উপদ্বীপের নানাস্থানে শ্লাভ নামগুলির পরিচয় পাওয়া যায়, এতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে শ্লাভ-প্রভাব কত দৃঢ়ভাবে বলকান উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটি শ্লাভ ভাষা দক্ষিণ-গ্রীসে প্রচলিত ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে সার্ব্ব-ক্রোট জাতির লোকেরা উত্তর-পশ্চিম বলকান বিভাগ আক্রমণ করে। তারা ডালমেসিয়া ও আদ্রিয়াতিক উপকূলভাগে, ইলীরিয় ও

অন্যান্য জাতিদের জয় করে সেখানে বসবাস করে। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে, তুরাণ গোষ্ঠীভুক্ত বুলগার জাতির লোকেরা দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে, থ্রেস প্রভৃতি স্থানের শ্লাভ জাতিদের পরাভূত করে। কিন্তু শীঘ্রই বুলগারগণ পরাজিত জাতিদের নবলব্ধ সভ্যতা গ্রহণ করে।

বুলগার রাজগণ সমস্ত বলকান অঞ্চলে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। নবম-দশম শতাব্দীতে, বুলগার অধিপতি সিমিওনের সময়ে তাঁদের সাম্রাজ্য আদ্রিয়াতিক সাগর হতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের পূর্ব্ব-রোমক বা গ্রীক সম্রাটদের সঙ্গে বুলগার সাম্রাজ্যের প্রায়ই সংঘর্ষ চলেছিল। বুলগার রাজগণ বলকানের নানা অঞ্চলে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত তাঁদের শাসন চালিয়েছিলেন। সার্বগণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, **স্টিফেন দুশানের** শাসনকালে তাদের প্রভাব আলবেনিয়া, মাসিডোনিয়া, এপিরাস, থেসালী এবং উত্তর-গ্রীসের উপর বিস্তার করে। আলবেনীয়গণ ও বোসনীয়গণ কিছুকালের জন্য, বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চতুর্থ ক্রুসেডের ল্যাটিনগণ কনষ্টান্টিনোপলে কিছুদিনের জন্য তাদের রাজত্ব স্থাপন করেছিল। ভেনিশীয়রা অনেকগুলি সমুদ্রকূলস্থিত নগর ও দ্বীপে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফ্রাঙ্ক-জাতীয় সামন্ত রাজাদের শাসন কিছুকালের জন্য সালোনিকা, এথেন্স, একিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানে স্থানে গ্রীক সম্রাটদের প্রভাবও বিস্তার করতো। ভেনিশীয়গণ অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত তাদের প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিল ও তারা তুর্কীদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকতো।

তুর্কীশক্তির অধীনে বলকান দেশ

বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে, এশিয়া-মাইনরের প্রবল অটোমান তুর্কীজাতির আক্রমণকারীরা চতুর্দ্দশ শতাব্দী হতে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত বলকান দেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা গ্যালিপোলি অধিকার করলো। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে সুলতান প্রথম মুরাদ আদ্রিয়ানোপলে তাঁর রাজধানী স্থাপিত করেন। দেখতে দেখতে শ্লাভ ও সার্বজাতির লোকেরা মুসলমান-শক্তির দ্বারা বিজিত হলো। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বকালে, প্রায়

সমগ্র বলকান অঞ্চল তুর্কী অধীনে চলে যায়। তুর্কীরা **১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে** কনষ্টান্টিনোপল জয় করে। এতদিন পরে ঘুণে-ধরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। এ যুগে নানা বলকান জাতি তুর্কী-অভিযান প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছিল। আলবেনীয়গণ তাদের দেশপ্রেমিক নেতা **স্কাণ্ডারবেগের** অধীনে, বীরত্বের সঙ্গে তুর্কীদের বাধা দিয়েছিল কিন্তু কোন কিছুই ইসলামের দুর্জ্জয় অভিজানকে ঠেকাতে পারলো না। তুর্কীদের বিপক্ষে ভেনিশীয়দের বাধাপ্রদানও বিফল হলো। দীর্ঘকালের জন্য বলকান দেশসকল তুর্কী-ক্ষমতার অধীনে চলে গেল।

জর্জ্জ কাষ্ট্রিয়োটা (স্কাণ্ডারবেগ)

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপান্বিত সুলতান **সোলেমানের** রাজত্বকালে তুরস্ক শক্তিমত্তার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে। সোলেমান মোহাক্সের যুদ্ধে (১৫২৬ খৃষ্টাব্দে) হাঙ্গারীর ক্ষমতা বিনষ্ট করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। যদিও ভিয়েনা কোনরূপে তুর্কী-গ্রাস হতে রক্ষা পেল, কিন্তু বলকান দেশগুলির উপর তখন তুর্কী-অভিযান অবারিত গতিতে প্রসার লাভ করতে লাগলো। তুর্কীদের প্রভাব কার্পেথিয় পর্ব্বতমালা হতে পারস্যের প্রান্তদেশ এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মরোক্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত হলো। কৃষ্ণসাগর বস্তুতঃ তুরস্কের হ্রদে পরিণত হলো, ভূমধ্যসাগরেও তুরস্কের আধিপত্য স্থাপিত হলো। সোলেমানের প্রবল প্রতাপের সম্মুখে বলকানবাসীদের আর কোন স্বাধীনতাই অবশিষ্ট রইলো না।

সোলেমানের মৃত্যুর পর তুর্কী সুলতানগণ আর সেরূপ সুদক্ষ ও বিজয়ী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে নানারূপ গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সুযোগে খৃষ্টান শক্তিগণও নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে সচেষ্ট হলো। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধে স্পেন, ভেনিশ ও পোপের শক্তি একত্র হয়ে তুরস্ককে হারিয়ে দেয়। তবে তুর্কী-রাজপরিবারে নিজেদের মধ্যে কলহ-বিরোধ সুরু হলেও বলকান দেশগুলির উপর তাদের প্রতিপত্তি সমভাবেই বজায় রইলো। কেবল তাদের প্রসারের প্রয়াস কিছুকালের জন্য বন্ধ ছিল।

আবার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, তুর্কী সেনাপতি কিউপ্রিলিদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীদের বিজয়লিপ্সা সতেজ হয়ে উঠলো। মহম্মদ ও

আমেদ কিউপ্রিলির বিজয়-পতাকা হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ডের কতকাংশ এবং আরও কয়েকটি স্থানে উড্ডীন হলো। কারা মুস্তাফা নামে তুর্কী সেনাপতি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা নগরী আক্রমণ করলেন। অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল, ভিয়েনার পতন হলে ইসলাম-শক্তি এবার বুঝি পশ্চিম-ইউরোপকেও আচ্ছন্ন করবে। বিদেশী শত্রুকে ভিয়েনার দ্বারপ্রান্ত হতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খৃষ্টান শক্তি অষ্ট্রিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো। পোল্যাণ্ডের বীর নায়ক **জন সোবিয়েস্কি** যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তুর্কীদের পরাভূত করলেন। তুর্কীশক্তি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এসময় থেকে তুর্কী-অভিযানের প্রবাহ মন্দীভূত হলো, তাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা দেখা দিল।

আমেদ কিউপ্রিলি

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তুর্কী ক্ষমতা ক্রমেই পতনের দিকে ধাবিত হলো। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ শক্তি ও ভেনিশীয়রা দক্ষিণ-গ্রীস, হাঙ্গারী ও ট্রানসিলভানিয়া অধিকার করলো। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত সেনাপতি **প্রিন্স ইউগেন** জেণ্টার যুদ্ধে তুর্কীদের পরাজিত করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে কার্লোউইজের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলে, ইউরোপীয় শক্তিরা বলকান অঞ্চলের কতক স্থান পুনরুদ্ধার করে। কার্লোউইজের সন্ধির পর থেকেই অটোমান শক্তি খর্ব্ব হতে থাকে। এরপর তুর্কীরা পূর্ব্ব-ইউরোপে দু'একবার
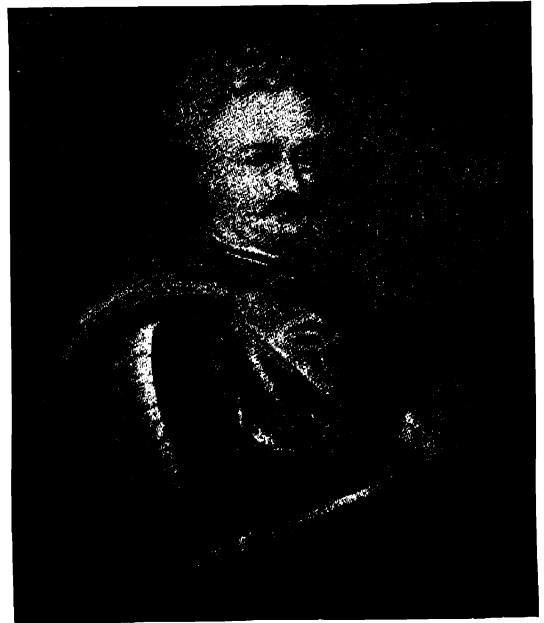
জন সোবিয়েস্কি

যুদ্ধে জয়লাভ করলেও, উদীয়মান শক্তি রাশিয়ার অগ্রসর-নীতির ফলে ক্রমেই তারা কৃষ্ণসাগরের অভিমুখে হটে যেতে লাগলো। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের আমলে তুরস্কের রাশিয়ার সঙ্গে কতকগুলি যুদ্ধ হয়। এই

প্রিন্স ইউগেন

যুদ্ধগুলিতে ক্রমান্বয়ে হেরে গিয়ে, তুরস্ক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে **কাচুক কাইনাজি** সন্ধিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি তুরস্কের পক্ষে একটা বড় বিপর্যয়। দক্ষিণদিকে রাশিয়ার প্রতিপত্তি এখন কৃষ্ণসাগরের

উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল। পতনশীল তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই অগ্রাভিযান-নীতি থেকেই ঐতিহাসিক **প্রাচ্য-সমস্যার** উদ্ভব হয়। এই নিকট-প্রাচ্য-সমস্যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমেই জটিল ও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা-আন্দোলন

তুরস্কের দুর্বলতা দেখে রাশিয়া ক্রমাগত বলকান অঞ্চলে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। বলকান দেশের শ্লাভ, সার্ব, গ্রীক প্রভৃতি জাতিরাও ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায়, স্বাধীনতা ও জাতীয়তার আদর্শে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা তুর্কী-অধীনতাপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সার্বিয়া, কারা জর্জ্জ নামক এক নেতার অধীনে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সার্বিয়া শীঘ্রই খানিকটা স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। এ সময়ে গ্রীকদের স্বাধীনতা-যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতেই গ্রীকদের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনে রাশিয়ার খুব সহানুভূতি ছিল। প্রথম ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স হীপসিলান্টির স্বাধীনতার প্রয়াস ব্যর্থ হলো। প্রধানতঃ গ্রীকদের স্বাধীনতার আন্দোলন হলো দক্ষিণ-গ্রীসে এবং ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে গ্রীক ও তুর্কী উভয় জাতি পরস্পরের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে। তুরস্কের সামন্ত-রাষ্ট্র মিশরের অধিপতি মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে, তুর্কীরা পর পর যুদ্ধে গ্রীকদের হারিয়ে দিতে লাগলো। গ্রীকেরা সহায়শূন্য হয়ে তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়লাভে নিরাশ হতে লাগলো।

শীঘ্রই আন্তর্জাতিক নীতির জটিলতা গ্রীক যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। রাশিয়া নিজের সুবিধা সাধনের অভিপ্রায়ে গ্রীসের পক্ষে যোগদানের জন্য উদ্‌গ্রীব হলো, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার অগ্রসর-নীতিতে চিন্তাব্যাকুল হলো। অথচ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় দেশেই নাগরিকদের মধ্যে গ্রীসের প্রতি একটা ব্যাপক সহানুভূতি দেখা দিল। প্রত্যক্ষভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান না করলেও, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চাইলো যে ইউরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীস পুনরায় স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের অন্তঃপাতী **নাভারিনো উপসাগরে,** ইংলণ্ড

ও ফ্রান্সের নৌবহরের সঙ্গে ইব্রাহিম পাশার তুর্কী-মিশরীয় নৌবহরের সঙ্ঘর্ষ হলো। তুর্কী জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না, তাই এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর তুরস্কের জোর প্রতিবাদে তারা দুঃখপ্রকাশ করলো ও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেল। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব এখন অব্যাহত হলো। রাশিয়ার সাহায্যে গ্রীকরা অনতিবিলম্বে যুদ্ধে জয়লাভ করলো এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, আদ্রিয়ানোপল সন্ধির দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করলো। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার **প্রিন্স অটো** গ্রীসের রাজা নির্ব্বাচিত হলেন। রাশিয়া বলকানে কতকগুলি সুবিধা আদায় করলো।

সার্বিয়া ও গ্রীসকে তুর্কীর অধীনতাপাশ থেকে মুক্তিলাভ করতে দেখে, বলকান অঞ্চলের অপরাপর খৃষ্টান দেশগুলির মধ্যেও মুক্তির আলোড়ন জেগে উঠলো। কিন্তু রাশিয়ার স্বার্থদুষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য প্রধান ইউরোপীয় শক্তির সাম্রাজ্যবাদ-নীতির ফলে, বলকান জাতিগুলি বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারলো না। রাশিয়া অনেকদিন থেকেই কৃষ্ণসাগর ও পূর্ব্ব-ইউরোপের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুর্কী-ক্ষমতায় ভাঙ্গন ধরে। তুর্কীরা শত শত বৎসর বলকান অঞ্চলে রাজত্ব করলেও, তাদের আইন-কানুন, রীতিনীতি ও ধর্ম্মের প্রতিকূলতার জন্য খৃষ্টান জাতিসমূহকে তারা আপন করে নিতে পারে নাই। তুর্কীদের অনাচার ও উৎপীড়নে বলকান জাতিদের মধ্যে বরং অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। বলকান খৃষ্টানদের অধিকাংশ ছিল গ্রীক চার্চ্চের অনুবর্ত্তী, রাশিয়া নিজে গ্রীক চার্চ্চের নেতা, তাই সে খৃষ্টানদের প্রতি দরদ দেখিয়ে ক্ষীয়মাণ তুর্কীশক্তির বিরুদ্ধে, বলকান অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে সুরু করলো। গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুরস্ককে তার অধীন মিশরের পাশা বা গভর্ণর মহম্মদ আলির সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, এতে তুরস্কের দুর্ব্বলতা ও মহম্মদ আলির বর্দ্ধমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর মহম্মদ আলির উচ্চাশা বেড়েই যায়। তিনি সিরিয়া জয় করতে মনস্থ করেন ও তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে প্যালেষ্টাইন আক্রমণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনী একর, দামাস্কাস প্রভৃতি অধিকার করে এশিয়া-মাইনরে উপস্থিত হয় এবং রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুরস্কের সুলতান প্রমাদ গণলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে অবিলম্বে সাহায্য
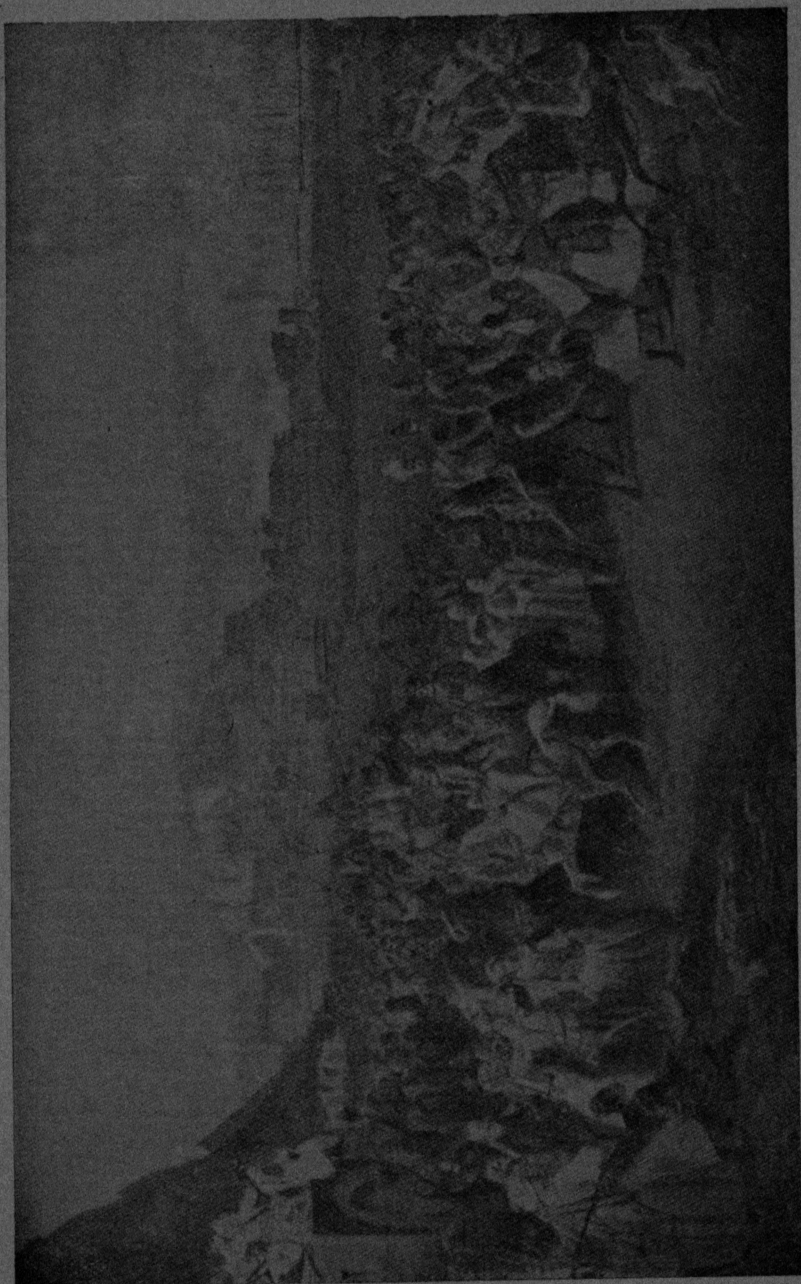
গ্রীসের শাসনকেন্দ্র নপ্লিয়া নগরে প্রিন্স অটোর সাড়ম্বরে প্রবেশ

না পাওয়ার দরুণ, তিনি বাধ্য হয়ে মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্য নিলেন। রাশিয়া এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সে অসংখ্য সৈন্যবাহিনী তুর্কী-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রেরণ করলো। অবশ্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেরও চৈতন্যোদয় হলো, তারা রাশিয়ার অগ্রাভিযানকে সুনজরে দেখলো না। তারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ থামিয়ে দিবার জন্য মহম্মদ আলিকে সিরিয়া ছেড়ে দিতে তুরস্কের উপর চাপ দিল। তুরস্কের তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

রাশিয়াও তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে **আঙ্কিয়ার স্কেলেসি চুক্তি** দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের উপর তার সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলো। এই সময়ে কনষ্টান্টিনোপলে রাশিয়ার জয়-জয়কার, দার্দানেলিজ প্রণালীতে তার যুদ্ধজাহাজের অবাধ গতি। কিন্তু ইংলণ্ডের জবরদস্ত বৈদেশিক সচিব পামারষ্টোন রাশিয়ার এরূপ প্রসার মোটেই বরদাস্ত করতে রাজি হলেন না। তিনি তাঁর নির্ভীক নীতি ও কূট-নৈতিক চালের জোরে, মহম্মদ আলি, রাশিয়া ও ফ্রান্স প্রত্যেকেরই সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা দমিত করলেন। তিনি ১৮৪০ সালে লণ্ডনে একটি সম্মিলন আহ্বান করলেন এবং সেখানে প্রাচ্য-সমস্যার মীমাংসায়, পামারষ্টোনের প্রাধান্যই স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

এরপর কিছুদিন বলকান অঞ্চলে আপাততঃ শান্তির ভাব বিরাজ করলো। কিন্তু এ শান্তি বেশীদিন টিকলো না। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাইরে বিরোধ সৃষ্টির অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ শীঘ্রই মিলে গেল। তিনি জেরুজালেমে ল্যাটিন সন্ন্যাসীদের হারানো অধিকারের পুনরুদ্ধারের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তুরস্কের রাজ্যপরিধির অন্তর্গত ছিল প্যালেস্টাইনের খৃষ্টান তীর্থস্থানগুলি। রোমক ও গ্রীক চার্চ্চ প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসিগণ এই স্থানসমূহের তত্ত্বাবধান করতেন। তুরস্কের সঙ্গে ১৭৪০ সালের সর্ত্তাবলী অনুসারে, তখন থেকে রোমক সন্ন্যাসীরা ফরাসী পরিচালনাধীনে প্যালেস্টাইনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ভাঙ্গাগড়ার সংঘাতে, ফরাসীদের প্যালেস্টাইনের মধ্যে রোমক ও গ্রীক সন্ন্যাসী পরস্পর বিরোধের প্রতি মনোযোগ শিথিল হয়ে গেল। এই অবসরে রাশিয়ার উৎসাহে, গ্রীক সন্ন্যাসিগণ রোমক সন্ন্যাসীদের সুবিধা-সুযোগ কেড়ে নিলেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন তুরস্কের সুলতানের কাছে দাবী করলেন যে, বেথলেহেম ধর্ম্মায়তনের প্রধান দরজার চাবি রাখার অধিকার প্রভৃতি পুনরায় রোমক সন্ন্যাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সুলতান উপায়ান্তর না দেখে এই দাবী মেনে নিলেন। অমনি রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস গ্রীক সন্ন্যাসীদের পক্ষে নজির টেনে, তুর্কী সুলতানের উপর পাল্টা চাপ দিলেন। নিরুপায় সুলতান উভয় পক্ষের বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু যেখানে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ বিবাদের জন্য উন্মুখ, সেখানে দুর্ব্বল সুলতান কি করতে পারেন ?

এরপরে ঘটনার গতি তীব্রবেগে ছুটলো। তুরস্কের উপর রাশিয়ার আবদার বেড়েই চললো। রাশিয়া দাবী করলো যে তুর্কী-সাম্রাজ্যের গ্রীকচার্চ্চপন্থী খৃষ্টান প্রজাদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার তার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তুর্কী-রাজ্য বিভাগ করে বলকান দেশে অগ্রসর হওয়াও রাশিয়ার মতলব ছিল। শীঘ্রই সে দানিয়ুব নদীর উত্তরাঞ্চলে ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া প্রদেশ অধিকার করলো। তখন ইংলণ্ডের উস্কানিতে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

কিন্তু রাশিয়ার কাছে তুরস্ক ক্রমাগত হেরে যেতে লাগলো। তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মাথার টনক নড়লো যে, রাশিয়া ত বলকান ভূভাগে কর্ত্তৃত্বে বসলো বলে। বলকানে রাশিয়ার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব্ব-ইউরোপে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর আধিপত্য বাড়াতে পারবেন না আর ইংলণ্ডের ভারত-সাম্রাজ্যের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। পামারষ্টোন তুরস্কের পক্ষ নিয়ে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সহযোগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তারপর যে ব্যাপক যুদ্ধ সুরু হলো তা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত।

মিত্রপক্ষ ক্রিমিয়া আক্রমণ করে দীর্ঘদিন তার উপর অবরোধ চালায়। ক্রিমিয়ার সংগ্রামে বালাক্লাভা ও ইংকারমানের যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রিমিয়াতে **ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের** আহত সৈন্যদের প্রতি সদাজাগ্রত, সেবাপরায়ণা মূর্ত্তি ইতিহাসে অমর কাহিনী হয়ে আছে। অবশেষে এ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে **প্যারিসের সন্ধিতে** যুদ্ধের অবসান হয়।

এই সন্ধির ফলে বলকান ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রাশিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তুরস্কের ক্ষমতা একরূপ অটুট রাখা হয়। প্রবল মিত্রশক্তিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, বলকান জাতিগুলি বিশেষ

কিছু সুবিধা লাভ করতে পারে নাই। সার্বিয়ার স্বাধীনতা অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া হলো। প্যারিস সন্ধির পর বলকান খৃষ্টান জাতিদের উপর তুর্কী অনাচার-অত্যাচার বেড়েই চললো। পূর্ব্ব-ইউরোপে বাধা পেয়ে রাশিয়ার সাম্রাজ্যলিপ্সা এসিয়ার দিকে প্রধাবিত হলো।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরেও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কী-সাম্রাজ্য দানিয়ুব নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কয়েকটি স্বাধীনতা পেয়েছিল

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

বটে, যেমন, মন্টিনিগ্রোর কৃষ্ণপর্ব্বতমালার আশ্রয়ে একদল লোক তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল, গ্রীস তার স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর সার্বিয়া যদিও নামে তখনও তুরস্কের অধীন কিন্তু কার্য্যত সে স্বাধীনভাবেই চলছিল। এই ক'টি বাদ দিয়ে বলকানের অবশিষ্ট বিস্তীর্ণ অংশে তখনও ইসলাম পতাকা প্রবহমান। ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া প্রদেশ থেকে

রাশিয়ার প্রভুত্ব সরিয়ে তখন কেবলমাত্র তুরস্কের রাজত্ব সেখানে আবার স্থাপিত হয়েছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের কর্ত্তৃত্ব সঙ্কীর্ণ হয়ে মাত্র কনষ্টান্টিনোপল ও তার আশেপাশে থ্রেসের ক্ষুদ্র অংশের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মাঝখানের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে চারটি প্রধান সমস্যার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম, বলকান জনসমূহের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য নানা উপায়ে কঠোর সংগ্রাম, দ্বিতীয়, নতুন বলকান রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্য বিবিধ প্রচেষ্টা, তৃতীয়, নতুন খৃষ্টান শক্তিনিচয়ের তুরস্ক ও অন্যান্য বলকান রাজ্যের বিপক্ষে অভিযান করে' নিজেদের রাজ্যবৃদ্ধির প্রয়াস, এবং চতুর্থ, ইউরোপের প্রবল শক্তিগুলির বিভিন্নমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তারা তুর্কীশক্তির জীর্ণতা ও নবউদ্ভূত বলকান রাজ্যগুলির অর্ব্বাচীনতা দেখে, এই সুযোগে নিজেদের সাম্রাজ্যস্ফীতির অভিপ্রায়ে, নানা কূটনৈতিক চালের আবর্ত্তে জড়িয়ে পড়লো।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্রাচ্য-সমস্যায় প্রথম আলোড়ন এল ওয়ালেচিয়া, মোল্ডাভিয়া প্রদেশ দুটি থেকে। এরা চাইলো পূর্ণ স্বাধীনতা ও দুই প্রদেশের মিলন। এই দুই দেশের লোকেরা হলো রুমানিয়। ইংলণ্ড চেয়েছিল তুরস্কের রাজ্য অব্যাহত রাখতে তাই সে এদের স্বাধীনতায় বাধা দিল। তুরস্ক ত এদের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হবেই। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ, রুমানিয়, সার্ব, শ্লাভ, রুথেন, ক্রোট, চেক, শ্লোভেন, ম্যাগেয়ার প্রভৃতি। রুমানিয়রা স্বাধীনতা পেলে তার সাম্রাজ্যভুক্ত রুমানিয় ও অপরাপর জাতিরা স্বাধীনতার আন্দোলন করবে ও তা'তে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরবে, তাই অষ্ট্রিয়াও রুমানিয়দের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা ও মিলনচেষ্টা মোটেই পছন্দ করলো না। এক ফ্রান্স রুমানিয়দের জাগরণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল কারণ ফ্রান্স ছিল পশ্চিম-ইউরোপে ল্যাটিন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, আর রুমানিয়রা পূর্ব্ব-ইউরোপে ল্যাটিন জাতি ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকেও নিজের মতানুবর্ত্তী করলেন।

নানা জটিলতার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া দুটি প্রদেশ সাধারণ গণভোটের জোরে এক রাজ্যে সংযুক্ত হলো ও মিলিত রাজ্যের নাম হলো রুমানিয়া। বুখারেস্ট নগরী হলো এর রাজধানী। আলেকজাণ্ডার কূজা হলেন রুমানিয়ার প্রথম প্রিন্স বা অধিপতি। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক বিপ্লবে প্রিন্স

কুজা সিংহাসনচ্যুত হন। তখন **প্রিন্স ক্যারোল,** পরবর্ত্তী রাজা চার্লস রুমানিয়ার অধীশ্বর হন। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি দেশের নানা উন্নতি বিধান করে' রুমানিয়াকে মধ্যযুগীয় অনগ্রসর অবস্থা থেকে আধুনিক উন্নত রাজ্যে পরিণত করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি রুমানিয়াকে একটি স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে রুমানিয়া জার্ম্মেণীর বিপক্ষে মিত্রশক্তি-পক্ষভুক্ত হয়ে যুদ্ধে যোগদান করে।

প্রিন্স ক্যারোল

যদিও তুরস্ক বলকান জাতিগুলির সঙ্গে সদয় ব্যবহারের শপথ করেছিল কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে খৃষ্টান প্রজাদের উপর তার অত্যাচার-উৎপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে লাগলো। কিন্তু অবহেলিত বলকান খৃষ্টানেরা আর এই অনাচার সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ক্রমে তাদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ স্থরু হয়। এ সময়ে রাশিয়ার উৎসাহে শ্লাভজাতির লোকেদের মধ্যে এক সর্ব-শ্লাভ আন্দোলন আরম্ভ হলো। রুমানিয়ার যুবকেরা যেমন শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শের জন্য প্যারিসে যেত, শ্লাভ যুবকগণ সেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা ও বিদ্রোহের প্রেরণা লাভের জন্য রাশিয়ায় দল বেঁধে যেতে আরম্ভ করলো। সার্বিয়া, বোসনিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া গুপ্ত-সমিতিতে ছেয়ে গেল।

দক্ষিণ-শ্লাভ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল সার্বিয়া। সার্বিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক যুক্তরাজ্য গঠন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তখন সে আয়োজন ব্যর্থ হয়। বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনাতে প্রথম ১৮৭৫-৭৬ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্থরু হয়। হার্জিগোভিনার কৃষকেরা তুরস্ককে ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃত হয়। এই বিদ্রোহ ক্রমে বলকান অঞ্চলে ছড়াতে থাকে। বোসনিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং অবশেষে বুলগেরিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে। বুলগারদের বিদ্রোহ খুব তীব্র আকার ধারণ করে, তারা অনেক তুর্কী কর্ম্মচারীকে হত্যা করে।

তখন স্থরু হলো ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের তুর্কীদের কুখ্যাত **বুলগেরিয়-অত্যাচার।** তুর্কী অনাচারের মুখে হাজার হাজার বুলগারের জীবন নিঃশেষিত হলো। এই ভীষণ সংবাদে সারা খৃষ্টান জগৎ ক্রোধানলে জ্বলে উঠলো। ইংলণ্ডের নেতা গ্লাডষ্টোন এ সময়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু ডিস্‌রেলি ছিলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রধান নীতি ছিল ইংলণ্ডের

প্রাচ্য-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা ও ভারত-সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করা। ডিসরেলি রাশিয়াকে আসল শত্রু মনে করতেন, তুরস্ককে নয়।

এদিকে রাশিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্লাভজাতিদের পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে এক নিরপেক্ষতার সন্ধি করে রাশিয়া এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। রাশিয়া রুমানিয়ার সহযোগিতা লাভ করলো। মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া সবাই রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধ করলো। চারদিক থেকে আক্রমণ করে রাশিয়া তুরস্কের রাজধানীকে বিপন্ন করলো। ককেসাস অঞ্চলেও তুরস্ক রাশিয়ার অপ্রতিহত গতি ঠেকাতে পারলো না। অবশেষে তুরস্ক বাধ্য হয়ে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে **সান স্টিফানো সন্ধিতে** আবদ্ধ হলো। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে কয়েকটি বলকান রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো এবং রাশিয়া, এসিয়া ও ইউরোপে অনেক স্থান লাভ করলো। এই ব্যবস্থার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, রাশিয়ার তাঁবেদারে নতুন প্রসারিত বুলগেরিয়া রাজ্যের সৃষ্টি। বুলগেরিয়া এখন বলকানের এক বিরাট অংশে বিস্তৃত হলো, নামে তুরস্কের অধীন হলেও আসলে রাশিয়ার কর্ত্তৃত্ব বুলগেরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হলো। তুরস্কের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকলো না।

বার্লিন-কংগ্রেস

সান স্টিফানো চুক্তির ফলে প্যারিসের সন্ধি বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল, রাশিয়ার শক্তিমত্তা আবার বলকানে প্রধান হয়ে উঠলো। সান স্টিফানো সন্ধিতে বুলগেরিয়া ও রাশিয়া বাদে আর কেহই সন্তুষ্ট হলো না। রুমানিয়া বিরক্ত হলো; সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং গ্রীস বুলগেরিয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে চটে গেল। অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলো, কিন্তু সব চেয়ে বেশী উত্তেজিত হলো ইংলণ্ড। রাশিয়া, বলকানে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারলে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে তার প্রাধান্য স্থাপিত করবে ও ক্রমে ইউরোপ ও এসিয়া উভয়পথে হীনবল তুর্কী-সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে, ভারত-সাম্রাজ্যের দিকে ধাওয়া করবে। তাই ইংলণ্ড বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার অগ্রসরে এবারও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

ডিসরেলি দাবী করলেন যে, নিকট-প্রাচ্য-সমস্যা শুধু রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে নিষ্পত্তি হতে পারে না, এটা সমগ্র ইউরোপীয় সমস্যা। অষ্ট্রিয়াও

এই মত দিল, জার্ম্মেণীর নেতা বিসমার্কও রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে অষ্ট্রিয়ার মতানুগামী হলেন। রাশিয়া অবস্থার বিপাকে পড়ে' সান স্টিফানো সন্ধি-সর্ত্তাবলীর পরিবর্ত্তনকল্পে, একটি ইউরোপীয় সম্মিলনীতে যোগ-দানে রাজি হলো। ব্যবস্থামত বার্লিণে এক কংগ্রেস বা সম্মিলন আহ্বান করা হলো। ইহাই হলো ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ **বার্লিণের কংগ্রেস**। বিসমার্ক এই কংগ্রেসের সভাপতি হলেন কিন্তু ডিসরেলি ছিলেন এর প্রকৃত নায়ক।

বার্লিণ-কংগ্রেসের বিধান অনুসারে রাশিয়ার হাতে থাকলো মাত্র বেসারেবিয়া, ককেসাস অঞ্চলে বাটুম ও কার্স এবং আর্মেনিয়ার কতক অংশ। রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো। বোসনিয়া ও হার্জ্জিগোভিনা অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হলো। ইংলণ্ড সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে শাসন করবার কর্ত্তৃত্ব পেল। ফ্রান্স উত্তর-আফ্রিকায় টিউনিসের উপর ভবিষ্যৎ দাবী জানালো, নবজাগ্রত ইতালি আলবেনিয়া ও ত্রিপোলির উপর তার দাবী পেশ করলো। এক নতুন জার্ম্মেণী কিছু না চেয়ে তুরস্কের সুলতানের কৃতজ্ঞতাভাজন হলো। বলকান রাষ্ট্রগুলি কিছু সুবিধা আদায় করলো বটে তবে তারা আশানুরূপ কিছু পেল না। সার্বিয়া ও মণ্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হলো। বুলগেরিয়া রাজ্যের মধ্যেই পরিবর্ত্তন আনা হলো বেশী। সান স্টিফানোর সর্ত্তানুযায়ী বুলগেরিয়ার যে আয়তন বৃদ্ধি হয়েছিল এখন তা বিশেষভাবে ছাঁটাই করে' পূর্ব্বেকার প্রায় এক-তৃতীয় অংশে পরিণত করা হলো। বুলগেরিয়ার দক্ষিণে পূর্ব্ব-রুমেলিয়া নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করা হলো, এর উপর তুরস্কের খানিকটা কর্ত্তৃত্ব থাকলো। মাসিডোনিয়া আবার তুরস্কের হাতে অর্পণ করা হলো।

বার্লিণ-কংগ্রেসে ডিসরেলির নীতিতে বলিষ্ঠতা ছিল, ইহা কতকটা কার্য্যকরীও হয়েছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কংগ্রেসের মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যতে ১৯১২-১৩ সালের বলকান যুদ্ধ ও ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অধিকাংশ কারণ। রাশিয়া সাময়িক বাধা পেল বটে কিন্তু তার স্থলে এখন বলকানে অগ্রসর হলো অষ্ট্রিয়া ও তার পশ্চাতে নব শক্তিশালী জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য। অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনা অধিকার করাতে শ্লাভজাতি ও সার্বিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার তীব্র বিরোধের সূত্রপাত হলো। তুরস্কেরও তার তথাকথিত বন্ধুদের প্রতি অসন্তোষের নানা কারণ ছিল। বার্লিণ-কংগ্রেসের পর ইংলণ্ডে গিয়ে ডিসরেলি অহঙ্কার করে বলেছিলেন যে, তিনি শান্তি

ও সম্মান এনেছেন; শান্তি তিনি কিছুকালের জন্য ইউরোপে এনেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাসমূহ সম্মানের গৌরব অর্জ্জন করতে পারে নাই।

বার্লিণ-কংগ্রেসের পর বলকানের অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো: তুর্কী-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে এখন পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হলো—দানিয়ুবের উত্তরে রুমানিয়া, দক্ষিণে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া, পশ্চিমে পাহাড়মালার অভ্যন্তরে মন্টিনিগ্রো এবং কোরিন্থ উপসাগরের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত গ্রীস। পূর্ব্ব-রুমেলিয়ার অবস্থা ছিল অর্দ্ধ-স্বাধীন আর বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনা অষ্ট্রিয়ার শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত।

এর পরে কুড়ি বছর বুলগেরিয়াই একরূপ নিকট-প্রাচ্য-সমস্যাকে সজীব রাখে। **প্রিন্স আলেকজাণ্ডার** ১৮৭৯-৮৬ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়ার অধিপতি ছিলেন। তিনি সাহসী সৈনিক ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন, কিন্তু বুলগেরিয়ার পার্লামেন্ট বা সোব্রান্জি তাঁকে প্রতিপদে বাধা দেয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাধ্য হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। তারপর দেশের শাসক হলেন স্যাক্সকোবার্গ-গোথার **প্রিন্স ফার্দিনান্দ।** বুলগেরিয়া স্বাধীন রাজ্য নাম পাবার পরও ইনি অনেক বছর রাজত্ব করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইনি জার্ম্মেণীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

বুলগেরিয়ার পূর্ব্ব-রুমেলিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলন আন্দোলন বেশ কিছুদিন চলে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বুলগেরিয়ার বিখ্যাত জন-নায়ক **স্টিফান স্টামবোলোভ।** স্টামবোলোভ ১৮৮৬-৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বুলগেরিয়ার অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তিনি বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার প্রতিপত্তি পছন্দ করতেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন। রাজা ফার্দিনান্দের শাসনে বুলগেরিয়ার প্রভূত উন্নতি হয়।

তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বকালে, ১৮৯৪-৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অসহায় খৃষ্টান আর্মেনীয়দের উপর তুর্কীরা যে নির্ম্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালায়, ইতিহাসের পাতা তাতে মসীলিপ্ত হয়ে আছে। তুর্কীদের নৃশংস অত্যাচার ও ইউরোপীয় শক্তিদের ঔদাসীন্য ও পরস্পর স্বার্থসংঘাতের দরুণ আর্মেনিয়ার হাজার হাজার লোকের জীবন বিনাশ পায়। আর্মেনিয় সমস্যা দ্বারা কিছুদিন নিকট-প্রাচ্য-সমস্যা সমাকীর্ণ থাকে। এর পরে বলকান অঞ্চলে গ্রীস ও ক্রীটের সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে।

নতুন স্বাধীন গ্রীসের রাজা **অটো** ১৮৩৩-৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপরে রাজা হন ডেনমার্কের প্রিন্স জর্জ্জ। তিনি **প্রথম জর্জ্জ** নামে

১৮৬৩-১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীসে রাজত্ব করেন। এঁর পরবর্ত্তী রাজার নাম **কনষ্টানটাইন।** গ্রীস স্বাধীন হলেও কতকগুলি গ্রীক-প্রধান স্থান সে পায় নাই। গ্রীস থেসালী, এপিরাস, মাসিডন ও ক্রীট দ্বীপকে তার রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করবার জন্য বহুদিন থেকে জোর চেষ্টা করছিল। এই স্থানগুলি তুরস্কের

ক্রীটের জাতীয় নেতা ভেনিজিলস

অধীনে ছিল। ক্রীটের লোকেরা গ্রীক ছিল বলে তারা তুর্কীর অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হবার নিমিত্ত বারবার বিদ্রোহ করছিল। ক্রীটের তরুণ বিপ্লবী নেতা **ভেনিজিলস** ঘোষণা করলেন যে, ক্রীট ও

গ্রীস সংযুক্ত দেশ, গ্রীসও ক্রীটকে সৈন্যসাহায্য পাঠালো। ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। এ যুদ্ধে গ্রীস হেরে গেল।

জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পরিচালনাধীনে নতুন জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের বলিষ্ঠ উত্থান বলকান ও তুর্কী রাজনীতিতে এক স্পষ্ট পরিবর্ত্তন নিয়ে এল। প্রায় একশো বছর ধরে ইংলণ্ড রাশিয়ার বিপক্ষতা করেছে ও তুরস্কের প্রতি বন্ধুভাব দেখিয়েছে। কিন্তু বার্লিণ-কংগ্রেসের পর থেকে তুরস্কের সঙ্গে ইংলণ্ডের মনোবিবাদ সুরু হয়। এ সুযোগে বিশ্বগ্রাসী উচ্চাভিলাষী কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম, বলকানে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে, তুর্কী সুলতানের সঙ্গে খুব বেশী সম্প্রীতি ও বন্ধুভাব দেখাতে থাকেন। তুর্কী-সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক নানাভাবে জার্ম্মাণপ্রভাব এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিরা বিশেষ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার স্থলে জার্ম্মেণীই এখন অষ্ট্রিয়ার সহযোগে, প্রবল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জার্ম্মেণীর বিরাট বার্লিণ-বাগদাদ রেললাইন পরিকল্পনায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভীত হয়ে পড়ে, কারণ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে জার্ম্মেণীর প্রভাব পূর্ব্বদিকে এত বিস্তৃত হবে যে তাতে তাদের সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে। রাশিয়াও বলকানে জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়ার ক্রমান্বয় প্রসারতাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে, রুশ-জাপান যুদ্ধে হেরে যাবার পরে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্বের মিলনে আবদ্ধ হলো।

১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে, তুর্কী-সাম্রাজ্যে "তরুণ-তুর্কী বিপ্লব" সংঘটিত হয়। এতে করে নিকট-প্রাচ্যে যে সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে তার পরিণতি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তুরস্কের অগ্রসর যুবদল খানিকটা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও কতকটা জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে, সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তাঁর ভাই পঞ্চম মহম্মদকে তুরস্কের সুলতান বলে ঘোষিত করে। তুরস্কের নতুন বেশে উত্থান অনেকেরই মনঃপূত হলো না তাই বলকানে প্রত্যেকে, যার যার স্বার্থরক্ষার দিকে মন দিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স ফার্দিনান্দ বুলগেরিয়াকে একটি স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনাকে সরাসরি তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল এবং এর থেকেই অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিরোধ উৎকট আকার ধারণ করলো।

আদ্রিয়াতিক সাগরের দিকে পথের স্বাধীনতালাভ অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে কলহের অন্যতম কারণ। মধ্যযুগে সার্বিয়া যে একটি স্বাধীন বড় রাজ্য ছিল একথা সে ভুলতে পারে নাই। এখন সে নিজেকে দক্ষিণ-শ্লাভ-জাতিদের মুক্তিদাতারূপে মনে করতে লাগলো। সার্বিয়া তুরস্কের কবল থেকে প্রথম দিকেই মুক্তিলাভ করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, সে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

তরুণ-তুর্কী বিপ্লবের পর ইউরোপীয় ভাগ্যাকাশে মহাযুদ্ধের ছায়া দ্রুত ঘনীভূত হতে লাগলো। বিজয়ী অষ্ট্রিয়া, মদমত্ত জার্ম্মেণী, শঙ্কাপীড়িত ইউরোপ, উত্তেজিত রাশিয়া এবং রুষ্ট সার্বিয়া—এ সব কিছুর মধ্যে আসন্ন দাবাগ্নির সঙ্কেত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নতুন একতাবদ্ধ ইতালিও জার্ম্মেণীর মত সাম্রাজ্য-প্রসারের জন্য উদ্‌গ্রীব হলো। ফ্রান্স, উত্তর-আফ্রিকার আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়া জয় করেছিল আর ইংলণ্ড মিশর অধিকার করেছিল, এজন্য ইতালি ত্রিপোলী অধিকার করবার অভিপ্রায়ে, অতর্কিতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এ যুদ্ধ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লসেন সন্ধির দ্বারা শেষ হয়, ত্রিপোলী ইতালির হস্তগত হয়।

এ সময়ে ক্রীট-নেতা ভেনিজিলসের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার বলে দীর্ঘ-আকাঙ্ক্ষিত **বলকান সঙ্ঘের** গঠন হয়। পশ্চিম-ইউরোপীয় প্রধান শক্তিদের ঔদাসীন্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং বিশেষ করে, মাসিডোনিয়ার খৃষ্টানদের প্রতি তুর্কীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে রুষ্ট হয়ে গ্রীস, সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া এই বলকান সঙ্ঘে যোগদান করে। এই শক্তিপুঞ্জ দাবী করে যে, তুরস্কের খৃষ্টানদের প্রতি প্রতিশ্রুত সংস্কারগুলি অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করতে হবে। তুরস্ক এই দাবী অগ্রাহ্য করার ফলে বলকান সঙ্ঘ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

চারদিক থেকে তুরস্ক আক্রান্ত হয় ও যুদ্ধে তার ক্রমাগত পরাজয় হয়। এ যুদ্ধের ফলে তুরস্ক একপ্রকার বলকান ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত হয়। তার হাতে মাত্র কনষ্টাণ্টিনোপল, জানিনা এবং আলবেনিয়ার স্কুটারি অবশিষ্ট থাকে। প্রধান শক্তিগুলি অবশ্য তুরস্কের এ বিপর্য্যয়ে খুসী হয় নাই, কিন্তু তারা বলকান রাষ্ট্রগুলিকে বাধা দিতে পারলো না।

তরুণ-তুর্কীদল আদ্রিয়ানোপল্ ছেড়ে দিতে হলো বলে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে

উঠলো। তারা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আবার বলকান সঙ্ঘের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত হলো। এবারও তুরস্কের সবদিকে পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে হলো। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-শান্তির দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি হলো। কনষ্টান্টিনোপল সহ থেসের সামান্য একটু অংশ বাদে, তুরস্ক প্রায় সব কিছুই হারালো। আলবেনিয়া আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার পেল। এতদিন পরে ক্রীট গ্রীসের সঙ্গে সংযুক্ত হলো।

এ যুদ্ধের ফলস্বরূপ আলবেনিয়ার অধিকার নিয়ে ও আড্রিয়াতিক সাগরের দিকে পথ উন্মুক্ত করা সম্পর্কে, সার্বিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে ভীষণ মনান্তরের সৃষ্টি হলো। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া এসময়ে জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়ার অগ্রসরে শঙ্কিত হয়ে, সার্বিয়ার অনুকূলে ঝুঁকে পড়তে লাগলো। সার্বিয়ার ক্ষমতা বিনষ্ট করবার জন্য অষ্ট্রিয়া যুদ্ধের কামনা করছিল, আর জার্ম্মেণী পেছন থেকে তীব্রভাবে অষ্ট্রিয়াকে উত্তেজিত করছিল।

ইতিমধ্যে বিজয়ী বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধের ফললাভ নিয়ে বিবাদ বেধে গেল। বুলগেরিয়া আবার আগের মত রাজ্যের আয়তন স্ফীত করতে সচেষ্ট হলো। আবার মাসিডোনিয়ার অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এবং শীঘ্রই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বলকান রাষ্ট্রগুলির ভিতর গৃহযুদ্ধ সুরু হলো। একদিকে বুলগেরিয়া অপরদিকে সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো, গ্রীস ও রুমানিয়া। এই দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হয়ে বিশেষভাবে হেরে গেল। তুরস্ক এই সুযোগে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে পুনরায় আড্রিয়ানোপল্ অধিকার করলো। অষ্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার লাঞ্ছনা ও সার্বিয়ার অগ্রাভিযানে আতঙ্কিত হয়ে, উভয় পক্ষকে বুখারেষ্ট সন্ধি দ্বারা যুদ্ধে বিরত হতে বাধ্য করলো।

দুইটি বলকান যুদ্ধের অবসানে বলকান অঞ্চল থেকে তুর্কী-সাম্রাজ্য একরূপ অন্তর্হিত হলো, আর খৃষ্টান রাজ্যগুলির আয়তন বেড়ে গেল। সবচেয়ে বেশী লাভ করলো সার্বিয়া ও গ্রীস। অষ্ট্রিয়াকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে সার্বিয়া, অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোসনিয়, হার্জিগোভিনিয়, ক্রোট, শ্লোভেন প্রভৃতি দক্ষিণ-শ্লাভ জাতিগুলির মধ্যে ষড়যন্ত্র চালাতে লাগলো। অষ্ট্রিয়াও সার্বিয়াকে উচিত শিক্ষাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিবাদের অজুহাত খুঁজতে লাগলো। রাশিয়া কিন্তু ক্রমাগত সার্বিয়াকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলো। তারপরে সংঘটিত হলো ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, সেই ভীষণ কাণ্ড যার থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলো। এসময় অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড বোসনিয়ার

রাজধানী সিরাজিভো নগরীতে, এক সার্ব বিপ্লবী যুবকের গুলিতে নিহত হন। একরূপ সঙ্গে সঙ্গেই অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সার্বিয়া ও শেষের ভাগে রুমানিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। বুলগেরিয়া ও তুরস্ক জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। এ যুদ্ধের প্রথম দিকে সার্বিয়া, অষ্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়া কর্ত্তৃক প্রবল ভাবে আক্রান্ত হয়। বুলগেরিয়ারও রাশিয়ার হস্তে লাঞ্ছনা কম ভোগ করতে হয় না। গ্রীস এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করে তবে শেষের দিকে মিত্রপক্ষের দিকে আসক্ত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে, জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়ার পরাজয় হলে, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। বিজয়ী পক্ষ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, ভার্সাই সন্ধি ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘের সর্ত্তাবলী দ্বারা, বলকান রাষ্ট্রগুলিকে জাতীয়তাবাদ ভিত্তির উপরে গঠিত করে। প্রাক্তন অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগস্থ, শ্লাভ জাতিগুলির সমাবেশে একটি নতুন বড় যুক্তরাজ্যের সৃষ্টি করা হয়। এ রাজ্যের নাম হলো **যুগোশ্লাভিয়া** এবং এর অন্তর্গত হলো সার্বিয়া, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা রাষ্ট্র ও সার্ব, ক্রোট, শ্লোভেন জাতি প্রভৃতি। সার্বিয়া এ রাজ্যে আধিপত্য লাভ করলো।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা বলকান অঞ্চলে পরিবর্ত্তন আনা হলো সবচেয়ে বেশী। বহুদিনের পরাধীনতার পর, পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করলো। পূর্ব্ব-বালটিকে ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া এই চারটি স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। চেকোশ্লোভাকিয়া নামে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হলো। হাঙ্গারী ও অষ্ট্রিয়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হলো। বুলগেরিয়ার আয়তন সঙ্কোচ করা হলো ও ছোট রাষ্ট্র আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হলো। মূল বলকান খণ্ডে তিনটি বড় রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো, যথা— যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং গ্রীস।

এই সব নব সৃষ্টির ফলে পূর্ব্ব-ইউরোপ ও বলকান অঞ্চল বহুভাগে বিভক্ত হলো আর এতে বলকান সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান হলো না। তুরস্কের কনষ্টান্টিনোপল ছাড়া আর বলকান অঞ্চলে বিশেষ কোন অধিকার থাকলো না। যদিও বলকান রাজ্যগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হলো কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানাজাতির সংমিশ্রণ থেকেই গেল। একটা সংখ্যালঘু-সমস্যা থেকেই গেল এবং এর

থেকে ক্রমাগত অশান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। বলকান রাষ্ট্রগুলির আর্থিক বিশৃঙ্খলা বেড়েই যেতে লাগলো এবং এ রাষ্ট্রগুলির সীমান্তরেখা এলোমেলো ভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছিল বলে, সবদিক দিয়েই গোলযোগ ও অশান্তি যুদ্ধের পর বরাবর বাড়তেই লাগলো।

বলকান রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থানই এরূপ জটিল যে ইতিহাসই যেন তাদের অদৃষ্টে শান্তিতে শাসন চালনা করবার অধিকার দেয়নি। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও, জার্ম্মেণী ও রাশিয়া দুই দুর্দ্দান্ত প্রতিপক্ষশক্তির ঝঞ্ঝার আবর্ত্তে পড়ে, বলকান দেশগুলিই সহ্য করেছে অধিকতম দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা। একবার গর্ব্বিত হিটলারের বিজয়ী রথ এই দেশগুলির বুকের উপর দিয়ে অভিযান করে আবার শক্তিমান্ সোভিয়েট রাশিয়ার পাল্টা-আক্রমণের রথচক্র এই দেশগুলিকেই ক্ষতবিক্ষত করে।

বলকান দেশগুলির বর্ত্তমান অবস্থা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে, বলকান দেশগুলির অধিকাংশ উৎকট কৃষি ও আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে পোটসডাম্ সন্ধির পরে অধিক সংখ্যক বলকান রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা মিটাতে না পেরে, রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট মতবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি পূর্ব্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্র ক্রমে, রাশিয়া পরিচালিত কমিনফর্ম বা পূর্ব্ব-ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট চক্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব দেশে দ্রুতগতিতে বামপন্থী 'লোকসাধারণতন্ত্র' স্থাপিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলিতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দলগুলিকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাশূন্য করা হয়েছে। কমিনফর্ম অন্তর্ভুক্ত-বলকান দেশসমূহ এখন রাশিয়াপুষ্ট, "পরস্পর আর্থিক সাহায্যকল্পে পূর্ব্ব-ইউরোপীয় পরিষদ"এ যোগদান করেছে। এই পরিষদ রাশিয়ার পক্ষে, ইঙ্গ-আমেরিকা উদ্ভাবিত পশ্চিম-ইউরোপীয় মার্শাল প্ল্যান ও উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির পাল্টা জবাব। বর্ত্তমানে এই পরিষদভুক্ত বলকান রাষ্ট্রগুলির, পশ্চিম-ইউরোপীয় শক্তিনিচয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বললেই চলে।

গ্রীস ও তুরস্ক সরকার এখন ইঙ্গ-আমেরিকার চক্রের অধীনেই আছে

যদিও গ্রীসের একদল লোক কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন। যুগোশ্লাভিয়ার নেতা **টিটো** বামপন্থী দলের লোক বটে কিন্তু তিনি ক্রমেই রাশিয়া ও

মার্শাল টিটো

কমিনফর্ম রাষ্ট্রগুলির সাথে তীব্র বিরোধে জড়িয়ে পড়ছেন যুগোশ্লাভিয়া এখন নানাভাবে আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে।

প্রায় চারশ' বছর আগে, উত্তর-আমেরিকার উর্ব্বরা ভূমি এবং অফুরন্ত খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়ে, **ইংরেজ** এবং **ডাচরা** আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে, সেখানে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে। আমেরিকার জমিতে ধান, তামাক, গম, তূলা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, আর তার খনিতে যে কয়লা, লোহা, পেট্রল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তার শেষ নাই। এই বিশাল দেশে গিয়ে ইংরেজ এবং ডাচরা, এক একজনে অনেকখানি করে জমি নিয়ে বাস করতে লাগলো।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ডে **ধর্ম্মব্যাপারে সংঘর্ষের জন্য,** একদল ইংরেজ পিউরিটান বা গোঁড়া-প্রোটেস্টাণ্ট তীর্থযাত্রী, "মে-ফ্লাওয়ার" জাহাজে হল্যাণ্ড থেকে প্রথমে আমেরিকায় যান। ক্রমে, দলে দলে ইংরেজ আমেরিকায় যাওয়ায় তাদের সংখ্যাই সেখানে সবচেয়ে বেশী বেড়ে গেল। ইংরেজরা আস্তে আস্তে উত্তর-আমেরিকার আটলাণ্টিকের উপকূলে, দশটি আলাদা **উপনিবেশ** স্থাপন করে, নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে লাগলো। ডাচদের ছিল তিনটি উপনিবেশ, সেই তিনটির উপর ইংরেজদের নজর পড়লো। সংখ্যায় অল্প ডাচদের কাছ থেকে, অনায়াসে তারা সেই তিনটি উপনিবেশ কেড়ে নিয়ে, **তেরোটি উপনিবেশই** নিজেদের করে নিল। এই উপনিবেশগুলোই পরে,

আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্রে** পরিণত হয়েছে, আমেরিকা বলতে সাধারণতঃ এই যুক্তরাষ্ট্রকেই বোঝায়।

উপনিবেশের লোকেরা বেশীর ভাগ ইংরেজ ছিল বলে তারা ইংলণ্ডের রাজাকেই নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করতো। পার্লামেণ্টের তৈরি আইন-কানুন মোটামুটি ভাবে মেনে চলতে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। প্রত্যেক উপনিবেশে একজন করে গবর্ণর এবং গবর্ণরকে পরামর্শ দেবার জন্য, একটা করে মন্ত্রণা-পরিষদ থাকতো। উপনিবেশের সাধারণ আইন তৈরির জন্যে, সাধারণ লোকদের নির্ব্বাচিত একটা ছোটখাটো পার্লামেণ্ট থাকতো। গবর্ণর এবং তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যপদের লোক নিযুক্ত করবার ক্ষমতা কিন্তু আমেরিকানদের ছিল না, ইংলণ্ডের রাজা এঁদের নিযুক্ত করতেন।

"মেফ্লাওয়ার" জাহাজ

বিরোধের সূত্রপাত

এইভাবে বেশ দিন কাটছিল। অসুবিধার মধ্যে শুধু **রেড ইণ্ডিয়ান** নামক আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা মাঝে মাঝে এসে হানা দিয়ে উপদ্রব করতো। ইংলণ্ডের যুদ্ধ-জাহাজ এদের উৎপাত থেকে রক্ষা করে, আমেরিকাকে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সাহায্য করতো বলে ইংলণ্ড এক **দাবী** তুললো যে, আমেরিকা তার সঙ্গে ছাড়া আর কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে না। **ক্রমওয়েলের শাসনকালে** ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই ধরণের একটা আইনও পাশ হয়। এই আইনকে বলে **'নেভিগেশন আইন'**।

'নেভিগেশন' শব্দের মানে হচ্ছে, সমুদ্রে যাতায়াত; সুতরাং 'নেভিগেশন আইনে'র মানে, সমুদ্রে যাতায়াত-বিষয়ক আইন। এই আইনটা পাশ হবার পর অবস্থাটা এই দাঁড়ালো যে, আমেরিকা ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশ থেকে কোন জিনিষ আমদানী করতে পারবে না, ইংলণ্ড ছাড়া অন্য কোথাও তার নিজের দেশের জিনিষ রপ্তানী করাও চলবে না। উপনিবেশের ইংরেজরা এই সব ব্যাপারে দেশের ইংরেজদের উপর **অসন্তুষ্ট** হয়ে উঠতে লাগলো।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে **কানাডা** নামে একটি দেশ আছে। এই দেশটিরও প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর, তাই দেখে ফরাসীরা এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আমেরিকায় যে সব ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতির লোক এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাদের নাম হয়েছে **আমেরিকান**। এরা এখন আর নিজেদের ইংরেজ, ফরাসী বা ডাচ প্রভৃতি বলে পরিচয় দেয় না, আমেরিকান নামে একটা আলাদা জাতিই গড়ে উঠেছে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তখন ভীষণ শত্রুতা চলেছে। আমেরিকানরাও মনে মনে ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্টই ছিল, কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে তাদের ঘাঁটাতে সাহস করতো না এই ভয়ে যে, ইংরেজের সঙ্গে যদি তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহলে কোনদিন হয়ত কানাডা থেকে ফরাসীরা এসে জোর করে, তাদের উপনিবেশ দখল করে নেবে অল্পদিনের মধ্যে। ইংরেজরাই আমেরিকানদের এই সমস্যার সমাধান করে দিল। তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 'সপ্তবার্ষিক যুদ্ধে' ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করে **কানাডা কেড়ে নিল**। আমেরিকানদের মনে যে ভয়টুকু ছিল, সেটাও দূর হয়ে গেল। তারা বুঝলো যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে এবার কানাডা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ষ্টাম্প আইন

এই সময় ইংলণ্ডের যিনি প্রধান মন্ত্রী, তাঁর নাম ছিল **জর্জ্জ গ্রেণভিল**। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, রেড ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত থেকে আমেরিকানদের রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডের অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমেরিকানরা এই টাকা দিতেও চায় না। তিনি তখন আদেশ দিলেন যে, ইংলণ্ডের ৭৫০০ সৈন্য আমেরিকায় এবং ২৫০০ সৈন্য

তার কাছেই, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ নামক দ্বীপে মোতায়েন থাকবে। এদের কাজ হবে বাইরের শত্রুর উপদ্রব থেকে আমেরিকানদের রক্ষা করা। কাজেই তিনি বললেন যে, **ব্রিটিশ সৈন্যদের কিছু খরচ** আমেরিকানদেরই দেওয়া উচিত।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে, এই বলে একটা আইন পাশ করালেন যে, এই সৈন্যদের খরচ বাবদ আমেরিকা বছরে এক লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি টাকা দেবে। এই আইনের নাম **'ষ্টাম্প আইন'**; কারণ, আমেরিকার লোকেরা যে সব দলিল সম্পাদন করবে, তার উপর ষ্টাম্প বসিয়ে এই টাকা আদায় করা হবে।

কোন লোক যদি অপরের কাছ থেকে জমিজমা অথবা বাড়ী-ঘর কেনে, কিংবা যদি কাউকে টাকা ধার দেয়, তাহলে সে টাকা দেবার সময় একটা লেখাপড়া করে নেয়। যে কাগজে এই লেখাপড়া করা হয় তাকে বলে দলিল, আর এই লেখাপড়া করাকে বলে দলিল সম্পাদন করা। আমাদের দেশে আইন আছে যে, এই রকম সব দলিলে সরকারের কাছ থেকে ষ্টাম্প কিনে সেটা এঁটে দিতে হবে। গ্রেণভিল আমেরিকার জন্য যে আইন পাশ করিয়েছিলেন, সেটা ঠিক এই জিনিষই।

ষ্টাম্প আইন পাশ হবার পর আমেরিকানরা গেল ভীষণ চটে। অধিকাংশ আমেরিকান জাতিতে ইংরেজ, তাদের মধ্যে গণ-অধিকারবোধ খুব প্রখর ছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আমেরিকানদের কোন প্রতিনিধি ছিল না, অতএব সে পার্লামেণ্ট কি করে আমেরিকানদের উপর ট্যাক্স বসাতে পারে, এই নিয়ে **জোর আন্দোলন** আরম্ভ হয়ে গেল। গ্রেণভিল সে ধাক্কা সামলাতে পারলেন না, এক বছরের মধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেন। তাঁর পরে প্রধান মন্ত্রী হলেন **লর্ড রকিংহাম**।

ইংলণ্ডে তখন **এডমাণ্ড বার্ক** নামে একজন বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা এবং বাগ্মী ছিলেন। তিনি নতুন প্রধান মন্ত্রী লর্ড রকিংহামকে বুঝালেন যে, আমেরিকানদের শান্ত করা একান্ত দরকার। রকিংহাম তাঁর কথা শুনে ষ্টাম্প আইন তুলে দিলেন; কিন্তু এই সঙ্গে তিনি আর একটা আইন পাশ করে, আমেরিকানদের জানিয়ে দিলেন যে, আমেরিকার জন্য আইন তৈরি করবার এবং ট্যাক্স বসাবার **অধিকার**, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আমেরিকার জন্য কেন সবরকম আইন তৈরি

করবে এবং ট্যাক্স বসাবে, এই ধরণের প্রতিবাদ আমেরিকানরা তুলেছিল বলেই রকিংহাম ঐ আইন পাশ করালেন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে, বড় পিটের মন্ত্রিসভার রাজস্ব-সচিব **টাউনসেণ্ড,** উপনিবেশে চা, কাঁচ এবং কাগজের **আমদানীর উপর শুল্ক** বসালেন।

ষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আমেরিকানরা আবার ক্ষেপে উঠলো এবং মাসাচুসেট্‌স নামক উপনিবেশ তীব্র প্রতিবাদ জানালো। কিছুদিন এই নিয়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে

বিরোধ চললো। অবশেষে **লর্ড নর্থ** প্রধান মন্ত্রী হয়ে, বাণিজ্য-শুল্ক তুলে দিলেন। আমেরিকানদের উপর কর বসাবার অধিকার যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে, শুধু এই কথাটা আমেরিকানদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার জন্য, তিনি **চায়ের উপর** একটা নামমাত্র শুল্ক রেখে দিলেন। আমেরিকানরা এটাও সহ্য করলো না। এই শুল্ক তুলে দেবার জন্য তারা একটা সমিতি গঠন করলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো যে, বিলাতী পণ্য তারা কেউ কিনবে না।

আমেরিকানরা ইংলণ্ডের লোকদের জানালো যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাবার জন্য কোন প্রতিনিধি যখন নাই, তখন তাদের উপর কর বসাবার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের থাকতে পারে না। ইংলণ্ড তার জবাবে বললো যে, আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের অধীন উপনিবেশ, তখন তার জন্য যে-কোন আইন তৈরি করবার এবং কর বসাবার ক্ষমতা, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিশ্চয়ই আছে। এই তর্ক নিয়ে দুই দেশের **বিরোধ** চরমে উঠলো। আমেরিকানরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো যে, তাদের বাণিজ্য তারা অবাধে চালিয়ে যাবে, ইংলণ্ডের কোন প্রভুত্ব তারা কিছুতেই সহ্য করবে না।

স্বাধীনতা অর্জ্জন

আমেরিকানদের মধ্যে স্বাধীনতার ধারণা আগে থেকেই ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অন্যায় ব্যবহার না করলেও হয়ত, তারা ক্রমে স্বাধীন হয়ে যেত। ষ্টাম্প আইন প্রভৃতি আইনে তাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন উগ্র হয়ে উঠলো। শীঘ্রই কয়েকটি অপ্রীতিজনক ঘটনা ঘটলো, আর এরূপ একটি ঘটনা থেকেই ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার **যুদ্ধের সূচনা** হয়।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, ঔপনিবেশিকগণ একটি ইংরেজ জাহাজ পুড়িয়ে ফেললো। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন উপনিবেশবাসী, রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে, **বোষ্টন বন্দরে** কয়েকটি ইংরেজ জাহাজ হতে, ৩৪০টি চায়ের বাক্স **সমুদ্রে ফেলে দিল**। ইংলণ্ডের অপরিণামদর্শী রাজা **তৃতীয় জর্জ্জ** ও **লর্ড নর্থ** তখন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করলেন। বোষ্টন বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং মাসাচুসেটস প্রদেশের স্বায়ত্ত-শাসন বাতিল

করা হলো। কিন্তু দমননীতি, ঔপনিবেশিক প্রতিরোধকে আরও প্রবল করে তুললো।

সকলের আগে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, **মাসাচুসেটস** নামক উপনিবেশ। জর্জ্জিয়া নামক একটি উপনিবেশ ছাড়া আর ১২টি উপনিবেশই মাসাচুসেটসকে সমর্থন করলো। ১৭৭৪ সালে এই ঘটনা ঘটলো। লর্ড নর্থ তখনও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। বিদ্রোহ যাতে সমস্ত আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য তিনি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু ফল হলো না।
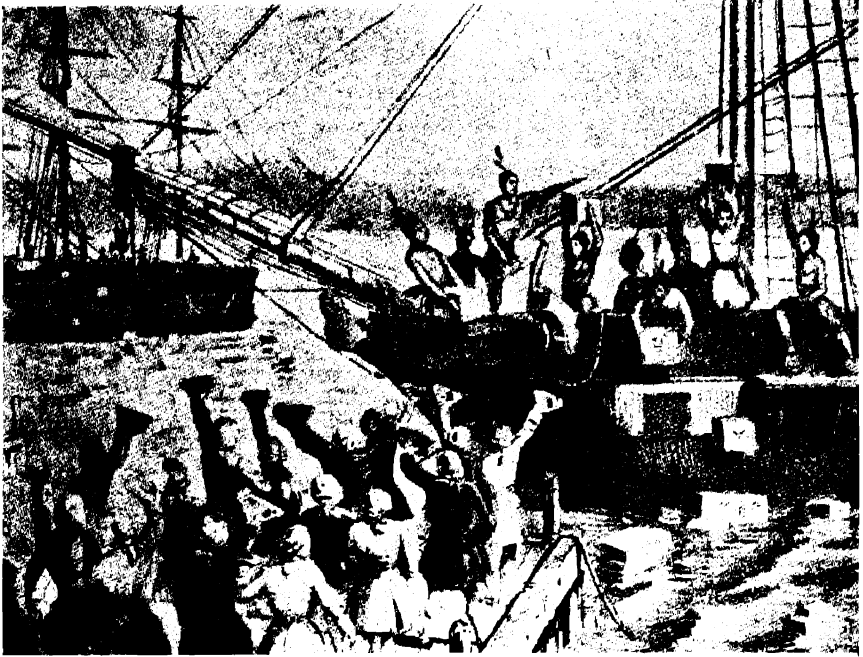
ইংরেজ জাহাজ হতে চায়ের বাক্স সমুদ্রে নিক্ষেপ

আমেরিকানরা একটা কংগ্রেস গড়ে তুললো এবং এই কংগ্রেসের উপর স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভার ছেড়ে দেওয়া হলো।

পরের বছর লেক্সিংটন নামক একটি বড় সহরে, ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে উপনিবেশের সৈন্যদের একটা ছোটখাটো রকমের **যুদ্ধ** হয়ে গেল। এই ব্যাপারের পর আমেরিকান কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হলো এবং **জর্জ্জ ওয়াশিংটন** নামক একজন নেতার উপর জাতীয় সৈন্যদল গঠনের ভার দেওয়া হলো।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন ছিলেন **ভার্জ্জিনিয়া** নামক উপনিবেশের এক

জমিদারের ছেলে। এঁদের নিজেদের জমিতেই প্রচুর তামাক উৎপন্ন হতো এবং তাই থেকে তাঁদের যথেষ্ট টাকা আয় হতো। ১৭৩২ সালে ওয়াশিংটনের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী, সাহসী ও কর্ম্মঠ ছিলেন। তাঁর বয়স যখন এগার বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। একুশ বছর বয়সে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি দেশের রাজনীতিতে যোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং দেশের লোকের অশেষ বিশ্বাস অর্জ্জন করেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের হাতে, স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতৃত্ব-ভার তুলে দিয়ে, আমেরিকানরা মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করতে লাগলো।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন

১৭৭৫ সাল থেকে, ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে আমেরিকানদের প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে, আমেরিকানরা অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে **যুদ্ধ** করতে লাগলো এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করলো। তবুও আমেরিকানরা বুঝতে পারলো যে, বাইরের কোন দেশের সাহায্য না পেলে শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে তারা লড়ে উঠতে পারবে না।
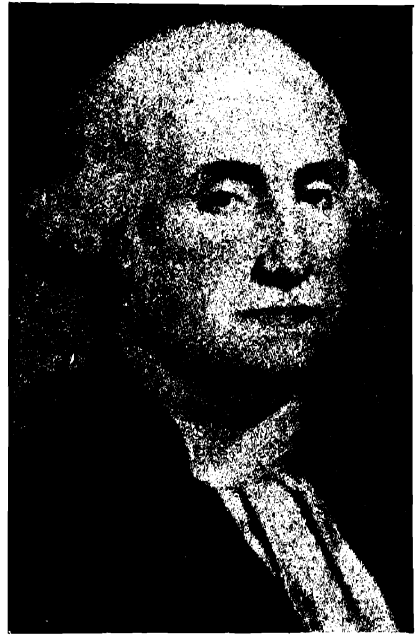
ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা তখনও চলেছে। কানাডা হারিয়ে ফ্রান্স ইংরেজদের উপর ভীষণ চটে রয়েছে। আমেরিকানরা তাদের সাহায্য চাইতেই তারা রাজী হয়ে গেল, কিন্তু ঐ সঙ্গে তারা দাবী করলো যে, তাদের সাহায্য নিতে হলে আমেরিকাকে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। আমেরিকানরা এই সর্ত্তে সম্মত হয়ে, ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই, **পূর্ণ স্বাধীনতা** ঘোষণা করলো।

ইংলণ্ডের তখন বড় দুঃসময়। ইউরোপের প্রায় সব দেশ তখন তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, প্রাশিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, নেপলস্, পর্টুগাল এবং হল্যাণ্ড তখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায়

লাফায়েৎ নামক একজন ফরাসীর নেতৃত্বে, ফ্রান্সের একদল স্বেচ্ছাসেবক আমেরিকানদের হয়ে যুদ্ধ করতে গেল।

ইংলণ্ডের জাহাজ যাতে আমেরিকায় এসে ঢুকতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখলেন লাফায়েৎ, আর ভিতরে স্থলযুদ্ধে জর্জ্জ ওয়াশিংটন, ইংরেজ সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে তুললেন। **ইংলণ্ড হেরে গেল।** ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে **"ভার্সাইয়ের সন্ধি"** দ্বারা এই সংগ্রামের অবসান হলো। ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করলো। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে-রাষ্ট্র সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তার সৃষ্টি এই ভাবে হলো।

আমেরিকা ত স্বাধীন হলো, কিন্তু তার নতুন শাসনতন্ত্র কি রকম হবে তাই নিয়ে এবারে নিজেদের মধ্যে মন-কষাকষি আরম্ভ হয়ে গেল। তেরটি উপনিবেশ এ সম্বন্ধে একমত হতে পারছিল না। চার বছর ধরে এই গোলযোগ চললো। অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে, জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে, **ফিলাডেলফিয়া নামক সহরে,** আমেরিকার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য এক সভার অধিবেশন হলো। এই সভাতেই আমেরিকার শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তেরটি উপনিবেশই তাকে মেনে নেয়। এই শাসন-সংবিধান রচনায় আমেরিকার যে নেতাগণ অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এঁরা হলেন **বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন,** রবার্ট মরিস, জেমস মাডিসন, আলেকজাণ্ডার হামিলটন, জর্জ্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি।

আজ দেড়শ' বছর হলো আমেরিকা এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই শাসিত হচ্ছে। তবে তেরটি উপনিবেশের সংখ্যা বেড়ে এখন আটচল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। উপনিবেশের বদলে এখন তাদের 'ষ্টেট' বা রাষ্ট্র বলা হয়।

আমেরিকার শাসনতন্ত্র মোটামুটি এই:—দেশে একজন সভাপতি থাকবেন; দেশের লোকেরা ভোট দিয়ে একটি পরিষদ গঠন করবে; এই পরিষদ সভাপতি নির্ব্বাচন করবেন। সভাপতি চার বছর পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকবেন। প্রত্যেক ষ্টেটে একজন গবর্ণর থাকবেন এবং একটি করে আইন-সভা থাকবে। সমস্ত দেশের জন্য একটা বড় আইন-সভা থাকবে, তার নাম **কংগ্রেস।** এই কংগ্রেসে দুটি ভাগ থাকবে, একটি **সিনেট,** অপরটি **প্রতিনিধি-পরিষদ।** প্রত্যেক ষ্টেটের আইন-সভা থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সিনেট গঠিত হবে, আর প্রতিনিধি-পরিষদে থাকবেন দেশের জনসাধারণের ভোটে নির্ব্বাচিত একদল প্রতিনিধি। সভাপতি তাঁর নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন, এঁরা তাঁদের কাজের

জন্য কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকবেন না। তবে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সন্ধি করতে হলে, সভাপতিকে কংগ্রেসের অনুমতি নিতে

প্রথম সভাপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটনের শপথ গ্রহণ

হবে। জর্জ্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার **প্রথম সভাপতি** নির্ব্বাচিত হলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন ও দাসপ্রথা-উচ্ছেদ

আমেরিকানরা প্রথমে আটলাণ্টিক উপকূলের কাছে উপনিবেশ স্থাপিত করেছিল। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তারা দলে দলে আমেরিকার বিস্তৃত পশ্চিম অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে অনেক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় ও তারা সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। আমেরিকা যত বিস্তৃত হতে থাকে, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত ততই প্রবল হতে থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের **দক্ষিণ অংশের** কয়েকটি রাষ্ট্রে তখনও **দাসপ্রথা** বিদ্যমান ছিল। সেখানকার আমেরিকানরা **নিগ্রোদের ক্রীতদাস** করে রাখতো এবং চাষ-আবাদের সমস্ত কাজ তাদের দিয়ে করাতো। ক্রীতদাসদের তারা ভাল করে খেতে দিত না, কুকুর-বিড়ালের মত তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো। সামান্য খাবার এবং মাথা গোঁজবার একটুখানি জায়গা ছাড়া তাদের আর কিছুই দেওয়া হতো না। কথায় কথায় মনিবরা চাবুক দিয়ে তাদের পিঠের ছাল তুলে ফেলতেন, কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

উত্তরাঞ্চল-রাষ্ট্রের অধিবাসীরা এসব পছন্দ করতো না, তাদের অংশে কোন লোক ক্রীতদাস রাখতো না। দরকার হলে রীতিমত মজুরী দিয়ে, নিগ্রোদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিত।

এই দাসপ্রথা নিয়ে, **উত্তর ও দক্ষিণ দিকের** রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মন-কষাকষি সুরু হয়ে গেল। উত্তর দিকের লোকেরা বললো, যে বর্ব্বর-প্রথা মানুষকে পশু করে রাখে, সেটা কোন সভ্য সমাজে থাকা উচিত নয়। দক্ষিণ দিকের লোকেরা প্রতিবাদ করলো। তারা দেখলো যে দাসপ্রথা খুব সুবিধাজনক; ক্রীতদাস দিয়ে যত কম খরচে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, স্বাধীন মজুরদের দিয়ে ততখানি করানো সম্ভব নয়। তারা ক্রীতদাস-প্রথা তুলে দিতে ভীষণ আপত্তি করলো।

এই মত-বিরোধ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠলো। অবশেষে দক্ষিণ দিকের লোকেরা জানালো যে, তারা উত্তর দিকের অধিবাসীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে, একটা **নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবে।**

আব্রাহাম লিঙ্কন তখন আমেরিকার সভাপতি। তিনি দাসপ্রথাকে

অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। দক্ষিণ দিকের লোকেদের তিনি বলে দিলেন যে, আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের বাইরে গিয়ে আলাদা দেশ গঠন করা চলবে না। দরকার হলে, তিনি তাদের জোর করে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাখতেও কুণ্ঠিত হবেন না।

আব্রাহাম লিঙ্কন অত্যন্ত দৃঢ়-চরিত্র ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। গরীবের ঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক, ছুতোর-মিস্ত্রির কাজও মাঝে মাঝে করতেন। ছোটবেলা থেকেই লিঙ্কন খুব বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি সব সময় বাবার কাছে কাছে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন। বড় বড় গাছ কুঠার দিয়ে কেটে ফেলতে তাঁর একটুও কষ্ট হতো না। তাঁর বাবা লেখাপড়া একেবারেই জানতেন না, লিঙ্কন কিন্তু নিজে লেখাপড়া শিখলেন। যে-কোন বই পেলেই তিনি সেটি মন দিয়ে পড়তেন।
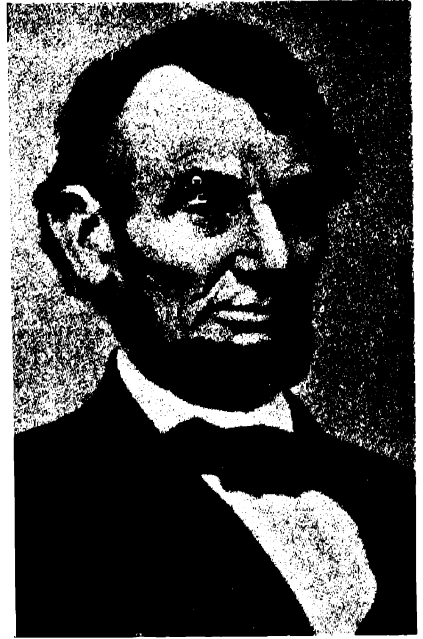
আব্রাহাম লিঙ্কন

বড় হয়ে লিঙ্কন এক গ্রামে, তাঁর একজন বন্ধুর সঙ্গে বখরায় একটি দোকান খুললেন। দোকানটা বেশী দিন চললো না, উঠে গেল। এতে তাঁর অনেক টাকা দেনা হয়ে গেল। তিনি এত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, পাওনাদারদের তিনি ফাঁকি দিলেন না। পনেরো বছর ধরে, নিজে কষ্ট সহ্য করে থেকে সেই দেনা তিনি শোধ করলেন। এরই মধ্যে তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করে, ছোট একটি সহরে ওকালতি আরম্ভ করলেন।

ওকালতি করতে গিয়েও তিনি কিন্তু তাঁর সততা বজায় রেখে চলতেন। যারা অপরকে ঠকাবার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা করতো, তিনি কিছুতেই তাদের পক্ষ সমর্থন করতেন না। একবার এক মোকদ্দমা হাতে নিয়ে কিছুদিন পর তিনি টের পেলেন যে, তাঁর মক্কেল অন্যায় করছে। তাঁকে সব কথা সে আগে বলে নাই, কাজেই আসল ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন নাই। প্রকৃত ঘটনা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে মোকদ্দমা

ছেড়ে দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি মানুষকে কখনও ঘৃণা করতেন না, তাঁর সঙ্গে কেউ শত্রুতা করলেও তিনি তাকে ক্ষমা করতেন। ১৮৬০ সালে, ৫১ বছর বয়সে তিনি আমেরিকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

লিঙ্কন যখন দক্ষিণ দিকের লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের আলাদা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি তিনি কিছুতেই দেবেন না, তারা তখন যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। চার বছর ধরে (১৮৬১-১৮৬৫) যুদ্ধ চললো। আমেরিকানদের নিজেদের মধ্যে, দুই দলে এই যুদ্ধ হয়েছিল, তাই একে বলে **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ**। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ভাঙ্গতে দেওয়া হবে না এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদ করে, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে হবে, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লিঙ্কন যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

স্বাধীনতার বিজয়-স্তম্ভ

চার বছর যুদ্ধ করবার পরে দক্ষিণ দিকের লোকেরা বুঝলো, আব্রাহাম লিঙ্কনকে দমানো চলবে না; তখন তারা পরাজয় স্বীকার করলো। এই যুদ্ধে তারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। লিঙ্কন তাদের ক্ষমা করলেন, এবং **ক্রীতদাসদের মুক্তি** দিয়ে, যাতে তারা উত্তর দিকের লোকদের মত সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু লিঙ্কনের এই ইচ্ছা সফল হবার আগেই, এক থিয়েটারগৃহে এক গুপ্তঘাতক গুলি করে তাঁকে হত্যা করলো। ক্রীতদাস-প্রথা দূর করা এবং **যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য** বজায় রাখার জন্য, আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্ত্তমান আমেরিকা

এই গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর সুরু হলো আমেরিকার সম্পদের দিন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, সভাপতি মনরোর বিঘোষিত, **"মনরো-নীতি"** অনুসারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতি ছিল, ইউরোপীয় ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে, সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে, নিজের পথে এগিয়ে
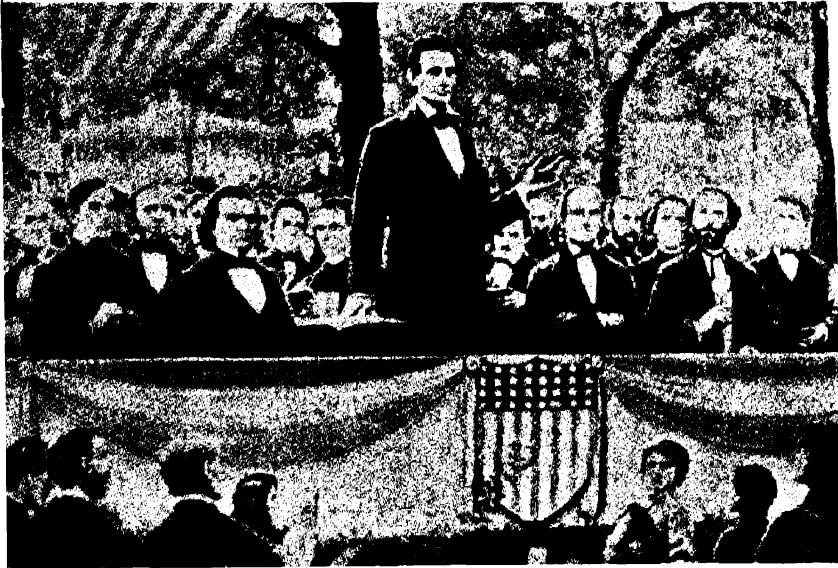
আব্রাহাম লিঙ্কন দাসপ্রথা নিয়ে মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করছেন

যাবে। যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকেও আমেরিকা মহাদেশের কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি। মনরো-নীতি থেকে সমগ্র আমেরিকার উপর, যুক্তরাষ্ট্রের একটা অভিভাবকত্বের ভাব গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতি ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে, আমেরিকা কিউবা, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, হাওয়াই দ্বীপমালা প্রভৃতি লাভ করে। শীঘ্রই আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে, জাপানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। শিল্পে ও ঐশ্বর্য্যে আমেরিকার সর্ববিধ উন্নতি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

আজ আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ। এখানে **এডিসনের মত বৈজ্ঞানিক** জন্মগ্রহণ করেছেন। টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করে, তিনি পৃথিবীর

এক দেশ হতে অপর দেশে খবর পাঠাতে শিখিয়েছেন। **রকফেলার, এণ্‌ড্রু কার্নেগীর** মত লোক কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করেছেন, তা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা দান করে গিয়েছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য।

দাসপ্রথা উঠে যাবার পর, আমেরিকায় **একটা নতুন সভ্যতা** গড়ে উঠেছে। সেখানে বড় বড় ধনী লোক এবং গরীব লোক যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তারা একজন অপরকে ঘৃণা করে না। সামান্য একজন দরিদ্র লোকও আশা রাখে, হয়ত একদিন সে-ও আমেরিকার সভাপতি হতে পারবে। লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারলে আমেরিকার **যে-কোন লোক** যুক্ত-রাষ্ট্রের **সভাপতি** হতে পারে; এ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই, শুধু যিনি সভাপতি হতে চান তিনি আমেরিকান হলেই হলো।
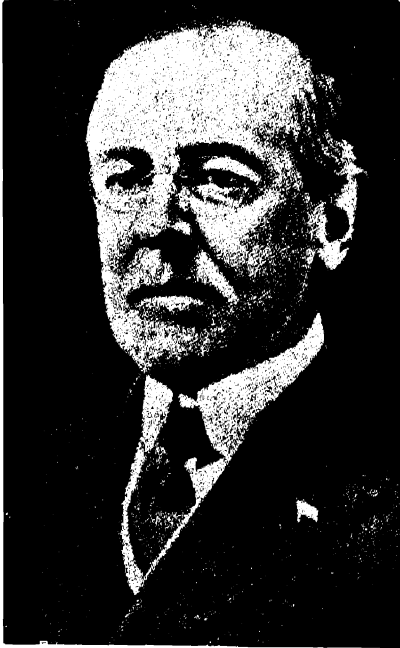
উড্রো উইলসন

স্বাধীনতা লাভের পর, আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজদের আগের সেই শত্রুতা ঘুচে গিয়ে আবার বন্ধুত্ব হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা এসে ইংলণ্ডের দিকে যোগ দেওয়াতে, ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। **উড্রো উইলসন** তখন আমেরিকার সভাপতি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আর কখনও যাতে যুদ্ধ হতে না পারে, সে জন্য উড্রো উইলসন চেয়েছিলেন—পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এমন একটা শক্তি-শালী জাতিসঙ্ঘ গড়ে তুলতে, যার ভয়ে কোন দেশই অপরকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। উইলসনের ইচ্ছানুযায়ী, এই রকম একটা **জাতিসঙ্ঘ** বা **'লীগ অব নেশনস'** সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে গঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু কার্য্যকালে, তিনি যা চেয়েছিলেন, এই সঙ্ঘ সে-রকমটি হয়ে উঠতে পারেনি।

রুজভেল্ট

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, **ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট** তখন আমেরিকার সভাপতি। ১৮৮২ সালের ৩০শে জানুয়ারী ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট আমেরিকার

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি আইন-পরীক্ষা পাশ করে, তিন বৎসর ওকালতি করেন। এই সময় হতেই তিনি

দেশের রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি দুবার নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রের গবর্ণর-পদে নির্ব্বাচিত হন। কিছুদিন তিনি আমেরিকার নৌ-বিভাগের সহকারী সেক্রেটারীর কাজও করেছিলেন। ১৯৩২ সালে, তিনি প্রথম আমেরিকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩০ সালের পর, পৃথিবীর সব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেক কমে গিয়েছিল, তার ফলে দেশের কৃষকদের উৎপন্ন ফসল ভাল দরে বিক্রী হতো না। কারখানার কাজ কমে যাওয়াতে শ্রমিকরাও খুব বেশী সংখ্যায় বেকার হয়ে পড়েছিল। এই বিপদ থেকে আমেরিকানদের বাঁচাবার জন্যে রুজভেল্ট প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সামলিয়ে নিতেও সক্ষম হন। তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকতেই নির্ব্বাচনের দিন এসে পড়ে, তাই আমেরিকানরা তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচন করে, তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার সুযোগ দিল। সত্যি-সত্যিই তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় আমেরিকার আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হলো।

রুজভেল্টের দ্বিতীয় দফা সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হবার এক বছর আগে, ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে দুটো মত প্রবল হয়ে ওঠে। রুজভেল্টের দল বললে, "এ যুদ্ধে ইংরেজদের সর্ব্বরকমে সাহায্য না করলে আমেরিকা নিজেই ভীষণ বিপদে পড়বে। হিটলার যদি একবার ইংরেজদের কাবু করতে পারেন, তাহলে তিনি আমেরিকাকে ছেড়ে দেবেন এ-কথা কিছুতেই মনে করা চলে না। সুতরাং যুদ্ধে না নেমে, দূর থেকে যত রকমে সম্ভব, অর্থাৎ টাকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র দিয়ে, ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত।"

রুজভেল্টের **বিপক্ষে** আমেরিকায় একটা মস্ত বড় দল ছিল, তার নাম **রিপাবলিকান দল।** রুজভেল্টের দলের নাম ছিল **ডেমোক্রাট দল।** বর্ত্তমানেও এ-দুটি দল আমেরিকায় খুব প্রধান। রিপাবলিকান দলের নেতা ছিলেন **ওয়েণ্ডেল উইলকি** নামে একজন কোটীপতি বণিক। এঁরা রুজভেল্টের দলের উত্তরে বললেন, "ইংরেজকে সাহায্য করার অর্থই হচ্ছে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। ইউরোপের ব্যাপারে আমেরিকার মাথা গলাতে যাবার কোন দরকার নাই। ইউরোপের রাজনীতি থেকে আমেরিকানদের দূরে থাকাই ভাল।"

১৯৪০ সালের সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় রুজভেল্ট এবং উইলকি

দুজনেই দাঁড়ালেন। রুজভেল্ট অনেক ভোটে উইলকিকে পরাজিত করে, **তৃতীয়বার সভাপতি** নির্ব্বাচিত হলেন। আমেরিকার কোন সভাপতির পক্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত নয় বলে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এই তার প্রথম ব্যতিক্রম হলো। উইলকি পরাজিত হয়ে তাঁর মত পরিবর্ত্তন করলেন। তিনি নিজে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে এলেন এবং বললেন যে, ইংরেজদের খুব বেশী করে সাহায্য পাঠানো উচিত।

রুজভেল্ট নানারকম আইন পাশ করিয়ে নিয়ে, ইংলণ্ডকে অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, যন্ত্রপাতি, রসদ প্রভৃতি তো দিলেনই, টাকাও ধার দিলেন। জার্ম্মেণীর বোমারু বিমানের জ্বালায় ইংলণ্ডের কল-কারখানাগুলি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, আমেরিকা থেকে সাহায্য পাওয়ায় তাদের অনেক সুবিধা হলো। এই সাহায্যের জোরে, ইংলণ্ড জার্ম্মেণীর সঙ্গে পূর্ণ তেজে যুদ্ধ করতে পারলো।

ওয়েণ্ডেল উইলকি

তবে নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এভাবে ইংলণ্ডকে সাহায্য করেছিল, এমনটা ভাবলে খুবই ভুল করা হবে। ১৯৪০ সালেই ইংরেজ সরকার, উত্তর-আমেরিকার বহু সহর, বন্দর, নৌ ও বিমান-ঘাঁটি ইত্যাদি নিরানব্বই বছরের জন্য ইজারা দিয়ে দেন মার্কিণ গবর্ণ-মেণ্টকে। উদ্দেশ্য—আমেরিকা সেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য ব্যূহ গড়ে তুলবে। ফলতঃ, নাৎসী-আক্রমণ পাছে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকায় এসে পড়ে, এই ভয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা উভয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তারই প্রতিরোধের জন্য এইসব জায়গা ইজারা নেওয়া এবং কানাডা-মার্কিণের ভিতর মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন।

এই ইজারার বিনিময়ে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশখানা ডেষ্ট্রয়ার দিয়ে দেয় ইংলণ্ডকে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরেই এগুলি ইংলণ্ডে এসে পড়ে।

বলা বাহুল্য, এইসব যুদ্ধ-জাহাজ পাওয়ার দরুণ ইংলণ্ডের প্রভূত শক্তিবৃদ্ধি হলো।

ইংলণ্ডে যখন জোর দৈনন্দিন বিমান-হানা চলতে লাগলো, তখন সেখানকার যুদ্ধ-পরিদর্শন করবার জন্য, ইংরেজ সরকারের আমন্ত্রণে, একদল সামরিক পর্য্যবেক্ষক লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট। এঁরা সেখানে যুদ্ধের যেসব নতুন নতুন রীতি ও কৌশল দেখে আসেন, তদনুযায়ী নবভাবে শিক্ষা দেওয়া হতে লাগলো মার্কিণ-বাহিনীকে।

১৯৪০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে **বাধ্যতামুলক সামরিক শিক্ষা** আইন পাশ হলো। এই আইনের প্রভাবের ভিতরে এল ২১ থেকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ১৬৫০০০০০ আমেরিকাবাসী। এই দেড় কোটীরও বেশী সমর্থ ব্যক্তি, দেখতে দেখতে শিক্ষিত সৈনিকে পরিণত হয়ে উঠলো।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে, পর পর দুইখানা মার্কিণ জাহাজ সুয়েজ-প্রণালীর মুখে **বোমার আঘাতে জলমগ্ন** হলো। এই মাসের শেষ ভাগে মস্কো নগরে রাশিয়া, ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহূত হয়। কিভাবে এই তিন শক্তি একত্রে, জার্ম্মাণ অগ্রগতির প্রতিরোধ করতে পারে, তাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

৩০শে অক্টোবর আইসল্যাণ্ডের অদূরে, মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার "রুবেন জেমস" টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হলো।

জাপানের মতিগতি ক্রমশঃ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে দেখে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ৬ই ডিসেম্বর তারিখে, ব্যক্তিগত শান্তি-আবেদন পাঠিয়েছিলেন জাপ-সম্রাটের কাছে। কিন্তু **৭ই ডিসেম্বর** সকালে, কোন চরমপত্র প্রদান না করেই, জাপ-বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হলো মার্কিণ-অধিকৃত বন্দর **পার্ল হারবারের উপর।** ম্যানিলাতেও বোমা পড়লো। ঐ দিনই জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রত্যুত্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও **জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা** করলো। ১১ই ডিসেম্বর জার্ম্মেণী আর ইতালিও যুদ্ধ ঘোষণা করলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

২২শে ডিসেম্বর, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল, ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে এক মন্ত্রণা-বৈঠকে মিলিত হলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, ওয়াশিংটনে সম্মিলিত ২৬টি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ **একত্র ঘোষণা** করলেন যে, তাঁরা একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে, এবং কেউই স্বতন্ত্রভাবে অক্ষশক্তির সঙ্গে

সন্ধি করবেন না। ২রা জানুয়ারী জাপানীরা **ম্যানিলা অধিকার** করলো।

-২৬শে জানুয়ারী মার্কিণ-সৈন্য উত্তর-আয়র্লণ্ডের আলষ্টারে এসে অবতরণ করলো। ৩১শে জানুয়ারী, মার্কিণ নৌ ও বিমানবহর গিলবার্ট ও মার্শাল দ্বীপে জাপানীদের আক্রমণ করলো।

২রা ফেব্রুয়ারী, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২৫ কোটী পাউণ্ড ঋণ দান করলো চীন-গবর্ণমেণ্টকে।

জানুয়ারীর শেষ ভাগেই, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্থল, জল ও বিমানশক্তি **জাপানী বাহিনীর সম্মুখীন** হয়েছিল। প্রধান যুদ্ধ চলছিল ফিলিপাইনের অন্তর্গত **বাতান উপদ্বীপে**। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি **ম্যাকআর্থার** এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাপ-সৈন্যের সম্মুখীন হয়েও, বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জাপানীরা ফিলিপাইন দ্বীপের **লুজনে অবতরণ** করলে সেখানেও চললো ঘোর যুদ্ধ।

ফিলিপাইনের অন্তঃপাতী সিউবিক উপসাগরে জেনারেল ম্যাকআর্থার আক্রমণ করলেন জাপানী সৈন্যকে। মার্কিণ **সেনাপতি ষ্টীলওয়েলকে** চীন-সরকার নিযুক্ত করলেন চীনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক-পদে। জেনারেল ম্যাকআর্থার গ্রহণ করলেন সর্ব্বাধিনায়ক-পদ, প্রশান্ত মহাসাগর-অঞ্চলে।

২রা মে, মার্কিণ "ইজারা ও ঋণ" (Lease and Lend) আইনের পরিধি ইরাক ও পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হলো। চীনকেও মার্কিণ "ইজারা ও ঋণ" আইনের আওতায় আনয়ন করা হলো জুন মাসের প্রথমেই। ৫ই জুন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

২৫শে জুন **জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে** নিযুক্ত করা হলো ইউরোপীয় রণাঙ্গনে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনার প্রধান সেনাপতি-পদে।

৭ই আগষ্ট সলোমান দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদাল ক্যানালে এসে মার্কিণ সেনা অবতরণ করলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মিত্রশক্তি মুখ্যতঃ যে সাহায্য পাচ্ছিল, তা হলো সমরোপকরণ, খাদ্য-সমগ্রী ও আর্থিক সাহায্য।

এই সময়েই **জাতিপুঞ্জ-সংসদ** প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে সুরু হয়।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কাসাব্লাঙ্কায় এসে

চার্চ্চিলের সঙ্গে মিলিত হলেন এক বৈঠকে। এইখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, জার্ম্মেণী বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ করবেন না।

উত্তর-আফ্রিকা রণাঙ্গনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব, মার্কিণ সেনাপতি আইসেন-হাওয়ারের উপর ন্যস্ত হলো। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে গুয়াদাল ক্যানাল মার্কিণ সেনার করায়ত্ত হলো।

মার্কিণ সেনা অতঃপর টিউনিসিয়ার যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে রইলো, ওদিকে

তিন প্রধানের সাক্ষাৎ

গুয়াদাল ক্যানালে নৌ ও বিমান-যুদ্ধ চালালো জাপানের বিরুদ্ধে। ২৯শে জুলাই, সিসিলির নিকোসিয়া দখল করলো মার্কিণ বাহিনী।

২রা সেপ্টেম্বর, চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে। ১৯শে অক্টোবর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিবগণ মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হলেন।

২২শে নভেম্বর, রুজভেল্ট ও চিয়াং-কাইশেকের এক সম্মেলন হলো কাইরোতে। আবার ২৮শে তারিখে তেহারাণে এক সম্মেলন হলো রুজভেল্ট, চার্চ্চিল ও ষ্টালিনের ভিতর।

১৯৪৪ সালের ২রা জানুয়ারী, পশ্চিম-রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির সর্ব্বাধিনায়ক-পদে বরণ করা হলো জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে।

২১শে ফেব্রুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ আয়ার-রাষ্ট্রকে এই অনুরোধ করে পাঠায় যেন অক্ষশক্তির সমস্ত প্রতিনিধিদের আয়ার থেকে বিদায় দেওয়া হয়।

৯ই জুন, মার্কিণ সেনা ফ্রান্সের অন্তঃপাতী ইসিনী অধিকার করলো। আভ্রাঙ্কেও তাদের অধিকৃত হলো। রেণী, ন্যাণ্টে, আঞ্জার্স, অর্লিয়েঁ, প্রত্যেক জায়গা থেকেই জার্ম্মাণ সৈন্যকে বিতাড়িত করলো মার্কিণেরা। মার্কিণ প্রথম বাহিনী ১১ই সেপ্টেম্বর, লাক্সেমবুর্গ-জার্ম্মাণ সীমান্ত পার হয়ে জার্ম্মেণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। আকেনের নিকটে সীগফ্রিড-

(বাম দিক হতে) প্রেসিডেণ্ট ট্রম্যান ও জেনারেল ম্যাক আর্থার

লাইন বিচূর্ণ হলো তাদের আক্রমণে। আকেন পরিবেষ্টিত হলো। ২৩শে অক্টোবর, জেনারেল দ্য'গল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত **নতুন ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে** স্বীকার করে নিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিণ সপ্তম বাহিনীর সম্মুখে জার্ম্মাণ সেনা ক্রমাগত পশ্চাৎপদ হতে লাগলো।

প্রথম বাহিনী সীগফ্রিড-লাইনের দুই মাইল দূরে, জার্ম্মাণ সীমান্ত পার হলো। ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৫) মার্কিণ সপ্তম বাহিনী মোজার নদী পার হলো। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম মার্কিণ বাহিনী, অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চললো বার্লিণের অভিমুখে।

ক্রিমিয়ার অন্তর্গত **ইয়াল্টাতে** রুজভেল্ট, চার্চ্চিল ও ষ্টালিনের এক সাক্ষাৎকার হলো, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। রাইন নদীর পশ্চিম তীরে, সর্ব্বত্রেই মিত্রশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। জার্ম্মাণ-প্রতিরোধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। ১৯শে এপ্রিল লিপজিগ, ২৮শে এপ্রিল রগসবার্গ এবং ৩০শে এপ্রিল মিউনিক অধিকার করলো মার্কিণ সেনা।

তৃতীয় বাহিনী চেকোশ্লোভাক সীমান্তে পৌঁছে গেল প্যাসোর নিকটে। নবম বাহিনী ব্যালোতে মিলিত হলো রুশসৈন্যের সঙ্গে। বার্লিণের পতন
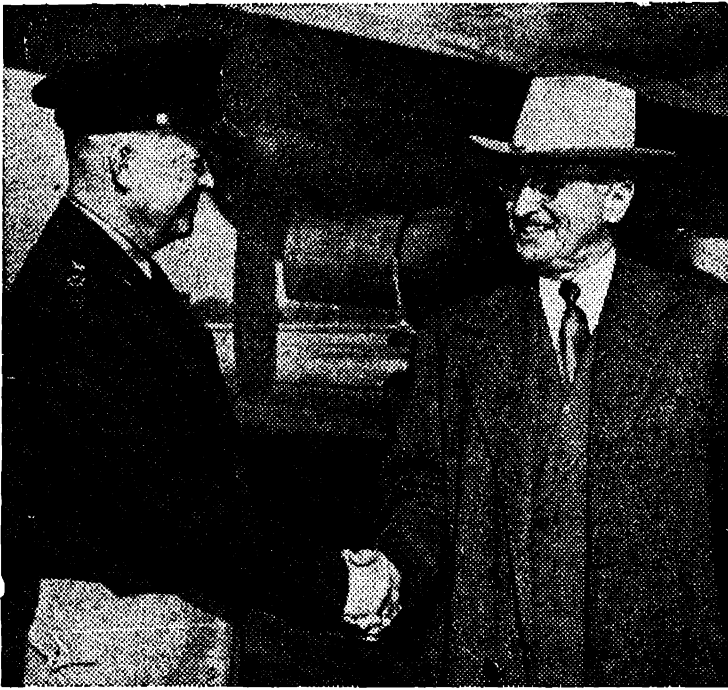
প্রেসিডেণ্ট টু ম্যান (ডান দিকে) ও জেনারেল আইসেনহাওয়ার

হলো ২রা মে, রুশসৈন্য প্রবেশ করলো বার্লিণে। সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণ বাহিনী-সমূহ **মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ** করতে লাগলো। মার্কিণ নবম বাহিনী নিরস্ত্র করলো জার্ম্মাণ নবম ও দ্বাদশ বাহিনীদ্বয়কে। মার্কিণ সপ্তম বাহিনী, বার্কেটস্‌গ্যাডেন, স্যালজবার্গ প্রভৃতি অধিকার করে, ব্রেনার-গিরিবর্ত্ম পার হয়ে **ইতালিতে প্রবেশ** করলো। ৮ই মে বার্লিণে জার্ম্মেণীর বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হলো। ৯ই মে গোয়েরিং ও মার্শাল কেসারলিং বন্দী হলেন ইতালিতে, মার্কিণ সেনার কাছে। **জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসান** হলো।

১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হয়

আকস্মিকভাবে। এর মাত্র তিন মাস আগে, তিনি চতুর্থবারের জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভ করলেন।

জার্ম্মেনীর পতনের পর ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হলো; কিন্তু অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জাপান তখনও অপরাজিত রয়েছে। আর দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাতে অনিচ্ছুক হয়ে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক ভীষণ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করলো জাপানের উপর। এর নাম 'য়্যাটম বোমা' (Atom Bomb) বা আণবিক বোমা। জাপানের **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** বন্দরের উপর দুটি মাত্র বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। তারই ফলে, ঐ দুটি সহর রেণু রেণু হয়ে ধূলোয় মিশিয়ে গেল! এই সাঙ্ঘাতিক বোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে, জাপান তখনই যুদ্ধ-বিরতির জন্য আবেদন জানায়। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, বেলা ১০॥টার সময় "মিসৌরী" জাহাজের উপর, জাপান **বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের চুক্তি-পত্র** স্বাক্ষর করলো।

অতঃপর মিত্রপক্ষের সামরিক শাসনের অধীনে আনীত হলো জাপান রাষ্ট্র। **জেনারেল ম্যাকআর্থার** নিযুক্ত হলেন মিত্রপক্ষের তরফ থেকে সামরিক শাসনকর্ত্তা। তিনি জাপান শাসন করতে লাগলেন জাপ মন্ত্রি-সভার সাহায্যে। যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী **হিদেকী তোজো** ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ, যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, **কোরিয়ার যুদ্ধের** ব্যাপারে মত-বিরোধের জন্য, আমেরিকার সভাপতি ট্রুম্যান, সেনাপতি ম্যাকআর্থারকে জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সামরিক কর্ত্তৃত্বপদ থেকে অপসারিত করেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার প্রভাব এখন সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে। কম্যুনিষ্ট নীতির কেন্দ্রশক্তি, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে, আমেরিকাই এখন, পশ্চিম-ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রধান ভরসাস্থল। উত্তর-আটলাণ্টিক-সংঘ ও ইউরোপ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য, আমেরিকা অকাতরে অর্থব্যয় ও সামরিক সাহায্য করে যাচ্ছে। জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানে আমেরিকার আধিপত্যই সবচেয়ে বেশী। দক্ষিণ-আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, কম্যুনিষ্ট-প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্র-গুলিকেও আমেরিকা আর্থিক সাহায্য করছে, যাতে তারা কম্যুনিষ্ট শক্তিকে ঠেকাতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকা

আমেরিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের বহু পূর্ব্বে, মধ্য-আমেরিকা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুতে উন্নত ধরণের সভ্যতা বিরাজ করতো।
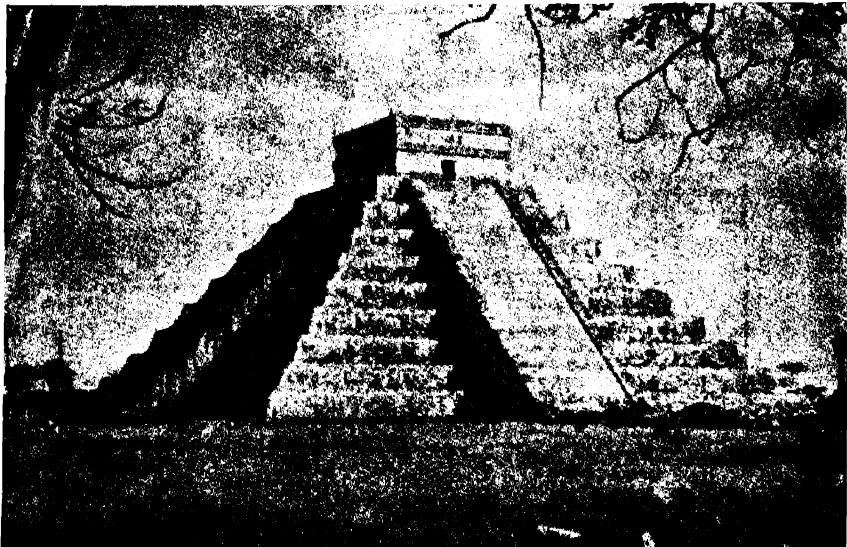
মায়া-সভ্যতার যুগের একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

এই সভ্যতা **"মায়া-সভ্যতা"** বলে অভিহিত হয়। যীশুখৃষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই এই সভ্যতা সুরু হয়।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে অনেক নগর গড়ে ওঠে। এই সময় প্রস্তরকার্য্য, মৃৎপাত্রশিল্প, বয়নশিল্প ও সুন্দব বঞ্জনশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। নগরগুলিতে বড বড প্রাসাদ নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা ছিল। তাদের লেখা কতকটা জটিল ধরণের ছিল। মায়া-সভ্যতার লোকেরা বিভিন্ন শিল্পে, বিশেষ করে ভাস্কর্য্যে খুব নৈপুণ্য লাভ করেছিল।

এই সকল সভ্য অঞ্চলে **অনেক রাষ্ট্র** গড়ে উঠেছিল। তাদের অনেক ভাষা

মাযা সভ্যতাব আব একটি নিদর্শন
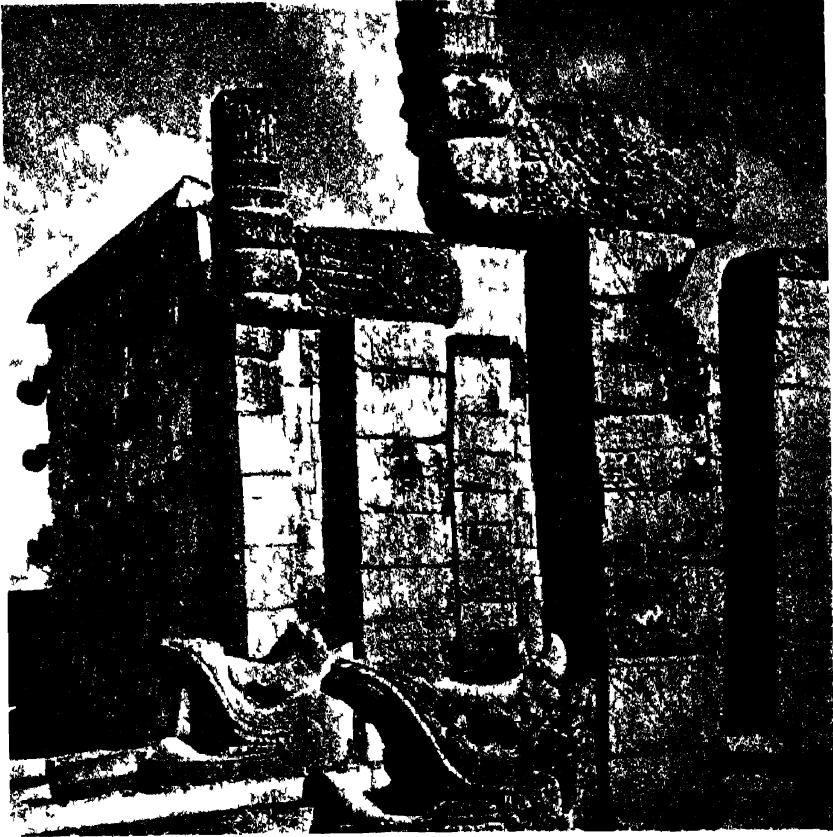
ও উন্নত ধরণের সাহিত্য ছিল। তাদের গবর্ণমেণ্ট ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রত্যেক নগরে শিক্ষিত সমাজ ছিল। দশম শতাব্দীতে **উক্সমল** একটি শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। অন্যান্য বড় নগরীর মধ্যে লাবুয়া, মায়াপন এবং সাওমুলতুনের নাম উল্লেখ করা যায়।

মধ্য-আমেরিকার তিনটি বড় রাষ্ট্র মিলে **'মায়াপন-সঙ্ঘ'** নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার স্থষ্টি করেছিল। এই সভ্যতায় পুরোহিতশ্রেণীর খুব আধিপত্য

ছিল। মায়াপন-সঙ্ঘ একশত বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়। তারপর বোধ হয়, একটা সামাজিক বিপ্লব হয় এবং মেক্সিকো ও **সীমান্তদেশ** থেকে বিদেশীরা এসে, এই দেশ আক্রমণ করে জয় করে। মেক্সিকো হতে যে আক্রমণকারীরা এসেছিল, তাদের নাম **আজটেক্‌স্**।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, এই আজটেক্‌স্‌রা একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত করে। তাদের রাজধানী ছিল **তেনেকতিতলন** নামে বড় নগরী। তারা সামরিক জাতি ছিল এবং মায়া-রাজ্যের প্রজাদের উপর অত্যাচার করতো। এই সাম্রাজ্য বাইরে খুব শক্তিশালী ছিল, কিন্তু ভিতরে তাদের ঘুণে ধরে গিয়েছিল। স্পেনের দুঃসাহসিক বীর **হারনান কর্টেস,** বন্দুক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই আজটেক্‌স্ সাম্রাজ্য জয় করেন। শীঘ্রই মায়া-সভ্যতা ও মেক্সিকো-সভ্যতার অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

দুইজন ইন্‌কা নরপতি

দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুর অধীশ্বরকে বলতো **'ইনকা'**। তিনি দৈব-নরপতির মত ছিলেন। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পেরু-সভ্যতার সঙ্গে মেক্সিকো-সভ্যতার কোন যোগাযোগ ছিল না। **পিজারো** নামক আর একজন স্পেনিশ যোদ্ধা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে, এই পেরু রাজ্য জয় করেন।

উত্তর-আমেরিকায় যেমন ইংলণ্ডের উপনিবেশ ছিল, দক্ষিণ-আমেরিকা ও মধ্য-আমেরিকায় তেমনি গড়ে উঠে স্পেনের উপনিবেশ। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় সবটাই ছিল স্পেনের অধীন, শুধু ব্রেজিল ছাড়া। পর্টুগীজরা এসে ব্রেজিল দখল করেছিল। প্রায় তিনশ' বছর দক্ষিণ-আমেরিকা স্পেনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডের রাজা যেমন উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশ-গুলোতে গবর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাতেন, স্পেনের রাজাও তেমনি দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশ শাসন করবার জন্য, গবর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাতেন।

দূর থেকে এইভাবে, এক দেশ অপর দেশকে বেশীদিন অধীনে রেখে শাসন করতে পারে না। উত্তর-আমেরিকা ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের হাতছাড়া

হয়ে গেল। দক্ষিণ-আমেরিকাতেও স্পেনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমে উঠতে লাগলো। আমেরিকা স্বাধীন হবার পর, তারাও একবার স্বাধীনতা লাভের

স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকানদের যুদ্ধ
(একখানি অতি প্রাচীন চিত্র হতে)

জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হলো না। স্পেনের কুশাসন, নিজেদের আর্থিক দুর্গতি, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরণা ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাকে জাগরিত করেছিল।

সাইমন বলিভার

সাইমন বলিভার নামক দক্ষিণ-আমেরিকার এক যুবকের মনে, দেশকে স্বাধীন করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। বলিভার ইউরোপ ভ্রমণে বেরোলেন। প্রথমেই তিনি গেলেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে। সেখান থেকে গেলেন ফ্রান্সে।

ফরাসী বিপ্লবের পর, **নেপোলিয়ন** তখন ফরাসী সম্রাটরূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন, তারই উৎসব ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরে

চলেছে। সাইমন বলিভার সেই উৎসব দেখে দুঃখিত হলেন। তাঁর মনে ধারণা হলো যে, ফ্রান্স তো সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করলো না! অত্যাচারী বুরবন রাজারা, একজনের পর একজন সিংহাসনে বসে কোটী কোটী লোকের উপর অবিচার করে গেছেন, দেশের কোটী কোটী লোক একজন লোকের খেয়াল মেনে চলতে বাধ্য হয়েছে।

একজন লোককে সিংহাসনে বসিয়ে, তাঁকে দেশশুদ্ধ সকলে রাজা বলে মেনে নিলে এরকম তো হবেই! একজন, দু'জন রাজা না-হয় ভাল হতে পারেন, কিন্তু সকলেই যে ভাল হবেন তার তো কোন মানে নাই। সুতরাং কোন লোককে রাজা না করে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, প্রজারা তাদের মনোমত লোক নির্ব্বাচিত করে, যদি তাঁর হাতে রাজ্যশাসনের ভার তুলে দেয় এবং তিনি যদি প্রজাদের বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে চলেন তাহলে প্রজাদের উপর অত্যাচার ও অবিচার হবার সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ, নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তাকে অন্যায় করতে দেখলে প্রজারা তাঁর কৈফিয়ৎ চাইতে পারে কিন্তু রাজার কাছে তা পারে না। নেপোলিয়নকে সম্রাট হতে দেখে সাইমন বলিভার এই জন্য খুব দুঃখিত হয়ে ইতালিতে গেলেন।

সাইমন বলিভার

নেপোলিয়ন ইতালি জয় করেছিলেন, কাজেই সেখানেও তিনি দেখলেন যে, নেপোলিয়ন ইতালির রাজা হয়েছেন বলে সেখানেও খুব উৎসব চলেছে। সাইমন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি দক্ষিণ-আমেরিকাকে স্পেনের রাজার অধীনতা থেকে মুক্ত করবেন এবং কাউকে রাজা করবেন না; প্রজাদের গবর্ণমেণ্ট গঠন করে, দেশের লোকের হাতে দেশ-শাসনের ভার তুলে দেবেন। এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে সাইমন বলিভার বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এলেন।

সাইমন বলিভার দেশে ফেরার অল্পদিন পরেই সংবাদ এলো যে, নেপোলিয়ন স্পেন জয় করেছেন। স্পেনের রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেছেন।

নেপোলিয়ন স্পেনের সিংহাসনে বসিয়েছেন তাঁর বড় ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে।

সাইমন দেখলেন, এই সুযোগ। স্পেনের রাজবংশের প্রতি দক্ষিণ-আমেরিকার লোকদের একটা অন্তরের টান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের উপর তাদের কোন ভক্তি ছিল না। কাজেই সাইমন বলিভারের উৎসাহে, **জোসেফ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে** যুদ্ধ করতে অনেকেরই আপত্তি হলো না।

ভেনিজুয়েলা নামক কলোনীটিতে **সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহ** ঘোষণা হলো। স্পেনের রাজা ভেনিজুয়েলায় যে গবর্ণর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, সেখানকার লোকেরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে, ভেনিজুয়েলায় প্রজাদের গবর্ণমেণ্ট গঠন করলো। এই ঘটনার পর থেকে, দক্ষিণ-আমেরিকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। সাইমন বলিভার হলেন এই **বিদ্রোহের নেতা**।

যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় সাইমন হেরে গিয়ে পলায়ন করলেন; কিন্তু তার অল্পদিন পরেই, তিনি আরও বেশী লোকজন নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ লোকই তাঁকে সাহায্য করতে লাগলো।

বছরের পর বছর ধরে এই **যুদ্ধ চললো**। সাইমন বলিভারই শেষে **জয়লাভ** করলেন, স্পেনের অধীনতা থেকে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলো মুক্তিলাভ করলো। দুর্ব্বল ও অক্ষম স্পেন আর তার উপনিবেশগুলোকে অধীনে রাখতে পারলো না।

উত্তর-আমেরিকায় যেমন ইংরেজদের তেরোটি উপনিবেশ ছিল, দক্ষিণ-আমেরিকাতেও তেমনি স্পেনের কয়েকটি উপনিবেশ ছিল; তার মধ্যে পাঁচটি ছিল বড়। এই পাঁচটির নাম মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু এবং ইকুয়াডর। এই উপনিবেশগুলি এক সঙ্গে করলে স্পেনের আকারের দশগুণ বড় হয়। শেষের চারটি উপনিবেশকে স্বাধীন করবার পর, তার প্রত্যেকটিতে **প্রজাদের গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়**। বলিভার তার একটিতেও কাউকে রাজা হতে দেন নাই। এই চারটির পর সাইমন আরও একটি উপনিবেশকে মুক্ত করেন; তাঁর নামানুসারে এই দেশটির নাম হয় **বলিভিয়া**।

উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার সব দেশের প্রতিনিধি নিয়ে, দুই দেশে

মিলে, একটি বিরাট শক্তিশালী গবর্ণমেন্ট গঠন করবার ইচ্ছা সাইমন বলিভারের মনে ছিল, কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। দক্ষিণ-আমেরিকায় সাইমন বলিভারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তারা তাঁকে **"পাঁচটি দেশের স্বাধীনতার জন্মদাতা"** বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

মনরো নীতি

ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়াডর এবং বলিভিয়াতে প্রজাদের গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে, ইউরোপের রাজা ও শাসক-সম্প্রদায় দস্তুরমত ভয় পেলেন। তাঁদের মনে ধারণা হলো যে, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা নিজেদের গবর্ণমেন্ট নিজেরা চালিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে এই দৃষ্টান্ত দেখে, ইউরোপের লোকেরাও যদি সেই পথ ধরতে আরম্ভ করে, তাহলে তাঁদের রাজত্বই তো আর থাকবে না! এই বুঝে ইউরোপের রাজারা, বিশেষ করে **অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক** দক্ষিণ-আমেরিকার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য, স্পেনকে সাহায্য করবেন বলে ঠিক করতে লাগলেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তখন যিনি সভাপতি, তাঁর নাম ছিল **মনরো**। সভাপতি মনরো ইউরোপের রাজাদের এই মতি-গতি বুঝতে পেরে ঘোষণা করলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলো তাদের নিজেদের ইচ্ছামত গবর্ণমেন্ট গঠন করবে, এ-অধিকার তাদের আছে। এতে অপর কোন দেশের, গায়ে পড়ে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং ইউরোপের কোন দেশ যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে, তাহলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তা সহ্য করবে না। সভাপতি মনরোর এই ঘোষণা **মনরো নীতি** নামে আজও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

সভাপতি মনরো ১৮২৩ সালে, এই নীতি ঘোষণা করেন এবং এর পর ইউরোপের কোন দেশ আর দক্ষিণ-আমেরিকায় বা আমেরিকার অন্য কোন অংশে যুদ্ধ করতে আসবার সাহস পায় নাই। মনরো ঐ সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছিলেন যে, আমেরিকার কোন দেশ, ইউরোপ বা এশিয়ার ব্যাপারে কখনো হাত দিতে যাবে না। ইংলণ্ডও দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিকে স্বাধীনতায় উৎসাহ দিয়েছিল।

দক্ষিণ-আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা

দক্ষিণ-আমেরিকায় এখন অনেকগুলি স্বাধীন দেশ আছে। তাদের মধ্যে ব্রেজিল, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়াডর, পেরু, বলিভিয়া, চিলি, আর্জ্জেণ্টাইন, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়ে প্রধান। এদের মধ্যে আকারে **ব্রেজিল সব চেয়ে বড়,** তারপরে আর্জ্জেণ্টাইন। এদের কোনটিতেই রাজা নাই, সবগুলিতে **প্রজাদের গবর্ণমেণ্ট** দেশ শাসন করছে। শুধু **গিনি** বলে একটা জায়গা আছে, সেটাকে তিনভাগ করে ইংরেজ, ডাচ এবং ফরাসীরা অধীন করে রেখেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, দক্ষিণ-আমেরিকার এই সব দেশের সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-সম্পর্ক বেড়ে যায়। এখনও এদের অধিকাংশের সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যই বেশী হয়। শুধু ইকুয়াডর এবং উরুগুয়ের সঙ্গে ইংরেজের আদান-প্রদান বেশী। ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে অনেক লোক, আজকাল দক্ষিণ-আমেরিকার এই সব দেশে গিয়ে বসবাস করছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের **প্রথম অবস্থায়** দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্তই ছিল **নিরপেক্ষ।** তবে জার্ম্মাণ গুপ্তচরেরা যাতে কোথাও ষড়যন্ত্র পাকাতে বা অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে তারা সবাই অল্পবিস্তর সতর্ক ছিল। ১৯৪৪এর ২৫শে জানুয়ারী, ট্রিনিডাডের ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আবিষ্কার করেন যে, আর্জ্জেণ্টাইনে নাৎসী গুপ্তচরেরা এক **ভীষণ ষড়যন্ত্র** করেছে। বৃত্তান্ত জানতে পেরে, কয়েকজন জার্ম্মাণকে ধৃত ও দণ্ডিত করেন আর্জ্জেণ্টাইন-গবর্ণমেণ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই, দক্ষিণ-আমেরিকার অন্যান্য দেশেও **জার্ম্মাণদের ধর-পাকড়** আরম্ভ হয়।

এ সত্বেও, আর্জ্জেণ্টাইনের উপর মিত্রশক্তির খুবই সন্দেহ ছিল শেষ পর্য্যন্ত। অক্ষশক্তির উপর এই দেশের সহানুভূতি খুবই প্রবল, এরকম ধারণা কোনদিনই বিসর্জ্জন দিতে পারে নি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ড।

১৯৪৩ সালে সবাই বুঝতে পারলো যে, অক্ষশক্তির ধ্বংস অনিবার্য্য। তখন এই সব নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, একে একে মিত্রশক্তির সঙ্গে **সক্রিয় সহযোগিতা** সুরু করলো। ১৯৪৪এর ৩রা জানুয়ারী, ব্রেজিল-বিমানবহর ইতালি যাত্রা করলো, জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। মে মাসে, এক অভিযাত্রী-বাহিনীও পৌঁছাল ইতালিতে।

অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে চিলি যুদ্ধ ঘোষণা করলো ১৯৪৫এর ১২ই ফেব্রুয়ারী, আর্জ্জেন্টিনা করলো ২৭শে মার্চ্চ, কলম্বিয়া ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৪। পেরু যুদ্ধ ঘোষণা করলো ১৯৪৫এর ১১ই ফেব্রুয়ারী। অন্যান্য দেশও ১৯৪৪ ও ১৯৪৫এর বিভিন্ন সময়ে, যুদ্ধ ঘোষণা করে মিত্রশক্তির সদিচ্ছা অর্জ্জন করলো। এরই ফলে, সানফ্রান্‌সিস্কোতে যখন **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের** প্রথম গোড়াপত্তন হলো তখন, দক্ষিণ-আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র অনায়াসেই তার সদস্য হতে পেরেছিল।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, দক্ষিণ-আমেরিকা কেবল **কাঁচা মালই রপ্তানী করতো** ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিনিময়ে আমদানী করতো প্রায় সকল রকম শিল্পদ্রব্য। কিন্তু যুদ্ধকালে ইউরোপীয় বাণিজ্য এক রকম বন্ধ হয়ে গেল; কাজেই দক্ষিণ-আমেরিকার স্থানে স্থানে নতুন নতুন **শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠলো।** কয়েক বৎসরের ভিতরই এ দেশে, বস্ত্র-শিল্পের ও কলকব্জা নির্ম্মাণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা গড়ে উঠে, দেশের সমৃদ্ধি সম্পাদন করেছে।

দক্ষিণ-আমেরিকা ও মধ্য-আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী দেশগুলিতে বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, জোর করে গবর্ণমেণ্ট অপসারণ এবং প্রকৃতপক্ষে, একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লেগেই আছে। কয়েকটি দেশে কম্যুনিষ্ট মতবাদ দ্রুত প্রবেশ করছে কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে তা দমন করছে। দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খুব বেশী। দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক-নীতিতে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটি প্রধান সহায়।